১৯৯৭ সালের বুকার পুরস্কার প্রাপ্ত

অরুন্ধতী রায়

দ্য গড অব স্মল থিংস

অনুবাদ ∫∫ আবীর হাসান

দ্য গড অব স্মল থিংস

অরুন্ধতী রায়

অনুবাদ : আবীর হাসান

সন্দেশ

ISBN-984-8088-66-0

দ্য গড অব স্মল থিংস

অরুন্ধতী রায়

অনুবাদ : আবীর হাসান

© সন্দেশ

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯

দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০০১

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহাবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে

লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত

কম্পোজ : **বুক ক্লাব কম্পিউটার** ৪৪ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

পানামা প্রিন্টার্স : ৫৯ পশ্চিম মালিবাগ ঢাকা ১২১৭ থেকে মুদ্রিত

পরিবেশক : **বুক ক্লাব** ৪৪ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

২২৫.০০ টাকা

উ ৎ স র্গ

নাসরিন হাসান

নক্সালীদের দৌরাত্ম্য এবং অন্যান্য সঙ্কট তাঁকে স্থিতিশীল থাকতে দেয়নি। নাম্বুদ্রিপাদের দল নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অনুসারী ছিলো, ফলে উগ্র বিপ্লবী বামপন্থীরা তাঁকে সংশোধনবাদী বলে অভিহিত করেছিলো। তবে নাম্বুদ্রিপাদ অবিচল ছিলেন। লেখিকার একটু শ্লেষ লক্ষ্য করা যায় নাম্বুদ্রিপাদের প্রতি। কারণটা হয়ত এই যে উপন্যাসটির আখ্যান ভাগটি রচিত হয়েছে যে এইমেনেম নামের অঞ্চলকে ঘিরে সেটি নাম্বুদ্রিপাদেরই আদি পৈতৃক বাসস্থান। সেখানেই প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মতো জাতপাতের বিভেদ, পার্টির নেতা এবং স্থানীয় বুর্জোয়া– লুম্পেনদের সঙ্গে আঁতাত, পুলিশী নৃশংসতা, প্রেমের মৃত্যু, দু'টি অবোধ মেধাবী শিশুর অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাওয়াকে লেখিকা সচেতন মানবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখে মানতে পারেননি। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল যে কিছু ফলেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। নিশ্চিতই তিনি আশা করেছিলেন সমাজ বদলের। কিন্তু তা হয়নি। হাহাকারটা যে ক্রোধ হয়ে উঠেছে, তা বেশ বোঝা যায়।

মার্কসবাদী রাজনীতি এবং ধর্ম বদলও যে ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে আদি বৈদিক বর্ণাশ্রম প্রথাকে লুপ্ত করতে পারে নি, আসলে তারই এক মর্মান্তিক কাহিনী এ উপন্যাসে বিধৃত। ভারতীয় অস্পৃশ্যদের ধর্মান্তরকে 'তপ্ত কড়াই থেকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া' বলে মন্তব্য করেছেন লেখিকা। আর ভারতীয় উচ্চমধ্যবিত্ত খৃস্টান পরিবারগুলোর প্রবণতাকেও সমালোচনা করেছেন অত্যন্ত রূঢ় ভাষায়। তাদের অতিরিক্ত ইংরেজী প্রীতি এবং বর্ণবাদী আভিজাত্যের গরিমা যে তাদের মানবতাবোধকে বিকশিত হতে দেয় না, ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতোই যে সেটা একইরকম চেতনায় আঘাত করে– সামাজিক সংস্কারে আঘাত করে– রাজনৈতিক সংস্কারে আঘাত করে এ বিষয়গুলোকেও খুলেমেলে ধরেছেন তিনি। এছাড়া উপমহাদেশীয় পারিবারিক মূল্যবোধ, প্রথা, ধর্ম, বর্ণ, জাতিভেদ, প্রশাসনিক দুর্নীতি ও সন্ত্রাস অনেক কিছুকেই আচমকা আঘাতে ধরাশায়ী করেছেন লেখিকা। মানব – মানবীর প্রেম এবং শিশু মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রায় পুরোটা উপন্যাস জুড়েই আছে। দু'টি যমজ ভাইবোন আর তাদের বাপের বাড়িতে থাকা স্বামী পরিত্যাগ করে আসা মাত্রকে নিয়ে এই কাহিনী।

বাঙালি পাঠক সামান্য একটু আত্মীয়তা অনুভব করতে পারেন কারণ আম্মু নামের মহিলাটি কেরালার এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হলেও বিয়ে করেছিলো কলকাতার এক বাঙালি তরুণকে, যে কাজ করতো অসমের চা বাগানে। মাতাল ব্যক্তিত্বহীন। তার একটা প্রচ্ছন্য ভূমিকা আছে। তাদের যমজ শিশু দু'টি– প্রচণ্ড মেধাবী, স্নেহের কাঙাল কিন্তু মা ছাড়া তাদের কেউ ছিলো না আদর করার মত। হ্যাঁ আর একজন পারতো কিন্তু সে পারেনি কেরালার অস্পৃশ্য গোষ্ঠীর লোক বলে; শ্রমিক, মার্কসবাদী পার্টির সদস্য বলে। যদিও নানান কাজে দক্ষ, যমজ শিশু দু'টির মায়ের প্রেমিক ছিলো সে। নাম ভেলুথা। এই ভেলুথা, যমজ শিশু দু'টি এসথা

আর রাহেল, তাদের মা, মামা, নানী সবাই সিরিয়ান খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু খৃষ্টান হলেও আদি বর্নাশ্রম ভিত্তিক জাতপাত ভেদ যায় নি। তার ওপর ছিল মার্কসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার। শিক্ষাবিস্তার। তাতেও সাম্য আসেনি।

বুর্জোয়া, লুম্পেন, গণতান্ত্রিক সুবিধাবাদী, চরমপন্থী সবারই কিছু ভূমিকা আছে এ উপন্যাসে। যে সময়টাকে বেছে নেয়া হয়েছে সেটা ফুটে উঠেছে। এ কাহিনীতে একটি আধাইংরেজ বালিকার ইংল্যান্ড থেকে আসা এবং এইমেনেমে তার মৃত্যুর ঘটনাটিকে পুরো কাহিনীর অনুঘটক কেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে; বলা হয়েছে, 'সোফি মল আসার পর থেকেই সব বদলে গিয়েছিলো।' হয়ত তাই, হয়ত না! এখানেই কাহিনী নিয়ে এতো বিশ্লেষণ শোভা পায় না, কারণ অনুবাদক শুধু পরিচিতির সূত্র দিতে পারেন, তার বেশি নয়।

তবে পরিচিতি নানামুখী হওয়ার অবকাশ রয়েছে এ উপন্যাসটির বেলায়। উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ভারতের আরব সাগর তীরবর্তী দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য কেরালার একটি পরিবার ও তাদের পারিপার্শিকতা নিয়ে। ভারতের কেরালা রাজ্যটিকে যেমন পশ্চিম বাংলার মতোই বামপন্থী আন্দোলনের সূতিকাগার বলা যায় তেমনি আবার শিক্ষা-ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী হিসাবেও মূল্যায়ন করা যায়। সম্ভবত মার্কসবাদী আন্দোলনের কারণেই। ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী কথাকলি নৃত্যের উৎসভূমিও ছিলো কেরালা। নৌপথে এখানে এসেছিলো সিরিয়ান খৃস্টানরা। তারও আগে পর্তুগীজ ও ইংরেজরা। কোচিন বন্দর এক সময় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলো বহির্বিশ্বে। এতো শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, এতো প্রগতিশীল রাজনীতির অনুশীলন, এতো সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সত্ত্বেও যে ভারতের বর্ণবাদের বিষক্রিয়া এখানেও আছে, ছিলো– সেসব কথাই বলা হয়েছে। ভারত স্বাধীন দেশ! এখানেও যে মানবতা ভুলুণ্ঠিত হয়, নারী ও শিশুরা নিগৃহীত হয়, খৃষ্টান পুলিশ অত্যাচার করে খৃষ্টান 'অস্পৃশ্যের' ওপর; এই বিষয়গুলি অবলীলায় উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। তবে রাজনৈতিক দৃষ্টির আর একটু গভীরতা আর একটু পরিণত বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয় ছিলো।

ঔপন্যাসিক অরুন্ধতী রায় যে ভাষা শৈলী ব্যবহার করেছেন, তা অভূতপূর্ব। বস্তুত একে একটি দীর্ঘ কবিতা বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে মহাকাব্য নয়। এর পর্বে পর্বে রয়েছে প্রতীকের ব্যবহার।

অ-ইংরেজ হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষার এমন ব্যবহার ব্যতিক্রমী নিঃসন্দেহে। বিশেষ্যর বিশেষণ নিয়ে একটা খেলা আছে এতে, গুণবাচক শব্দকে নামবাচক শব্দে পরিণত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে যদিও মনে হয় কৃত্রিম এবং কষ্টে সজ্জিত তবুও সব কিছুকে একটা পরিণতি, একটা সামঞ্জস্যের মধ্যে নিয়ে যেতে পেরেছেন ঔপন্যাসিক। আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তির সুবিধা আদায় করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; কারণ এতো প্রতীকী বড় হাতের অক্ষর, এতো ইটালিকস্ এতো যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে যে, পাঠককে মাঝে মাঝে তা বিভ্রান্তও করতে পারে। কারণ সম্পূর্ণ বাক্য অনেক সময়ই ব্যবহৃত হয় নি। একটি শব্দ দিয়েও বাক্যের সঙ্কেত

দেয়া হয়েছে কবিতার মতোই। অনুবাদের ক্ষেত্রেও এই প্রকরণটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সে কারণে জটিল প্রতীক বা সঙ্কেতের সরলীকরণ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় নি কারণ তাহলে পাঠকের চাহিদা অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। সেক্ষেত্রে অনুবাদকর্ম না হয়ে এটি হতো রূপান্তর। কাহিনীটা বলা হতো কিন্তু মূল লেখার প্রতি সুবিচার করা হতো না।

প্রকৃতপক্ষে অভূতপূর্ব এবং ব্যতিক্রমী এক ঘটনা ঘটিয়েছে এই উপন্যাসটি। লেখিকার ১৯৯৭ সালের "বুকার পুরস্কার" প্রাপ্তিকে তাই আকস্মিক বলে মনে হয় না; যোগ্যতা নিশ্চয়ই আছে – যেমন বিষয়বস্তুর দিক থেকে, তার চেয়ে বেশি কাঠামো এবং অনুসৃত ভাষা শৈলীর বিচারেও। এটি লেখিকার প্রথম উপন্যাস হলেও যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় রেখেছেন তিনি এতে। তবে কেন যেন মনে হয় চিত্রনাট্য লেখার অভ্যাসের ছাপ রয়েছে পুরো উপন্যাসের শরীর জুড়ে। ফলে চিত্রটা বুঝতে পাঠককে বেগ পেতে হয় না কিন্তু একই শব্দ কিংবা একই বাক্যের বারবার ব্যবহার – টানা পাঠের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে।

বাংলা অনুবাদের নামকরণ প্রসঙ্গে অনেকে বলেছিলেন একটা বাংলা নাম দিতে। কী হতো সেটা ? "ক্ষুদে জিনিসের দেবতা"! কিংবা "ক্ষুদ্রের ঈশ্বর"! হতে পারতো, আক্ষরিকভাবে এবং এ উপন্যাসের মূল বিষয়ই সেটা। সঙ্গতও। কারণ বলা হয়েছে সমাজের বঞ্চিত, আশ্রিত আর অস্পৃশ্যরা বড় দেবতাকে ধরতে পারেনা, তাদের কাছে ঘেঁষতে পারেনা। এমনকি খৃষ্টধর্মের ঈশ্বর কিংবা মার্কসবাদের তত্ত্বও ভারতীয় জাতপাতের ভেদ মেনে চলে। ফলে দেবতা বা ঈশ্বর বঞ্চিতরা বানিয়ে নেয় শক্তিহীন ক্ষুদে দেবতা। নিছক বেঁচে থাকার অবলম্বন; জীবনের জন্যে নয় নির্বাণের জন্যেও নয়। এসব দেবতার অমন ক্ষমতাও নেই। কিন্তু মূল ইংরেজীতে বিষয়টি যেভাবে উত্থাপন করা হয়েছে একটি বিশেষ্য পদবাচক শব্দ সমষ্টি হিসাবে পাঁচটি ইংরেজী শব্দে বাংলায় সেই বিশেষ আবেদনটা আক্ষরিক অনুবাদে অন্যরকম মনে হতে পারে; তার চেয়ে বড় কথা পরিচিতি। উপন্যাসটি লেখা শেষ হওয়ার আগে থেকেই ইংরেজী নামেই এটা এতোবেশি পরিচিতি পেয়েছে যে একে পরিবর্তন করা উচিৎ নয় বলেই মনে করেছি।

নামকরণের বিষয়টিও প্রতীকী। ঘটনা পরম্পরা এবং অঘটনের অশনি সঙ্কেত, জাতিভেদ মানুষকে যে মহান ও বৃহতের পরিসীমা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সেটাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে এই নামকরণের মাধ্যমে। সামাজিক ভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং পারিবারিকভাবে বঞ্চিত মানুষদের যে বৃহতের দিকে তাকানোর– ছোঁয়ার বা অবলম্বন করার অধিকার নেই– ফলে তারা যে বাধ্য হয় ক্ষুদ্রকে দেবতা করে অবলম্বন বানাতে, তারই ইঙ্গিতবাহী এই নামকরণ। এই দেবতার মন-মেজাজ বড় দেবতার মতোই উগ্র, অভিমানী কিন্তু নিয়তির লিখন খণ্ডণে ক্ষমতাহীন। হয়ত বিশ্বাসঘাতকও! ফলে বঞ্চিতেরা ভয়াবহ নিয়তিকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হয়, শক্তিহীন বিকলাঙ্গ দেবতা, হয় অদৃশ্য হয়ে যায় –না হয়

নিজেই দেহত্যাগ করে। হ্যাঁ, নিয়তিবাদিতাকে এ উপন্যাসের মূল সুর হিসাবে মূল্যায়ন করা যায়, যা অমোঘ এবং অনিবার্যতায় পর্যবসিত হয় শেষ পর্যন্ত। মৃত্যু আর বিকার ছিন্নভিন্ন করে দেয় ক্ষুদ্র ও বঞ্চিত মানুষগুলোকে। তারা কেউ অস্পৃশ্য পুরুষ, কেউ আশ্রিতা মা, কেউ অবোধ শিশু। নিয়তি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে; এ নিয়তি আসলে ভারতীয় সমাজের (সব ধর্ম ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নিরপেক্ষ) আধাআদিম বর্বর নিষ্ঠুরতা, অন্য কিছু নয়।

এই বাংলা অনুবাদের প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনুবাদকের পাশাপাশি প্রকাশক লুৎফর রহমান চৌধুরীর নামও পাঠককে সমান গুরুত্বে বিবেচনা করতে হবে। শুধু সদিচ্ছা বা বিপুল অর্থলগ্নিই নয়, তাঁর বহু রাত্রির নিদ্রাহীন শ্রমও জড়িত এর সঙ্গে। এটুকুর অন্তত সঠিক মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

পাঠক, তাহলে চলুন– কেরালার মীনাচল নদীর তীরে এইমেনেমে– যেখানে খৃষ্টান, হিন্দু আর অচ্ছুৎ এবং মার্কসবাদীরা বর্ণাশ্রমের অলিখিত আইনের চাঁদোয়ার নিচে সহাবস্থান করছে আর চালিয়ে যাচ্ছে অনাদিকালের কামড়া-কামড়ি।

ঢাকা

১২/২/৯৯

আবীর হাসান

সূচিপত্র

১৭ ❒ প্যারাডাইস পিকলস এ্যাণ্ড প্রিজার্ভস
৪৫ ❒ পাপাচির মথ
৯১ ❒ ঢ্যাঙা লালটিন, বেঁটে মোমবাতি
৯৬ ❒ অভিলাষ টকিজ
১২০ ❒ ঈশ্বরের নিজের দেশ
১৩০ ❒ কোচিনের ক্যাঙ্গারু
১৪৫ ❒ উইজডম এক্সারসাইজ নোট বুক
১৫৩ ❒ বাড়িতে স্বাগতম আমাদের সোফিমল
১৭৩ ❒ মিসেস পিল্লাই, মিসেস ইয়াপেন, মিসেস রাজাগোপালান
১৭৯ ❒ নৌকায় নদী
১৯৭ ❒ ক্ষুদে জিনিসের দেবতা
২০৮ ❒ কচু থোমবান
২১৬ ❒ হতাশ আর আশাবাদী
২৪২ ❒ কাজ হলো সংগ্রাম
২৬০ ❒ পার হয়ে যায়
২৬২ ❒ কয়েক ঘন্টা পর
২৬৬ ❒ কোচিন পোতাশ্রয়ের টার্মিনাস
২৭৫ ❒ ইতিহাসের বাড়ি
২৮২ ❒ আম্মুকে বাঁচানো
২৯০ ❒ মাদ্রাজ মেল
২৯৭ ❒ বাঁচার দাম

সন্দেশ প্রকাশিত আবীর হাসানের আরো বই :

মোটর সাইকেল ডায়েরী (দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ) / আর্নেস্তো চে গুয়েভারা
ইরাকের সাদ্দাম যুগ / আবীর হাসান
সমরখন্দ / আমিন মাআলুফ

১

প্যারাডাইস পিকলস এ্যাণ্ড প্রিজার্ভস

এইমেনেমে মে মাসটা গরম, ভাবালুতার কাল। দিনগুলো লম্বা আর আদ্র। নদীটা ক্ষীণতোয়া। কালো কাকগুলো উজ্জ্বল আম ধরা ডালে বসে খেয়েই চলেছে, গাছগুলো ধূসর সবুজ। লাল কলা পেকে গেছে আর কাঁঠালগুলো ফাটছে। নীল মাছিগুলো ফলের গন্ধমদির বাতাসে উড়ছে ভন্‌ভনিয়ে। স্বচ্ছ জানলার কাঁচে ধাক্কা খেয়ে মরে পড়ে থাকছে উজ্জ্বল সূর্যের নিচে।

রাতগুলো পরিষ্কার কিন্তু কিছুর জন্যে যেন খুব শান্তভাবে অপেক্ষা করছে। তবে জুনের গোড়াতেই আসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু, বৃষ্টি ঝরে তিন মাস। শুধু বৃষ্টি আর বাতাস, মাঝে মাঝে এক পশলা রোদ বাচ্চাদের ফুসলিয়ে নিয়ে যায় খেলতে।

গ্রামগুলো হয়ে ওঠে দুর্বিনীত সবুজ। জমির আলগুলো সাবু গাছে আড়াল হয়ে যায়, শিকড় গাড়ে, ফুল ফোটায়। ইঁটের দেওয়ালে শ্যাওলার রঙ ধরে। গোলমরিচের লতা উঠে যায় বিদ্যুতের খুঁটি বেয়ে। বুনো লতা বর্ষার জলে ডোবা রাস্তার সুরকির ওপর ছড়িয়ে পড়ে। বাজারগুলোয় জমে নৌকার ভিড়। রাস্তায় পূর্ত বিভাগের খোঁড়া গর্তে জল জমে, খেলে বেড়ায় ছোট ছোট মাছ ।

রাহেল যখন এইমেনেমে ফিরলো তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো। রূপালী বৃষ্টির ধারা মাটিতে পড়ে নরম করে দিচ্ছিলো আলগা মাটিকে। পাহাড়ের ওপরের পুরানো বাড়িটার কোণা বের করা ছাদটাকে মনে হচ্ছিলো কানঢাকা টুপির মতো। স্যাঁত্‌সেঁতে হওয়ায় শ্যাওলা ছাওয়া দেওয়ালগুলো ভিজে ফুলে উঠেছিলো। বুনো হয়ে যাওয়া বাগানটা ছোট ছোট প্রাণের ফিসফিসানি আর কোলাহলে ছিলো মুখরিত।

ছোট একটা সাপ চক্‌চকে নুড়ি পাথরের সঙ্গে শরীর ঘষছিলো। হলুদ সোনা ব্যাঙগুলো পুকুরের নোংরা বেড়ে ওঠা জলে সাঁতরাচ্ছিল লীলাসঙ্গীর জন্যে।

বৃষ্টিজলে ভেজা একটা বেজি দৌড়ে গেলো পাতায় ঢাকা সড়কের ওপর দিয়ে।

বাড়িটাকে কেমন যেন খালিখালি লাগছিলো। দরজা-জানলাগুলো বন্ধ ছিলো। সামনের বারান্দায় কেউ ছিলো না। আসবাবপত্রহীন। তবে বাইরে দাঁড়িয়েছিলো

আকাশী নীল রঙের, ক্রোমিয়ামের লেজ-পাখনাওয়ালা বিশাল প্লেমাউথ গাড়িটা আর বাড়ির ভিতরে ছিলেন বেবি কোচাম্মা ।

বেবি কোচাম্মা রাহেলের নানী। তার নানার ছোট বোন। আসলে তাঁর নাম নবমী, নবমী ইপে, কিন্তু সবার কাছে তিনি বেবি নামেই পরিচিত। বুড়ি হয়ে তিনি বেবি কোচাম্মা নামেই পরিচিত হয়ে যান। অবশ্য তাঁকে দেখতে রাহেল আসেনি। রাহেল আসলে তার ভাই এসথাকে দেখতে এসেছে।

যমজ ভাইবোন এসথা আর রাহেল। একটু আগে পরে ওদের জন্ম। ডাক্তার বলতো দুই ভ্রূণের শিশু। রাহেলের চেয়ে এসথা বা এসথাপ্পেন আঠারো মিনিটের বড়। ছোটবেলা থেকেই ওদের চেহারা অন্যরকম। যদিও দু'জনের গড়ন ছিলো হালকা পাতলা চ্যাপ্টা বুক, কৃমি-চোষা শরীর। আর একজনের ছিলো এলভিস প্রিসলি কায়দায় চুল ফাঁপানো। সেজন্যে সাধারণত যেমন হয়, তাদেরকে চিনতে কেউ প্রশ্ন করতো না কোনটা কে? তাদের আত্মীয়রা এবং অর্থডক্স সিরীয় – বিশপ যাঁরা প্রায়ই আসতেন তাদের এইমেনেমের বাড়িতে, খুব সহজেই দু'জনকে আলাদা করে চিনতে পারতেন। চার্চের জন্য চাঁদা তুলতে আসতেন বিশপরা।

আসল রহস্যটা ছিলো অনেক গভীরে, আরো গোপন এক জায়গায়।

সেই অসংলগ্ন বছরগুলোতে স্মৃতি যখন কেবল ডানা মেলতে শুরু করেছিলো আর জীবনকে মনে হতো বাধাবন্ধনহীন, তখন রাহেল আর এসথা নিজেদের মনে করতো আমি মানে দু'জন মিলেই এবং আলাদা ভাবেও আমরা, দুর্লভ যমজ সিয়ামিজ বাচ্চাদের মতো শরীর, আলাদা হলেও পরিচয় এক।

রাহেলের এখনও মনে পড়ে, একরাতে এস্থার স্বপ্নের মজায় তার নিজেরই হাসতে ইচ্ছে হয়েছিলো। আরও কিছু কিছু স্মৃতি সে অনধিকারে হলেও রোমন্থণ করতে পারে।

যেমন অভিলাষ টকিজে সিনেমা দেখতে গিয়ে ড্রিঙ্কওয়ালা এসথার সঙ্গে যা করেছিলো কিংবা মাদ্রাজে যাওয়ার পথে মাদ্রাজ মেল-এ এসথার খাওয়া টমেটো স্যাণ্ডউইচটার স্বাদ।

এরকম ছোট ছোট ঘটনা।

যাই হোক, এখন যদিও রাহেলের মনে হয়- এসথা আর সে আর আগের মতই তবে আলাদাভাবে ওরা দু'জন যেমন সবসময় থাকার কথা তেমন নেই। ওরা ছিলো।

সব সময়।

ওদের দু'জনের এখন জীবন আলাদা। আকার এবং আকৃতি, এসথার জীবন এসথার-রাহেলের জীবন রাহেলের।

সীমানা, দেওয়াল, কিনারা তাদের জীবনের দিগন্ত অন্য রকম করে দিয়েছে। আবির্ভাব হয়েছে কতগুলো দানবের। দানবগুলো ক্ষুদে তবে দীর্ঘ ছায়া পড়ে তাদের আর তারা আবছা অন্ধকারে চষে বেড়ায় সর্বত্র। আধখানা করে চাঁদ এসে জমে

ওদের চোখের নিচে আর এখন দু'জনের বয়সই আম্মুর সমান। এই বয়সেই মারা গিয়েছিলো সে।

একত্রিশে। বেশী বয়সে নয়।

কমও নয়।

তবে মৃত্যুর জন্যে যথেষ্ট।

আর একটু হলেই বাসের মধ্যেই জন্মাতো এসথা আর রাহেল। যে গাড়িতে ওদের বাবা আম্মুকে শিলং-এর হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলো, সেটা আসামের চা বাগানের মধ্যে এক পাকদণ্ডিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তারা গাড়ি ছেড়ে একটা ভিড়ঠাসা সরকারী বাস থামিয়েছিলো। গাড়ির যাত্রীরা দু'জনকে বসার জায়গা করে দিয়েছিলো। যাত্রীদের অধিকাংশই ছিলো গরিব আর হয়তো এক পোয়াতি মহিলাকে করুণা করেই তারা ওটুকু করেছিলো।

সারাটা পথ ওদের বাবা আম্মুর পাশে বসে ধরেছিলো তাদের শুদ্ধ ফোলা পেটটাকে - যেন ঝাঁকি না লাগে। এ ঘটনার কিছু দিন পরেই, তাদের বাবা-মার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় আর আম্মু কেরালায় ফিরে এসে একা থাকতে শুরু করে।

এসথা ভাবে যদি ওরা বাসেই জন্ম নিতো তবে সারাজীবনই বাসে পয়সা ছাড়া চড়তে পারতো। এমন ধারণা তার কোত্থেকে হয়েছিলো সেটা না বোঝা গেলেও যমজ ভাই-বোন অনেকদিন পর্যন্ত বাবা-মার ওপর বিরক্ত ছিলো। সারাজীবন বিনা পয়সায় বাসে চড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্যে। এরকম আজগুবি ধারণাও ওদের ছিলো যে ওরা জেব্রা ক্রসিং এ মারা গেলে সরকার ওদের মৃতদেহ সৎকারের খরচা, দেবে। ওদের ধারণা ছিলো জেব্রাক্রসিং মানেই বিনা পয়সায় সৎকারের ব্যবস্থা। যদিও এইমেনেমে মরার জন্যে কোনো জেব্রাক্রসিং ছিলো না, কাছাকাছি শহর কোট্টাইয়ামেও ছিলো না। তবে দু'ঘন্টার পথ পেরিয়ে কোচিনে ওরা ওরকম দু' একটা দেখেছিলো গাড়ির জানালা দিয়ে।

সরকার সোফি মলের শেষকাজের খরচা দেয়নি, কারণ সে জেব্রাক্রসিং-এ মরেনি। তারটা হয়েছিলো এইমেনেমের নতুন রঙ করা পুরানো চার্চে। সোফি মল এসথা আর রাহেলের মামাতো বোন, চাকো মামার মেয়ে। সে ইংল্যাণ্ড থেকে বেড়াতে এসেছিলো। সে যখন মারা যায় তখন এসথা আর রাহেল মাত্র সাত বছরের। সোফির বয়স ছিলো প্রায় নয়। তার জন্যে আনা হয়েছিলো বাচ্চাদের মাপের কফিন।

মখমলের কাজ করা।

পিতলের হাতলটা ছিল ঝকঝকে ।

ভিতরে সে শুয়েছিলো হলুদ বেলবটম প্যান্ট পরে, চুলে ছিলো রিবন বাঁধা আর ইংল্যাণ্ডে তৈরি তার পছন্দের গো গো ব্যাগটাকে নিয়ে। তার চেহারা ছিলো বিবর্ণ

আর চামড়া কুঁচকে গিয়েছিলো। ধোপার বুড়ো আঙ্গুলের মতো, জলে অনেকক্ষণ ডুবে থাকলে যেমন হয়।

কফিন ঘিরে সমবেতরা হলুদ চার্চের মধ্যে ধরা গলায় শোক সংগীতের মুর্চ্ছনা তুলেছিলো। ধর্মজাজকরা ছিলেন গম্ভীর অন্ধচ রোববারে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে তাঁদের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠতো।

বড় মোমবাতিগুলো পড়েছিলো নুয়ে আর ছোটগুলো খাড়াই ছিলো।

এক অচেনা বুড়ী তুলোয় সুগন্ধি নিয়ে সোফির কপালে লাগিয়ে দিয়েছিলো, সব সময় সে ছিলো কফিনের কাছে কাছেই। হয়তো সোফি মখমল আর কফিনের কাঠের ঘ্রাণ নিচ্ছিল।

সোফির ইংরেজ মা মার্গারেট কোচাম্মা মলের বাবা চাকোকে কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করতে দিচ্ছিলো না। পুরো পরিবারটাই একসাথে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, মার্গারেট আর বেবি কোচাম্মা, তার পাশে এসথা, রাহেল আর সোফির দাদী মামাচ্চি। মামাচ্চির দৃষ্টি প্রায় ছিলোইনা আর বাইরে বের হলে তিনি কালো চশমা পরতেন। তাঁর চোখ বেয়ে ঝরছিলো অশ্রু এবং গড়িয়ে যাচ্ছিলো চিবুক ছুঁয়ে বৃষ্টির ফোঁটার মতো। লাটখাওয়া সাদা শাড়িতে তাঁকে আরও ছোট আর অসুস্থ লাগছিলো। চাকো ছিলো মামাচ্চির একমাত্র ছেলে, তাই তাঁর খারাপ লাগারই কথা। তার জন্যে তাঁর যন্ত্রণা।

যদিও রাহেল, এসথা আর ওদের মা অন্ত্যাষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলো, তারা আলাদা দাঁড়িয়েছিলো পরিবারের অন্যান্যদের কাছ থেকে। কেউ ওদেরকে দেখছিলো না।

চার্চের ভিতরে ছিলো খুব গরম। সাদা লিলি ফুলগুলো ছিলো নির্জীব। একটা মৌমাছি মরে পড়েছিলো ফুলের মধ্যে। আম্মুর হাতের স্তোত্র'র বইটা নড়ে উঠেছিলো, তার চামড়া ছিল ঠাণ্ডা। এসথা তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলো। জেগে ছিলো বহু কষ্টে। আম্মুর হাতের সঙ্গে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলো সে। রাহেল জেগেই ছিলো। বাস্তব জীবনের টানাপোড়েনে সে যুগপৎ ছিলো হতাশ ও বিরক্ত।

তার মনে হলো সোফি জেগে গেছে তার শেষকাজ দেখার জন্যে। সে রাহেলকে দু'টো জিনিস দেখালো। প্রথমটা হলো, হলুদ চার্চের নতুন রং করা উঁচু ছাদ যেটা রাহেল কখনো দেখে নি। রংটা ছিলো আকাশী নীল, আকাশের মতো টুকরো টুকরো সাদা আর কোনো জেট প্লেনের মতো কিছু একটা। আসলে কফিনে শুয়ে ওপরের এসব ভালো ভাবেই দেখা যাওয়ার কথা, অন্তত পাশে দাঁড়ানো মানুষগুলোর হাতের বই আর বিষণ্ন পাছার চেয়ে। রাহেল চিন্তা করলো কারা যেন রঙের কৌটো নিয়ে ওপরে গেছে কষ্ট করে মেঘের জন্যে সাদা রঙ নিয়ে। নীল রঙ, আকাশের জন্যে। রূপালী, জেট প্লেনের জন্যে আর নিয়ে গেছে ব্রাশ, রঙ পাতলা করার জন্যে তারপিন।

সে চিন্তা করলো সেখানে বসে আছে ভেলুথার মতো কেউ। খালি গা, চকচকে শরীর এবং একটা কাঠের তক্তার ওপরে বসে এঁকে চলেছে রূপালী জেট প্লেন, চার্চের নীল আকাশে।

সে ভাবলো যদি দড়ি ছিঁড়ে যায়– তাহলে কি হবে! তার মনে হলো, ভেলুথা ঝরে পড়া তারার মতো পড়ে যাবে আকাশ থেকে, যে আকাশ তার নিজের তৈরি, মেঝেতে মরে পড়ে থাকবে, খুলি থেকে গাঢ় রক্ত কোনো গোপন জিনিসের মতো বের হয়ে আসবে।

ততক্ষণে এসথা আর রাহেলের উপলব্ধি হয়েছে মানুষকে ভাঙার মতো পৃথিবীর আরও অনেক উপায় আছে, সে গন্ধের সাথে এরই মধ্যে ওরা ভালোভাবেই পরিচিত হয়েছে, যেমন বাতাসে পুরনো গোলাপের ঘ্রাণ। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো সোফি দেখলো, রাহেলই বাদুড়ের বাচ্চা। শেষকাজ চলার সময় রাহেল দেখলো একটা ছোট কালো বাদুড় বেবি কোচাম্মার দামী শাড়ি বেয়ে উঠছে- তার বাঁকা নখগুলো দিয়ে। যখন বাদুড়টা তাঁর পেট বরাবর শাড়ি আর ব্লাউজের মাঝখানে আসলো তখনি বেবি কোচাম্মা চিৎকার করে হাতের বইটা বাতাসে ছুঁড়ে মারলেন। কি হয়েছে? সবাই জানতে চাইলো গান থামিয়ে।

বিষণ্ন যাজকরা তাঁদের কোঁকড়ানো দাড়ির মধ্যে সোনার আংটি পরা আঙ্গুলগুলো চালিয়ে দিলেন, যেন মাকড়সার জাল ছাড়াচ্ছেন।

ছোট্ট বাদুড়টা জেট প্লেনের মতো উড়তে লাগলো।

শুধু রাহেলই দেখতে পেলো কফিনের মধ্যে সোফির খেলনা গাড়িটা চলছে।

আবার শোকের গান শুরু হলো এবং একটা লাইন দু'বার গাওয়া হলো। যেন হলুদ চার্চটা আবার গলার মতো ফুলে উঠতে লাগলো।

সোফি মলের কফিনটা যখন চার্চের পিছনের কবরস্থানে গর্তে নামানো হলো, রাহেলের হঠাৎ মনে হলো সোফি মনে হয় জ্যান্ত। সে শুনতে পেলো (সোফির পক্ষে) লালচে কাদার থকথকে শব্দ আর সুরকির কড়কড়ে আওয়াজ যা চকচকে কফিনের ঝলকানিকে কিছুটা ম্লান করে দিয়েছিলো। সে নিস্তেজ ভোঁতা আওয়াজ শুনতে পেলো কফিনের পলিশ করা কাঠ আর মখমলের ঢাকনার মধ্যে দিয়ে। বিমর্ষ যাজকদের গলার আওয়াজ কাঠ ও মাটির জন্যে কিছুটা নির্জীব হয়ে যাচ্ছিলো।

আমরা গভীর বিশ্বাসে তোমাকে সঁপে দিচ্ছি তাঁর হাতে, সবচেয়ে
ক্ষমতাশীল পিতা যিনি,
আমাদের শিশুর আত্মা দেহ ত্যাগ করেছে,
এবং আমরা তার দেহ মাটিতে সমর্পন করছি,
মাটি থেকে মাটিতে, ভস্ম থেকে ভস্মে, ধুলি থেকে ধুলিতে।

মাটির নিচে মনে হলো আর্তনাদ করে উঠলো সোফি। দাঁত দিয়ে মখমলের কিছুটা ছিঁড়ে ফেললো।

কিন্তু পাথর আর মাটির ভিতর দিয়ে কিছু শোনা গেলো না।

সোফি মারা গেলো নিঃশ্বাস নিতে না পেরে তার শেষকৃত্যই তার মৃত্যুর কারণ, ধুলি থেকে ধুলি, ধুলি থেকে ধুলিতে।

তার কবরের স্মৃতিফলকে লেখা ছিলো "*সূর্যের এক কিরণ যা অল্প কয়েকদিনের জন্যে আমাদেরকে ধার দেওয়া হয়েছিলো।*"

পরে আম্মু ওদেরকে বুঝিয়েছিলো অল্প কয়েক দিন মানে সামান্য একটু সময়।

ক্রিয়াকর্ম শেষ হলে আম্মু যমজ দু'জনকে নিয়ে কোট্টাইয়াম পুলিশ ষ্টেশনে গেলো, ওটা ওদের আগে থেকেই চেনা। কারণ আগের দিন ওরা অনেকক্ষণ ওখানে কাটিয়েছিলো। উগ্র ধোঁয়া পুরানো পেশাবের গন্ধে ভরা ছিলো দেওয়াল-আসবাবপত্র। ওরা গন্ধ পাওয়ার আগেই নাকে আঙুল দিলো।

আম্মু অফিসারের সাথে দেখা করতে চাইলে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। আম্মু বললো, একটা বড় গলদ হয়ে গেছে আর একটা দরখাস্ত করতে চাইলো সে, ভেলুথাকে দেখতে চাইলো।

ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথুর গোঁফ ছিলো অনেকটা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের মহারাজা পুতুলের মতো, নড়ে চড়ে উঠলো, যদিও তার চোখে ছিলো চালাকি আর লোভ। 'বুঝতে পারছো না বেশ দেরি হয়ে গেছে?' বললো সে, মালয়ালমের কোট্টাইয়াম উচ্চারণে। সে আম্মুর উঁচু বুকের দিকে চোখ রেখে কথা বলছিলো। সে আরো বললো যে কোট্টাইয়াম পুলিশের খুব ভালো ভাবেই জানা আছে সবকিছু আর তারা কোন খানকি বা বেজন্মাদের কাছ থেকে কিছু শুনতে চায় না। আম্মু বললো 'দেখা যাবে।' টমাস ম্যাথু আম্মুর দিকে এগিয়ে আসলো ব্যাটন হাতে।

'আমি তোমার জায়গায় হলে চুপচাপ কেটে পড়তাম বাড়ির দিকে।' ব্যাটনটা দিয়ে আম্মুর বুকের ওপর টোকা মারতে মারতে বললো সে। মনে হচ্ছিল যেন সে আমের ঝুড়ি থেকে ভালো গুলো বেছে নিচ্ছে। ইন্সপেক্টর ম্যাথু হাবভাবে বুঝিয়ে দিলো, সে খুব ভালোভাবেই জানে কাকে সে ধরতে পারে, কাকে সে পারেনা। পুলিশদের একটা বাড়তি ইন্দ্রিয় থাকে এ ব্যাপারে।

পিছনে একটা লাল নীল-রঙের বোর্ডে লেখা -

Politeness-	ভদ্রতা
Obedience-	বিশ্বস্ততা
Loyalty-	আনুগত্য
Inteligence-	বুদ্ধিমত্তা
Courtesy-	সৌজন্যতা
Efficiency-	দক্ষতা

পুলিশ ষ্টেশন থেকে বেরুনোর সময় আম্মু কাঁদছিলো। তাই খানকি মানে কি সেটা তাকে জিজ্ঞেস করা গেলোনা। অথবা বেজন্মা কথাটার অর্থ। এই প্রথম ওরা মাকে কাঁদতে দেখলো। সে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো না, তার চেহারা ছিলো কঠিন, অশ্রু গড়িয়ে যাচ্ছিল শক্ত চোয়ালের ওপর দিয়ে। যমজ ভাইবোনের ভয় হচ্ছিলো। মায়ের কান্নার জন্যে। সব অবাস্তবকে বাস্তব মনে হচ্ছিলো। এইমেনেমে তারা বাসে ফিরে গেলো। খাকি প্যান্ট পরা রোগা বাস কনডাক্টার তাদের দিকে আসলো। সে একটা সিটে তার নিতম্বের ভর দিয়ে টিকিটের যন্ত্র নিয়ে জিজ্ঞেস করলো কোথায়? রাহেলের নাকে আসলো টিকেট আর বাসের ভিতরের রডের টকো ধাতব গন্ধ যা কনডাক্টারের হাত থেকে আসছিলো। 'কোথায় যাবে?'

'সে মারা গেছে।' আম্মু ফিসফিসিয়ে বললো 'আমিই তাকে মেরে ফেলেছি।'

এসথা তাড়াতাড়ি বললো, "এইমেনেম যাবো।" যাতে কনডাক্টার মাথা গরম না করে।

সে আম্মুর ছোট ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে দিলো। কনডাক্টার তাকে টিকেট দিলো। এসথা সেগুলো ভাঁজ করে যত্ন করে রাখলো, সে তার ছোট হাতে ক্রন্দসী মাকে জড়িয়ে ধরলো।

দু' সপ্তাহ পরে। এসথা ফিরে গেলো, আম্মু ওকে ওদের বাবার কাছে ফেরত পাঠালো। বাবা তখন সদ্য চাকরী ছেড়েছে। আসামের চা বাগানের চাকরী ছেড়ে দিয়ে নতুন একটা কারখানায় চাকরী করতো যেখানে কার্বন কালি তৈরী হয়। মদ্যপানের মাত্রাও কিছুটা কমেছিলো। আবার বিয়ে করেছিলো এবং মাঝে মাঝে মাতালও হতো।

এসথা আর রাহেল দু'জন দু'জনকে তার পর থেকে আর দেখেনি।

এখন তেইশ বছর পরে এসথা বাবার কাছ থেকে ফিরেছে। তার বাবা তাকে এইমেনেমে পাঠিয়েছে একটা সুটকেস আর একটা চিঠি দিয়ে। সুটকেস ভরা ছিলো নতুন কাপড়, বেবি কোচাম্মা রাহেলকে চিঠিটা দেখালো। চিঠিটা স্কুলের হাতের লেখার মতো বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা, কিন্তু নিচে তার বাবার স্বাক্ষর ছিলো। অন্তত তার বাবার নামটা। রাহেল মনে করতে পারছিলো না তার বাবার সইটা কেমন।

চিঠিতে লেখা ছিলো, বাবা কার্বন ফ্যাক্টরীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় চলে যাচ্ছে একটা সিরামিক ফ্যাক্টরীতে চাকরী নিয়ে এবং এসথাকে সে সেখানে নিতে পারবেনা। চাকরীটা হলো নিরাপত্তা প্রধানের। সে এইমেনেমে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে আর যদি কখনো ভারতে আসে তবে সে এসথার দেখাশোনা করবে, যদিও তার মনে হচ্ছে সেটা অসম্ভব।

বেবি কোচাম্মা রাহেলকে বললেন সে ইচ্ছা করলে চিঠিটা রাখতে পারে। রাহেল সেটা খামে ভরে রেখে দিলো। খামের কাগজটা নরম হয়ে কাপড়ের মতো দলা পাকিয়ে গিয়েছিলো।

ও ভুলেই গিয়েছিলো যে এইমেনেমে মৌসুমী বায়ু কতটা আর্দ্র হতে পারে। ফুলে যাওয়া কাঠের আলমারীতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়, বন্ধ জানালা ঝটকা দিয়ে খুলে যায়। বইগুলো নরম হয়ে যায়, কাগজগুলো কেমন যেন ঢেউয়ের মতো হয়ে যায়। সন্ধ্যায় পোকামাকড় বেরিয়ে পড়ে এবং বেবি কোচাম্মার ৪০ ওয়াটের বাল্বের গায়ে আছড়ে পড়ে মরে। সকালে তাদের মৃতদেহগুলো ছড়িয়ে থাকে মেঝেতে, জানালার চৌকাঠে। কচু মারিয়া প্লাস্টিকের ডাস্টপ্যানে করে ওগুলো তুলে ফেলে দেয়। বাতাসে তখন কেমন যেন একটা পোড়া পোড়া গন্ধ ভেসে বেড়ায়।

জুন মাসের বৃষ্টিটা আগের মতোই আছে।

বৃষ্টিতে পুরানো কুয়োগুলো ভরে যায়। শুয়োরের শুন্য খোঁয়াড়গুলো সবুজ শ্যাওলায় ভরে যায়। ঘাসগুলো সতেজ সবুজ এবং ঝলমলে দেখায়, কেঁচোগুলো নরম কাদায় যেন নৃত্য করে। কাঁটাওয়ালা আগাছাগুলো মাথা নুইয়ে বসে থাকে, গাছগুলো থাকে বেঁকে।

কিছুটা দূরে বাতাস আর বৃষ্টির মধ্যে নদীর ধারে, এসথা হাঁটছিলো বজ্রমেঘের অন্ধকারের মধ্যে। তার পরনে খেঁতলানো স্ট্রবেরি-গোলাপী টি শার্ট, রং জ্বলে যাওয়া। সে জানে যে রাহেল এসেছে :

এসথা সব সময় শান্ত থাকতো, তাই ঠিক করে বলা সম্ভব নয় কবে কখন কোথায় সে কথা বলা বন্ধ করেছিলো। একেবারেই বন্ধ। আসলে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সেটা হয়নি। আস্তে আস্তে হয়েছে। সেটা চোখে পড়ার মতোই নয়, যেন তার কথা শেষ হয়ে গেছে, আর কিছু বলার নেই। যদিও এসথার স্তব্ধতা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। তবে তা হৈ চৈ করে বলার মতোও নয়। ওটা কোনো দোষারোপ, প্রতিবাদের স্তব্ধতা নয়, অনেকটা আত্মরক্ষার চেষ্টা। মানসিক ভাবে নিজেকে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা। যদিও মনে হয় এসথার বেলায় এই খাপ খাওয়ানোর চেষ্টাটা চিরস্থায়ী।

বহুদিন ধরে সে নিজেকে এমন ভাবে তৈরি করেছে যাতে বইয়ের মধ্যে, বাগানে, পর্দার আড়ালে, দরজায়, রাস্তায় নিজেকে মগ্ন রাখতে পারে, যেটা সাধারণ ভাবে চোখে ধরাই পড়বেনা। সে অন্য কোন অপরিচিতের সঙ্গে এক ঘরে থাকলেও তাকে কেউ সহজে চিনতে পারেনা। সে যে একদম কথা বলেনা সেটাও বুঝতে আর-একটু সময় লাগে। কেউ কেউ তাকে আদৌ বুঝতেই পারে না। এসথা আসলে পৃথিবীর খুব সামান্য জায়গার দখলই রাখে।

সোফি মলের শেষকৃত্যর পর এসথা কলকাতায় গেলে, বাবা তাকে ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলো। সে তেমন আহামরি ভালো ছাত্র ছিলো না, কিন্তু একেবারে ফেলনাও ছিলো না, কোন দিক দিয়ে খারাপও ছিলো না। তার প্রোগ্রেস রিপোর্টে লেখা থাকতো, সাধারণ ছাত্র বা সন্তোষজনক। তবে অভিযোগ ছিলো, সে লেখাপড়ার বাইরের কোনো বিষয়ে আগ্রহী নয় যদিও কেউ তাকে ঠিকমত বলেনি বাইরের বিষয়গুলো কি?

এসথা সাধারণভাবে স্কুল শেষ করলেও কলেজে ভর্তি হতে রাজী হয়নি। বরং সে ঘরের কাজে মেতে উঠলো যেটা তার বাবা ও সৎমার পছন্দ ছিলোনা। যেন সে তার নিজের মতো আয় উপার্জনে ব্যস্ত। ও ঘর ঝাড়ু দেওয়া- মোছা, কাপড় ধোয়ার কাজ করতো। রাঁধতে শিখেছিলো আর বাজার থেকে সবজি আনতো, বাজারের তরকারিওয়ালা, যারা চকচকে গাদাকরা তরকারির পিছনে বসে থাকতো, তাকে দেখেই চিনতে পারতো এবং অন্য খদ্দের থাকলেও তাকেই বেশি খাতির করতো। ওরা তাকে জং ধরা টিনের পাত্রে করে পছন্দমতো সবজী তুলে দিতো। ও কখনোই দরকষাকষি করতো না, তরকারিওয়ালারাও কখনো ওকে ঠকাতো না, সবজীগুলো ওজন করে, দাম দেওয়া হলে তার লাল রঙের বাজারের ব্যাগে সেগুলো ওরা তুলে দিতো এমন ভাবে, যাতে নিচে থাকে পেঁয়াজ, বেগুন আর ওপরে থাকে টমেটো । ফাও হিসেবে ও পেতো ধনে পাতা কিংবা কাঁচামরিচ, এসথা মানুষ ভর্তি ট্রামে চড়ে সেগুলো নিয়ে বাসায় ফিরতো। যেন একসমুদ্র আওয়াজের মধ্যে শব্দহীন বুদবুদ।

দুপুরের খাওয়ার সময় তার কিছুর দরকার হলে সে নিজে উঠে গিয়ে নিয়ে আসতো।

একবার স্তব্ধতা আসলে সেটা এসথার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ থাকতো। এটা তার মস্তিষ্কের বাইরে এসে তাকে জড়িয়ে রাখতো। তাকে নাড়া দিতো ভ্রূণের আদিম হৃদস্পন্দনের মতো। নীরবতা তার হুঁড়গুলো বের করে তার খুলির ভিতরে ঢুকতো। তার স্মৃতির কোঠায় হানা দিতো। পুরনো শব্দগুলোকে দূর করে দিতো যেন সে আর সেগুলো উচ্চারণ করতে না পারে। এই চিন্তাগুলোকে প্রকাশ করার জন্যে শব্দগুলোকে বাছাই করে আলাদা করে উলঙ্গ করে দেওয়া হতো অকথ্য-অসারতায়। তাই কারো দৃষ্টিগ্রাহ্য হতো না যে কোথায় তা আছে। এসথা ধীরে ধীরে জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলো। তার অন্তরে লুকানো অক্টোপাসটার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে সেটাকে নিয়ে বাঁচতে শিখলো, যা তার নিজেরই ছিটানো অপ্রাকৃত কালি দিয়ে তার অতীতকে ঢেকে দিতে সাহায্য করলো। ধীরে ধীরে তার নীরবতার কারণ মুছে গিয়ে স্মৃতির মণিকোঠার ভাঁজে গেঁথে গেলো।

যখন খুবচাঁদ নামের তার খুব আদরের সংকর কুকুরটা কষ্ট পেয়ে মারা যায়, অন্ধ, লোম ওঠা, সতের বছর বয়সে, এসথা তাকে বাঁচানোর খুব চেষ্টা করেছিলো। যেন তার বাঁচা-মরার ওপর নিজের অনেক কিছু নির্ভর করেছিলো। মরার মাস কয়েক আগে খুবচাঁদ পিছনের বাগানে যাওয়ার দরজার নিচে লাগানো রাবারের অংশের কাছে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরের ভিতরের দেওয়ালে হলদেটে পেশাবে ভরে ফেলতো।

পেশাব করা শেষ হলে তার সবুজ চোখে এসথাকে দেখতো তারপর আস্তে আস্তে স্যাঁতস্যাঁতে কুশনে ফিরে যেতো। তার ভেজা পা মেঝেতে ছোপ ছোপ দাগ এঁকে দিতো। এসথা দেখতে পেতো কুশনে হয়ে থাকা মৃত্যুপথযাত্রী খুবচাঁদের মসৃণ বেগুনী অণ্ডকোষে জানলার প্রতিবিম্ব, আর আকাশ, সে আকাশের উড়ে যাওয়া

কোনো পাখি। এসথার কাছে মনে হতো বাসি গোলাপের ঘ্রাণের মতো, ভেঙ্গে পড়া কোন মানুষের স্মৃতির মতো ছিলো এই বাস্তবতা, ভঙ্গুর ও নাজুক। কিভাবে যে এতোদিন তার অস্তিত্ব টিকেছিলো তা একটা অবাক ব্যাপার। একটা বুড়ো কুকুরের অণ্ডকোষে উড়ে যাওয়া কোনো পাখির প্রতিবিম্ব এসথাকে সশব্দে হাসাতো।

খুবচাঁদের মৃত্যুর পর এসথা হাঁটতে লাগলো। প্রথমে সে টহল দিতো তার পাড়ায় তারপর ক্রমশঃ আরও দূরে যেতে লাগলো। লোকজন তাকে হাঁটতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো, ফিটফাট পোশাকে এক নিঃশব্দ পথচারী।

এসথার চেহারা হয়ে উঠলো কালচে আর রুক্ষ। রোদে পুড়ে কিছু বলিরেখা দেখা দিলো। তাকে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান মনে হতো। যেন শহরে আসা কোনো জেলে, যার মাথায় সমুদ্রের অজানা রহস্য।

এইমেনেমে ফিরে এসথা সারা শহরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো।

কখনো সে নদীর পাড়ে বেড়াতো, ফসলের গন্ধের সঙ্গে নদীর জলে মেশা কীটনাশকের গন্ধ মিলেছিল। বিশ্ব ব্যাংকের ঋণের টাকায় কেনা। বেশীর ভাগ মাছই মরে গিয়েছিলো। কিছু কিছুর ডানায় পচন ধরেছিলো।

অন্যান্যদিন সে হাঁটতো যে রাস্তা দিয়ে তার পাশে থাকতো নতুন ডিজাইনের বাড়িগুলো। মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতে যাওয়া নার্স, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী আর ব্যাংক কেরানিদের কঠোর শ্রম আর অসুখী উপার্জন দিয়ে তৈরি। রাস্তার পাশের অন্য বাড়িগুলো সবুজে ছাওয়া, তাদের ছিলো নিজস্ব গাড়ির রাস্তা যার দু'পাশে রাবার গাছ। প্রত্যেকেই নিজস্বতার বৈচিত্রে গর্বিত।

সে হেঁটে যেতো তার নানার বাবার তৈরি গ্রামের অচ্ছুৎ শিশুদের স্কুলের পাশ দিয়ে।

পেরিয়ে যেতো সোফি মলের হলুদ চার্চ, এইমেনেম যুব কুংফু ক্লাব, নতুন কুঁড়ি নার্সারী স্কুল (উঁচুবর্ণের লোকের জন্য), রেশন দোকান- যেখানে চিনি, চাল ও পাকা কলা বিক্রি হতো। কলা আর দক্ষিণ ভারতীয় সস্তা পর্নো পত্রিকা (যাতে থাকত কাল্পনিক দক্ষিণ ভারতীয় কামকলা), ছাদ থেকে ঝুলতো। কলা আর পত্রিকাগুলো গরম বাতাসে ঘুরে ঘুরে পেঁচিয়ে যেতো আলস্যে। ছবিতে ছিলো খদ্দেরদের মন কাড়ার মতো উলঙ্গ মেয়েমানুষের ছবি যারা মিথ্যে রক্তের মধ্যে শুয়ে থাকত।

এসথা কখনও হেঁটে যেতো লাকি প্রেসের পাশ দিয়ে। লাকি প্রেস বুড়ো কমরেড কে, এন, এম, পিল্লাই এর ছাপাখানা, যেটা এইমেনেমে কম্যুনিষ্ট পার্টির অফিস ছিল। সেখানে অনুষ্ঠিত হতো রাতের শিক্ষা সভাগুলো, বিলানো হতো মার্কসবাদী পার্টির পদ্যের ছাপানো প্যামফ্লেট। ছাদের ওপরে পতাকাটা পুরানো আর ঝ্যালঝেলে হয়ে গিয়েছিলো, লাল রঙটা গিয়েছিলো জ্বলে।

কমরেড পিল্লাই এক সকালে বের হয়ে আসলেন ছাই রঙের এক কোট গায়ে, তাঁর পরনের সাদা ধুতির ভিতর দিয়ে অণ্ডকোষের ছায়া দেখা যাচ্ছিল। গরম

নারকেল তেল মেখেছিলেন তিনি। তাঁর হাড় থেকে ঝুলে পড়া গায়ের মাংস মনে হচ্ছিল চুইংগাম, তিনি এখন একাই থাকেন। স্ত্রী কল্যাণী মারা গেছেন ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারে, ছেলে লেনিন থাকে দিল্লীতে। বিদেশী দূতাবাসে ঠিকাদারী করে সে।

কোন কোনদিন কমরেড পিল্লাই বাড়ির বাইরে বসে গায়ে তেল মাখতেন, এসথাকে দেখলেই হাঁক দিতেন। তিনি চিৎকার করে এসথাকে ডাকতেন তাঁর চড়া গলায় যা বয়সের ফলে কিছুটা খস্‌খসে হয়ে গিয়েছিল। যেন ছাল ছাড়ানো আখ।

সুপ্রভাত, 'তোমার দিনের নিয়ম চলছে?' এসথা কোন কথা না বলে তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যেতো, রুক্ষও নয় ভদ্রও নয়। নিঃশব্দে।

কমরেড পিল্লাই তাঁর নিজের সারা গায়ে চাপড় মেরে মেরে রক্ত চলাচল করানোর চেষ্টা করতেন। তিনি বুঝতেন না, এতদিন পরে এসথা তাঁকে চিনতে পেরেছে কি পারেনি! অবশ্য তিনি এটাকে তেমন পাত্তাও দিতেন না। যদিও তাঁর ঐ উৎসুক্য কোন ভাবেই হালকা কিছু ছিলো না। কমরেড পিল্লাই কোন ভাবেই যা ঘটেছে তার জন্যে নিজেকে দায়ী করতেন না। পুরো ঘটনাটাকেই তিনি রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি বলে মনে করতেন। পুরানো কোন কেচ্ছার মতো মনে করতেন। কিন্তু তখন কমরেড পিল্লাই জবরদস্ত রাজনীতিবিদ ছিলেন, দুনিয়াতে তিনি বেরিয়েছিলেন বর্ণচোরা গিরগিটির মতো। কখনো নিজেকে খুলে ধরেননি, আবার সেটা চেপেও গেছেন। হৈচৈ এর মধ্যে থেকে উঠে এসে অক্ষত থেকেছেন।

তিনি, প্রথম এইমেনেমে রাহেলের ফিরে আসার কথা শুনতে পান। খবরটাতে তিনি যতটা উৎসুক হয়েছিলেন, তার চেয়ে কম হয়েছিলেন বিচলিত।

এসথা কমরেড পিল্লাই-এর কাছে আগন্তুকের মতো, সে হঠাৎ করেই বলা নেই কওয়া নেই এইমেনেম ছেড়ে চলে যায় অনেক দিন আগে, কিন্তু রাহেল কমরেড পিল্লাইকে ভালোভাবেই চেনে, রাহেল তার সামনেই বড় হয়েছে। তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন এই ভেবে যে, কেন সে ফিরে আসলো এতোদিন পর!

রাহেল ফিরে আসার আগ পর্যন্ত ব্যাপারটা ছিলো এসথার মনে মনে চুপচাপ, কিন্তু রাহেল এসে জিনিসটাকে উস্‌কে দিলো। মেল ট্রেনের জানলার পাশে বসলে আলো ও ছায়ারা গায়ের ওপর খেলা করে। যে পৃথিবীটা এতো দিন আটকে ছিলো সেটা খুলে গেলে এসথা শুনতে থাকলো সব ধ্বনি, ট্রেনের, ট্রাফিকের, সঙ্গীতের, স্টক মার্কেটের গুঞ্জন। যেন কোন বাঁধ ভেঙে জংলী পানির তোড়ে ভেসে এলো ধুমকেতু, বেহালা, কুচকাওয়াজ, একাকীত্ব, মেঘমালা, দাড়ি, বুজরুক, চ্যালা পতাকা, ভূমিকম্প, দুঃখ কষ্ট–ঘূর্ণিতোড়ে সব গেলো ভেসে।

এসথা নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে বৃষ্টির আদ্রতা অনুভব করেনি কিংবা যে শীতে কাঁপা কুকুর ছানাটা তার পাশে গরম হওয়ার জন্যে বসেছিলো, সেটার মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠাও অনুভব করতে পারেনি। ও হেঁটে গেলো পুরনো তাহার গাছটার পাশ দিয়ে সুরকী বিছানো পথের শেষ মোড় পর্যন্ত, যেটা নদীতে গিয়ে মিশেছে।

বৃষ্টিতে কোমর দুলিয়ে হাঁটতে লাগলো ও। জুতোর তলায় লেগে থাকা কাদা অদ্ভুত শব্দ করছিলো। শীতে কুকুর ছানাটা কাঁপছিল আর তাকে দেখছিলো।

বেবি কোচাম্মা ও কচু মারিয়া যারা টকো মনের, বদমেজাজী, বেঁটে রাধুনি ওরাই এইমেনেমের বাড়িতে ছিলো- যখন এসথা ফিরে আসে, তাদের নানী মামাচি ততদিনে মারা গিয়েছেন। চাকো এখন কানাডায় থাকে এবং এ্যান্টিকের ব্যবসা করে, ওটা তেমন লাভজনক নয়।

শুধু রাহেলের জন্যে।

যখন আম্মু মারা যায় (শেষবার যখন সে এইমেনেমে আসে শ্বাস-কষ্ট নিয়ে, তার বুক থেকে অসুস্থ কোন দূরের মানুষের চীৎকারের মতো আওয়াজ হতো), রাহেল চলে যায়। এক স্কুল থেকে আর এক স্কুলে। সে ছুটিতে বাড়িতে এলেও চাকো আর মামাচি তাকে উপেক্ষা করতো। ওদেরকে তার মনে হতো যেন তারা নিজেদের দুঃখকষ্ট বুকে নিয়ে শুঁড়িখানায় বুঁদ হয়ে থাকা জোড়া মাতাল। রাহেল বেবি কোচাম্মাকেও উপেক্ষা করতো। রাহেলকে কিভাবে মানুষ করা হবে সে ব্যাপারে চাকো ও মামাচি ভাবতে চেষ্টা করতেন কিন্তু তাঁরা ঠিক করতে পারতেন না। তাঁরা ঠিকই রাহেলের জন্যে খাবার, কাপড় আর বেতনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন কিন্তু তাঁদের উদ্বেগ বা চিন্তাটা সরিয়ে রেখেছিলেন। সোফির মৃত্যুর পর তার শূন্যতা নীরবে এইমেনেমের বাড়িতে ঘুরে বেড়াতো, যেন নরম কোনো কিছু মোজা পায়ে ঘুরে বেড়াতো।

মোটা বইয়ের তাকে, খাবারের মধ্যে মামাচির বেহালার খোলে, চাকোর হাঁটুর নিচের কাটা দাগের মধ্যে, মাঝে মাঝে যেটা তার চিন্তার বিষয় হয়ে উঠতো আর এসব জায়গায় লুকিয়ে থাকতো। চাকোর পাতলা মেয়েলি পায়ের কটা দাগে। এটাই আশ্চর্য যে, কী করে মৃত্যুর স্মৃতি এতদিন রয়ে যায়। কারুর জীবনের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি লম্বা হয়। ওজনদারও।

অনেক বছর ধরে সোফির স্মৃতি হিসাবে (যে ছিলো ছোট ছোট জ্ঞানের প্রশ্নকারী, যেমন- বুড়ো পাখিরা মরতে যায় কোথায়? কেন মরা পাখিরা আকাশ থেকে পাথরের টুকরার মতো টুক করে খসে পড়েনা ? অথবা যে ছিলো কঠিন বাস্তবতার অগ্রদূত অথবা রক্তাক্ত হওয়ার ওস্তাদ, যেমন - সে দেখেছিলো দুর্ঘটনায় মরা এক মানুষকে, যার চোখের মণি দু'টো মাথার পাশে ঝুলছিলো ঠিক ইয়োইয়োর চাকতির মতো)। জমে থাকা এসব বিষয় আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে যাচ্ছিল, তবে সোফির শূন্যতা দৃঢ় কঠিন ও জীবন্ত হয়ে গিয়েছিলো। ওটা থাকতো সবসময়ই যেমন প্রত্যেক মৌসুমে নিজের ফল থাকে গাছে। সরকারী চাকরীর মতো চিরকেলে। এর মধ্যে রাহেল শিশু (স্কুল পরিবর্তনের মধ্যে) থেকে নারী হয়ে গেলো।

রাহেল এগার বছর বয়সে প্রথম কালো তালিকাভুক্ত হল নাজারো কনভেন্ট স্কুলে। সে ধরা পড়ে গিয়েছিলো হাউস টিউটরের কোয়ার্টারের বাইরে গোবরের

একটা দলাকে ছোট ছোট ফুল দিয়ে সাজাতে গিয়ে। পরের দিন স্কুলের সকালের সমাবেশে তাকে অক্সফোর্ড ডিকশনারী দেখে বের করতে বাধ্য করা হলো 'নৈতিক অবক্ষয়' শব্দের অর্থ। জোরে জোরে পড়তে বললে রাহেল পড়লো, দুষিত বা বিকৃত করার মতো অবস্থা বা গুণ। রাহেলের পিছনে বসে ছিলো শক্ত মুখে একসারি নান আর সামনে ছিলো স্কুলের একদল ছাত্রী।

"বিকৃতির দোষ, নৈতিক বিকৃতি, মানবিক চরিত্রের সহজাত দুষিতকরণ, যাহা আদি পাপ হইতে উদ্ভূত। নির্বাচিত ও অনির্বাচিত উভয়েই এই পৃথিবীতে আসে বিধাতা হইতে পৃথক সত্তা নিয়া এবং পাপই হয় তাহাদের একমাত্র কর্ম।"

- জে, এইচ, ব্লান্ট।

বার বার রাহেলের বিরুদ্ধে স্কুলের ওপরের ক্লাসের মেয়েদের অভিযোগের জন্যে ছ'মাস পরে তাকে বহিষ্কার করা হলো– তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো- সে ইচ্ছে করে দরজার পিছনে লুকিয়ে থাকতো আর বড় মেয়েদের সঙ্গে ধাক্কা খেতো। প্রিন্সিপাল তাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে (মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে, বেত মেরে, খেতে না দিয়ে) সে স্বীকার করেছিলো তার ওসব করার কারণ– সে পরখ করতে চাইতো ধাক্কা খেলে স্তনে ব্যথা লাগে কিনা।

খৃষ্টান প্রতিষ্ঠানে স্তনকে স্বীকার করা হতোনা। তাই যেখানে তাদের অস্তিত্বই থাকার কথা নয়, সেখানে ওতে ব্যাথা লাগার প্রশ্নই ওঠেনা।

বহিষ্কারের প্রথম কারণ ছিলো এটা। দ্বিতীয়টা ছিলো সিগারেট খাওয়া, তৃতীয়ত সে প্রিন্সিপালের মাথার নকল খোঁপা চুরি করে সেটা আগুনে পুড়িয়েছিলো। জিজ্ঞাসাবাদে সে খোঁপাটা চুরি করার কথাও স্বীকার করেছিলো।

এরপর যতগুলো স্কুলেই সে গেছে সব জায়গায় টিচাররা লক্ষ্য করেছে–

সে খুবই শান্ত আর ভদ্র মেয়ে।

তার কোন বন্ধু নেই।

এ বিষয়গুলো একাকীত্ব ও সভ্যতার আড়ালে নষ্ট হওয়া হিসাবে চিহ্নিত হলো আর এ কারণেই তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো (তাদের মাষ্টারনীর মতো ঘ্রাণ নেওয়ার মাধ্যমে, জিভের স্পর্শে, মিষ্টি চুষে খাওয়ার মতো), ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তারা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতো এমনভাবে যেন রাহেল জানেই না কিভাবে কাউকে যুবতী হতে হয়।

ওরা কিন্তু আসল ঘটনা থেকে খুব একটা দূরেও ছিলো না।

আসলে, বলা যায়, বঞ্চিত হওয়ার ফলে রাহেলের আত্মাটা মুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। ওটাকে দুর্ঘটনাও বলা যায়।

রাহেল যেনতেন ভাবেই বড় হলো। তার বিয়ে দেওয়ার জন্যে কেউ ছিলোনা। তার বিয়ের যৌতুক দেয়ার মতো কেউ না থাকায় কোন উৎসুক স্বামীও উঁকি মারেনি তার হৃদয়ের দিগন্তে।

তাই যতদিন সে নিজে এব্যাপারে হৈচৈ না করেছে ততদিনই তার খেয়াল খুশি মতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পেরেছে। "স্তনের ব্যথা আছে কিনা এবং তা কতটুকু, নকল খোঁপা কত ভালোভাবে পোড়ে অথবা জীবন যাপন কেমন ভাবে হওয়া উচিত?"

স্কুল শেষ করে সে ভর্তি হলো দিল্লীর একটা মধ্যম মানের স্থাপত্য বিদ্যার স্কুলে। স্থাপত্যবিদ্যায় ভর্তি তার আগ্রহের ফলে হয়নি। অথবা অলৌকিক ভাবেও নয়। সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলো এবং পাশ করলো। পরীক্ষকরা তার কাঠ কয়লায় আঁকা স্কেচগুলো দেখে মুগ্ধ হলো। যদিও সেগুলো সৃজনশীলতার বিচারে তেমন কিছু ছিলো না। তার অবিবেচকের মতো টানা অস্থির রেখা গুলোকে শৈল্পিক আত্মবিশ্বাস মনে করলেও আসলে সে শিল্পী ছিলো না। সে আট বছর কলেজে কাটিয়েছিলো কিন্তু পাঁচ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স শেষ করে ডিগ্রী নিতে পারেনি।

বেতন ছিলো অল্প, তাই কোন রকমে চলে যেতো হোস্টেলে থেকে, ছাত্রীদের কম পয়সার মেসে খেয়ে, ক্লাসে খুব কম গিয়ে। সে ড্রাফ্টসম্যান হিসাবে কাজ করতো স্থাপত্য ফার্মগুলোতে যেখানে ছাত্রদের কম পয়সায় নক্সা আঁকার কাজ করানো হতো এবং ভুল হলে তাদেরই দোষ দেওয়া হতো। অন্য ছাত্ররা বিশেষ করে ছেলেরা রাহেলের এরকম চলাফেরা ও উড়নচণ্ডী ভাব দেখে তাকে এড়িয়ে চলতো। সে কখনোই ডাক পেতোনা তাদের হৈ হুল্লোড়ের পার্টিতে বা সুন্দর বাড়িতে, এমনকি তার শিক্ষকরাও তাকে নিয়ে একটু চিন্তিত ছিলো। তার অদ্ভুত– অবাস্তব বাড়ির নক্সা দেখে, ওগুলো সে আঁকতো সস্তা বাদামী কাগজে আর কারুর সমালোচনায় কান দিতো না।

সে মাঝে মাঝে চাকো আর মামাচিকে লিখতো কিন্তু কখনোই এইমেনেমে ফিরে যায়নি। যখন মামাচি মারা গেলেন, চাকো কানাডায় গেলো– তখনও না।

সে স্থাপত্য স্কুলে থাকতেই ল্যারি ম্যাক ক্যাসলিনের সঙ্গে পরিচিত হলো। সে দিল্লীতে থেকে ডক্টরেট থিসিসের জন্যে রসদ যোগাড় করেছিলো। তার থিসিসের বিষয় ছিলো, 'দেশীয় স্থাপত্যে শক্তির সঠিক প্রয়োগ।' সে প্রথমে একদিন রাহেলকে দেখে স্কুলের লাইব্রেরিতে আর কয়েকদিন পরে আবার দেখে খান মার্কেটে, সে পরেছিলো জিন্‌সের প্যান্ট আর সাদা টি শার্ট। টি শার্টের গায়ে লাগানো ছিলো পুরানো চাদরের একটা টুকরো যা তার ঘাড় ও পিঠে ছড়িয়েছিলো। তার উদ্দাম চুল পিছনে বাঁধা ছিলো সোজা করে, যদিও সোজা ছিলোনা। একটা ছোট হীরে ছিলো তার নাকে, নাকফুল, সেটা জ্বল জ্বল করতো। তার কাঁধের হাড়ের গড়ন ছিলো অপূর্ব আর পাগুলো ছিলো খেলোয়াড়দের মতো শক্ত সমর্থ।

'ঐ ভেসে যায় এক সুরের মুর্চ্ছনা,' ল্যারী বলল। নিজেকে এবং রাহেলকে অনুসরণ করে এক বইয়ের দোকানে ঢুকলো। যদিও তারা দু'জনই বইয়ের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলোনা।

রাহেলের বিয়েটা এমনভাবে হলো যেন এয়ারপোর্টের খালি চেয়ার পেলেই যে কোনো যাত্রী সেটাতে বসে পড়বে এবং বসাটাই তার জন্যে আসল কথা। রাহেল

তার সঙ্গে বোস্টনে চলে গেলো। ল্যারি তার স্ত্রীকে যখন জাপটে ধরতো, তার বুক বরাবর থাকতো রাহেলের গাল, ল্যারি খুব সহজেই রাহেলের মাথার ওপরটা দেখতে পেতো, সেখানে কালো চুলের বন্যা। যখন তার আঙুল রাহেলের ঠোঁটের কোনায় রাখতো শুনতে পেতো হালকা স্পন্দন, সে উপভোগ করতো। আর রাহেলের ভিতরের ধড়ফড়ানি, সে তা স্পর্শ করতো আর চোখ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করতো যেন কোন হবু বাবা তার স্ত্রীর পেটের বাচ্চাকে অনুভব করছে। সে তাকে এমন আলতো করে ধরতো, যেন সে একটা উপহার; ভালোবাসায় মোড়া, ছোট আর স্থির এবং খুবই মূল্যবান। কিন্তু যখন তারা সঙ্গম করতো তখন রাহেলের চোখ দু'টো তার কাছে একটু বিরক্তিকর লাগতো। মনে হতো তারা পরস্পরের নয়, অন্য কারো। যে দেখছে, যেন জানলা দিয়ে সমুদ্রের দিকে কিংবা নদীতে একটা নৌকা অথবা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া কোনো টুপিপরা লোক।

বিষয়টা বুঝতে না পারায় তার একটু অস্বস্তি ছিলো। তার মনে দ্বন্দ্ব ছিলো এটাকে অনিচ্ছা বা যন্ত্রণার মধ্যে কোনো স্তরে ফেলা যায়! সে জানতো না যে কোথায় সে জায়গাটা, যেমন যে দেশ থেকে রাহেল এসেছে সেখানে দুঃখ-কষ্টগুলো একটা আর একটার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে থাকে। আর সেই ব্যক্তিগত দুঃখগুলো কখনোই হতাশার চরমে পৌছায় না। সে জানতো না যে কোনও দেশের পথের পাশের মিনার, উগ্রতা, সন্ত্রাস, ঘৃণী, চলন্ত, হাস্যকর, পাগলামি, নিরর্থক গণবিক্ষোভের পাশে ব্যক্তিগত হতাশাকে ফেলে রাখলে কি ঘটে! বিরাট দেবতা গরম লু হাওয়ার মতো গর্জন করে এবং সম্মান দাবী করতে থাকে। তখন ছোট দেবতা (আমুদে ও আত্মতৃপ্ত, ব্যক্তিগত ও সীমাবদ্ধ) আসে দহন জ্বালা নিয়ে, ছ্যাবলার মত হাসতে থাকে, নিজের শেষ সীমায় পৌছে। নিজের অযৌক্তিকতায় অভ্যস্ত হয়ে সে হয়ে ওঠে কুঁচুটে ও সাধারণ। কোন কিছুকেই তেমন কিছু মনে হয়না। সবকিছুকেই মনে হয় কেমন যেন গুরুত্বহীন। কখনোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না কিছুই, কিন্তু খারাপ যা হওয়ার তা হয়েই চলে। সন্ত্রাস যে দেশ থেকে যে এসেছে সেটা যুদ্ধ ও শান্তির ভয়াবহতায় সুস্থির হয়ে গেছে আর খারাপ ঘটনা ঘটেই চলেছে।

তাই ছোটবেলার ঈশ্বর হাসে শুন্য হাসি এবং খুশী মনেই বিদায় নেয়। হাফ প্যান্ট পরা বড়লোকের ছেলের মতো। সে শিশ দিলো, নুড়ি পাথরে মারলো লাথি। তার ভঙ্গুর উল্লাসের উৎস ছিলো তার ভাগ্যের সীমাবদ্ধতা। সে মানুষের চোখের তারায় ভেসে থাকলো এক অদ্ভুত বাঙ্ময়তায়। ল্যারি রাহেলের চোখে যা দেখলো তা হতাশা নয় বরং একধরনের জোর করে তৈরি করা আশাবাদ।

একটা শূন্যতা যেখানে এসথার কথাগুলো ছিলো, তার পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব ছিলোনা, এক যমজের ভিতরের একাকিত্ব আর একজনের নিরবতার নামান্তর, দু'টো ব্যাপার সুন্দর খাপ খেয়ে যায়। অনেকগুলো চামচ একটার ওপর আর একটা সাজিয়ে রাখার মতো কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকার শরীর মিলে যাওয়ার মতো।

ওদের বিচ্ছেদ হয়ে গেলো, রাহেল তখন কয়েকমাস ন্যুইয়র্কের এক ভারতীয় রেস্তোরায় পরিচারিকার কাজ করেছিলো। তার পর কয়েক বছর এক পেট্রোল পাম্পে রাতের বেলার কাজ। ওয়াশিংটনের একটু দূরের এই পাম্পে তাকে কাজ করতে হতো একটা বুলেট-প্রুফ কেবিনের মধ্যে বসে। প্রায়ই মাতালরা বমি করে দিতো টাকা রাখার পাত্রের মধ্যে, দালালরা তাকে আরো আকর্ষণীয় চাকরীর লোভ দেখাতো। দু'বার সে দেখেছে গাড়ীর যাত্রীদের কাঁচের বাইরে থেকে গুলি করা হচ্ছে। একবার পিঠে ছুরি খাওয়া এক লোককে চলন্ত গাড়ী থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো তার সামনে।

তখন বেবি কোচাম্মা তাকে লিখেছিলেন যে এসথা এইমেনেম ফিরে এসেছে, রাহেল তার পেট্রোল পাম্পের চাকরী ছেড়ে এইমেনেমে ফিরে আসলো, এসথার সঙ্গে দেখা করার জন্যে – বৃষ্টির মধ্যে।

পাহাড়ের ওপরের ছোট্ট বাড়িটায় বেবি কোচাম্মা বসে ছিলেন ডাইনিং টেবিলের ধারে। একটা পাকা শশার বোঁটার নিচে থেকে ঘষে তিতো দূর করতে ব্যস্ত, তাঁর পরনে ছিলো ঢিলে চেক নাইটগাউন ওটার হাতা ছিলো ফোলানো এবং হলুদের ছিটে দাগ ভরা। টেবিলের নিচে তিনি দোলাচ্ছিলেন তাঁর ছোট পরিপাটি পা। মনে হচ্ছিল একটা ছোট বাচ্চা পা দোলাচ্ছে বড় চেয়ারে বসে, পা'দুটো ছিলো শোথরোগে ফোলা, দেখতে মনে হতো পা'র মত দেখতে ফোলানো বালিশ। আগে কখনো কেউ এইমেনেমে বেড়াতে এলে বেবি কোচাম্মা তাদের বড় পায়ের ব্যাপারে আগ্রহী হতেন, তাদের বড় চটিগুলো পরে বলতেন "দেখ ওরা আমার পায়ের চেয়ে কত বড়?" তারপর তিনি চটিগুলো পরে সারা বাড়ি হেঁটে বেড়াতেন শাড়িটা একটু তুলে যাতে সবাই তাঁর ছোট পায়ের দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারে।

তিনি শশাটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, যেন ভেতরে কোনো বিজয়ের আনন্দ চাপা ছিলো। এসথা রাহেলের সঙ্গে কথা না বলাতে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। এসথা রাহেলের দিকে তাকিয়ে কথা না বলে পাশ দিয়ে চলে গেলো যেমন সে অন্য সবার সঙ্গে করে।

বেবি কোচাম্মার বয়স তিরাশি বছর, মোটা চশমার আড়ালে তাঁর চোখ দু'টো মাখনের মতো থ্যাবড়ানো। তিনি রাহেলকে বললেন, 'আমি কি বলেছিলাম দেখেছিস? তুই কি আশা করেছিলি? বিশেষ কোনো ব্যবহার? ওর মাথাটা বিগড়েছে। ও আর কাউকে মনে করতে পারেনা। তোর কি মনে হয়?'

রাহেল কিছু বললোনা, চুপ করে থাকলো।

ও এসথার নড়াচড়া অনুভব করলো, আর অনুভব করলো তার চামড়ার ওপর পড়া বৃষ্টির ভেজাভাব। তার মগজের মধ্যে কর্কশ টানাপোড়েনের শব্দও সে শুনতে পেলো। বেবি কোচাম্মা রাহেলের দিকে তাকালেন অস্বস্তি নিয়ে। তখন তিনি এসথার ফিরে আসার খবর চিঠিতে লিখে দেওয়ার জন্যে নিজেকে দোষ দিচ্ছিলেন।

কিন্তু তাঁর কীইবা করার ছিলো? সারাজীবন তো আর তিনি তাকে আগলে রাখতে পারতেন না কেনই বা তা তিনি করবেন? সেটা তো তাঁর দায়িত্বও না। নাকি তাঁরই দায়িত্ব?

নাতি আর নানীর মধ্যে ছিলো নীরবতা, যেন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি। ফোলা, নষ্ট। বেবি কোচাম্মা মনে করলেন, রাতে শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে হতে হবে। তিনি রাহেলকে কিছু একটা বলার কথা ভাবছিলেন।

'তুই আমার চুলের বব ছাঁটটা কেমন পছন্দ করছিস?' জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁর শশা লেগে থাকা হাতে চুলের স্পর্শ নিলেন, শশার একটু ফেনা হাত থেকে লেগে গেলো চুলে ।

রাহেল কিছু বলার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। সে দেখলো বেবি কোচাম্মাকে শশার ছাল ছাড়াতে ব্যস্ত। শশার হলুদাভ সোনালী ছাল পড়ছিলো তাঁর কোলের ওপর। তাঁর কালো কলপ দেওয়া চুল ছড়ানো ছিলো মাথার ওপরে এলামেলো হয়ে যেন অগোছালো সুতো। কলপের জন্যে তাঁর কপালে একটু হালকা ধূসর ছায়া ছিলো এবং মনে হচ্ছিলো চুলের রেখা বরাবর একটা দ্বিতীয় রেখা। রাহেল খেয়াল করলো বেবি কোচাম্মা মেকআপ করেন। লিপস্টিক। শুর্মা, হালকা রুজ বোলানো। যেহেতু বাড়িটা ছিলো বন্ধ আর অন্ধকার, আর ছোট বাল্বটার পাওয়ার ছিলো ৪০ওয়াট, তাঁর লিপস্টিকের রঙ খানিকটা ঠোঁটের বাইরেও চলে এসেছিলো; দ্বিতীয় দু'টো ঠোঁট এর মতো লাগছিলো। তাঁর মুখ আর ঘাড়ের চর্বি কিছুটা কমেছিলো। ফলে তাঁর গোলাগাল চেহারাটাকে লাগছিলো তিনকোণা। যেহেতু তিনি ডাইনিং টেবিলে বসে ছিলেন তাই তাঁর বিশাল নিতম্ব লুকানো ছিলো। তাঁকে অনেকটা জবুথবু মনে হচ্ছিল। ডাইনিং রুমের আধো আলোতে তাঁর মুখের বলিরেখাগুলো দেখা যাচ্ছিলো না তাই তাঁকে অনেক কমবয়সী লাগছিলো। গায়ে ছিলো অনেক গহনা। রাহেলের মৃত নানীর গয়না। পুরোটাই। ঝিকমিক করা আংটি, হীরে বসানো কানের দুল, সোনার চুড়ি, সুন্দর নক্সাকরা সোনার চেন যেটাকে বার বার ছুঁয়ে দেখে তিনি নিশ্চিত হচ্ছিলেন যে সেটা ওখানে আছে এবং ওটা তাঁরই। তাঁকে মনে হচ্ছিল নতুন বউয়ের মতো– নিজের সৌভাগ্যে উচ্ছ্বসিত।

রাহেলের মনে হলো যে বেবি কোচাম্মা তাঁর জীবনটাকে উল্টো দিক থেকে যাপন করছেন, সেটা ছিলো উৎসুক কিন্তু সংযত দৃষ্টিভঙ্গি। বেবি কোচাম্মা আসলেই তাঁর জীবনটা উল্টোভাবে যাপন করেছেন। অল্প বয়সে তিনি জাগতিক পৃথিবীকে অস্বীকার করলেও বুড়ো বয়সে মনে হচ্ছে সেটাকেই জাপটে ধরেছেন। তিনি সেটাকে জাপটে ধরেছেন এবং সেটাও তাঁকে জাপটে ধরেছে।

তিনি যখন আঠার বছরের, বেবি কোচাম্মা ভালোবেসে ফেলেন এক সুদর্শন আইরিশ যাজক ফাদার মুলিগ্যানকে, কেরালায় তাঁকে কাজ দিয়ে পাঠানো হয়েছিলো মাদ্রাজের চার্চ থেকে।

তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলো নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন, যাতে বুদ্ধিমত্তার সাথে সেগুলো খণ্ডাতে পারেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ফাদার মুলিগ্যান আসতেন

এইমেনেমের বাড়িতে, বেবি কোচাম্মার বাবা রেভারেন্ড ই. জন, ইপের সঙ্গে দেখা করতে, তিনি ছিলেন মার থোমা চার্চের যাজক। রেভারেন্ড ইপে খৃষ্টান সমাজে খুব ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। ওরা মনে করতো তাঁকে বিশেষ ভাবে দীক্ষিত করেছিলেন সিরিয়ান চার্চের প্রধান এবং সে ব্যাপারটা অনেকটা গ্রাম্য লোককাহিনীর মতই প্রচলিত ছিলো। ১৮৭৬ সালে যখন বেবি কোচাম্মার বাবা সাত বছরের তখন তাঁর বাবা তাঁকে সিরিয়ান চার্চের প্রধানের কাছে নিয়ে যান, প্রধান তখন কেরালায় সিরিয়ান খৃষ্টানদের দর্শন দিচ্ছিলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন প্রধান যাজক কোচিনের কল্যাণী হাউসের পশ্চিমের বারান্দায় একদল লোকের উদ্দেশ্যে কথা বলছেন। তাঁর বাবা তাঁকে এই সুযোগে কানে কানে কিছু বলে এগিয়ে দিলেন সামনে। ভবিষ্যতের রেভারেন্ড নুয়ে বসে শক্ত ও ভীত ঠোঁটে চুমু খেলো প্রধানের মধ্যমার আংটিতে আর তাতে থুথু লাগিয়ে দিলো। প্রধান তাঁর আংটি জামার হাতায় মুছলেন এবং আশীর্বাদ করলেন। তার অনেক পরে সে বড় হয়ে যাজক হলো। রেভারেন্ড ইপে সমধিক পরিচিত হলেন 'পুন্যানু কুঞ্জু' নামে, যার অর্থ ছোট আশীর্বাদপুষ্ট– তাঁর আশীর্বাদের জন্যে দূর-দুরান্তের গ্রাম থেকে নৌকায় করে মানুষ আসতো তাঁর কাছে।

যদিও রেভারেন্ডের সঙ্গে ফাদার মুলিগ্যানের বয়সের ফারাকটা বেশ এবং দুই চার্চের সঙ্গে যুক্ত দু'জন (যার একমাত্র অনুভূতি হলো পারস্পরিক আবেগের অভাব) তবুও দু'জনে পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করতেন। প্রায়ই ফাদারকে দুপুরের খাবারের জন্যে দাওয়াত করা হতো, দু'জন পুরুষের মধ্যে একজনেরই কেবল যৌন অনুভূতি আসতো তন্বী কিশোরীকে দেখে। সে টেবিলের পাশে ঘুর ঘুর করতো খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে। প্রথমদিকে বেবি কোচাম্মা ফাদার মুলিগ্যানকে ভোলাতে চেয়েছিলেন নকল সেবা আর দান-খয়রাতের নাটকের মাধ্যমে। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সকালে চার্চে ফাদার আসার আগেই বেবি কোচাম্মা গ্রামের কোন গরীব বাচ্চাকে জোর করে সাবান দিয়ে স্নান করাতেন। জোরাজুরিতে বেচারা বাচ্চাটা তার উঁচু হয়ে থাকা বুকের হাড়ে ব্যথা পেতো।

'সুপ্রভাত ফাদার' তিনি ফাদারকে দেখা মাত্রই বলতেন হাসিমুখে, যদিও অন্য হাতে তিনি শক্ত করে ধরে থাকতেন বাচ্চাটার সাবান মখোনো পিচ্ছিল হাত।

'তোমাকেও সুপ্রভাত' ফাদার মুলিগ্যান ছাতা গুটাতে গুটাতে বলতেন।

বেবি কোচাম্মা বলতেন, "ফাদার প্রথম কোরিন্থিয়ামের কিছু ব্যাপার আপনাকে জিজ্ঞেস করার আছে। ১০ম পর্বে, তেরো নম্বর পংক্তিতে বলেছে– 'সব বস্তুই আমার অনুগত, কিন্তু সব বস্তুই আমার জন্য সুবিধাজনক নয়।' ফাদার, কিভাবে সব বস্তু তাঁর অনুগত নয়? আমি বুঝলাম কিছু কিছু বস্তু তাঁর প্রতি অনুগত, কিন্তু–"

ফাদার মুলিগ্যান খুব খুশী হতেন, এই মনে করে- তিনি ছোট্ট মেয়েটার মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন যে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো টানটান হয়ে, চুমু খেতে উৎসুক মুখ আর চক্‌চকে কয়লা-কালো চোখ নিয়ে। হয়তো তিনি নিজেও তরুণ ছিলেন তাই তাঁর সবুজাভ চোখে তিনি যে উচ্ছ্বাস বহন করতেন তা কিশোরীর বাইবেলীয় অবাস্তব সন্দেহগুলোর সঙ্গে ঠিক মানানসই হতো না।

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দুপুরে সূর্যের গা জ্বলানো উত্তাপের মধ্যে তাঁরা কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিশোরী ও ধর্মীয় লোকটি যাঁরা দুজনেই অখৃষ্টানের মতো অনুরাগে আচ্ছন্ন। বাইবেলটা তাঁদের কাছে ছিলো অসার, একটা ছুতো ছিলো।

মাঝে মাঝে তাঁদের বকবকানির মধ্যে সেই ছোট্ট বাচ্চাটি– যাকে জোর করে স্নান করানো হতো, সে পিছলে পালিয়ে যেতো এবং ফাদার মুলিগ্যান সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে উঠতেন আমাদের উচিত ওকে তাড়াতাড়ি ধরে আনা নয়তো ও ঠান্ডা লাগিয়ে ফেলবে।

তারপর তিনি তাঁর ছাতা খুলতেন এবং চকোলেট রঙের আলখাল্লা আর নরম চটি পায়ে হাঁটা দিতেন। তাঁকে ব্যাগ্র দ্রুত পদক্ষেপে হেঁটে যাওয়া উটের মতো লাগতো। চলে যাওয়ার সময় তিনি পিছনে ফেলে যেতেন বেবি কোচাম্মার ব্যাকুল হৃদয়কে, যা বাঁধা ছিলো শুধু তাঁরই জন্য। মনে হতো হৃদয়টা পড়ে থাকতো পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পাতা আর নুড়ি পাথরের ওপর বিক্ষত এবং প্রায় ভঙ্গুর অবস্থায়।

একটা বছর গেলো শুধু বৃহস্পতিবার পার করে করে। ফাদার মুলিগ্যানের সময় হয়ে আসলো মাদ্রাজে ফিরে যাবার। যেহেতু দান-খয়রাত কোনো ভালো ফল আনলোনা তাই হতাশ বেবি কোচাম্মা তাঁর সব আশা বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দিলেন।

এক ধরনের একগুঁয়েমি দেখিয়ে (যা তখনকার দিনে একটা যুবতী মেয়ের মধ্যে দেখা গেলে কোনো শারীরিক অসম্পূর্ণতা যেমন জোড়াঠোঁট বা বিকৃত পা-এর মতো মনে করা হতো) বেবি কোচাম্মা তাঁর বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে রোমান ক্যাথলিক হলেন। তিনি ভ্যাটিকানের বিশেষ অনুগ্রহে মাদ্রাজের এক কনভেন্টে শিক্ষানবীশ হিসাবে শপথ নিলেন। তিনি মনে করলেন এতে তাঁর সঙ্গে দৈবাৎ মাঝে মধ্যে সামনা সামনি কথা হলেও ফাদার মুলিগ্যানকে দেখা হবে নানান অনুষ্ঠানে। তিনি কল্পনায় দেখতেন ভারি মখমলের পর্দা লাগানো অন্ধকার ঘরে বসে তাঁরা ঈশ্বর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন। এটাই তাঁর কাম্য ছিলো, এটাই ছিলো তাঁর সাহসে কুলিয়ে ওঠা একমাত্র আশা। শুধুমাত্র তাঁর কাছে থাকা। এতো কাছে যেন তাঁর দাড়ির ঘ্রাণ পাওয়া যায়, তাঁর আলখাল্লার বুনন দেখা যায়। কেবল দৃষ্টি দিয়েই তাঁকে ভালোবাসার জন্যে।

বেবি কোচাম্মা খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেললেন, তাঁর এই চেষ্টা তেমন কাজে [illegible]বে না। তিনি দেখলেন বয়সী সিস্টাররা তাদের উঁচু দরের বাইবেলীয় সন্দেহে আচ্ছন্ন করে রাখে যাজকদের। যেসব তাঁর তুচ্ছ ধারণার চেয়ে অনেক উঁচু মানের এবং বুঝলেন এভাবে ফাদার মুলিগ্যানের কাছে যেতে তাঁর কয়েক বছর লেগে যেতে পারে।

তিনি অস্থির ও অসুখী হয়ে উঠলেন কনভেন্টে। তাঁর মাথার চামড়ায় দেখা দিলো এলার্জির গোটা। ওটা হলো বার বার টুপির ঘষার ফলে। তিনি অন্যদের চেয়ে অনেক ভালো ইংরেজী বলতে পারেন বলে সবাই মনে করতো। ফলে তিনি আরো একা হয়ে যেতে লাগলেন।

কনভেন্টে যোগ দেওয়ার এক বছরের মধ্যেই বাবা তাঁর কাছ থেকে পেতে লাগলেন উদ্ভট সব চিঠি। যেমন

আমার প্রিয় বাবা,

আমি ভালো ও সুখে আছি। কিন্তু কোহিনূর অসুখী আর ঘরের জন্যে ওর মন টানে। প্রিয় বাবা, আজকে কোহিনূর দুপুরের খাওয়ার পর বমি করেছে এবং জ্বর এসেছিলো। কনভেন্টের খাবারে কোহিনূরের হয়না, যদিও আমার ভালোই লাগে। বাবা, আসলে কোহিনূর দুঃখে আছে কারণ কেউ তাকে নিয়ে চিন্তাও করে না, বোঝেও না।

যদিও সে সময়ে কোহিনূর নামটা ছিলো দুনিয়ার সবচেয়ে বড় হীরের। রেভারেন্ড ই, জন, ইপে অন্য কোনো কোহিনূরের কথা জানতেন না। তিনি অবাক হতেন, কি করে একটা মুসলমান নামের মেয়ে ক্যাথোলিক কনভেন্টে আসলো!

বেবি কোচাম্মার মা-ই প্রথম বুঝতে পারলেন যে কোহিনূর আর কেউ না বেবি কোচাম্মা নিজেই। তাঁর মনে পড়লো, তিনি বেবি কোচাম্মাকে তাঁর বাবার (বেবি কোচাম্মার নানার) উইলের একটা কপি দেখিয়েছিলেন, যেখানে লেখা ছিলো, "আমি আমার রত্নগুলো দেখেছি এবং তাদের মধ্যে একটা হলো আমার কোহিনূর।" রত্নগুলো বলতে তিনি তার নাতি নাতনিদের বুঝিয়েছিলেন। তিনি তাঁর টাকা ও গহনা নাতি-নাতনিদের ভাগ করে দেন উইল করে। কিন্তু কখনোই পরিষ্কার করেননি কাকে তিনি কোহিনূর মনে করতেন। বেবি কোচাম্মার মা বুঝতে পারলেন বেবি কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই ধরে নিয়েছে যে, কোহিনূর বলতে তিনি তাঁকেই বুঝিয়েছিলেন। যতদিন কনভেন্টে ছিলেন বেবি কোচাম্মা কোহিনূর নামটা ব্যবহার করেই পরিবারের কাছে চিঠি লিখতেন এবং নিজের সমস্যার কথা বলতেন, কারণ চিঠিগুলো পোস্ট করার আগে গ্র্যান্ড মাদার তা নিজে পড়তেন।

রেভারেন্ড ইপে মাদ্রাজে গিয়ে মেয়েকে কনভেন্ট থেকে ফেরত আনলেন – তিনি কনভেন্ট থেকে আসতে পেরে খুশীই হয়েছিলেন। তবে এটা নিশ্চিত করেছিলেন যে আর ধর্মান্তরিত হবেন না এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিকই ছিলেন। রেভারেন্ড ইপে উপলব্ধি করলেন যে তাঁর মেয়ের এখন যা সুনাম হয়েছে তাতে তার আর কোনো স্বামী জুটবে বলে মনে হয়না, যেহেতু সে কোনো স্বামী পাবেনা তাই বলে শিক্ষা অর্জন করতে তো কোনো বাধা নেই! তাই তিনি তার জন্যে ব্যবস্থা করলেন আমেরিকার রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা কোর্স করার।

দু'বছর পরে, বেবি কোচাম্মা রচেষ্টার থেকে বাগানের সাজসজ্জার ওপর ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরে আসলেও ফাদার মুলিগ্যানের জন্যে তাঁর ভালোবাসার টান আরও বেড়ে গিয়েছিলো। যৌবনের সেই পাতলা সুন্দরীকে আর খুঁজে পাওয়া যেতনা তাঁর মধ্যে। রচেষ্টারে থাকার সময় তাঁর শরীর অসম্ভব বেড়েছিলো। সত্যি বলতে কি অস্বাভাবিক রকমের মোটা। এই বৃদ্ধির জন্যে চুনগাম ব্রিজের ঠাণ্ডা মেজাজের ছোট চেলাপ্পেন দর্জিও তাঁর ব্লাউজের জন্যে বুশ শার্টের মজুরী হাঁকতো। তাঁর আলসামি যাতে না

আসে তাই তাঁর বাবা তাঁকে এইমেনেমের বাড়ির সামনের বাগানের দেখাশোনার ভার দিলেন। যেখানে তিনি এক অদ্ভুত বাগান তৈরি করলেন– যা দেখতে কোট্টাইয়াম থেকেও লোক আসতো।

ঢিবির মতো ঢালু এক টুকরা জমি যার চারপাশে ছিলো নুড়ি বিছানো ঘোরানো পথ। বেবি কোচাম্মা ওটাকে বদলে ফেললেন বেঁটে সবুজ ঝোপের দেওয়াল ঘেরা, পাথরের টুকরো আর অদ্ভুত মানুষের আকৃতির নালা দিয়ে এক অপূর্ব বাগানে। তাঁর সবচেয়ে পছন্দের ফুলের মধ্যে ছিলো এন্থুরিয়াম। কয়েক ধরনের এন্থুরিয়াম ছাড়াও সেখানে ছিলো 'রাবরাম,' 'হানিমুন' আর কয়েক প্রজাতির জাপানী ফুল। ওগুলোর মোটা পাপড়ির রঙ ছিলো বিচিত্র – কালো, রক্ত লাল আর কমলা। তাদের ভেতরটা সব সময়ই হলুদ। বেবি কোচাম্মার বাগানের মাঝখানে, 'ক্যানা ও ফ্লক্স' এর বেত দিয়ে ঘেরা জায়গায় বসানো মার্বেল পাথরের ডানাওয়ালা শিশু মূর্তিটা ছায়া ফেলছিলো এক রূপালী আভার অগভীর জলাশয়ের মধ্যে যেখানে ফুটে ছিলো নীল পদ্ম। জলাশয়ের প্রত্যেক কোনায় অলস ভাবে শোয়ানো ছিলো একটা করে প্লাষ্টার-অব-প্যারিসের তৈরি গোলাপী রূপকথার মূর্তি যাদের গালগুলো ছিলো টকটকে লাল আর মাথায় লাল টুপি।

বেবি কোচাম্মা বিকেল কাটাতেন বাগানেই। শাড়ি আর গামবুট পরে, হাতে উজ্জ্বল কমলা রঙের বাগানের দস্তানা পরে, কেটে ছোট করতেন একজোড়া বড় ঝোপ। সিংহ পোষ মানানোর ট্রেনারের মতো তিনি প্যাঁচানো লতাকে পোষ মানাতেন আর শক্ত লোমের মতো ক্যাকটাসের পরিচর্যা করতেন। তিনি বনসাই করা গাছ গুলোকে ছোট রাখতেন, দুর্লভ অর্কিডের যত্ন করতেন। আবহাওয়ার বিরুদ্ধে মনে হতো তিনি যুদ্ধ করছেন। আলপাইন অঞ্চলের সাদা ফুলের ইডেল ওয়েস গাছ আর চীনা পেয়ারা ফলানোর চেষ্টা করতেন। প্রত্যেক রাতে পায়ে মলম মালিশ করতেন আর পায়ের আঙুলের চামড়ার ঘষামাজা করতেন।

প্রায় অর্ধশতাব্দীর কঠোর ও খুঁতখুঁতে পরিচর্যার পর এমন সাজানো বাগানটাকে ফেলে রাখা হয়েছে। নিজের মতো সেটা এখন তালগোল পাকিয়ে জংলী হয়ে গেছে। এমন হয়েছে, যেন একটা সার্কাস, যেটার জন্তুগুলো খেলার কৌশল সব ভুলে বসে আছে।

যে আগাছাটাকে লোকে বলতো কম্যুনিষ্ট পাচা (কারণ কেরালায় ওটা কম্যুনিজমের মতোই ছড়িয়ে পড়েছিলো) ওটা ভালো গাছগুলোকে খেয়ে ফেলেছে। কেবল লতাগুলো বেড়েই চলেছে, মৃতদেহের পায়ের নখের মতো। লতাগুলো বামন পুতুলগুলোর নাকের ফুটোর মধ্যে দিয়ে ঢুকে মাথার ভিতরে ছেয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল এসবে তারা খুব অবাক হয়েছে কিংবা এক্ষুণি হাঁচবে।

এরকম হঠাৎ অনানুষ্ঠানিক পরিত্যাগের কারণ নতুন একটা জিনিসের প্রতি ভালোবাসা। বেবি কোচাম্মা এইমেনেমের বাড়ির ছাদে একটা ডিসএ্যান্টেনা লাগিয়েছেন। তিনি তাঁর বসার ঘরে বসে স্যাটালাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে দুনিয়ার

সভাপতিত্ব করেন। বুঝতে অসুবিধা হয়না যে কি পরিমান উৎসাহ বেবি কোচাম্মার মধ্যে উথলে উঠেছে। ধীরে ধীরে হয়নি। হয়েছে এক রাতের মধ্যেই। সোনালী কেশবতী; যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ফুটবল, যৌনতা সবকিছু একই ট্রেনে চেপে এসেছে। একসঙ্গেই বের হয়েছে বোঁচকা থেকে। সব একই সরাইখানার অতিথি। আর এইমেনেমে যেখানে সবচেয়ে জোরালো আওয়াজ ছিলো বাসের ভেঁপু, এখন সেখানে যখন তখন ভূতের মতো এনে দাঁড় করানো যায় যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, আলোকচিত্রের মতো স্পষ্ট গণহত্যা আর বিল ক্লিনটনকে।

তাই যখন তাঁর সাজানো বাগানটার গাছগুলো শুকিয়ে মরে যাচ্ছিলো, বেবি কোচাম্মা তখন আমেরিকান এন,বি,এ লীগের খেলাগুলো, একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ আর গ্র্যান্ড স্লাম টেনিসে মেতেছিলেন। সপ্তাহ্‌র দিনগুলোতে তিনি এখন দেখেন 'দ্য বোল্ড এন্ড দ্য বিউটিফুল আর সান্তা বারবারা' যেখানে সোনালী কেশবতী ঝলমলে রমণীরা (যাদের ঠোঁট রাঙানো আর চুল স্প্রে করে চেপে বসানো) পুরুষদের উত্তেজিত করে, অক্ষুণ্ন রাখে নিজেদের যৌনসাম্রাজ্য। বেবি কোচাম্মা তাদের ঝলমলে কাপড় চোপড়, স্মার্ট আর বিগলিত চেহারা খুব ভালোবাসেন। দিনের বেলায় আবার দৃশ্যগুলো দেখে বেবি কোচাম্মা নিজের মনে হাসেন।

রাঁধুনী কচু মারিয়ার কানে ঝুলছিলো মোটা সোনার কানের দুল, ওগুলোর ওজনে তার লতি দুটো কদাকার হয়ে গিয়েছিলো। তার পছন্দ ছিলো ওয়ার্ল্ড রেসলিং ফেডারেশনের কুস্তি প্রতিযোগিতা *রেসলিং ম্যানিয়া,* যাতে হাল্ক হোগান এবং মিঃ পারফেক্ট (যাদের ঘাড় মাথার চেয়ে চওড়া এবং পরে থাকতো আঁটোসাঁটো ট্র্যাকস্যুট), ওরা নিষ্ঠুরভাবে পেটাতো একজন আর একজনকে।

কচু মারিয়ার হাসি দেখে মনে হতো, নিষ্ঠুরতাকে সে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

সারাদিন তারা বসার ঘরে বসে থাকতো, বেবি কোচাম্মা বড় হাতলওয়ালা বাগানের চেয়ারে না হয় গাড়ির সোফায় তাঁর পায়ের অবস্থার সঙ্গে মিল রেখে, কচু মারিয়া তাঁর পাশে মেঝেয় (যখন ইচ্ছা চ্যানেল বদলাতো) নিজেদেরকে টেলিভিশনের হুল্লোড়ের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতো। একজনের চুল সাদা বরফের মতো, আর একজনের কালো, কলপ করা। তারা সব প্রতিযোগিতায় ঢুকতো, কেউ বিজ্ঞাপন দেখে মূল্য ছাড়ের সুবিধা নিতো এবং দু'একবার টি শার্ট আর একটা থার্মোফ্লাস্ক জিতেছিলো, যা বেবি কোচাম্মা তাঁর আলমারীতে ভরে রেখেছেন।

বেবি কোচাম্মা এইমেনেমের বাড়িটাকে খুব ভালোবাসতেন আর আসবাবপত্র গুলোকে খুব মূল্যবান মনে করতেন, ওগুলো অবশ্য তিনি সবার চেয়ে দীর্ঘজীবি হওয়াতেই হাতাতে পেরেছেন। মামাচির বেহালা, বেহালার খাপ, উটি বাসনপত্রের আলমারী, প্লাস্টিকের ঝুড়ির মতো চেয়ারগুলো, দিল্লীর বিছানা, ভিয়েনার ড্রেসিং টেবিল, যার হাতির দাঁতের কাজ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, ভেলুথার তৈরী লাল কাঠের খাওয়ার টেবিল।

তিনি বিবিসিতে দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধ দেখে ভয় পেয়েছিলেন। চ্যানেলগুলো বদলানোর সময় এসব দৃশ্য দেখে তাঁর ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা বিপ্লব ও

মার্কসবাদী– লেনিনবাদী গন্ডগোলের পুরানো আশংকা আবার চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। দিনে দিনে অস্থির ও অত্যাচারিত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাঁর মনে হয় জাতিবিনাশ, দুর্ভিক্ষ, গণহত্যাগুলো তাঁর সম্পত্তির সরাসরি শত্রু।

তিনি তাঁর জানালা দরজাগুলো বন্ধ রাখেন যখন সেগুলো ব্যবহার না হয়। জানালাগুলো ব্যবহার করেন কেবল বিশেষ কারণে। এক ঝলক বিশুদ্ধ বাতাস ঢোকানোর জন্যে। দুধের দাম মেটানোর জন্যে, ঘরে আটকে পড়া মাছি বের করার জন্যে (কচু মারিয়া তোয়ালে হাতে সারা বাড়ি তাড়িয়ে বেড়ায়)।

তিনি তাঁর পুরানো রঙচটা ফ্রিজটাও বন্ধ করে রাখেন, যার ভিতর থাকে সাপ্তাহিক ক্রীম বনরুটিগুলো। ও বস্তুগুলো কচু মারিয়া আনে কোট্টাইয়ামের সবচেয়ে ভালো বেকারী থেকে, দু' বোতল "চাল-পানি" যা তিনি সাধারণ জলের বদলে খান।

তাকের নিচে মামাচির উইলো ডিজাইনের বাসনপত্রের যে ক'টা বাকি ছিলো সেগুলো রেখেছিলেন।

প্রায় এক ডজনের কাছাকাছি ইনস্যুলিনের বোতল, মাখন-পনির রাখার খোপে রেখেছিলেন তিনি, রাহেল তাঁকে এনে দিয়েছিলো। তাঁর সন্দেহ হতো, দেখতে নিষ্পাপ ও মায়াময় চোখের ছেলেমেয়েরাও হতে পারে থালাবাসন চোর কিংবা ক্রীম-বন চোর, অথবা চোরের স্বভাবের ডায়াবটিক রোগী যারা এইমেনেমে এসেছে বিদেশী ইনস্যুলিনের আশায়।

তিনি যমজ দু'ভাই বোনকেও বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মনে হতো যে এরা সব কিছুই পারে। যে কোন কিছুই। *তারা তাদের দেওয়া উপহারও চুরি করে নিয়ে যেতে পারে*। তিনি মনে করলেন এবং দুঃখ পেলেন এই ভেবে যে, তিনি আবার দু'জনকে একজন ভাবতে শুরু করেছেন। এত বছর পরেও। যাতে অতীত তাঁকে ছেয়ে ফেলতে না পারে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর চিন্তা ভাবনাগুলো ঝেড়ে ফেললেন। কিন্তু ভয় গেলো না, ভাবলেন, ওরা আবার তাঁকে দেওয়া উপহার চুরি করে নিতে পারে।

তিনি রাহেলের দিকে তাকালেন। ও দাঁড়িয়েছিলো খাওয়ার টেবিলের কাছে। আবার ভূতুড়ে চোর মনে হলো তাকে; কারণ ও-ও খুব শান্ত আর নিঃশব্দ থাকার কৌশল রপ্ত করেছে, এসথার মতোই। বেবি কোচাম্মা রাহেলের চুপচাপ হয়ে যাওয়ায় কিছুটা ভয় পেলেন।

তিনি কাঁপা গলায়, ভুল বকার মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'তো? তোমার পরিকল্পনা কি? কতদিন থাকবে ঠিক করেছো?'

রাহেল কিছু বলতে চাইলো, তবে তা শোনা গেলো না। যেন এক টুকরা টিন। সে জানালার কাছে গিয়ে ওটা খুলে দিলো এক ঝলক টাটকা বাতাসের জন্যে।

'তোমার বাতাস খাওয়া হলে ওটা বন্ধ করে দিও'– বলেই মুখটা বন্ধ করলেন বেবি কোচাম্মা।

এখন আর ঐ জানালা থেকে নদীটা দেখা যায় না।

আগে হলে দেখতে পেতো, যতদিন না মামাচি পিছনের বারান্দাটায় এইমেনেমের দরজা লাগিয়েছিলেন।

রেভারেন্ড জন ইপের তেলরং-এর প্রতিকৃতি আর এলেউটি আমাচির (এসথা ও রাহেলের বড় মা-বাবার) ছবি পিছনের বারান্দা থেকে সরিয়ে সামনের বারান্দায় রাখা হয়েছিলো।

সেখানে এখন ঝোলানো হয়েছে রেভারেন্ড জন ইপে আর তাঁর স্ত্রীর ছবি। কৃত্রিম চোখের শুকানো মোষের মাথাটার দু'পাশে ঝুলছে। রেভারেন্ড ইপে হাসি মুখে তাকিয়ে ছিলেন নদী পার হয়ে রাস্তার দিকে।

এলিউটি আমাচিকে মনে হচ্ছিল বেশি বিমূঢ়। যেন তিনি ঘুরে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। তাঁর পক্ষে নদীর দৃশ্যটা না দেখতে পারাটা ভালো ছিলো না। তিনি তাঁর স্বামীর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু হৃদয়ে তিনি অন্য জিনিস দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর ভারি ও ময়লা 'কুনুক' কানের দুল (যা রেভারেন্ড তাকে শুভেচ্ছা স্বরূপ দিয়েছিলেন) কানের লতি নিয়ে অনেকটা ঝুলে পড়ে প্রায় কাঁধ বরাবর নেমে গিয়েছিলো, তাঁর কানের লতির ফুটো দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো উষ্ণ নদীকে এবং সেখানে নুয়ে পড়া গাঢ় রঙের গাছগুলোকে, জেলে নৌকো, জেলে ও তাদের ধরা মাছগুলো।

যদিও বাড়ি থেকে নদীটা আর দেখা যাচ্ছিল না। তবে সমুদ্রের ঝিনুক যেমন সবসময় একটা সামুদ্রিক অনুভূতি বুকে ধরে রাখে সেরকম এইমেনেমের বাড়িটা ধরে রেখেছিলো একটা নদীর গন্ধ।

একটা কেমন যেন ধেয়ে আসা, গড়িয়ে চলা, মাছের মতো সাঁতারের অনুভূতি।

খাওয়ার ঘরে যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো এবং বাতাসে তার চুল উড়ছিলো সেখান থেকে রাহেল দেখতে পেলো বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ছে তার নানীর পুরানো আচার ফ্যাক্টরীর জংধরা টিনের চালে আর সেখান থেকে গড়িয়ে মাটিতে।

প্যারাডাইস পিকল্‌স এ্যান্ড প্রিজার্ভস।

নদী আর বাড়ির মাঝখানে ছিল কারখানাটা। ওরা বানাতো আচার-চাটনি, জ্যাম, গুঁড়োমশলা এবং আনারস, টিনজাত করতো আর বানাতো কলার জ্যাম (অবৈধভাবে)। কারণ এফ, পি, ও (খাদ্য দ্রব্যের মানরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান) তাদের এই জ্যামকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো। তাদের খাদ্যনীতির নিয়ম অনুযায়ী এটাকে জ্যাম ও বলা যায়, জেলিও বলা যায়। বস্তুটা ছিল জেলির চেয়ে পাতলা আবার জ্যামের চেয়ে গাঢ়। ওটাই ছিলো সন্দেহজনক, এই ঘনত্ব কোনও শ্রেণীতে পড়ে না বলে তাদের মনে হয়েছিলো।

তাদের বই অনুযায়ী।

রাহেল পিছনের কথা মনে করতে চেষ্টা করলো। তার মনে হলো যদিও এই পারিবারিক সমস্যাটা ছিলো বড় ছোটর– কিন্তু সমস্যাটা ছিলো অনেক গভীর একটা ব্যাপার, শুধু মাত্র জ্যাম-জেলির মতো তুচ্ছ বিষয়ের নয়। হয়তোবা, আম্মু, এসথা এবং সে ছিলো সবচেয়ে বিশ্রীধরণের প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গকারী। কিন্তু তারাই শুধু নয়, অন্যরাও। তারা সবাই নীতিগুলো ভঙ্গ করেছে, তারা সবাই নিষিদ্ধ অঞ্চলে ঢুকেছে। তারা সবাই আইনের বরখেলাপ করেছে এবং ঠিক করেছে কাকে কতটুকু ও কিভাবে ভালোবাসা হবে। সে সব আইন যা নির্ধারণ করে দাদী-নানীকে দাদী-নানী, চাচা-মামাদের চাচা-মামা, মা'দের মা, চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো ভাই-বোনদের, জ্যামকে জ্যাম ও জেলিকে জেলি হিসাবে।

এটা এমন একটা সময় যখন চাচারা হয়ে যায় বাবা, মায়েরা হয়ে যায় প্রেমিকা, মামাত বোনেরা মারা যায় ও শেষকৃত্য হয় তাদের।

এটা এমন একটা সময় যখন অচিন্ত্যনীয় বিষয়গুলোকে চিন্ত্যনীয় মনে হয় এবং অসম্ভব বলে মনে হওয়া ব্যাপারগুলো সত্যি সত্যিই ঘটে।

সোফি মলের শেষকৃত্যের আগেই পুলিশ ভেলুথাকে ধরেছিলো।

হাতকড়া তার কব্জিতে দাগ তৈরি করেছিলো। ঠাণ্ডা হাতকড়া, ওটা থেকে পাওয়া যায় ধাতুর টকো গন্ধ।

যেন বাসের ভিতরের ইস্পাতের রড, কন্ডাক্টারের হাতের গন্ধওঁয়ালা। পুরো ঘটনাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর, বেবি কোচাম্মা বলে উঠলেন, '*যেমন বুনবে তেমনই ঘরে তুলবে।*' যদিও এখানে বোনা ও তোলার মধ্যে তাঁর কোন ভূমিকাই ছিলোনা।

তিনি তাঁর ছোট ছোট পায়ে ফিরে গেলেন তার এমব্রয়ডারির কাজে। তাঁর ছোট পায়ের গোড়ালি কখনই মেঝে ছুঁতোনা।

এসথাকে ফেরত পাঠানোর চিন্তাটা তাঁরই মাথা থেকে বের হয়েছিলো।

মার্গারেট কোচাম্মার মনের ভিতরে তার নিজের মেয়ের মৃত্যুর জন্যে শোক ও তিক্ততা এমনভাবে পেঁচিয়ে ছিলো যেন সেটা একটা কড়া স্প্রিং। সে ইংল্যান্ড ফিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তেমন কিছু বলতো না, তবে সুযোগ পেলেই এসথাকে চড় কষাতো। রাহেল দেখলো, আম্মু এসথার ছোট বাক্সটা গুছালো। আম্মু ফিসফিস করে বললো, 'হয়তো ওদের কথাই ঠিক, একটা ছেলের আসলেই হয়তো একটা বাবা দরকার হয়।'

রাহেলের মনে হলো তার চোখগুলো মরে গেছে।

তাঁরা হায়দ্রাবাদে এক যমজ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করলেন। ওরা চিঠিতে লিখে জানালো যে, একই ভ্রূণ নিষিক্ত যমজদের আলাদা রাখা উচিত নয়। কিন্তু দুই নিষিক্ত ভ্রূণ থেকে হওয়া এই যমজ দু'টিও অন্যান্য সাধারণ যমজদের চেয়ে আলাদা নয় এবং অন্যান্য ভেঙে যাওয়া সংসারের শিশুদের যেমন মানসিক পীড়নের শিকার

হতে হয় এদেরও তেমনি হয়েছে, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। সাধারনের বাইরে কিছু নয়। তাই এসথাকে ট্রেনে চড়িয়ে ফেরত পাঠানো হলো। ওর সাথে তার টিনের বাক্স, তার চোখা জুতো জোড়া, খাকি হোল্ডঅল, প্রথম শ্রেণীতে, সারারাত মাদ্রাজ মেলে মাদ্রাজ, সেখান থেকে তাদের বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে মাদ্রাজ থেকে কলকাতা। তার টিফিন ক্যারিয়ারে ছিলো টমেটো স্যান্ডউইচ। আর ঈগল পাখি আঁকা এক ঈগল ফ্লাস্ক। তার মাথায় ছিলো সব উদ্ভট চিত্রকল্প।

বৃষ্টি। ধেয়ে আসা কালো জলধারা, একটা গন্ধ, মধুর মিষ্টি, অনেকটা বাতাসে দোলা বাসি গোলাপের মতো।

তবে সবচেয়ে খারাপ যেটা সেটা হলো সে তার মাথায় নিয়ে এলো এক তরুনের স্মৃতি, যার মুখটা এক বৃদ্ধের মুখের সঙ্গে মিলে যায়। একটা ফোলা থ্যাতলানো মুখের ছবি, যার হাসিটাকে যেন কেউ উল্টোপাল্টা করে দিয়েছে। সচ্ছ তরলের একটা ধারার ছবি যার মধ্যে বাল্ব এর ছায়া দেখা যাচ্ছে। একটা রক্তাক্ত চোখ, খোলা, বিস্ময়ে বিস্ফোরিত এবং তার দিকে মেলা। এসথা– এসথা কি করেছে, সে ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে

'হ্যাঁ'।

'হ্যাঁ,' এই সেই লোক।

যে শব্দটাকে এসথা কোন রকমেই আটকে রাখতে পারেনি, *'হ্যাঁ'*।

পাগলামি মনে হয়না কাজে এসেছিলো। সেটা ওখানেই গেড়ে বসেছিলো, গভীরভাবে, খাঁজে খাঁজে, যেমন আমের আঁশ গেঁথে যায় দাঁতের ফাঁকে, দুশ্চিন্তা করে তখন কোনো লাভ হয় না।

একেবারে বাস্তবতার নিরীখে বিচার করলে এটা বলাই ঠিক যে, সবকিছুর শুরু সোফি মলের এইমেনেমে আসার পর থেকে। হয়তো এটাই সত্যি যে, ব্যাপারগুলো একদিনেই বদলে গিয়েছিল, কয়েক ডজন ঘন্টা, সারাজীবনের কাজকে প্রভাবিত করতে পারে। যখন যে রকম হয়, অর্থাৎ যে সমস্ত কয়েক ডজন ঘন্টা (যাদেরকে মনে হয় কোন আগুনে পোড়া বাড়ির ধ্বংসস্তুপ) যেমন পুড়ে যাওয়া ঘড়ি, ঝলসানো ছবি, অল্প পোড়া আসবাব– এসবকে অবশ্যই ধ্বংসাবশেষ থেকে তুলে এনে পরীক্ষা করা হয়, আর জবাব দিতে বাধ্য করা হয়।

ছোট ছোট ঘটনা, সাধারণ বিষয়, ভেঙে ফেলা এবং আবার জোড়া লাগানো। নতুন অর্থ দিয়ে গাঢ় রঙে রাঙানো। হঠাৎ করে তারা হয়ে ওঠে কোন কাহিনীর উপজীব্য– শ্বেতশুভ্র অস্থি কাঠামো।

তবুও বলতে হয় সোফি মল এইমেনেমে আসার পরপরই ওটা শুরু হয়েছিলো– এটা একভাবে দেখা। অন্যদিক দিয়ে এটাও বলা যায় যে, ওটা শুরু হয়েছিলো হাজার হাজার বছর আগে থেকেই। মার্কসবাদীরা আসার অনেক আগে। বৃটিশরা মালাবার দখলের আগে। ওলনদাজদের আসার আগে, ভাস্কো-দা-গামা আসার আগে,

জ্যামোরিন-এর কালিকট জয়েরও আগে। তারও আগে যখন মেরুন রঙের আলখাল্লা পরা তিন সিরিয়ান যাজককে পর্তুগীজরা খুন করে সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলো—তাদের যখন পাওয়া গিয়েছিলো তখন সামুদ্রিক সাপ তাদের বুকে পেঁচিয়ে ছিলো আর তাদের দাড়িতে জড়িয়ে ছিলো শামুক। আরো বিতর্ক করা যায় যে, এটা শুরু হয়েছে আরো অনেক আগে থেকেই যখন কেরালাতে খৃষ্ট ধর্ম নৌকায় চড়ে এসেছিলো ব্যাগের চায়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো। এটা আসলে শুরু হয়েছিলো সেদিন থেকে, যখন ভালোবাসার আইন প্রণীত হয়েছিলো। সেই সব আইন যা দিয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে কাকে, কিভাবে।

আর কতটুকু ভালোবাসতে হবে।

যাই হোক, বাস্তবতার নিরীখে, এক বাস্তব আশাহীন জগতে...

২

পাপাচির মথ

ওটা ছিল ডিসেম্বরের ঝকঝকে নীল আকাশের এক দিন। সালটা উনসত্তর (উনিশটা উহ্য)। এটা কোনও পরিবারের জন্যে, এমন একটা সময় যখন এমন কিছু ঘটে, যাতে তার গোপন মূল্যবোধগুলো মৃদু ধাক্কা খেয়ে বের হয়ে আসে আর বুদবুদের মতো ওপরে ভাসতে থাকে কিছুদিনের জন্যে এবং সবাই তা দেখতেও পায়।

আকাশী নীল রঙের প্লেমাউথ গাড়িটা, লেজে সূর্যের ছটা, নতুন ধান খেত আর পুরনো রাবার গাছের পাশ দিয়ে ছুটে গেছে কোচিনের দিকে। তারও আগে একটা ছোট দেশে যার ভূগোলটাও একই রকম (জঙ্গল, নদী, ধান ক্ষেত, কম্যুনিস্ট)-এর উপর এত বেশী বোমাবর্ষণ করা হয়েছিলো যার ফলে তা ছ' ইঞ্চি ইস্পাতের নিচে হারিয়ে গিয়েছিলো। অবশ্য এখানে তখন শান্তির সময়, প্লেমাউথের যাত্রী পরিবারটি পূর্বাভাসের শঙ্কা ছাড়াই যাচ্ছিল।

প্লেমাউথটা ছিল পাপাচির, রাহেল আর এসথার নানার, এবং রাহেল আর এসথা কোচিনে যাচ্ছিল *'দ্য সাউন্ড অব মিউজিক'* ছবিটা তৃতীয়বারের মতো দেখতে। সবগুলো গান ছিল ওদের মুখস্ত।

তারপর ওরা সবাই থাকতে গিয়েছিলো হোটেল সি কুইনে, সেখানে পুরানো খাবারের ঘ্রাণ ম্ ম্ করছিলো। আগে থেকেই বুকিং করা ছিলো। পরের দিন ভোরে তাদের যাওয়ার কথা ছিলো, কোচিন এয়ারপোর্টে চাকোর প্রাক্তন স্ত্রীকে আনতে– তাদের ইংলিশ মামী, মার্গারেট কোচাম্মা আর তাদের মামাতো বোন সোফি মল– যারা এইমেনেমে বড় দিন কাটাতে আসছিলো। সেই বছরের শুরুতে মার্গারেট কোচাম্মার দ্বিতীয় স্বামী জো গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলো। যখন চাকো দুর্ঘটনার কথা জানলো তখন সে তাদের এইমেনেমে বেড়িয়ে যাবার জন্যে বললো। তার মতে, সে কোনভাবেই ওদেরকে ইংল্যান্ডে একা, চুপচাপ বড় দিন উদযাপন করতে দিতে পারে না– এমন এক বাড়িতে, যেটা বেদনাবিধূর স্মৃতিতে ভরা।

আম্মু বলতো, চাকো সব সময় মার্গারেট কোচাম্মাকে ভালোবাসতো, পাপাচি অবশ্য কথাটা মানতেন না, পাপাচি মনে করতেন যে, চাকো কখনোই মার্গারেটকে ভালোবাসেনি।

রাহেল ও এসথা আগে কখনোই সোফি মলকে দেখেনি। ওরা তার সম্বন্ধে অনেক শুনেছে, যদিও তা গত সপ্তাহে। বেবি কোচাম্মা ও কচু মারিয়া এমনকি পাচাচির কাছ থেকেও। যদিও ওরা সোফি মলকে কখনোই দেখেনি –তবু তারা এমন ব্যবহার করছিলো যেন তাকে অনেক আগে থেকেই চেনে। ওটা মনে হচ্ছিলো 'সোফি মল কি মনে করবে?' এরকম একটা সপ্তাহ্।

সেই সপ্তাহ্র পুরোটাই বেবি কোচাম্মা লেগে থাকলেন দু' যমজের ব্যক্তিগত কথাবার্তা শোনার তত্ত্বাবধানে এবং যখনই তিনি ওদের দেখতেন ওরা মালয়েলাম ভাষায় কথা বলছে, তখনই ওদের ওপর চাপানো হতো ক্ষতিপূরণের দায়, যেটা তাদেরকে দেওয়া হাতখরচ থেকে কথায় কথায় কেটে নেওয়া হতো। তিনি তাদেরকে বাধ্য করতেন শিখতে– 'শাস্তিস্বরূপ'– আমি সবসময়ই ইংরেজিতে কথা বলবো প্রত্যেকটা ১০০ বার করে। যখন ওরা তারিখ লেখা শেষ করতো, তিনি লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে দিতেন যেন পরের শাস্তির জন্য সেগুলো ওরা আবার ব্যবহার না করে।

তিনি ওদেরকে একটা ইংরেজি গান মকশ করতে বাধ্য করেছিলেন যা ওরা ফিরে আসার পথে গাইবে। তাদের গানটা শব্দ ধরে ধরে শিখতে হয়েছিলো এবং উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হয়েছিলো। প্রের নানসি এইসুম

Rej-oice in the Lo-Ord Or-Orlways
(রিজ-অয়েস ইন দ্য, ল-ওরড় অর-অরলয়েজ)
And again I Say rej-Oice.
(এ্যান্ড আগেইন আইসি রিজ-অয়েস)
ReJOice
(রিজঅয়েস)
ReJOice
(রিজঅয়েস)
And again I Say rej-Oice.
(এ্যান্ড আগেইন আই সি রিজ-অয়েস)

এসথার পুরো নাম হলো এসথাপ্পেন ইয়াকো। রাহেলের তো রাহেলই। ঐ সময়ে তাদের কোন উপাধি ছিলো না, কারণ আম্মু চিন্তাভাবনা করছিলো তার যুবতী বয়সের নামে ফিরে যেতে। যদিও সে বলতো, বাবার বা স্বামীর নাম যোগ করার ব্যাপারে মেয়েরা খুব একটা ইচ্ছুক নয়।

এসথা তার চোখা জুতোটা পরেছিলো আর চুল ফাঁপিয়ে রেখেছিলো এলভিসের মতো। তার প্রিয় এলভিসের গান ছিলো, 'পার্টি' *সাম পিপ্‌ল লাইক টু'রক, সাম পিপ্‌ল লাইক টু রোল।* এবং সে আশেপাশের কেউ যখন তাকে লক্ষ্য না করতো তখন গুন গুন করে গাইতো। একটা ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট গিটারের মতো ধরে এলোপাথাড়ি ঝাঁকিয়ে এলভিসের মতো ঠোঁট বাঁকিয়ে গান করতো। *বাট মুনইন আন'আ গ্রুনইন গোন্যা স্যাটিসফাই মাই সোল, লেস হ্যাভ আ পার্টি* এসথার ছিলো পিটপিটে, ঘুমে জড়ানো চোখ আর তার সামনের দাঁতগুলো ছিলো এবড়োথেবড়ো। রাহেলের নতুন দাঁতগুলো গজানোর অপেক্ষায় মাড়ির ভিতরে বসে ছিলো। কলমের ভিতর যেন শব্দ বসে থাকে। এটাই অবাক ব্যাপার যে, আঠার মিনিটের ছোট বড় হওয়ার জন্যে সামনের দাঁত ওঠার সময়েরও হেরফের হয়। রাহেলের মাথায় ছিল ঝর্নার মতো চুল। চুল বাঁধা থাকতো 'লাভ-ইন-টোকিও' দিয়ে, দু'টো পুঁতিকে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা একটা জিনিস। কোনভাবেই ওটার সঙ্গে ভালোবাসা বা টোকিওর সম্পর্ক ছিলো না। কেরালাতে 'লাভ ইন টোকিও' সময়ের পরীক্ষায় পাস করে টিকে গেছে আর তখন সেখানে মেয়েদের জিনসপত্রের ভালো দোকানে জিজ্ঞেস করলেই পাওয়া যেত। একটা রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা দু'টো পুঁতি।

রাহেলের খেলনা হাত ঘড়ির ওপর সময় আঁকা ছিলো। দু'টা বাজতে দশ মিনিট। তাঁর একটা ইচ্ছা ছিলো এমন একটা ঘড়ি কেনার যেটার সময় ইচ্ছা করলেইও বদলে নিতে পারবে (তার মতে সময়ের উৎপত্তিই হয়েছে সেজন্য)। তার হলুদ ফ্রেমের লাল প্লাস্টিকের সানগ্লাসগুলো তৈরি হয়েছিলো পৃথিবীকে লাল দেখার জন্যে। আম্মু বলেতো, ওগুলো ওর চোখের জন্যে খারাপ আর কম পরার জন্যে বলতো। ওর এয়ারপোর্টে পরার ফ্রকটা ছিলো আম্মুর সুটকেসে। ওটার নিচের দিকটা আবার রঙ মিলিয়ে বানানো হয়েছিলো ওপরের সঙ্গে।

চাকো গাড়ি চালাচ্ছিলো। সে আম্মুর চেয়ে চার বছরের বড়। রাহেল আর এস্‌থা তাকে চাচেন বলতে পারতো না কারণ যখনই বলতো, সে তাদেরকে বলতো চেতান আর চেধুতি। ওরা তাকে আম্মাভেন বললে সে তাদেরকে বলতো আপোই ও আম্মাই। যদি তারা তাকে বলতো মামা সে তাদের বলতো মামী যেটা লোকজনের সামনে ইজ্জতের ব্যাপার ছিলো। তাই ওরা তাকে চাকোই বলতো।

চাকোর ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু বই আর বই। সে সবগুলো পড়েছে এবং সেখান থেকে লম্বা লম্বা সব উদ্ধৃতি তুলে রেখেছিলো কোন কারণ ছাড়াই অথবা এমন কোনো কারণে যা কেউ বুঝতে পারত না। যেমন, সেদিন সকালে যখন গেটের বাইরে বের হলো গাড়িতে, ওরা চিৎকার করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মামাচিকে বিদায় জানাচ্ছিল, চাকো হঠাৎ বলে উঠলো: '*গ্যাটস্‌বি ঠিক প্রমাণিত হলো শেষে, যে গ্যাটসবিকে ক্ষয় করেছিলো সে, এই ধুলো, যা ভেসেছিলো তার স্বপ্নে জাগরণে এবং সাময়িক দুঃখ-কষ্টে আর মানুষের সাময়িক সমৃদ্ধিতে।*'

সবাই এসব ব্যাপারে এতো অভ্যস্ত ছিলো যে, তারা নড়াচড়াও করলো না বা নিজেদের দিকে চাওয়াচাওয়িও করলো না। চাকো অক্সফোর্ডের নামকরা বিদ্বান আর

তার জন্যে কোন বিশেষ জায়গায় প্রবেশাধিকার ও খামখেয়ালীপনার অনুমতি দেওয়া ছিলো, যেটা সবার জন্যে ছিলো না।

সে দাবী করছিলো যে সে এ পরিবারের কাহিনী লিখবে আর সেটা প্রকাশ না করার জন্যে পরিবার তাকে টাকা দেবে। আম্মু বলতো পরিবারে একমাত্র চাকোই আছে যে আত্মীয়স্বজনের গুপ্তকথা ফাঁস করার জন্যে ঘুষ চাইতে পারে।

অবশ্য সেটা তখনকার কথা। সন্ত্রাসের আগের।

প্লেমাউথে আম্মু বসেছিলো সামনে, চাকোর পাশে, তখন তার বয়স ছিলো সাতাশ। তার পেটের ভিতরে ছিলো তার জ্ঞান যা তাকে বুঝিয়েছিলো যে, তার জীবন যাপিত হচ্ছে। তার একটাই সুযোগ ছিলো এবং সে একটা ভুল করেছিলো, সে ভুল মানুষকে বিয়ে করেছিলো।

আম্মু তার স্কুলের পড়া শেষ করেছিলো যে বছর, সে বছর তার বাবা দিল্লীর চাকরী থেকে অবসর নিয়ে এইমেনেমে ফিরে এসেছিলেন। পাপাচির মতে কলেজে কোন মেয়ের লেখাপড়ার দরকার নেই এবং ওটা বাজে খরচ। তাই আম্মুকে দিল্লী ছেড়ে তাদের সাথে চলে যেতে হলো। তখনকার দিনে এইমেনেমের একটা ছোট মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার ছিলো না। এর মধ্যে সে তার মাকে বাড়ীর কাজকর্মে সাহায্য করতে পারতো। যেহেতু তার বাবার তেমন সঙ্গতি ছিলো না সেহেতু তার যৌতুকের মাত্রাটাও ছিলো কম। ফলে বিয়ের প্রস্তাব আসলো না, এভাবে দু'বছর কেটে গেলো। আঠার বছরের জন্মদিনও পার হয়ে গেলো। তার বাবা-মা'র চোখেও ব্যাপারটা তেমন গুরুতর ছিলো না। আম্মু অস্থির হয়ে উঠলো, সারাদিন তার মাথায় ঘুরতো এইমেনেমে তার বদ মেজাজী বাবার কাছ থেকে পালানোর কষ্টকল্পনা। সে অনেকগুলো বুদ্ধি এঁটেছিলো, শেষে একটা কাজে আসলো। পাপাচি তাকে গরমের ছুটিটা কলকাতায় এক দূর সম্পর্কের পিসীর কাছে কাটানোর অনুমতি দিলেন। সেখানে আর একজনের বৌভাতের অনুষ্ঠানে আম্মু তার ভবিষ্যত স্বামীকে খুঁজে পেলো।

লোকটা ছুটিতে ছিলো, আসামের এক চা বাগানের সহকারী ম্যানেজারের চাকরী করতো। তার পরিবার ছিলো বিত্তশালী, জমিদার এবং দেশ বিভাগের পর তারা পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আসে। সে ছোটখাটো হলেও, সুঠাম ছিলো; দেখতেও ভালো। তার চোখে ছিলো এক মান্ধাতার আমলের চশমা, যেটাতে তাকে গম্ভীর লাগছিলো? যার ফলে তার সহজাত আকর্ষণ ও সৌম্য তারুণ্যের রসবোধ প্রকাশ পাচ্ছিলো। তার বয়স ছিলো তখন পঁচিশ আর ছ'বছর ধরে চা বাগানে কাজ করছিলো। সে কলেজে যায়নি। সেজন্যে তার কথাবার্তায় স্কুলের ছেলেমি ছিলো পুরোমাত্রায়। আম্মুর সাথে পরিচিত হওয়ার পাঁচ দিনের মাথায় সে প্রস্তাব দিলো। আম্মু তাকে ভালোবাসার ভান করেনি। সে শুধুমাত্র খারাপ দিকগুলো চিন্তা করেছিলো আর প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছিলো। সে ভাবলো যেকোন কিছু বা যে কেউই হোক না কেন সেটা এইমেনেমে ফিরে যাওয়ার চেয়ে ভাল। সে তার বাবা-মাকে তার সিদ্ধান্তের কথা লিখে জানালো। তাঁরা কোন উত্তর দেননি।

আম্মুর বিয়েটা ছিলো কলকাতার মতো জায়গায় বেশ জাঁকালো। পরে যখন সে ঐ দিনটার কথা মনে করতো তখন তার মনে পড়তো যে তার স্বামীর একটু করুণ ঢুলু ঢুলু চোখ, মনে হতো ভালোবাসায় কামার্ত হওয়ার উৎসাহে জ্বল জ্বলে, আসলে ছিলো বড় আট পেগ হুইস্কির মদালসতা ছাড়া অন্য কিচ্ছু না।

আম্মুর শ্বশুর ছিলেন রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কেমব্রিজের বক্সিং-এ ব্লু পাওয়া। তিনি বিএবিএ'র – বেঙ্গল এ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। তিনি নবদম্পতিকে উপহার দিলেন হাতে রং করা গোলাপী রঙের একটা বিরাট গাড়ি। তিনি নিজেই চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওতে ভরা হয়েছিলো সব গয়না আর উপহার। তিনি যমজ বাচ্চা দু'টো হওয়ার আগেই মারা গেয়েছিলেন তাঁর পিত্ত পাথরের অপারেশনের সময় অপারেশন টেবিলেই। তাঁর শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছিলেন বাংলার সমস্ত মুষ্টিযোদ্ধারা, শোকে যোগদানকারীদের অধিকাংশের ছিলো লণ্ঠনের মতো চোয়াল আর ভাঙা নাক।

আম্মু আর তার স্বামী যখন আসামে গেলো, আম্মু (ও ছিল সুন্দরী, যুবতী) চা বাগান-মালিকদের ক্লাবের মধ্যমণি হয়ে উঠলো। সে শাড়ির সাথে পিঠ খোলা কালো ব্লাউজ পরতো আর হাতে থাকতো সোনালি রঙের শিকল লাগানো হাত ব্যাগ। সে লম্বা সিগারেট টানতে শিখলো। লম্বা সিগারেটের পাইপে লাগিয়ে ঠোঁট গোল করে ঠিক মাপের ধোঁয়ার রিং বের করতে শিখলো। সে বুঝতে পারলো তার স্বামী মদখোর তো বটেই এবং একেবারে ছন্নছাড়া। সব মদখোরের মতো তারও ছিলো ধূর্তামী আর মদের প্রতি প্রাণান্ত আকর্ষণ। তার কিছু কিছু ব্যাপার আম্মু কখনো বুঝতে পারেনি। তাকে ছেড়ে দেওয়ার অনেক পরেও সে অবাক হতো এই মনে করে যে, কেন সে এতবেশী মিথ্যো বলতো! যখন মিথ্যো বলার প্রয়োজন ছিলো না, সত্যিই যখন তার বলার দরকার ছিলো না। বন্ধুদের সাথে গল্পের সময় সে বলতো ঝলসানো স্যামন মাছ তার খুব পছন্দ যদিও আম্মু জানতো সেটা সে পছন্দ করতো না। কিংবা সে ক্লাব থেকে ফিরে এসে আম্মুকে বলতো যে সে *মিট মি ইন সেন্ট লুইস* দেখে এসেছে। তখন আসলে দেখানো হয়েছে *দ্য ব্রোঞ্জ বাফারু* যখন আম্মু তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতো সে কখনোই স্বীকার করতো না বা ক্ষমা চাইতো না। সে শুধু খিলখিল করে হাসতো আর আম্মুকে এতোই জ্বালাতন করতো যে তা ছিলো তার সহ্যের বাইরে।

চীনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় আম্মু ছিলো আট মাসের পোয়াতী। সেটা ১৯৬২ সালের অক্টোবরের কথা। চা বাগানের মালিকদের স্ত্রী ও সন্তানদের আসাম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। আম্মুর যেহেতু বাচ্চা পেটে তাই সে আসামেই থেকে গেলো। নভেম্বরে এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনির বাস ভ্রমণে শিলং-এর পথে যখন এসথা আর রাহেলের জন্ম হয়, তখন গুজব ওঠে যে– চীন ভারত দখল করে ফেলছে এবং ভারতের প্রতিরোধ ব্যর্থ হতে চলেছে। মোমবাতির আলোয়। এমন এক হাসপাতালে, যার জানালাগুলো অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছিলো। ওরা কোনরকম

ঝামেলা ছাড়াই মায়ের পেট থেকে বের হয়ে এসেছিলো। একজনের আঠারো মিনিট পরে আর একজন। একটা বড় বাচ্চার বদলে দু'টো ছোট বাচ্চা।

যেন দু'টো সিল মাছ, মায়ের পেটের ভিতরের পিচ্ছিল ঝিল্লীতে জড়ানো। জন্মের চেষ্টায় ভাঁজে ভরা। আম্মু ওদের পরখ করে দেখলো ওরা কোন অঙ্গ বিকৃতি নিয়ে জন্মেছে কিনা আর তারপর চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লো।

সে গুনলো চারটে চোখ, চারটে কান, দু'টো মুখ, দু'টো নাক, কুড়িটা আঙুল আর কুড়িটা নিখুঁত নখ।

সে দেখতে পায়নি তাদের যমজ হৃদয়। সে তাদেরকে পেয়ে খুশি হয়েছিলো, তাদের বাবা হাসপাতালের করিডোরে একটা শক্ত বেঞ্চের ওপর মাতাল হয়ে সটান হয়েছিলো।

যমজ বাচ্চা দু'টোর বয়স যখন দু'বছর তখন তাদের বাবার মদ্যপানের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে তাকে প্রায় অচল করে ফেলেছিলো। ওটা হয়েছিলো চা বাগানের নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য। প্রায়ই সে সারাদিন কাটিয়ে দিতো বিছানায় শুয়ে এবং কাজে না গিয়ে। হঠাৎ একদিন তার ইংরেজ ম্যানেজার মিঃ হলিক তাকে ডেকে পাঠালেন নিজের বাংলোতে জরুরী কথাবার্তার কথা বলে।

আম্মু বাড়ির বারান্দায় বসে দুঃশ্চিন্তা নিয়ে অপেক্ষা করছিলো স্বামীর ফিরে আসার জন্যে। সে মোটামুটি নিশ্চিত ছিলো যে, মিঃ হলিক তার স্বামীকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করার জন্যই ডেকেছেন। সে অবাক হলো যখন দেখলো তার স্বামী ফিরে আসলো নিরাশ হয়ে কিন্তু একেবারে বিধ্বস্ত নয়। সে বললো মিঃ হলিক তাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছেন এবং সেটা নিয়ে সে আম্মুর সাথে আলোচনা করতে চায়। সে প্রথমে আবলতাবল কথা বলতে শুরু করলো, তার দৃষ্টি এড়িয়ে আর কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। সে বললো প্রস্তাবটাকে বাস্তবতার নিরিখে দেখলে– এটা এমন একটা প্রস্তাব যাতে তাদের ভবিষ্যতে দু'জনেরই উপকার হবে, দু'জনের না বলে তাদের সবার বলাই ভালো, বাচ্চাদের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করলে।

মিঃ হলিক তার অবুঝ সহকারীর সঙ্গে খোলামেলাভাবে কথা বলেছিলেন। তিনি তাকে তার সম্বন্ধে শ্রমিক ও অন্যান্য সহকর্মীদের অভিযোগের কথাও বলেছিলেন।

তিনি বলছিলেন, 'তোমাকে চাকরী ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি।'

তিনি চাইছিলেন নিস্তব্ধতার চাপটা পড়ুক। তিনি টেবিলের ওপাশে বসে থাকা অসহায় মানুষটিকে চাচ্ছিলেন দুর্বল করতে, কাঁদাতে। তারপর হলিক আবার বললেন 'তবে, একটা *সমাধান* অবশ্য থাকতে পারে... আমরা কোনোভাবে ব্যাপারটার একটা সুরাহা করতে পারি। ইতিবাচক চিন্তা ভাবনাই ভালো– যেমন আমি সবসময় বলি তোমার ঈশ্বর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে একটু হিসাব করা দরকার। হলিক একটু থেমে এক কাপ কালো কফির আদেশ দিলেন। তুমি খুব ভাগ্যবান, অপূর্ব একটা পরিবার, সুন্দর ছেলেমেয়ে এত সুন্দরী একটা বউ...' বলে

তিনি একটা সিগারেট ধরালেন এবং জলন্ত দেশলাই কাঠিটা ধরে রাখলেন যতক্ষণ না তাঁর আঙুলে আঁচ লাগলো। 'এত সুন্দর একটা বউ...' কান্নাটা থেমে গেলো। ধাঁধা লাগা বাদামী চোখ দু'টো তাকালো মৃতের মত বিভৎস লাল শিরা ফুলে ওঠা সবুজ চোখ দু'টোর দিকে। মিঃ হলিক প্রস্তাব দিলেন যে, বাবা কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে অন্য কোথাও চলে যাক, কোন ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্যে। যতদিন ঠিক হতে লাগে ততদিনের জন্যে। আর সেই কটা দিন আম্মু তাঁর বাংলোতে যাবে তাঁর 'দেখাশোনা করার জন্যে'।

এর মধ্যেই হলিক বেশ ক'জন চা শ্রমিকের (যাদের দিকে তার দৃষ্টি ছিল) সাদা রঙের ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছিলেন, এই প্রথম তাঁর কর্মকর্তা স্তরে ঢোকার চেষ্টা।

আম্মু দেখলো তার স্বামীর মুখ নড়েচড়ে শব্দ তৈরি করছিলো। সে কিছু বললো না, তার স্বামী তার নীরবতায় প্রথমে অস্বস্তিতে ভুগছিলো। রেগে গেলো। হঠাৎ সে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চুল ধরে, তাকে ঘুষি মেরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লো। আম্মু বুক সেল্‌ফ থেকে সবচেয়ে ভারি বইটা *রিডার্স ডাইজেস্ট ওয়ার্ল্ড এটলাস* দিয়ে সজোরে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মাথায় তার পায়ে, তার ঘাড়ে, পিঠে বাড়ি মারলো। যখন তার স্বামীর জ্ঞান ফিরলো, সে তার কাটা ছেঁড়া দেখে অবাক হলো। সে তার মারামারির জন্যে ক্ষমা চাইলো আর তারপরই আবার তার বদলীর ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে বিরক্ত করতে লাগলো। এটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হলো, মাতলামি-মারামারির পরে বিরক্ত করা। আম্মুর ঘেন্যা ধরে গেলো, মদের বাসী গন্ধ, তার চামড়ার ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসতো আর শুকনো, শক্ত বমি রোজ সকালে তার মুখের চারধারে লেগে থাকতো। যখন তার মারামারি স্ত্রী থেকে সন্তানদেরকেও জড়িয়ে ফেললো তখন, আম্মু তার স্বামীকে ছেড়ে অনাহূতের মত এইমেনেমে বাবা-মার কাছে ফিরে আসলো। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের তখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেখানেই সে ফিরলো যেখান থেকে কয়েক বছর আগে সে পালিয়েছিলো। শুধু পার্থক্য এটুকুই যে তখন তার দু'টো বাচ্চা। আর কোন স্বপ্ন নেই।

পাপাচি তাকে বিশ্বাস করলেন না এ জন্য না যে, তার স্বামীকে তিনি ভালো জানতেন বলে। বরং এজন্য যে তিনি বিশ্বাস করলেন না যে, কোন ইংরেজ– কোন ইংরেজ পুরুষ অন্য পুরুষের স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে পেতে চাইতে পারে।

আম্মু তার সন্তানদের অবশ্যই ভালোবাসত, তবে তাদের নিষ্পাপ বড় চোখের আকর্ষণ, তাদের অন্যান্য মানুষকে ভালোবাসার ইচ্ছে, যারা তাদেরকে ভালোবাসে না, ঐ ধরনের বিষয়গুলো তাকে জ্বালাতন করতো এবং মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হতো ওদের মারতে– শুধু ওদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে, নিরাপত্তার জন্যে।

ব্যাপারটা এমন ছিলো যেন– যে জানালা দিয়ে ওদের বাবা চলে গেছে আর সে জানালাটা ওরা খুলে রেখেছে অন্য কারো আসার জন্যে এবং তারা তাকে স্বাগত জানাবে।

আম্মুর কাছে যমজ বাচ্চারা ছিলো একজোড়া আশ্চর্য ব্যাঙের মতো, যারা একজন আরেকজনের ওপর মানসিকভাবে নির্ভরশীল আর সশব্দে ছুটে চলা

ট্রাফিকের মধ্যে যেন ওরা চলাফেরা করতো। ট্রাক কিভাবে চ্যাপ্টা করতে পারে ব্যাঙদের সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ওরা। আম্মু ওদের দিকে কঠিন চোখে তাকাতো। তার দৃষ্টির জন্যে তাকে লম্বাটে দেখাতো, সবসময় সাবধানী আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সে তার বাচ্চাদেরকে হামেশাই কড়াগলায় বকাঝকা করতো, আবার ওদের পক্ষেও যেতো খুব তাড়াতাড়ি।

নিজের ব্যাপারে সে বুঝতো, এরপর আর কোনো সুযোগ নেই। সেখানে তখন ছিলো শুধুই এইমেনেম। একটা সামনের বারান্দা আর একটা পিছনের বারান্দা। একটা নদী আর একটা আচার কারখানা।

আর পিছনে সবসময় লেগে থাকা চড়া স্বরের ঘ্যান ঘ্যানানির মতো সমাজের নিষেধ।

বাবা-মার কাছে ফিরে আসার ক'মাসের মধ্যেই আম্মু বুঝতে পারলো, করুণার কদাকার চেহারা এবং অবজ্ঞার কলাকৌশল। বৃদ্ধ, নারী-আত্মীয়ারা আর অভিজ্ঞ দাড়িওয়ালারা (যাদের থুতনি কয়েক ভাঁজ হয়ে ঝুলে পড়েছে) সারারাত ধরে পথ চলে এইমেনেমে এসে তাকে বিচ্ছেদের জন্যে সমবেদনা জানাতো। তারা তার হাঁটুতে চাপ দিতো আর ক্রুর চোখে তাকাতো। আম্মু কোনো রকমে তাদেরকে চড় মারার ইচ্ছে থেকে নিজেকে সামলাতো অথবা চাইতো তাদের স্তনবৃন্ত প্লাস দিয়ে চেপে ধরতে। চ্যাপলিন-এর মডার্ণ টাইমস সিনেমার মতো।

বিয়ের ছবিগুলোর দিকে তাকালে আম্মুর মনে হতো, যে মহিলা তার দিকে চেয়ে আছে সে অন্য কেউ। একটা বোকা গহনা পরা বউ। তার রেশমী সূর্যাস্ত রঙের শাড়ি যার মধ্যে সোনালী কারুকাজ করা, সবগুলো আঙুলে আংটি, চন্দনের ফোঁটা বাঁকা ভুরুর উপরে এগুলো দেখতে দেখতে আম্মুর নরম মুখটা একটু বেঁকে গিয়ে একটা মৃদু শ্লেষের হাসি ফুটে উঠতো। বিয়ে যতটা না তার চেয়ে এই ব্যাপারটা ওর হৃদয়কে মোচড়াতো এত কষ্ট করে সেজেগুজে নিজেকে বলি হওয়ার জন্যে সঁপে দিয়েছিলো বলে। এটাকে মনে হতো এতো হাস্যকার, এতো ব্যর্থ। যেন জ্বালানি কাঠ পালিশ করা।

গ্রামে যারা গহনা বান'তো তাদের কাছে গিয়ে সে তার ভারি বিয়ের আংটিগুলোকে গলিয়ে পাতলা চুড়ি বানিয়ে আনলো। সেগুলোর মধ্যে সাপের মাথার নক্সা ছিলো এবং সেগুলো রাহেলের জন্য তুলে রাখলো। আম্মু এটা জানতো যে, বিয়ের ব্যাপারটাকে এড়ানোর উপায় নেই। সমাজের বাস্তব নিয়মের দিক থেকে বিচার করতো সে, কিন্তু তার জীবনের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিলো বিয়ের আয়োজন *ছোট* আর যথাসম্ভব *সাধারণ কাপড় চোপড়ে* হওয়া দরকার। তার ধারণা বিয়ে এমন হলে কিছুটা কম পৈশাচিক হতে পারে।

মাঝে মাঝে যখন আম্মু তার পছন্দের গানগুলো শুনতো রেডিওতে, তখন তার ভিতরে কিছু একটা আলোড়িত হতো। একটা তরল ব্যাথা তার চামড়ার নিচে বয়ে যেতো এবং সে দুনিয়া থেকে ডাইনীর মতো বের হয়ে পড়তো এক অন্যরকম ভালো আর সুখের জায়গার উদ্দেশে। এরকম দিনগুলোতে তার ভিতরে অস্থির আর পোষ

না মানা কিছু একটা থাকতো। যেন সে সাময়িকভাবে সরিয়ে রাখতো মাতৃত্ব ও বিচ্ছেদবোধের নীতিগত ধারণাগুলো। এমন কি তার হাঁটার ভঙ্গিতেও উগ্রতা দেখা যেতো যেটা সাধারণ মায়ের চলার ভঙ্গির মতো না। সে খোঁপায় লাগাতো ফুল আর তার চোখে উদ্ভাসিত হতো অপার্থিব আলো। সে কারো সাথে কথা বলতো না। সে ঘন্টার পর ঘন্টা নদীর পাড়ে বসে কাটিয়ে দিতো তার প্লাস্টিকের ছোট্ট রেডিওটা নিয়ে, ওটা দেখতে ছিলো ছোট কমলালেবুর মতো। সে সিগারেট খেতো আর মাঝে মাঝে রাতে সাঁতার কাটতো।

কী এমন ছিলো, যেটা আম্মুকে ঠেলে দিয়েছিলো এমন নিরাপত্তাহীনতার দিকে? এটা কি ভবিষ্যত সম্বন্ধে অজ্ঞতা? কিছু একটা যা তার ভিতরে বসে যুদ্ধ করতো তার সঙ্গে। কেমন একটা ঘোঁটপাকানো ব্যাপার। যার সঙ্গে তুলনা চলে কোন মায়ের অসীম কোমলতা আর কোন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর অন্ধ ক্রোধের। এটাই তার ভিতরে জন্মেছিলো আর ঘটনাক্রমে তাকে পাগল করেছিলো ভালোবাসতে সেই পুরুষকে– যাকে তার ছেলে মেয়েরা দিনে ভালোবাসতো। রাতে সেই নৌকাটাই ব্যবহার করতো যেটা দিনে তার সন্তানেরা ব্যবহার করতো। সেই নৌকায় এসথা বসেছিলো আর রাহেল ওটাকে আবিষ্কার করেছিলো।

যে সব দিনে রেডিওতে আম্মুর পছন্দের গানগুলো হতো সেদিন সবাই তাকে নিয়ে চিন্তিত থাকতো। তারা বুঝতে পারতো সে এই পৃথিবীর অসংখ্য ছায়ার মধ্যেই বসবাস করে। যেটা তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এমন একটা নারী যাকে তারা এরমধ্যেই ত্যাজ্য করেছে এবং তার হারানোর মতো তেমন কিছু আর নেই আর এজন্যেই সে বিপজ্জনক। তাই যেসব দিন রেডিওতে আম্মুর পছন্দের গান বাজতো লোকজন তাকে এড়িয়ে চলতো। কিংবা গোল হয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াতো আর সবাই একমত ছিলো যে তাকে তার মতোই চলতে দেওয়া উচিত।

অন্য সব দিন সে হাসলে গালে গভীর টোল পড়তো।

তার মুখ ছিলো গোল, কাটা কাটা চেহারা, কালো চোখের ভুরু, (যা দেখতে উড়ন্ত সামুদ্রিক পাখির ডানার মতো) একটা ছোট্ট সোজা নাক এবং উজ্জ্বল বাদামী চামড়া। ডিসেম্বর মাসের ঐ পরিষ্কার নীলাকাশ ছাওয়া দিনে, তার এলোমেলো ও ঢেউ খেলানো চুল উড়ছিলো গাড়ির বাতাসে। তার কাঁধ খোলা ব্লাউজের জন্যে মসৃণ কাঁধকে পলিশ করা চকচকে মনে হচ্ছিল যেন তা কিছুক্ষণ আগেই বার্নিশ করা হয়েছে। কখনো কখনো রাহেল আর এসথার কাছে সে ছিলো সবচেয়ে সুন্দর রমণী– তাদের মধ্যে যাদের তারা দেখেছে। আবার কোন কোন সময় তাকে অতটা সুন্দরী মনে হতো না।

প্লেমাউথের পিছনের সিটে রাহেল আর এসথার মাঝখানে বসেছিলেন বেবি কোচাম্মা, প্রাক্তন নান এবং হেলান দিয়ে শুয়ে থাকা বেবি নানী, দুঃখী মানুষের সহদুঃখী মানুষের মতো। বেবি কোচাম্মা যমজ ভাই বোনদের দেখতে পারতেন না,

তাঁর মনে হতো যে ওরা উছন্নে যাওয়া। বেওয়ারিশ অনামী শিশু, তার চেয়ে যেটা খারাপ সেটা হলো, তারা অর্ধেক হিন্দু বর্ণশংকর শিশু যাদের আত্মসম্মানবোধওয়ালা কোনো সিরিয়ান খৃষ্টান কোনদিন বিয়ে করবে না। তিনি আশা করতেন যে ওরা উপলব্ধি করুক ওরা থাকে তাঁর দয়ায় এইমেনেমের বাড়িতে, যেখানে তাদের থাকার কোনো অধিকার নেই। বেবি কোচাম্মা আম্মুর ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন, কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, আম্মু তার ভাগ্যের সঙ্গে সবসময় লড়াই করতো অথচ সে নিজে তার ভাগ্যকে খুশি হয়েই মেনে নিয়েছিলো। পুরুষহীন হতশ্রী নারী জীবন। দুঃখী ফাদার মুলিগ্যানহীন বেবি কোচাম্মা। তিনি বছরের পর বছর কোন রকমে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে নিজেকে চালিয়েছেন ফাদার মুলিগ্যানের জন্যে তার রুদ্ধ ভালোবাসা থেকে বাঁচিয়ে রেখে যেটা সম্ভব হয়েছিলো। একমাত্র তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও মনের জোরের কারণে ঠিক কাজটি করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

তিনি মনেপ্রাণে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন সেই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে যাতে ধরা হতো ছাড়াছাড়ি হওয়া বিবাহিত মেয়ের বাবা-মায়ের বাড়িতে কোন স্থান থাকে না। ভালোবাসার বিয়েভাঙা কোন মেয়ের জন্যে, আসলে ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না বেবি কোচাম্মার রাগ ছিলো কতটা। অসবর্ণ *ভালোবাসার* বিয়েভাঙা মেয়ের ব্যাপারে অবশ্য বেবি কোচাম্মা খানিকটা রাগলেও তাকে কাছে রাখতেই পছন্দ করতেন।

যমজ বাচ্চা দু'টো আসলে এসব বোঝার জন্যে ছোটই ছিলো। তাই বেবি কোচাম্মা তাদের সুখের মুহূর্তে তাদের হিংসা করতেন, যখন তারা একটা বড় ফড়িং ধরে সেটার পা দিয়ে তাদের হাতের তালু থেকে ছোট নুড়ি পাথর তুলতো, অথবা যখন শুয়োর নাওয়ানোর অনুমতি পেতো কিংবা মুরগির কাছ থেকে একটা গরম ডিম পেতো। কিন্তু সবকিছুকে তিনি হিংসা করতেন এ জন্য যে, ওদের মিলেমিশে থাকার আরাম, খুশী তাঁকে বিরক্ত করতো। তিনি ওদের কাছ থেকে আশা করতেন অল্প হলেও দুঃখের কিছু।

এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে আসার পথে মার্গারেট কোচাম্মা বসবে সামনে চাকোর পাশে কারণ সে তার প্রাক্তন স্ত্রী। সোফি মল বসবে তাদের মধ্যে, আম্মু বসবে পিছনে।

দু' ফ্লাস্ক জল থাকবে। সিদ্ধ করা জল মার্গারেট কোচাম্মা আর সোফি মলের জন্যে, বাকি সবার জন্যে এমনি কলের জল।

মালপত্র থাকবে গাড়ির বুটে।

রাহেল ভাবতো *বুট* শব্দটা খুব ভালো। *স্টার্ডির* চেয়ে বুট শব্দটা খুব সুন্দর যে কোনভাবেই, স্টার্ডিটা হলো একটা কুৎসিৎ শব্দ যেন কোন বামনের নাম। *স্টার্ডি কোসি উম্মেন* মানে শান্ত, মধ্যবিত্ত ঈশ্বরভীত বামন, যার হাঁটু নিচু আর এক পাশ অন্যরকম।

প্লেমাউথের ওপরে ছাদের ওপর বসানো ক্যারিয়ারের চারদিকটা প্লাইউডের তৈরি, চারপাশে টিনের ঘের দেওয়া। তাতে বড় করে লেখা ছিলো "প্যারাডাইস

পিকলস এ্যান্ড প্রিজার্ভস।" লেখাটার নিচে আঁকা ছিলো মিক্সড ফুড জ্যামের ও তেলে ভেজানো ঝাল লেবুর আচারের বোতলের ছবি যাদের গায়ের লেবেলে লেখা ছিলো বড় করে "প্যারাডাইস পিকলস এ্যান্ড প্রিজার্ভস।" বোতলগুলোর পাশে আঁকা ছিলো প্যারাডাইসের তৈরি সব কিছুর তালিকা আর একটা সবুজ মুখ ও ঘাগরা পড়া কথাকলি নৃত্যশিল্পীর ছবি। তার ঢেউতোলা ঘাগরার নিচের এস আকারের ঘূর্ণায়মান অংশে লেখা ছিলো, "স্বাদের রাজ্যের অধিপতি" –এই অংশটুকু আবিষ্কারের কৃতিত্ব কে, এন, এম পিল্লাই-এর। এটা *'রুচি লোকেথিনড়ি রাজাভু'* বাক্যের আক্ষরিক অনুবাদ যেটাকে মনে হয়েছে *'স্বাদের রাজ্যের রাজা'* এর চেয়ে একটু কম হাস্যকর। কিন্তু যেহেতু কমরেড পিল্লাই লেবেলটা ছাপিয়ে ফেলেছিলেন তাই সেটাকে বদল করে আবার ছাপার জন্যে বলার সাহস আর কারো হয়নি। তাই খুঁতখুঁতানি নিয়ে হলেও, 'স্বাদের রাজ্যের রাজা' কথাটা স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলো প্যারাডাইস পিকলসের বোতলের লেবেলে।

আম্মু বলতো কথাকলি নৃত্যশিল্পী ছিলো এখানে কথা ঘোরানোর জন্যে খামোখা লাগানো একটা চরিত্র আর এ ব্যাপারে ওটার কোন দরকার ছিলো না। চাকো বলতো এটা সে জুড়ে দিয়েছিলো একটা আঞ্চলিক গন্ধ রাখার জন্যে এবং বিদেশে রপ্তানির জন্যেও সেটা খুব কাজে আসবে। আম্মু বললো, ওপরের সাইনবোর্ডটার জন্যে তাদেরকে হাস্যকর লাগছিলো, মনে হচ্ছিলো একটা মোবাইল সার্কাস পার্টি, যাদের পিছনে লেজ আছে।

পাপাচি দিল্লী থেকে সরকারি চাকরী ছেড়ে অবসর নিয়ে এইমেনেমে থাকার জন্য আসার পর থেকেই মামাচি বাণিজ্যিকভাবে আচার তৈরি করা শুরু করেছিলেন। কোট্টাইয়ামের বাইবেল সমাজ তাদের মেলার জন্যে মামাচিকে তাঁর কিছু বিখ্যাত কলার জ্যাম ও ছোট আমের আচার বানিয়ে দিতে বলে। এবং তা খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। মামাচি দেখতে পেলেন যে, তিনি তাঁর তৈরির ক্ষমতার চেয়ে বেশি অর্ডার পেয়েছেন। ওই সাফল্যে আনন্দিত হয়ে তিনি ঠিক করলেন বরাবর জ্যাম নিয়ে লেগে থাকবেন এবং সারাবছরই ব্যস্ত থাকতে লাগলেন। পাপাচি নিজের ব্যাপারে সুনামহীনতায় ভুগছিলেন– অবসর নেওয়ার পর। তিনি ছিলেন মামাচির চেয়ে সতের বছরের বড়, এবং উপলব্ধি করলেন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন আর তার স্ত্রী তখনও যুবতী।

যদিও মামাচির ছিলো চোখের সাদা অংশে সমস্যা এবং ততোদিনে তিনি পুরোপুরি অন্ধ। পাপাচি তাঁকে আচার বানাতে সাহায্য করতেন না, কারণ তিনি মনে করতেন আচার বানানো কোন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার জন্যে উপযুক্ত কাজ হতে পারেনা। তিনি সবসময়ই ছিলেন দাম্ভিক। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ সবার এতো পাত্তা দেওয়াতে বিরক্ত হতেন। তিনি উঠোনের উপর ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটতেন তাঁর ফিটফাট স্যুট পরে। তাঁর হাঁটার ফলে গাদা দেওয়া মরিচ আর

সদ্য গুঁড়ো করা হলুদের ঢিবির চারধারে একরকম গোল গোল দাগের সৃষ্টি হতো। তিনি হাঁটতে হাঁটতে দেখতেন মামাচির কেনা ও ওজন করা লেবু, ছোট কাঁচা আমে লবণ মাখানো ও শুকানো। প্রত্যেক রাতে তিনি তাকে পিতলের ফুলদানি দিয়ে পেটাতেন। অবশ্য পেটানোটা নতুন কিছু ছিলো না। নতুন ছিলো এই পেটানোর মাঝামাঝি সময়টা নির্ধারণ। এক রাতে পাপাচি মামাচির বেহালাটা ভেঙে নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন।

তখন চাকো অক্সফোর্ড থেকে গরমের ছুটিতে বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলো। সে ততদিনে লম্বা আর বড় হয়েছে এবং ব্যালিওলের নৌকাবাইচে অংশ নেওয়ার মতো শক্তিশালী ছিলো। বেড়াতে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে সে দেখলো, পাপাচি মামাচিকে পড়ার ঘরে পেটাচ্ছেন। চাকো দৌড়ে ঘরে ঢুকে পাপাচির হাত থেকে ফুলদানিটা টেনে ছিনিয়ে নিলো তাঁর পিছন থেকে।

'আমি কখনোই এ জিনিস আর ঘটতে যেন না দেখি, কখনোই না'– সে তার বাবাকে বললো।

সেদিনের বাকি সময়টা পাপাচি বারান্দায় বসেই কাটিয়ে দিলেন এবং শক্তমুখে সাজানো বাগানটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কচু মারিয়ার আনা খাবারের প্লেটগুলোকে দেখলেন না। সেদিন বেশি রাতে তিনি তাঁর পড়ার ঘরে গেলেন এবং মেহগনি কাঠের তৈরি রকিং চেয়ার বের করলেন। তিনি সেটাকে গাড়ির রাস্তার ওপর এনে রেখে, কলের মিস্ত্রীর রেঞ্চ দিয়ে বাড়ি মেরে ভেঙে ছোট ছোট টুকরা করলেন। তিনি চাঁদের আলোয় সেগুলো ফেলে রাখলেন। বার্নিশ করা সরু ও টুকরা কাঠের একটা গাদা। তিনি আর কোনদিন মামাচিকে ছোঁননি, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কখনো আর কথাও বলেননি তার সাথে। কিছু প্রয়োজন হলে তিনি কচু মারিয়া বা বেবি কোচাম্মাকে দিয়ে করাতেন।

সন্ধ্যায় যখন তিনি জানতেন লোকজন দেখা করতে আসবে, তিনি বারান্দায় বসে থাকতেন এবং খামোখা শার্টের বোতাম লাগাতেন, দেখাতে চাইতেন যে মামাচি তাকে অবহেলা করেন, বুদ্ধিটা কাজেও লেগেছিলো কারণ এইমেনেমে তখন খেটে খাওয়া স্ত্রীদের বাঁকা চোখেই দেখা হতো, সেটাকে তিনি কিছুটা বাড়াতে পেরেছিলেন।

তিনি আকাশী নীল রঙের প্লেমাউথটা কিনেছিলেন মুন্নারের এক বৃদ্ধ ইংরেজের কাছ থেকে। এইমেনেমে তিনি ছিলেন এক নৈমিত্তিক দৃশ্য, তিনি চলতেন তাঁর চওড়া গাড়ি চালিয়ে সরু রাস্তা দিয়ে। বেশি দামি নয় কিন্তু সুন্দর পোশাকে তবে পশমী স্যুটের ভিতরে ঘেমে যেতেন। তিনি মামাচি বা পরিবারের অন্য কাউকে গাড়িটা ব্যবহার করতে দিতেন না। এমনকি বসতেও দিতেন না। প্লেমাউথটা ছিলো পাপাচির প্রতিশোধ।

পাপাচি ছিলেন পুষা ইনস্টিটিউটের এক জাঁদরেল পতঙ্গবিশারদ। স্বাধীনতার পর যখন ব্রিটিশরা চলে গেলো, তাঁর পদ বিশেষজ্ঞ পতঙ্গবিদ থেকে বদলে হলো

যুগ্ম-পরিচালক, পতঙ্গবিজ্ঞান। যে বছর তিনি অবসর নিলেন পদোন্নতি পেয়ে, তখন তিনি প্রায় পরিচালকের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো, তাঁর আবিষ্কৃত পতঙ্গটিকে নিজের নামে নামকরণ করতে না পারা।

পতঙ্গটি একদিন সন্ধ্যায় তাঁর মদের গ্লাসে পড়েছিলো– তিনি সারাদিন মাঠে কাজ শেষে এক রেস্ট হাউসের বারান্দায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলেন। তিনি যখন মথটাকে তুলে দেখলেন, মথটার পিঠে ছিলো অস্বাভাবিক ঘন লোম। তিনি খুব ভালো করে লক্ষ্য করলেন। বেড়ে চলা উত্তেজনার মধ্যে তিনি ওটাকে ফ্রেমে আটকালেন, মাপলেন ও পরের দিন কিছুক্ষণ রোদে রাখলেন যাতে মদটা উড়ে যায়। তারপর তিনি প্রথম ট্রেনেই দিল্লী রওয়ানা হলেন। তাঁর আশা ছিলো, এ ব্যাপারে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে পারবেন এবং সেই সাথে আসবে খ্যাতি। ছ'মাস অসহ্য দুশ্চিন্তার পরে, পাপাচির গভীর হতাশার মধ্যে তাঁকে বলা হলো যে, তাঁর আবিষ্কৃত পতঙ্গটিকে চিহ্নিত করা গেছে একটু অস্বাভাবিক জাতের অন্য একটি খুব পরিচিত প্রজাতির বলে যেটা উষ্ণমণ্ডলীয় লিমানট্রিডে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

আসল আঘাতটা আসলো বারো বছর পরে, যখন মৌলিক ট্যাক্সোনমিক নাড়াচাড়া করার সময় পতঙ্গ প্রাণী বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, পাপাচির পতঙ্গটা আসলেই ছিলো একটা অন্য প্রজাতির ও ভিন্ন ধরনের জিন আছে ওতে এবং নতুন উদ্ভাবন। কিন্তু ততোদিনে অবশ্য পাপাচি অবসর নিয়ে এইমেনেমে চলে এসেছেন। তাঁর আবিষ্কারের দাবি উত্থাপন করার জন্যে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর পতঙ্গের নামকরণ করা হলো তখন পদে আসীন পতঙ্গবিদ্যা বিভাগের পরিচালকের নামে –যাঁকে পাপাচি দেখতে পারতেন না।

যদিও তাঁকে নিয়ে পতঙ্গ আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই হাসাহাসি করত লোকজন। তার পরের বছরগুলোতে মথটাকেই দোষারোপ করা হতো তাঁর খারাপ মেজাজ আর হঠাৎ রেগে ওঠার জন্য। ওটার ক্ষতিকর ভূত-ধুসর-লোমশ ও অস্বাভাবিক রকমের ঘন লোমের পিঠ, তার থাবা বাড়ির সবাইকেই যেন গ্রাস করতো। এ ঘটনা তাঁকে, তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে আর তাদের ছেলেমেয়েদেরকেও কষ্ট দিতো।

তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এইমেনেমের ভ্যাপসা গরমেও, প্রতিদিন তিনি পরতেন তার নিখুঁত ইস্ত্রি করা থ্রিপিস স্যুট আর নিতেন সোনার পকেট ঘড়ি। তাঁর ড্রেসিং টেবিলের ওপরে তাঁর সাবান এবং তার রুপালী চুলের ব্রাশের পাশে ছিলো তাঁর যৌবনের একটা ছবি। ছবিতে তাঁর চুল ছিলো লম্বা, ছবিটা তিনি তুলেছিলেন ভিয়েনার এক ফটোগ্রাফারের স্টুডিওতে। ওখানে ছ'মাসের একটা ডিপ্লোমা কোর্স করেছিলেন, যার ফলে তিনি ঊর্ধ্বতন পতঙ্গবিদের চাকরীর জন্য দরখাস্ত করতে পেরেছিলেন।

ভিয়েনায় মামাচি বেহালার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। তাঁর শেখা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো –যেদিন তার শিক্ষক –লনস্কি টিফেনথাল ভুল করে পাপাচিকে

বলেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী অস্বাভাবিক রকমের প্রতিভাময়ী এবং তাঁর মতে, অর্কেস্ট্রায় বাজানোর ক্ষমতা রাখেন।

মামাচি পারিবারিক ছবির এলবামে পাপাচির মৃত্যু সংবাদটি আটকে রেখেছিলেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে খবরটি দেওয়া হয়েছিলো এভাবে–

> এইমেনেমের খ্যাতিমান পতঙ্গবিজ্ঞানী শ্রী বেনান জন ইপে, পিতা মৃত রেভারেন্ড জন, ইপে (পুন্যান কুঞ্জু নামে যিনি সমধিক পরিচিত) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গতরাতে কোট্টাইয়াম হাসপাতালে মারা গেছেন। রাত ১.০৫-এর দিকে তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হয় এবং দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ২.৪৫ মিনিটে তিনি মারা যান। শ্রী ইপে গত ছ'মাস ধরে স্বাস্থ্যগত নানান জটিলতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী শোষমা ও দুই সন্তান রেখে গেছেন।

পাপাচির মৃত্যুর পর মামাচি কাঁদছিলেন এবং তার চোখের কন্ট্যাক্ট লেন্সগুলো চোখ থেকে খসে পড়লো। আম্মু যমজদের বললো যে মামাচি বেশি কাঁদছেন কারণ যতটা না তিনি তাকে ভালোবাসতেন, তার চেয়ে বেশি অভ্যস্ত ছিলেন তিনি তাঁকে দেখতে। আচার কারখানার পাশে ঘুরে বেড়াতে, আর তাঁর হাতের মার খেতে। আম্মু বলতো যে, মানুষেরা অভ্যাসের দাস এবং ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে কী রকম সব ব্যাপারে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আম্মু বলল, 'তোমরা আশপাশে খেয়াল করলেই দেখতে পাবে যে ফুলদানির বাড়ি খাওয়া –ওসবের মধ্যে সামান্য একটা।'

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে মামাচি রাহেলকে তাঁর কন্ট্যাক্ট লেন্সটা চোখের ভিতর থেকে ঠিক করে বের করতে বললেন খাপে ভরা কমলা রঙের একটা কাঁচের নল দিয়ে।

রাহেল মামাচিকে জিজ্ঞেস করলো, মামাচি মরে গেলে সে ওটা পেতে পারে কিনা? আম্মু তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে কষে একটা চড় লাগালো। 'আমি কখনো শুনতে চাই না যে তুই কোন মানুষের মরার কথা বলাবলি করছিস– আম্মু বললো।

রাহেল আর এসথার অনুভূতিশীল হওয়ার জন্যে এটা বহু আগেই পাওনা ছিলো। পাপাচির ভিয়েনায় তোলা ছবিটা, তাঁর লম্বা চুল আবার বাঁধিয়ে বসবার ঘরে ঝোলানো হলো।

তাঁর চেহারাটা ছিলো ছবির উপযোগী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে ছাঁটা। ছোট মানুষের বড় একটা মাথা। তাঁর একটা দ্বিতীয় থুতনি ছিলো যেটা তিনি ঝুঁকে পড়লে অথবা নিচে তাকালে স্পষ্ট চোখে পড়তো। ফটোতে তিনি যাতে দ্বিতীয় থুতনিটা না দেখা যায় সেভাবে পোজ দিয়েছিলেন। কিন্তু মাথাটা ততো উঁচু করেননি, যাতে উদ্ধত দেখায়। তাঁর হালকা বাদামী চোখগুলো ছিলো প্রশান্ত কিন্তু

কেমন অপরাধী। যেন তিনি ফটোগ্রাফারের জন্য ভদ্র হতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মাথায় ঘুরছিলো বউকে মারার ফিকির।

তাঁর ওপরের ঠোঁটের মাঝখানে ছিলো একটা উঁচু মাংসপিণ্ড যেটা নিচের ঠোঁটের ওপর ঝুলে ছিলো, কামুকদের যেমন থাকে আর যে সব বাচ্চারা বুড়ো আঙুল চোষে তাদের যেমন হয়। তাঁর থুতনিতে ছিলো গভীর একটা টোল যা দেখে মনে হচ্ছিল অদৃশ্য খ্যাপাটে সন্ত্রাসের রেখা। লুকনো হিংস্রতার মতো। তিনি খাকি রঙের প্যান্ট পরেছিলেন, যদিও তিনি জীবনে কখনো ঘোড়ায় চড়েননি। তাঁর ঘোড়ায় চড়া জুতোয় স্টুডিওর বাতির ছায়া পড়েছিলো। একটা হাতির দাঁতের তৈরি ছড়ি তাঁর কোলের ওপর রাখা ছিলো। ছবিটাতে ছিলো একটা দাম্ভিক গাম্ভীর্য, ফলে যে ঘরে ওটা ঝোলানো ছিলো সেখানে তৈরি হয়েছিলো কেমন একটা শীতলতা।

তিনি যখন মারা গেলেন পাপাচির জন্য রেখে গেলেন লোহার বাক্সভরা দামি স্যুট আর চকোলেটের কৌটা ভর্তি কব্জি-বন্ধনী, যেগুলো পরে চাকো কোট্টাইয়ামের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলো। কতগুলোকে আলাদা করে, পরে আংটি ও লকেট বানানো হয়েছিলো মেয়েদের যৌতুক হিসাবে ব্যবহারের জন্যে।

যমজরা যখন জিজ্ঞেস করলো 'কব্জিবন্ধনী' কি? আম্মু উত্তর দিলো ওগুলো দিয়ে কব্জিগুলোকে জোড়া দেওয়া যায়– তারা খুব খুশি হয়েছিল উদ্ভট যুক্তির একটা গন্ধ পেয়ে যা এতদিন মনে হচ্ছিল যুক্তিহীন। *কব্জি+বন্ধনী= কব্জিবন্ধনী*। তাদের কাছে এটা নির্ভুল অংক আর যুক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতার মতো মনে হলো, *কব্জিবন্ধনী*। তাদের মধ্যে জন্ম দিলো এক অসাধারণ (বাড়িয়ে বললে) প্রশান্তি এবং ইংরেজী ভাষার প্রতি প্রবল আকর্ষণ।

আম্মু বললো যে, পাপাচি ছিলেন সংশোধনের অযোগ্য ব্রিটিশ সিসিপি (*চিহ্ন চিহ্পোচ*-এর সংক্ষেপ হিন্দিতে যার মানে মেয়র)। চাকো বলতো পাপাচির মতো এ রকম লোকের ঠিক নাম হওয়া উচিত *এ্যাঙলোফাইল*! রাহেল ও এসথাকে দিয়ে তিনি দেখালেন এ্যাঙলোফাইল শব্দটা *রিডার্স ডাইজেস্ট গ্রেট এনসাইক্লোপিডিয়া ডিকশনারিতে*। সেখানে লেখা ছিলো– এমন ব্যক্তি যে ইংরেজের দিকে প্রবলভাবে ঝোঁকা। এরপর এসথা ও রাহেল ডিসপোসেট শব্দের অর্থ বের করলো।

তাতে লেখা ছিলো

১. *সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা*

২. *মনকে নির্দিষ্ট অবস্থানে নিয়ে আসা*

৩. *মুক্ত হওয়া, রেহাই পাওয়া, ধ্বংস করা, শেষ করা, মীমাংসা করা, খাদ্যভক্ষণ করা, হত্যা করা, বিক্রয় করা।*

চাকো বললো, পাপাচির জন্যে এটাই হবে।

মনকে নির্দিষ্ট অবস্থানে নিয়ে আসা সম্বন্ধে চাকো বললো, *'পাপাচির মনটাকে এমন একটা জায়গায় আনা হয়েছে যাতে তিনি ইংরেজদের পছন্দ করেন।'*

চাকো যমজদের বললো, যদিও তার ব্যাপারটাকে স্বীকার করতে ঘেন্না হয় তবুও এটাই সত্যি যে তারা সবাই ইংরেজদের পছন্দ করে। তারা একটা ইংরেজ পছন্দ করা পরিবার। ভুল দিকে তাক করা, নিজেদের ইতিহাসের বাইরে বন্দী এবং নিজেদের ফেলে আসা পদচিহ্নগুলো খুঁজে পায় না, কারণ তাদের পদচিহ্নগুলো মুছে গেছে। সে বললো যে, ইতিহাস হলো রাতের এক পুরোনো বাড়ির মতো যার ভিতরের বাতিগুলো জ্বালানো আর পূর্বপুরুষরা ফিসফিসিয়ে কথা বলে।

'ইতিহাস বুঝতে হলে' চাকো বললো, 'আমাদের বাড়ির ভিতরে গিয়ে শুনতে হবে তারা কি বলছে। আর বইগুলো পড়তে হবে এবং দেওয়ালের ছবিগুলো দেখতে হবে, ভিতরের গন্ধটাও শুঁকে দেখতে হবে।

এসথা আর রাহেলের কোন সন্দেহ ছিল না যে, যে বাড়িটার কথা চাকো বলেছে সেটা নদীর ওপারে, পরিত্যক্ত রাবার বাগানের ভিতরে, যেখানে তারা কখনো যায়নি। কারি সাইপুর বাড়ি। কালো সাহেবের বাসা। ইংরেজটা 'দেশী' হয়ে গিয়েছিলেন। মালয়েলাম বলতেন ও মন্ডু পরতেন। এইমেনেমের আঞ্চলিক পোশাক। এইমেনেম হলো তাঁর ব্যক্তিগত আঁধার হৃদয়। তিনি দশ বছর আগে মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছিলেন কারণ তাঁর ভালোবাসার ছেলেটিকে তার বাবা-মা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে দিয়েছিলো। আত্মহত্যার পরে সম্পত্তিটা কারি সাইপুর রাধুনী আর তাঁর সহকর্মীর মধ্যে মামলাবাজির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বাড়িটা বছরের পর বছর খালি পড়ে আছে। খুব অল্প লোকই সেটা দেখেছে। কিন্তু যমজরা সেটা কল্পনায় দেখতে পেলো।

ইতিহাসের বাড়ি।

ঠাণ্ডা পাথরের মেঝে, ময়লা দেওয়াল, ঢেউ খেলানো জাহাজের চেহারার জানালা। ফুলো ফুলো, মোটাসোটা টিকটিকিগুলো ছবির পিছনে লুকিয়ে থাকতো, আহম্মক পূর্বপুরুষ, যাদের শক্ত নখে পুরনো হলদেটে মানচিত্রের মতো গন্ধ, তারা গল্প করে বইয়ের পাতা উল্টানোর মতো খস খস শব্দে।

'কিন্তু আমরা ভিতরে যেতে পারি না' –চাকো বললো 'কারণ আমরা বাইরে থেকে বন্ধ আর যখনই আমরা জানালা দিয়ে তাকাই আমরা সবাই দেখি আমাদেরই ছায়া এবং যখনই শুনতে চেষ্টা করি তখনই শুনতে পাই ফিসফিস কথাবার্তা এবং আমরা অর্থ বুঝতে পারি না। কারণ আমাদের মন একটা যুদ্ধ দিয়ে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। একটা যুদ্ধ যেটা আমরা জিতেছি এবং হেরেছি। সবচেয়ে বিশ্রীধরনের যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ যা স্বপ্নগুলোকে বন্দী করে নতুন স্বপ্ন দেখায়। এমন এক যুদ্ধ যা আমাদের দখলদারদের সম্মান করতে বাধ্য করে আর নিজেদের অবজ্ঞা করতে শেখায়।'

'আমাদের দখলদারদের বিবাহ করো –অনেকটা সেরকম' আম্মু শুকনো গলায় বললো, মার্গারেট কোচাম্মাকে বোঝাতে গিয়ে। চাকো তাকে এড়িয়ে গেলো, সে

যমজদের ডেসপাইজ শব্দের অর্থ বের করতে বললো, লেখা ছিল– *ডেসপাইজ মানে অবজ্ঞা করা, ঘৃণা করা, ঘৃণার চোখে দেখা।* চাকো বললো, যে যুদ্ধের কথা সে বোঝাতে চাচ্ছে –স্বপ্নের যুদ্ধ, *ডেসপাইজ* এর সব মানেগুলোই এখানে খাপ খায়।

'আমরা যুদ্ধবন্দী' চাকো বললো আমাদের স্বপ্নগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, এখন আমরা কোন জায়গাতেই অধিকার দাবি করতে পারি না। আমরা ঝড় ওঠা সমুদ্রে নোঙ্গরবিহীন তরী ভাসিয়েছি। আমরা হয়তো কখনোই তীরে ওঠার অনুমতি পাবোনা। আমাদের দুঃখগুলো কখনোই সবচেয়ে দুঃখময় মনে হবে না। আমাদের আনন্দগুলো কখনোই সবচেয়ে আনন্দময় হবে না, আমাদের স্বপ্নগুলো কখনোই সবচেয়ে সুন্দর স্বপ্ন হবে না আমাদের জীবনগুলো কখনোই সবচেয়ে সফল হয়ে উঠবে না।

তারপর রাহেল আর এসথাকে ইতিহাসের একটা উদাহরণ দেখানোর জন্যে (যদিও তার পরের কয়েক সপ্তাহে উদাহরণ দেখাতে চাকো নিজে ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলো) সে তাদের বললো, ধরিত্রী নারীর কথা। সে তাদেরকে কল্পনায় দেখতে বলেছিলো পৃথিবী যা চার হাজার ছ'শ মিলিয়ন বছরের পুরানো –কিন্তু সেটা ছিলো ছেচল্লিশ বছর বয়সী এক নারীর মতো বৃদ্ধ –যেমন বৃদ্ধ ছিলেন আলয়াম্মা নামে তাঁদের মালায়ালম ভাষার শিক্ষিকা। পৃথিবীটাকে পৃথিবী হতে প্রয়োজন হয়েছিলো ধরিত্রী নারীর পুরো জীবন। মহাসাগরগুলোকে আলাদা আর পর্বতগুলোর উঁচু হওয়ার জন্যে ধরিত্রী নারীর বয়স লেগেছিলো এগারো বছর। চাকো বললো যখন প্রথম এককোষী প্রাণের উদ্ভব হয় প্রথম প্রাণীরা যেমন কেঁচো, কীট ও জেলী ফিস, এসবের উদ্ভব হয় তখন তাঁর বয়স ছিলো চল্লিশ বছর। যখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশের কোঠা ছাড়িয়েছে –তার মাত্র আট মাস আগে তখন ডাইনোসরেরা পৃথিবীতে ঘোরাঘুরি করতো।

'সারা মানবসভ্যতা যেভাবে আমরা এটাকে জানি' –চাকো যমজদের বললো "মাত্র দু'ঘন্টা আগে শুরু হয়েছে ধরিত্রী নারীর জীবনে।" এতোটুকু সময়ে আমরা এইমেনেম থেকে কোচিনে যাই। এটা ছিলো ভয়ংকর ও *নির্মোহ* চিন্তাভাবনা, চাকো বললো (রাহেলের মনে হলো *নির্মোহটা* চমৎকার একটা শব্দ) দুনিয়াতে নিরহঙ্কার ও চিন্তামুক্ত থাকা, সমসাময়িক ইতিহাসের পুরোটা, বিশ্বযুদ্ধগুলো, স্বপ্নের যুদ্ধ, চাঁদে মানুষ, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষার অনুসন্ধান –এগুলো সবই ধরিত্রী নারীর চোখের পাতা পিট পিট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবং আমরা প্রিয় সন্তানরা যা আছি এবং যা কখনো হতে পারবো, শুধুমাত্র তার চোখের পাতা ফেলা, চাকো চমৎকারভাবে বললো, বিছানায় শুয়ে –চৌকাঠের দিকে তাকিয়ে।

যখন চাকো মানসিকভাবে এরকম থাকতো তখন সে উঁচু গলায় কথা বলতো। ঘরটাকে মনে হতো চার্চের মতো। কেউ তাকে শুনছে কিনা সেটা সে পরওয়া করতো না। যদি কেউ শুনতোও, তারপরও সে যা বুঝাচ্ছে সেটা তারা বুঝতে

পারছে কিনা সে ব্যাপারে তোয়াক্কা করতো না। আম্মু তার এসব মানসিক ভাবকে '*অক্সফোর্ড ভাব*' বলতো।

পরে যা কিছু হয়েছে তার কারণ খুঁজতে গিয়ে '*পলকফেলা*' শব্দটাকে সবচেয়ে বেয়াড়া শব্দ বলে মনে হলো ধরিত্রী নারীর চোখের প্রকাশভঙ্গি বর্ণনা করতে গিয়ে। *পলকফেলা* শব্দটা ছিলো মোচড়ানো, সুখী সমৃদ্ধ।

যদিও ধরিত্রী নারী যমজদের মনে একটা স্থায়ী দাগ কেটেছিল। তবে ইতিহাসের বাড়ি যেটা হাতের এতো কাছে –সেটাই তাদেরকে বেশি ভাবিয়েছিলো। তারা সেটা নিয়ে প্রায়ই ভাবতো।

নদীর অন্য পাড়ের বাড়িটা।

হৃদয়ের অন্ধকারে জ্বলজ্বলে। এমন একটা বাড়ি যেখানে তারা যেতে পারে না, ফিসফিসানিতে ভরপুর, যা তারা শুনতে পায় না।

ওরা তখনও জানতো না তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি ঐ বাড়িটায় যাবে, নদী পার হয়ে এমন জায়গায় যাবে, যেখানে তাদের যাওয়া উচিত নয়। এমন এক লোকের সাথে যাবে যাকে তাদের ভালোবাসা উচিত নয়। এবং তারা কৌতুহলী চোখে দেখবে ইতিহাসকে তাদের সামনে উন্মোচিত হতে। পিছনের বারান্দায়। যখন তাদের সমবয়সী অন্য বাচ্চারা সাধারণ লেখাপড়া শিখছিলো। এসথা আর রাহেল শিখলো ইতিহাস কিভাবে নিজের নিয়মগুলোর সঙ্গে আপোস মীমাংসা করে আর যারা তার আইনভঙ্গ করে তাদের কাছ থেকে কিভাবে প্রাপ্য আদায় করে। তারা শুনতে পেয়েছিলো এর পতনের বিরক্তিকর শব্দ। ওরা এর ঘ্রাণ নিয়েছিলো এবং কখনো তা ভোলেনি।

ইতিহাসের গন্ধ।

যেমন বাতাসে ভাসা বাসি গোলাপের ঘ্রাণ।

একটা সাধারণ জিনিসের ভিতরে চিরদিনের জন্য গেঁথে গেলো অদৃশ্যভাবে। কোট ঝোলানোর হ্যাঙ্গারে, টমেটোতে, রাস্তার আলকাতরায়, কিছু কিছু রঙের মধ্যে, রেস্তোরাঁর প্লেটে। শব্দহীনতায় ও চোখের শূন্যতায়, তারা বড় হলো বেঁচে থাকার নিয়ম আর ঘটনাগুলোকে আঁকড়ে ধরে। তারা নিজেদেরকে বোঝাতে চাইতো যে, ভূগোলের সময়ের হিসাবে এসব অর্থহীন। ধরিত্রী নারীর একটা পলক-ফেলা মাত্র। ঘটে গেছে সবচেয়ে খারাপটাই। কেবল খারাপ ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু এসব ঘটনা তাদের স্বস্তি দিতো না।

চাকো বললো, *দ্য সাউন্ড অব মিউজিক* দেখতে যাওয়াটাও ইংরেজ-পছন্দের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি।

আম্মু বললো, "আরে দূর পৃথিবীটাই আছে দেখার জন্য। চলো *দ্য সাউন্ড অব মিউজিক*' ছবিটা দেখে আসি। ছবিটা হিট করেছে।'

চাকো তার বই পড়ার মতো ভঙ্গিতে বললো কক্ষনো না –যাকগে যাক।

মামাচি প্রায়ই বলতেন যে চাকো খুব সহজেই ভারতের চালাক লোকদের সেরা হতে পারে। '*কার মতো?*' আম্মু বলতো *কিসের? কেন!*' মামাচি গল্পটা বলতে ভালোবাসতেন (চাকোর গল্প) সে অক্সফোর্ডের শিক্ষকদের মধ্যে নামকরা। চাকো নাকি ছিলো বিচক্ষণ এবং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতাওয়ালা।

এ ব্যাপারে আম্মু সব সময় কমিকের মতো বলতো, 'হা, হা, হা।'

সে বলতো :

ক. অক্সফোর্ডে গেলেই কেউ চালাক হবে এমন কোনো কথা নেই।

খ. চালাক হলেই ভালো প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায় সেটাও ঠিক নয়।

গ. যে লোক একটা আচার কারখানাই ঠিকমতো চালাতে পারে না সে কি করে পুরো দেশ চালাবে?

ঘ. সব ভারতীয় মা-ই ছেলেকে নিয়ে ঘোরের মধ্যে থাকে তাই ছেলের ক্ষমতা ঠিকমতো বিচার করতে পারে না।

চাকো বলতো :

ক. অক্সফোর্ডে কেউ *যায়* না, অক্সফোর্ডে *পড়ে*।

খ. এবং অক্সফোর্ডে *পড়াশুনা* করে তুমি *নিচে নেমে আসো*।

'নিচে নেমে আসা মানে কি ভূ-পাতিত হও?' আম্মু জিজ্ঞেস করলো, '*সেটা* তুমি অবশ্য ঠিকই করো, তোমাদের বিখ্যাত প্লেনগুলোর মতো।'

আম্মু বলল যে, দুর্ভাগ্য কিন্তু যেটা ঘটবেই বলে বোঝা যায়, চাকোর প্লেনগুলোর সেই ভাগ্যটা আসলে তার ক্ষমতার আসল মাপ।

প্রত্যেক মাসে একবার (বর্ষাকাল বাদে) ডাকে একটা প্যাকেট আসতো চাকোর নামে ভিপিপিতে। ওটার মধ্যে সবসময়ই থাকতো একটা বালসা প্লেন তৈরির টুকরো। চাকো সাধারণত আট থেকে দশ দিনের মধ্যে প্লেনটা জোড়া দিয়ে তৈরি করে ফেলতো: ছোট তেলের ট্যাংক আর মোটর লাগানো ডানাওয়ালা। ওটা তৈরি হলে সে এসথা আর রাহেলকে নিয়ে ধানক্ষেতে গিয়ে ওড়তো। ওটা কখনোই এক মিনিটের বেশি ওড়েনি। মাসের পর মাস, সাবধানে বানানো চাকোর প্লেনগুলো সবুজ ধান ক্ষেতে গিয়ে পড়তো। আর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের জন্যে রাহেল আর এসথা ছুটে যেতো যেন তারা উদ্ধারকাজে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

একটা লেজ, তেলের ট্যাংক, একটা ডানা, একটা জখমি যন্ত্র।

চাকোর ঘর ভরা ছিল কাঠের ভাঙা প্লেনে। আর তার পরের মাসে আরেকটা প্যাকেট আসতো। চাকো কখনোও ভেঙে পড়ার জন্য টুকরোর প্যাকেটগুলোকে দোষ দিতো না।

পাপাচির মৃত্যুর পরেই চাকো মদ্রাজ খৃষ্টান কলেজের প্রভাষকের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এইমেনেমে আসলো তার ব্যালিওল দাঁড়টা আর আচার মহরারাজ খেতাব পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে।

সে তার পেনশন ও প্রভিডেন্টফান্ডের টাকা দিয়ে কিনলো একটা 'ভারত'-বোতলের ছিপি আটকানোর যন্ত্র। তার দাঁড়টা (ওতে বাইচ দলের অন্য সবার নাম সোনালী অক্ষরে লেখা ছিলো) লোহার আংটা দিয়ে কারখানার দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওটা।

চাকো আসার আগে পর্যন্ত কারখানাটা ছিলো ছোট কিন্তু লাভ হতো। মামাচি এটাকে একটা বড় রান্না ঘর হিসাবে চালাতেন। চাকো এটাকে রেজিস্ট্রি করলো এবং একটা অংশীদারী ব্যবসায় পরিণত করলো এবং মামাচিকে বললো যে তিনি স্লিপিং পার্টনার অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অংশীদার। যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করলো (টিনজাত করার যন্ত্র, কড়াই, চুলো) এবং শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ালো। ক'দিনেই অর্থনৈতিক উন্নতি হতে শুরু করলো। কিন্তু কৃত্রিমভাবে তাকে চলতে সাহায্য করেছিলো চাকোর ব্যাংক থেকে নেওয়া একগাদা ঋণ যা সে এইমেনেমের বাড়ির আশপাশের পারিবারিক সম্পত্তি, ধান ক্ষেতগুলো বন্ধক রেখে পেয়েছিলো। যদিও আম্মু চাকোর মতোই কাজ করতো কারখানায়। যদিও আম্মু সমান পরিশ্রম করতো কারখানার জন্যে তবুও যখনই সে (চাকো) ফুড ইন্সপেক্টর বা ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলতো –সে সব সময় বলতো, '*আমার* কারখানা, *আমার* আনারস, *আমার* আচার' এইভাবে। আইনগতভাবেই এমন হতো কারণ মেয়ে হিসাবে আম্মুর কোন অধিকার ছিলো না সম্পত্তির ওপর।

চাকো রাহেল আর এস্থাকে বলতো আম্মুর নিজেকে রক্ষার মতো ক্ষমতা ছিলো না। আম্মু বললো, 'আমাদের আশ্চর্য পুরুষ সমাজকে ধন্যবাদ।'

চাকো বললো, তোর যা আছে সেটা আমার এবং আমার যা আছে সেটাও আমারই। নিজের আকৃতি ও স্থূলতার তুলনায় তার হাসিটা ছিলো অনেক উঁচু স্বরের যখন সে হাসতো তার সমস্ত শরীর কাঁপতো তবে সে পড়ে যেত না।

চাকো এইমেনেমে আসার আগ পর্যন্ত মামাচির কারখানার কোন নাম ছিলো না। প্রত্যেকে তার আচার ও জ্যামকে উল্লেখ করতো "শোষা'র কাঁচা আম, অথবা 'শেষা'র কলার জ্যাম"। 'শোষা' ছিলো মামাচির নামের প্রথম অংশ শোষামা। চাকোই প্রথম কারখানাটার নাম দেয় 'পিকলস এ্যান্ড প্রিজার্ভস' এবং লেবেল ডিজাইন করে কমরেড কে এন এম পিল্লাই এর প্রেসে ছেপেছিলো। প্রথমে সে এটার নাম রাখতে চেয়েছিলেন 'জিউস পিকলস এ্যান্ড পিজার্ভস'। কিন্তু এ ধারণাটা সবাই বাদ দিতে বলেছিলো কারণ সবার মতে জিউস ব্যাপারটা দুর্বোধ্য এবং আঞ্চলিকতার সঙ্গে মিলছাড়া, অথচ প্যারাডাইস এর অর্থ আছে (কমরেড পিল্লাই এর বুদ্ধিতে পরশুরাম আচার নামটা বাতিল হয় বেশি বেশি দিশি হওয়ার জন্যে)। এটা চাকোর বুদ্ধি –প্লেমাউথের ছাদের ওপরের খাঁচায় একটা বোর্ড বসিয়ে দেওয়া, কোচিনে যাওয়ার পথে ওটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করছিলো যেন খুলে পড়ে যাবে।

ভাইকমের কাছে তাদেরকে থেমে দড়ি কিনে ওটাকে শক্ত করে বাঁধতে হলো। এ জন্য ওদের আরও কুড়ি মিনিট দেরি হলো। রাহেলের চিন্তা হতে লাগলো যে, *দ্য সাউন্ড অব মিউজিক* শুরু না হয়ে যায়!

তারপর, তারা যখন কোচিনের কাছাকাছি পৌঁছালো তখন রেলওয়ে লেভেল ক্রসিঙের লাল-সাদা রং করা গেটটা নামানো ছিলো। রাহেল জানতো ওটা ঘটছে এজন্যে যে, ও তা চায়নি বলে।

ও তখনও তার মুখে লাগাম আঁটতে শেখেনি। এসথা বললো, এটা একটা অমঙ্গলের সংকেত। ফলে এখন তারা ছবিটার শুরুটা হয়তো দেখতে পাবে না। যখন জুলি এ্যান্ড্রেস শুরু করেন পাহাড়ের ওপর থেকে একটা বিন্দু থেকে এবং আস্তে আস্তে বড় হতে হতে শেষ পর্যন্ত পর্দায় উপস্থিত হন তাঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর নিয়ে যা ঠাণ্ডা জলের মতো এবং তাঁর নিঃশ্বাস সুগন্ধীর মতো। লাল-সাদা হেলানো খুঁটিটায় সাদা অক্ষরে লেখা ছিলো 'থামুন'।

রাহেল বলে উঠলো, 'সর্বনাশ'। লাল রঙে একটা হলুদ নির্দেশিকায় লেখা ছিলো, বি ইন্ডিয়ান বাই ইন্ডিয়ান ('ভারতীয় হউন, ভারতীয় পণ্য কিনুন')।

'নাইদনী উব নাইদনি এব' এসথা বললো।

যমজরা পড়ার ব্যাপারে ছিলো ইঁচড়েপাকা । তারা পড়ে ফেলেছিলো টম নামের বুড়ো কুকুর, জ্যানেট ও জন, এবং তাদের রোনাল্ড রিডআউট ওয়ার্ক বুকস্। রাতে আম্মু কিপলিং এর 'জঙ্গল বুক' থেকে পড়ে শোনাতো।

'তখন চিল নামের ঘুড়িটা রাতকে এনেছে বাসায়
ম্যাং নামের বাদুড়টা তাকে মুক্তি দিয়েছে।'

হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে ওরা শুনতো, বিছানার পাশের টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সোনালী লাগত। পড়ার সময় আম্মু গলাটা মাঝে মাঝে শের খানের মতো রাশভারী করে আবার কখনো মেয়েলি করে তুলতো টাবাকুই'র মতো।

'তুমি পছন্দ করো এবং তুমি পছন্দ করোনা' এটা পছন্দ, অপছন্দের কি? যে ষাঁড়টাকে আমি হত্যা করেছি তার নামে বলি, আমাকে কি তোমার কুত্তার খোঁয়াড়ে নাক গলাতে হবে আমার ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্যে? শের খান, এ কথা বলছে। 'রক্ষা' (দানবের নাম) উত্তর দিচ্ছে –যমজ দু'জন চেঁচিয়ে উঠতো প্রায় সমস্বরে।

'মানুষের বাচ্চাটা আমার, লুংরি আমার। তাকে মারতে পারবে না, সে বেঁচে থাকবে সবার সঙ্গে দৌড়ানোর জন্যে এবং শিকার করার জন্যে এবং শেষে তোমাকে

হ্যাঁ তোমাকে, যে তুমি ছোট্ট ন্যাংটা বাচ্চা মারো, ব্যাঙ খেকো, মাছ মারো সেই তোমাকেই শিকার করবে।'

বেবি কোচাম্মা, যাঁকে তাঁদের নিয়মিত পড়াশোনার ভার দেওয়া হয়েছিলো ওদেরকে পড়ে শুনিয়েছিলেন *দ্য টেমপেস্ট*, যেটার সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছিলেন চার্লস ও মেরী ল্যাম্ব।

'যেখানে মৌমাছি মধু পান করে, সেখানে আমি মধু পান করি,' রাহেল ও এসথা বলতো, 'প্রিমরোজ ফুলে আমি থাকি'।

তাই যখন বেবি কোচাম্মার অস্ট্রেলিয়ান মিশনারী বান্ধবী মিস মিটেন রাহেল আর এসথাকে একটা ছোটদের বই '*সুসী কাঠবেড়ালীর দুঃসাহসী অভিযান*' উপহার দিলেন এইমেনেমে বেড়াতে এসে। তাতে তারা খুবই অপমানবোধ করেছিলো। প্রথমে তারা বইটা সোজা দিক থেকে পড়ছিলো; মিস মিটেন ছিলেন গোঁড়া খৃস্টান তিনিও একটু হতাশ হলেন, যখন দেখলেন ওরা বইটা তাঁকে গড় গড় করে পড়ে শোনালো, কিন্তু উল্টো দিক থেকে।

সুসী কাঠবেড়ালীর দুঃসাহসী অভিযান। '*এক বসন্তের সকালে সুসী কাঠবেড়ালী ঘুম থেকে উঠলো* (উল্টো দিক থেকে)।' তারা মিস মিটেনকে দেখালো কিভাবে *মালায়লাম, ম্যাডাম আই এম এডাম* এই ইংরেজি শব্দগুলোকে উল্টো ও সোজা দু'ভাবেই পড়া যায়। ওরা তাঁকে বললো যে, এটাই কেরালার কথ্য ভাষা। তিনি বললেন, তাঁর ধারণা ছিলো যে, এটাকে বলা হতো কেরালিজ, এসথা তারপর থেকে মিস মিটেনকে দেখতে পারতো না, প্রায়ই বলতো বোকার মতো কিছু ধারণা আছে ওঁর।

মিস মিটেন বেবি কোচাম্মার কাছে নালিশ করলেন এসথার অভদ্রতার জন্যে আর উল্টো দিক থেকে পড়ার জন্যে। তিনি বেবি কোচাম্মাকে বললেন যে, তিনি ওদের চোখে শয়তানের অন্ধকার দেখছেন। *শয়তানের লক্ষণ* ওদের চোখে (উল্টো দিক থেকে)। ওদের বাধ্য করা হলো লিখতে যে, *ভবিষ্যতে আমরা আর উল্টোদিক থেকে পড়বোনা, ভবিষ্যতে আমরা আর উল্টো দিক থেকে পড়বোনা।* প্রত্যেকটা একশ' বার এবং সোজা করে।

কয়েকমাস পরে মিস মিটেন মারা গেলেন একটা দুধের ভ্যানের নিচে পড়ে হোবার্টে, ক্রিকেট মাঠ থেকে ফেরার পথে। যমজদের কাছে এ বিষয়টার একটা গোপন ঔচিত্য ছিলো, কারণ দুধের ভ্যানটা *পিছনে চলছিলো*।

আরো অনেক বাস আর গাড়ি থামলো লেভেল ক্রসিঙের দু'পাশে। একটা এ্যাম্বুলেন্সে (যার গায়ে লেখা ছিলো, *স্যাকরেড হার্ট হসপিটাল*) ওতে ছিলো হুল্লোড় করা কিছু লোকজন যারা বিয়েতে যাচ্ছিলো। কনেটা পিছনের জানালা দিয়ে

তাকাচ্ছিলো, তার মুখের কিছুটা ঢাকা পড়েছিলো রেডক্রসের বড় মাপের ক্রস চিহ্নের আড়ালে।

সবগুলো বাস ছিলো মেয়েদের নামে লুসিকুট্টি, মলিকুট্টি, বীনা মল। মালায়লাম ভাষায় মল মানে ছোট মেয়ে আর মন মানে ছোট ছেলে, বীনা মল নামের বাসটা ভরা ছিলো তীর্থযাত্রীতে। তাদের মাথা ন্যাড়া করা হয়েছিলো তিরুপতিতে। বাসের জানালায় রাহেল দেখতে পাচ্ছিলো এক সারি ন্যাড়া মাথা, জানালা বেয়ে নেমেছিলো বমির গড়ানো ছোপ ছোপ দাগ। সে বমির ব্যাপারে একটু বেশি কৌতূহলী ছিলো। সে কখনো বমি করেনি। একবারও না। এসথা অবশ্য করেছিলো এবং যখন করেছিলো তখন তার গা নরম ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো এবং তার চোখগুলো দেখাচ্ছিল অসহায় ও সুন্দর এবং আম্মু তাকে একটু বেশি আদর করেছিলো। চাকো বলতো এসথা আর রাহেল ছিলো বিশ্রীরকম মোটা, সোফি মলও। সে বলতো তার কারণ হলো বেশির ভাগ সিরিয়ান খৃষ্টান আর পার্সীদের মতো হেলা ফেলায় ওরা মানুষ হয়নি।

মামাচি বলতেন যে তাঁর নাতি নাতনী হেলা ফেলায় মানুষ হওয়ার চেয়েও খারাপ জিনিসে আক্রান্ত হয়েছে। তিনি বোঝাতেন বাবা-মা'র ছাড়াছাড়ি হওয়ার ব্যাপারটাকে। যেন এ দু'টোই একমাত্র পছন্দ করার বিষয়, হয় হেলা ফেলায় মানুষ হওয়া কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ।

রাহেল বুঝতে পারে না –কি তাকে খারাপ করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে গোমড়া মুখে বসে থাকতো আর আয়নার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো।

আমার সারাজীবনে করা সবকিছুর চেয়ে এখন যেটা করছি সেটা অনেক অনেক ভালো –দুঃখ করে নিজে নিজে বলতো। সেটা ছিলো রাহেলের সিডনী কারটোন তথা চার্লস ডারনি হওয়া, যে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো শিরচ্ছেদের অপেক্ষায়। ব্যাপারটা ছিলো 'এ টেল অব টু সিটিজ' উপন্যাসের সচিত্র কমিক অনুবাদের অংশ থেকে নেয়া।

সে অবাক হয়ে ভাবছিলো কি জন্য চুলহীন তীর্থযাত্রীরা এরকম ভক ভক করে বমি করেছিলো, অথবা তারা কি একই সাথে একটা নির্দিষ্ট তালে (যেমন অর্কেস্ট্রার সময় অথবা বাসের ভিতরে গাওয়া ভজনের তালে তালে) বা আলাদা আলাদা, একজন একজন করে বমি করেছিলো!

প্রথমদিকে যখন লেভেল ক্রসিংটা শুধু বন্ধ হয়েছে, বাতাসটা ভারি হয়েছিলো, থমকে দাঁড়ানো গাড়িগুলোর ইঞ্জিনের অধৈর্য্য শব্দে। কিন্তু যখন ক্রসিঙের কর্মচারীরটা তার খুপরির মধ্যে থেকে বের হয়ে এসে হেলেদুলে আস্তে আস্তে পাশের চায়ের দোকানে গেলো তখন বোঝা গেলো যে তাদেরকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ড্রাইভাররা তাদের ইঞ্জিনগুলো বন্ধ করে নেমে হেঁটে পাগুলোর আড় ছাড়াচ্ছিল।

তার বেয়াড়াভাবে নোয়ানো ক্লান্ত আর ঘুমকাতুরে মাথাটার জন্যে লেভেল ক্রসি তার দেবত্বের মিনতি করে আবির্ভূত করলো ভিক্ষুকের দলকে। ওদের শরীরে ছিলে পট্টি বাঁধা। ট্রেতে করে তাজা নারকেলের শাঁস, কলাপাতার ওপর পারিম্পু ভাদা এবং কোল্ড ড্রিঙ্কস কোকা-কোলা, ফান্টা, রোজমিল্ক নিয়ে ফেরিওয়ালারা ঘুরছিলো।

একটা কুষ্ঠরোগী পট্টি বাঁধা গায়ে মাটি লেপে, গাড়ির জানালার কাছে এ ভিক্ষা চাইলো।

আম্মু বললো, 'ওর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল রক্তকে আমার মনে হচ্ছে পারা আ ক্রোমিয়াম মেশানো।'

'অভিনন্দন' চাকো বললো, 'একেবারে আসল কায়েমী স্বার্থবাদীদের মতে বলেছিস'।

আম্মু হাসলো এবং ওরা হাত মেলালো। যেন আসলেই তাকে কায়েমী স্বার্থবা হওয়ার জন্য বুদ্ধিমত্তার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। এরকম মুহূর্তগুলোকে যমজ খুব দামী মনে করতো এবং দামি পুঁতির মতো স্মৃতির সুতোয় গেঁথে রাখতো (অনেকটা দুর্গন্ধময়) কণ্ঠহারে।

রাহেল আর এস্থা তাদের নাক চেপেছিলো প্লেমাউথের শিকিখানা জানালায় আকুল শিকনি ঝরা বিষণ্ন বাচ্চাদের দল ছিলো তাদের পিছনে। আম্মু বললো, 'ন শক্তভাবে এবং যেন বকা দিচ্ছিলো। চাকো একটা চারমিনার ধরালো। তিনি জো টান দিলেন এবং জিভে লেগে থাকা তামাকের ছোট কণাটা সরালেন।

প্লেমাউথের ভিতরে, রাহেলের এসথাকে দেখতে কষ্ট হচ্ছিল। কারণ বে কোচাম্মাকে তাদের মাঝখানে লাগছিলো একটা পর্বতের মতো, আম্মু ওদে মারামারি ঠেকাতে আলাদা করে বসিয়েছিলো। যখন ওরা মারামারি করতো, এস রাহেলকে বলতো ইনসেক্ট, বিপদ দেখলেই পালিয়ে যায়। রাহেল তাকে বলতে এলভিস ঘুরে-ঘুরে টেলভিস এবং একটা হাস্যকর নাচ দেখাতো যাতে এসথা আ রেগে কাঁই হয়ে যেতো। যখন তারা ক্ষেপে গিয়ে মারামারি করতো, তখন দু'জনে এতো একরকম ছিলো যে, মারামারিটা চলতেই থাকতো এবং ওদের সামনে টেবি ল্যাম্প, ছাইদানী জলের জগ থাকলে —সব গুঁড়ো হয়ে যেতো কিংবা আর ঠিক করা মতো থাকতো না।

বেবি কোচাম্মা সামনের সিটের পিছনটা ধরেছিলেন। যখন গাড়িটা চলতো, তা হাতে জমা চর্বি দুলতো বাতাসে। এখন ওটা একটা মাংসল পর্দার মতো ঝুলে আ যেজন্য এস্থা ও রাহেল কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

এসথার দিকের রাস্তায় ছিলো একটা চায়ের দোকান, যেখানে চায়ের সঙ্গে বি হচ্ছিল দামি গ্লুকোজ বিস্কুট, ওগুলো রাখা ছিলো ঘোলা কাঁচের বোয়েমে এ সেগুলোর ভিতরে ছিলো মাছি, আর ছিলো লেমনেড। মোটা কাঁচের বোতলে মু

বন্ধ করা ছিলো নীল রঙের ছিপি দিয়ে যেন গ্যাসের হিসহিস শব্দ শোনা যায়। একটা লাল বরফের বাক্সের ওপরে দায়সারাভাবে লেখা ছিলো *'কোকা-কোলার সঙ্গে সবকিছুই ভালো।'*

লেভেল ক্রসিঙে মুরলীধরন নামের পাগলটা স্থির হয়ে বসেছিলো মাইল ফলকটার ওপর। পা দুটোকে আড়াআড়ি করে রাজকীয়ভাবে। তার লিঙ্গ আর অণ্ডকোষ ঝুলেছিলো নিচের দিকে এবং সংকেতটার দিকে তাক করে ছিলো ওটা, যাতে লেখা ছিলো–

কোচিন

২৩

মুরালীধরন ছিলো পুরোপুরি উদোম কিন্তু সে মাথায় পরেছিলো লম্বা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। ওটাকে মনে হচ্ছিলো বাবুর্চির টুপি তবে স্বচ্ছ, যেটার ভিতর দিয়ে দৃশ্যাবলী দেখা যাচ্ছিলো –যদিও অস্পষ্ট, বাবুর্চির মাপের কিন্তু অবৈধ। সে ইচ্ছে করলেও টুপিটা মাথা থেকে খুলতে পারছিলো না কারণ তার দু'টো হাতই ছিলো না। হাত দু'টো উড়ে গিয়েছিলো ১৯৪২ সালে সিঙ্গাপুরে যুদ্ধ করতে গিয়ে। ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার পরপরই, এক সপ্তাহ্‌র মধ্যেই। সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্যে। স্বাধীনতার পর তাকে প্রথম সারির মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং তাকে দেওয়া হয় সারাজীবন প্রথম শ্রেণীতে রেলভ্রমণের ছাড়পত্র। ওটাও সে ফেলেছে হারিয়ে (তার মানসিক ভারসাম্যের সঙ্গে সঙ্গে), তাই সে এখন আর ট্রেনের ভিতরে অথবা রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে থাকতে পারে না। মুরালীধরনের বাড়িঘর ছিলো না। কোনো দরজা ছিলো না –বন্ধ করার মতো, কিন্তু তার পুরানো চাবির গোছা সে শব্দ করেই রাখতো কোমরের সঙ্গে। একটা চক্‌চকে গোছা। তার মন ভরা ছিলো বাসন-কোসন কাঠের আলমারীতে, সেগুলো গোপন সুখে হুল্লোড় করতো।

একটা এলার্ম ঘড়ি। একটা লাল গাড়ির সুরেলা ভেঁপু। গোসলখানার জন্যে একটা লাল মগ। একটা বউ, যার ছিলো একটা হীরে। একটা ছোট বাক্স যার মধ্যে দরকারী কাগজপত্র। একটা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আসা। একটা *'আমি দুঃখিত, কর্নেল সভাপতি, কিন্তু সম্ভবত আমি আমার বক্তব্য বলতে পেরেছি,'* এবং বাচ্চাদের জন্যে নরম কলার খোসা ছাড়ানো টুকরো।

সে দেখতো ট্রেনগুলোর আসা-যাওয়া। সে তার চাবিগুলো গুনতো।

সে দেখতো সরকারের উত্থান-পতন। সে তার চাবিগুলো গুনতো।

সে দেখতো বিষণ্ন শিশুদের, ওরা তাদের সিকনিঝরা নাকগুলো নিয়ে আকুল হয়ে তাকিয়ে থাকতো গাড়ির জানালার কাঁচে।

গৃহহীন, অসহায়, অসুস্থ, ছোট ও হারানো, সব কিছু একের পর এক তার জানালা পেরিয়ে যেত। মাঝে মাঝে কিছু দেখে খুশিও হয়ে উঠতো। তখনও সে কেবল তার চাবিগুলোকে গুনতো।

সে ঠিক করতে পারতো না কোন আলমারীটা তাকে খুলতে হতে পারে, কিংবা কখন। সে বসে থাকতো গরম পাথরটার ওপর, তার জট পড়া চুল আর জানালার মতো চোখগুলো নিয়ে। আর মাঝে মাঝে খুশি হয়ে উঠতো অন্য কিছু দেখে। খুশি থাকতো তার চাবিগুলোর জন্যে এবং সেগুলো গুনে গুনে আবার ঠিক করে গোনা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করতে পেরেও খুশি হতো।

সংখ্যা ঠিক থাকলেই চলতো।

হতবুদ্ধিই ছিলো ভালো।

মুরালীধরণ তার মুখ নাড়াতো গোনার সময় এবং সুন্দর ছন্দ মিলিয়ে অর্থহীন শব্দ আওড়াতো।

অন্যার

রান্ডার

মুন্নার

এসথা দেখলো তার মাথার কোঁকড়া চুলের রং ধুসর, তার হাত নেই, বগলের খাঁজের উড়ন্ত চুলগুলো কালো এবং তার জঙ্ঘার লোমগুলো কালো আর প্যাঁচানো। একই লোকের নানান রকমের চুল। এসথা একটু অবাক হলো –এটা কিভাবে হয়! সে বিষয়টা কাকে জিজ্ঞেস করবে ভাবছিলো।

অপেক্ষা করতে করতে রাহেলের ভিতর ফুলে ফেঁপে ফেটে যাবার যোগাড় হলো। সে ঘড়ির দিকে তাকালো। দু'টো বাজতে দশ মিনিট বাকী। সে ভাবছিলো জুলি এন্ড্রুস ও ক্রিস্টোফার পামারের কথা দু'জন চুমু খাচ্ছিল আড়াআড়িভাবে যাতে ওদের নাকে ধাক্কা না লাগে। সে আশ্চর্য হলো –মানুষের এমন আড়াআড়ি চুমু খাওয়া দেখে। সে কাকে জিজ্ঞেস করবে ভাবছিলো।

তখন দূর থেকে একটা ঘরঘর শব্দ ভেসে এলো আটকে থাকা গাড়িগুলোর দিকে এবং ঢেকে দিলো আলখাল্লার মতো। ড্রাইভার যারা তাদের পা ঝেড়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করছিলো তারা তাদের গাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। ভিখিরী আর ফেরিওয়ালারা গেলো উধাও হয়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যে রাস্তার ওপর আর কাউকে দেখা গেলোনা। শুধুমাত্র মুরালীধরন ছাড়া। মুরালীধরন গরম পাথরটার ওপর ভর দিয়ে চুপচাপ বসেছিলো। অবিচলিত কিন্তু খানিকটা কৌতূহলী।

হৈচৈ শোনা গেলো। শব্দ পাওয়া গেলো পুলিশের বাঁশির ।

এগিয়ে চলা গাড়ির বহর তখনও দাঁড়িয়ে আছে পিছনের সারি থেকে একদল মানুষ বেরিয়ে এলো, যাদের হাতে ছিলো লাল পতাকা আর ব্যানার এবং মুখে ছিলো শ্লোগান যা ক্রমাগত বাড়ছিলো। 'জানালাগুলো তুলে দাও' চাকো বললো, 'শান্ত থাকো, ওরা আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।'

'তুমি কেন ওদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছোনা কমরেড ?' আম্মু জিজ্ঞেস করলো চাকোকে। 'আমি গাড়ি চালাতে পারবো।'

চাকো কিছু বললো না। তার চোয়ালের নিচে জমে থাকা আর একটা পেশির দলা একটু শক্ত হলো। সে তার সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো আর জানালা তুলে দিলো।

চাকো ছিলো স্বঘোষিত মার্কসবাদী। সে তার কারখানার সুন্দরী মেয়ে মজুরদের তার ঘরে ডেকে এনে শ্রমিক অধিকার আর ট্রেড ইউনিয়ন আইনের ওপর বক্তৃতা দেওয়ার ছুতোয় তাদের সঙ্গে ফস্টিনষ্টি করতো, যখন তখন। চাকো তাদেরকে বলতো কমরেড, তারাও যাতে চাকোকে কমরেড বলে সে জন্য জোরাজুরি করতো (ওতে তারা খুব মজা পেতো আর খিলখিল করে হাসতো)। তাদের বিহ্বলতা আর মামাচির আতঙ্কের মধ্যেও সে তাদেরকে বাধ্য করতো তার সাথে এক টেবিলে বসে চা খেতে।

এমনকি একবার সে তাদের এক দলকে নিয়ে গিয়েছিলো আলেপ্পোতে সেখানে তারা যোগ দিয়েছিলো এক ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক ওয়ার্কশপে। তারা গিয়েছিলো বাসে, ফিরেছিলো নৌকোয়, অবশ্য ফিরে এসেছিলো খুব আনন্দেই। কাঁচের চুড়ি আর খোঁপায় ফুল গুঁজে।

আম্মু বলতো, এটা শুয়োর ধোয়ানোর মতো একটা ব্যাপার। এক ছোটলোক বখে যাওয়া রাজার '*কমরেড কমরেড*' খেলা ছাড়া আর কিছুই না। অক্সফোর্ড ফেরতা জমিদারী মেজাজের এক অবতার –যে তার ওপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল মেয়েলোকদের জোর করে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্যে।

মিছিল আরেকটু এগোতেই আম্মু তার জানালাটা উঠিয়ে দিলো। এসথা আর রাহেল তাদেরগুলোও উঠিয়ে দিলো (রাহেলেরটা উঠাতে একটু কষ্ট হয়েছিল কারণ হাতলটার কালো গোল বল্টুটা খুলে পড়ে গিয়েছিল)।

হঠাৎ করে আকাশীনীল প্লেমাউথটাকে লাগছিলো অসম্ভব রকমের কাজের, ঐ সরু ও ছোট গর্তওয়ালা রাস্তায়। যেন কোন মোটা মহিলা একটা সরু করিডোরের ভিতর দিয়ে কষ্ট করে পার হচ্ছে। যেমন বেবি কোচাম্মা চার্চে করতেন (রুটি আর মদের দিকে যাওয়ার সময়)।

'সাবধান!' বেবি কোচাম্মা বললেন, যখন মিছিলের সামনের দিকটা গাড়ির কাছে আসলো। 'চোখের দিকে তাকাবিনা। ওটাই ওদেরকে উসকে দেয়।'

তাঁর ঘাড়ের পাশে জোরে জোরে হৃদস্পন্দন পড়ছিলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে রাস্তাটা গিজগিজ করতে লাগলো হাজার হাজার মানুষে। মানুষের সমুদ্রে গাড়িগুলোকে মনে হচ্ছিলো দ্বীপের মতো। বাতাস লাল পতাকায় ছেয়ে গেল, ওগুলো নামছিলো আর উঠছিলো। যখন মিছিলকারীরা নির্ভয়ে লেভেল ক্রসিং গেটের নিচ দিয়ে পার হয়ে রেললাইনের ওপর দিয়ে ত্রস্তপায়ে চলে যাচ্ছিলো তখন মিছিলটাকে মনে হচ্ছিলো একটা লাল ঢেউ।

হাজারো কণ্ঠস্বরের মিলিত শব্দ স্থির হয়ে জমে থাকা যানজটকে ঢেকে দিয়েছিলো শব্দের ছাতার মতো।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

খোঝিলালী একতা জিন্দাবাদ'।

তারা চীৎকার করে বলে উঠলো, 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক,' 'দুনিয়ার মজদুর এক হও।' এমনকি চাকোর কাছেও আসলে এর কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ছিলো না। কেন যে কেরালাতে কমিউনিস্ট পার্টি এতোটা সফল ছিলো। যতটা ভারতের অন্য কোথাও ছিলো না, অবশ্য এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিতে হয়।

পরস্পর প্রতিযোগী কয়েকটা মতাদর্শ ছিলো। এর একটা কারণ –কেরালার জনসংখ্যার বিরাট অংশ হলো খৃস্টান। কেরালার জনসংখ্যার শতকরা কুড়ি ভাগ সিরিয়ান খৃষ্টান, যারা বিশ্বাস করতো যে তারা সেই একশ' ব্রাহ্মণের বংশধর যাদেরকে সেন্ট টমাস নামের এক পাদ্রী খৃষ্টধর্মে দিক্ষিত করেছিলেন। পুনরুত্থানের পর যখন তিনি পূর্বে ভ্রমণ করছিলেন। সাংগঠনিকভাবে এই মতবাদ বা বিতর্ক (যা ছিলো প্রাথমিক অবস্থায়) চলে আসছিলো, মার্কসবাদ ছিলো খৃষ্টধর্মের একটি সাধারণ প্রতিকল্প। ঈশ্বরের বদলে মার্কস, শয়তানের বদলে কায়েমী স্বার্থবাদী। স্বর্গের পরিবর্তে একটা শ্রেণীহীন সমাজ, চার্চের পরিবর্তে দল এবং চলার পথের গঠন ও উদ্দেশ্য থাকলো একই রকমের। একটা জটিল প্রতিযোগিতা যার শেষে একটা উপহার। যেখানে হিন্দু মানসিকতায় অনেক জটিলতার জগাখিচুড়ি ব্যাপার আছে।

এই মতাদর্শ প্রচারের অসুবিধা ছিলো এটাই যে, কেরালায় সিরিয়ান খৃষ্টানরা কমবেশি ধনী, জমিজমাওয়ালা (আচার কারখানার মালিক) জমিদার এবং তাদের জন্যে সমাজতন্ত্রে যে ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে তা মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। তারা সবসময় কংগ্রেসকে ভোট দিতো।

দ্বিতীয় কারণ, রাষ্ট্রের জনসংখ্যার অধিকাংশই শিক্ষিত। হয়তোবা কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্যেই শিক্ষার হার এতো বেশি। আসল গোপন কথাটা হলো, যে কম্যুনিজম কেরালায় প্রবেশ করেছিলো গোপনে। সংস্কারের লক্ষ্যে বিপ্লব হলেও ওটা কখনোই প্রকাশ্যে বর্ণাশ্রম প্রথায় ভোগা ও অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী সমাজের ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। মার্কসবাদীরা কাজ করেছে। জাতি-বর্ণের সীমানা না ভেঙে কখনোই তাদেরকে বিতর্কিত না করে, অন্তত সেভাবে, যাতে দৃষ্টিগোচর না হয়ে, তারা করতে চেয়েছিলো জগাখিচুড়ি বিপ্লব। উত্তেজক প্রাচ্যের মার্কসবাদের সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুত্বের মিশেল। যার মধ্যে গণতন্ত্রের একটু ছোঁয়া ছিলো।

চাকো যদিও পার্টির কার্ডধারী সদস্য ছিলো না। তবে প্রথম দিকেই দীক্ষিত হয়েছিলো এবং সেভাবেই ছিলো। কঠোর পরিশ্রমের সময়, একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে।

১৯৫৭ সালের রমরমা অবস্থার সময় সে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর নিচের দিকের ছাত্র ছিলো যখন কমিউনিস্টরা রাজ্যসভায় জয়লাভ করে এবং নেহেরু তাদেরকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। চাকোর নায়ক কমরেড ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদ (কেরালার মার্কসবাদীদের মধ্যে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র, ও উঁচু বর্ণের ব্রাহ্মণ) প্রথমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হন, বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে জয়ী কমিউনিস্ট সরকারের। হঠাৎ করে কমিউনিস্টরা নিজেদের আবিষ্কার করে এমন এক অবস্থায় যা অস্বাভাবিক ছিলো, সমালোচকদের ভাষায় অবাস্তব –যেখানে তাদের একই সাথে সরকার পরিচালনা ও বিপ্লব লালন করে যেতে হবে। সমালোচকরা বললেন অসম্ভব। এ ব্যাপারে কমরেড ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদ সেটাকে সম্ভব করার জন্যে নিজের মতবাদ তৈরি করলেন।

তাঁর প্রবন্ধ '*শান্তিপূর্ণভাবে কম্যুনিজমের বিকাশ,*' চাকো পড়েছিলো অধ্যবসায়ের সঙ্গে এবং একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে। সহজাতভাবেই তার ছিলো প্রশ্নাতীত সমর্থন। ওটার মধ্যেই বিস্তারিতভাবে লেখা ছিলো। কিভাবে কমরেড ই, এম, এস নাম্বুদ্রিপাদের সরকার চায় ভূমি-সংস্কার আইন প্রয়োগ, পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করতে, বিচার ব্যবস্থাকে উল্টে ফেলতে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল জনশত্রু কংগ্রেস সরকারের হাত ভেঙে দিতে।

দুর্ভাগ্য, বছর শেষ না হতেই 'শান্তির পথে বিকাশের শান্তিময় অংশটুকু শেষ হয়ে গেলো।'

প্রত্যেকদিন সকালে খাবার সময় একজন বিজ্ঞ পতঙ্গবিদ তাঁর তার্কিক ছেলেকে উপহাস করতেন খবর কাগজের রিপোর্টগুলো পড়ে, যেখানে লেখা থাকতো দাঙ্গা, হরতাল এবং পুলিশী নিষ্ঠুরতার ঘটনাবলী যা কেরালাকে অস্থিতিশীল করছিলো। 'তো কার্ল মার্কস' পাপাচি মুখ বাঁকিয়ে অবজ্ঞা করতেন যখনই চাকো টেবিলে আসতো। এখন আমরা এসব ছাত্রদের নিয়ে কি করবো? এইসব বোকা গুণ্ডারা আমাদের জনগনের সরকারকে উত্যক্ত করছে। আমরা কি তাদের নিশ্চিহ্ন করবো? সত্যিই ছাত্ররা আর তখন জনগণের অংশ ছিলো না?

পরের দু'বছরে রাজনৈতিক কলহটা গণ্ডগোলে পরিণত হলো, সেটাতে ইন্ধন জোগালো কংগ্রেস আর চার্চ। চাকো তার বি, এ শেষ করলো আর অক্সফোর্ডের আরো একটা ডিগ্রি আনার জন্য যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময়েই কেরালায় প্রায় গৃহযুদ্ধ বাধার উপক্রম হলো। নেহেরু কমিউনিস্ট সরকারকে বরখাস্ত করলেন এবং নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় আসলো। সেটা ছিলো ১৯৬৭ সাল। প্রথমবার ক্ষমতায় আসার প্রায় দশ বছর পরে কমরেড ই, এম, এস নাম্বুদ্রিপাদের পার্টি আবার আসলো ক্ষমতায়। এবার সম্মিলিত সরকার। দুই পার্টি

হিসাবে পুরানো পার্টি দু'টুকরো হয়েছিলো –ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সিপিআই ও সিপিআই (এম)।

পাপাচি ততদিনে মারা গেছেন, চাকোর বিয়ে ভেঙেছে। প্যারাডাইস পিকলসের বয়স সাত বছর। কেরালা তখন ভেঙে পড়েছে দুর্ভিক্ষ আর অনাবৃষ্টিতে। মানুষ মারা যাচ্ছে। খাদ্য সমস্যাকে যে কোন সরকারেরই অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে রাখতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় থাকার সময়, কমরেড ই, এম, এস নাম্বুদ্রিপাদ তাঁর *শান্তির পথে বিকাশ পরিকল্পনা* বাস্তবায়িত করার জন্যে ধরলেন সংযমী পথ। ফলে পড়লেন চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির রোষানলে। তারা তাঁকে প্রকাশ্যে দোষারোপ করলো তাঁর '*সংসদীয় সংশোধনবাদের জন্যে*' এবং তাঁকে দোষী করা হলো জনসাধারণকে ত্রাণ দেবার জন্যে –অভিযোগ করা হলো –এর ফলে জনসাধারণের বিবেচনা ক্ষমতা ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে এবং বিপ্লব থেকে তারা দূরে সরে যাচ্ছে।

পিকিং তার সহযোগিতা বন্ধ করে তা দিতে লাগলো সদ্যজাত সবচেয়ে জঙ্গী অংশ সিপিআই(এম)-এর নক্সালদের। কারণ পশ্চিমবঙ্গের নক্সালবাড়ি গ্রামে একটা সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেছিলো মার্কসবাদী বিপ্লবীরা। তারা কৃষকদের সশস্ত্র যোদ্ধায় পরিণত করলো এছাড়াও, জমি দখল, মালিকদের তাড়ানো এবং গণ আদালতে শ্রেণী শত্রুদের বিচার করতো। নক্সাল আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং প্রত্যেক কায়েমী স্বার্থবাদীর বুকে ভীতির সঞ্চার করেছিলো।

এমনিতেই শঙ্কিত কেরালার বাতাসে তারা উত্তেজনা ও ভয়ের নতুন একটা গন্ধ ছড়াতে শুরু করলো। উত্তরে শুরু হয়েছিলো হত্যা। সে বছর মে মাসে খবরের কাগজে ছাপা হলো একটা অস্পষ্ট ছবি যাতে দেখা গেলো পালঘাটের এক জমিদারকে ল্যাম্পপোস্টের সাথে বেঁধে গলাকাটা হয়েছে। তার মাথাটা পড়ে ছিলো মরদেহের পাশে, একটু ঘনকালো রঙের গর্তের মধ্যে যেটা হতে পারে জল, হতে পারে রক্তও। সাদা কালোতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো না। ভোরবেলার ধূসর আলোয়।

তার অবাক হওয়া চোখগুলো ছিলো খোলা।

কমরেড ই, এম, এস নাম্বুদ্রিপাদ ('*পালানো কুত্তা, সোভিয়েত ভাঁড়*') তাঁর পার্টি থেকে নক্সালদের বিতাড়িত করলেন এবং ক্রোধকে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বার্থে বর্ম পরালেন।

ঐ দিনের মিছিল –যা ঢেউ তুলেছিলো নীলাকাশের রঙে শোভিত প্লেমাউথের পাশ দিয়ে –সেটা ছিলো ঐ কর্মসূচীরই অংশ। এটা সংগঠিত করেছিলো ত্রিবাঙ্কুর কোচিন মার্কসবাদী শ্রমিক ইউনিয়ন। তাদের ত্রিবানদামের কমরেডরা ব্যক্তিগতভাবে সচিবালয় পর্যন্ত মিছিল করে গিয়ে জনসাধারণের দাবির স্মারকলিপি উপস্থাপন করবে সরাসরি কমরেড ই, এম, এস এর কাছে। যেন অর্কেস্ট্রার বাদকরা দরখাস্ত করছে তাদের পরিচালককে। তাদের দাবির মধ্যে ছিলো ধান চাষীরা, যাদের প্রতিদিন বাধ্য করা হয় সাড়ে এগারো ঘন্টা ক্ষেতে কাজ করতে –সকাল সাতটা

থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত –তাদেরকে দুপুরের খাওয়ার জন্যে এক ঘন্টা সময় দিতে হবে। প্রতিদিনের জন্যে মেয়ে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এক রুপি পঁচিশ পয়সা থেকে বাড়িয়ে তিন রুপী করতে হবে। পুরুষদের ক্ষেত্রে দু'রুপী পঞ্চাশ পয়সা থেকে বাড়িয়ে চার রুপী পঞ্চাশ পয়সা করতে হবে। তারা আরো দাবি করেছিলো যে অস্পৃশ্য হরিজনদেরকে আর তাদের জাতের নাম ধরে ডাকা যাবে না, আচ্চু প্রায়াণ অথবা কেলান পারাভান অথবা কুট্টান পুলায়ান কে ওভাবে না ডেকে শুধু আচ্চু অথবা কেলান অথবা কুট্টান নামে ডাকতে হবে।

'এলাচির রাজারা' 'কফির সামন্তরা' এবং 'রাবার জমিদাররা' –যাদের কেউ কেউ ছিলো বোর্ডিং স্কুলের পুরানো বন্ধু, নেমে আসতো নির্জন উঁচু বাগানগুলো থেকে এবং নাবিকদের ক্লাবে বসে ঠাণ্ডা বিয়ার খেতো। তারা তাদের চশমাগুলোকে কপালে তুলে বলতো '*একই গোলাপ অন্য নামে*' –ভিতরের বেড়ে ওঠা শংকাকে লুকানোর জন্যে তারা হাসাহাসি করতো।

সেদিনের মিছিলকারীরা ছিলো দলীয় কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক। অস্পৃশ্য ও উঁচুবর্ণের লোকরাও তাদের কাঁধে পুষে রাখা রাগ ভর্তি একটা মশাল যেটাকে নতুন করে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে। এই ক্রোধের এক দিকে ছিলো নক্সাল –এবং সেটা নতুন।

প্লেমাউথের জানালা দিয়ে রাহেল দেখতে পাচ্ছিল, যে শব্দটা তারা সবচেয়ে উঁচু স্বরে বলছিলো সেটা হলো 'জিন্দাবাদ'। এটা বলার সময় তাদের গলার রগ ফুলে উঠছিলো। যে হাতে তারা পতাকা ও ব্যানার ধরেছিলো সেগুলো মুঠো পাকানো আর শক্ত ছিলো।

প্লেমাউথের ভিতরটা ছিল শান্ত আর গরম।

বেবি কোচাম্মার ভয়টা স্যাঁতস্যাতে-আঠালো তামাক পাতার চুরুটের মতো গাড়ির মেঝেতে গুটিয়ে পড়েছিলো। ওটা ছিলো কেবল শুরু। যে ভয়টা পরের বছরগুলোতে বেড়ে তাঁকে গ্রাস করেছিলো। ভয়টা তাঁকে বাধ্য করতো তাঁর জানালা আর দরজাগুলো বন্ধ করে রাখতে। যেটার জন্যে তিনি পেয়েছিলেন দু'টো চুলের রেখা আর দু'টো মুখ। তাঁর ভয়টাও ছিল আদিকালের এবং প্রাচীন। ভয়টা আসলে ছিলো অধিকার হারানোর।

তিনি চেষ্টা করছিলেন তাঁর জানালার সবুজ বাতিগুলো গুণতে, কিন্তু মন দিতে পারছিলেন না। একটা খোলা হাত গাড়ির জানালায় বাড়ি মারলো আরেকটা পাকানো মুঠো মারলো ঘুষি।

আকাশীনীল রঙের গরম বনেটের ওপর। ওটা খুলে গেলো। প্লেমাউথটাকে মনে হচ্ছিল চিড়িয়াখানার তিনকোনা নীল একটা প্রাণীর মতো খাবার চেয়ে মুখ হাঁ করা।

একটা বনরুটি।

একটা কলা।

আর একটা দলাপাকানো ঘুষি বনেটটাকে বাড়ি মেরে সেটাকে বন্ধ করে দিলো। চাকো তার জানালাটা নামিয়ে যে লোকটা ওটা করলো তাকে বললো,

'ধন্যবাদ, *কেটো*! ভালারি ধন্যবাদ।'

'এতটা বিগলিত হয়ো না কমরেড,' আম্মু বললো, 'হঠাৎ ঘটে গেছে। ওর সাহায্য করার ইচ্ছা ছিল না। কি করে সে জানবে এই গাড়ির ভিতরে ফুরফুরে মনগুলোর একটা হলো খাঁটি মার্কসবাদী?

'আম্মু'! চাকো বললো, তার কণ্ঠস্বরে ছিল শীতলতা আর জোর করা উদাসীনতা। কোন কিছুকে খোঁচা না মেরে তোর চাঁছাছোলা উল্টোপাল্টা কথা না বলে কি থাকতে পারিস না?

নিস্তব্ধতা গাড়িটাকে ভরে ফেললো যেন জমানো স্পঞ্জ। চাঁছাছোলা কথাটাকে মনে হলো নরম মাখনের মধ্যে ছুরি চালানোর মতো। একটা কাঁপুনি দেওয়া দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সূর্যটা জ্বলজ্বল করতে লাগলো। পরিবারের এই হলো ঝামেলা। হিংসুটে ডাক্তারের মতো, তারা জানে কোথায় বাড়ি মারতে হবে।

ঠিক তখনই রাহেল ভেলুথাকে দেখতে পেলো। ভিল্লে পাপেনের ছেলে ভেলুথা। তার সবচেয়ে পছন্দের বন্ধু ভেলুথা। সাদা শার্ট আর ধুতি পরা, একটা লাল নিশান হাতে মিছিলে ভেলুথা। তার ঘাড়ের শিরাগুলো রাগে ফুলেছিলো। সে এমনিতে কখনো শার্ট পরতো না।

রাহেল তাড়াতাড়ি তার দিকের জানালা নামিয়ে ফেললো।

'ভেলুথা-ভেলুথা' সে ডাকতে লাগলো।

সে মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেলো, আর তার পতাকা হাতে নিয়ে শুনলো। অন্য রকম পরিস্থিতিতে সে শুনলো একটা পরিচিত স্বর। রাহেল গাড়ির সিটের ওপর দাঁড়িয়ে, প্লেমাউথের জানালা দিয়ে সে মাথা বের করে দিলো, দেখে মনে হচ্ছিলো যেন একটা চিলে কাঠির ভেঁপু। লাভ-ইন-টোকিও ওর মধ্যে আটকে যাওয়া এক ঝর্ণা এবং একটা হলুদ ফ্রেমের সানগ্লাস।

'ভেলুথা! *ইভিদে*! ভেলুথা।' তার ঘাড়ের শিরা ফুলে উঠলো।

সে পাশে চলে গেলো আর দ্রুত হারিয়ে গেলো তার চারপাশের রাগী ভিড়ের মধ্যে।

গাড়ির মধ্যে আম্মু তাড়াতাড়ি ঘুরে বসলো। তার চোখে ছিলো রাগ। সে রাহেলের পায়ের গুলিতে আস্তে চাপড় মারলো, ওটা ছিলো তার বাঁ দিকের একমাত্র খোলা জায়গা যেখানে চাপড় মারা যায়। পায়ের গুলি আর বাদামী পা যেগুলোতে পরা ছিল বাটার স্যান্ডেল।

আম্মু বললো, ঠিক মতো বস্!

বেবি কোচাম্মা রাহেলকে টেনে নামালেন। ও সিটের ওপর আশ্চর্য আওয়াজ করে বসে পড়ল। তার মনে হলো কোনো কিছু বুঝতে ভুল হয়েছে।

'ওটা ভেলুথাই *ছিলো*!' সে হাসিমুখে বললো, 'তার হাতে একটা পতাকা' ছিলো।

যেন পতাকাটা ছিলো তার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর এক মজার যন্ত্র। কোন বন্ধুর কাছে থাকার মতো একটা বস্তু।

আম্মু বললো, 'তুই একটা হাঁদা পুঁচকে ছুঁড়ি।'

তার হঠাৎ ভয়ানক রাগ রাহেলকে যেন গাড়ির সিটের সঙ্গে গেঁথে দিলো। রাহেল বোকা বনে গেলো। সে বুঝতে পারছিলো না আম্মু কেন এতো রাগ করলো? কি সব ব্যাপার!

'কিন্তু সেইতো *ছিলো*,' রাহেল বললো।

'চুপ কর।' আম্মু বললো।

রাহেল দেখলো আম্মুর কপালের আরও ওপরে ঘামের আভাস এবং তার চোখগুলো হয়েছে শক্ত মার্বেলের। যেমন পাপাচির ছিলো ভিয়েনার স্টুডিওর ছবিতে (পাপাচির মথ ফিসফিস করছিলো তার ছেলে-মেয়ের শিরায়!)।

বেবি কোচাম্মা রাহেলের জানালার কাঁচ তুলে দিলেন।

কয়েক বছর পরে, একটা ঝলমলে শরতের সকালে নিউইয়র্কের গ্রান্ড সেন্ট্রাল থেকে কটন হারমোনে যাওয়া রোববারের ট্রেনে রাহেলের হঠাৎ মনে পড়লো আম্মুর সেই চেহারাটা। যেন রহস্যময় লাল গুঁড়ো। যেন একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন যা একটা বইয়ের পাতা থেকে সরে গেছে আর কখনোই কোনো বাক্যের শেষে গিয়ে বসেনি।

সেই মার্বেল পাথরের মতো শক্ত আম্মুর চোখ। তার ওপরের ঠোঁট ঘামে চক্‌চক করা। এবং হঠাৎ আহত হওয়া ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতা।

এসব কি বুঝিয়েছিলো?

রোববারের ট্রেনটা ছিলো প্রায় শূন্য। রাহেলের সিটের কোনার দিকে এক মহিলা বসেছিলো তাঁর গালের চামড়াটা ছিলো ফাটা এবং গোঁফে লেগে ছিল কফ সেগুলোতে সে ছেঁড়া কাগজ মুড়িয়ে রাখছিলো। তার কোলের ওপর রাখা রোববারের কাগজের স্তূপ থেকে সে টুকরো করেছিলো। সে ছোট ছোট প্যাকেটগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলো তার সামনের খালি সিটগুলোর উপর। যেন কফের একটা দোকান তৈরি করবে। সে কাজ করে যাচ্ছিলো আর আপন মনে বিড় বিড় করছিলো শান্ত, নরম স্বরে।

স্মৃতি হয়ে ছিলো ঐ ট্রেনের মহিলাটি। অন্ধকারে পাগলের মতো সে আলমারীর জিনিসগুলো একটার পর একটা হাতড়ে বেড়াচ্ছিল এবং সবচেয়ে অদরকারিগুলো বেরিয়ে আসছিলো। চঞ্চল দৃষ্টি, একটা ফাঁকা অনুভূতি, ধোঁয়ার গন্ধ, একটা গাড়ির ওপর, এক মায়ের পাথুরে চোখ। সে ভাবলো ঠিকই মনের দিক দিয়ে স্বচ্ছ ছিলো আম্মু, নাহলে অতো বড় অন্ধকারের চাঙড়কে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলো কি করে! সবাই এখন ভুলে গেছে।

সহযাত্রীর পাগলামী রাহেলের ভালোই লাগছিলো। নিউইয়র্কের পেটের ভিতরটাকে সে চিনতে পারছিলো। পরস্পরকে না চেনার সমস্যা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো। *ধাতব টকো গন্ধ যেন সেই বাসের ইস্পাতের রড আর বাস কন্ডাক্টরের হাতের গন্ধ। একটা তরুণ যার ছিলো বুড়ো লোকের মতো মুখ।*

ট্রেনের বাইরে হাডসন নদী ঝিলমিল করছিলো। গাছগুলো ছিলো শরৎকালের লালচে বাদামী, অল্প অল্প শীত লাগছিলো।

'ঐ যে একটা স্তনবৃন্ত বাতাসে,' ল্যারি ম্যাক ক্যাসলিন রাহেলকে বললো, আর তার হাতের তালুটা রাখলো ইঙ্গিতের জন্য। প্রতিবাদীর মতো ফুটে ছিলো রাহেলের স্তনের বোঁটা। সুতির টি শার্টের ভিতর দিয়ে। সে অবাক হলো রাহেল হাসলো না বলে। রাহেল অবাক হলো এই ভেবে যে, কেন যখনই সে বাড়ির কথা মনে করতে চায় তার মনে পড়ে অন্ধকারের রং, নৌকার তেলতেলে কাঠ, পিতলের পিদিমের উপর কেঁপে কেঁপে জ্বলা অর্থহীন আলোর শিখা।

ভেলুথাই *ছিলো* ওটা।

রাহেল ঠিক চিনেছিলো। সে (রাহেল) তাকেই দেখে। সেও (ভেলুথা) তাকে দেখছিলো। সে যেকোন জায়গায় তাকে দেখলেই চিনতে পারবে। আর যদি সে শার্ট না পরতো তবে পিছন থেকেই তাকে চেনা যেত। সে তার পিঠটা চিনতো। যে পিঠ তাকে হেলান দিতে দিতো। এতো বেশি বার যে গোনা যায় না। ওটার ওপর ছিলো হালকা বাদামী জন্মদাগ, অনেকটা সরু শুকনো পাতার মতো। সে বলতো ওটা সৌভাগ্যের পাতা, ওটা নাকি সময়মতো বৃষ্টি আনে। একটা কালো পিঠের ওপর বাদামী পাতা। হেমন্ত রাতের একটা পাতা।

একটা সৌভাগ্যের পাতা কিন্তু আসলে ততটা সৌভাগ্যের নয়।

ভেলুথার কাঠমিস্ত্রী হওয়ার কথা ছিলো না।

তার নাম ছিলো ভেলুথা, মালায়লমে –যার অর্থ দাঁড়ায় সাদা (কারণ সে খুব বেশি কালো ছিলো)। তার বাবা, ভিল্লে পাপেন, পারাভান ছিলো। একটা মদের জালা। তার একটা চোখ ছিল কাঁচের। একবার একটা গ্রানাইট টুকরাকে হাতুড়ি দিয়ে খোদাই করতে গিয়ে একটা পাথর কুচি তার বাঁ চোখে উড়ে গিয়ে পড়েছিলো আর চোখটাকে মাঝখান থেকে দু'টুকরো করে দিয়েছিলো।

ভেলুথা তার বাবা ভিল্লে পাপেনের সঙ্গে আসতো ছোটবেলায় এইমেনেমের বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে, উঠোনের গাছ থেকে পাড়া নারকেল কুড়িয়ে দিতে। পাপাচি পারাভানদের বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দিতেন না। কেউই দিতো না। তারা উঁচুজাতের বাড়ির কোনো জিনিস ছুঁতে পারতো না। ছোট জাতের হিন্দু আর ছোট জাতের খৃষ্টান। মামাচি রাহেল আর এসথাকে বলেছিলেন, তাঁর মনে পড়ে এক সময় তাঁর 'ছোট বেলায়' যখন সবাই ভয় পেতো পারাভানরা পিছন দিকে হানা দিয়ে ঢুকবে হাতে ঝাড়ু নিয়ে এবং তাদের পদচিহ্ন মুছে যেতে থাকবে, তখন যেন ব্রাহ্মণ বা সিরিয়ান খৃষ্টানরা ভুল করে সেগুলোর উপর পা ফেলে নিজেদের অপবিত্র না করে ফেলে। মামাচির সময় পারাভানদের, অন্যান্য অস্পৃশ্যদের মতোই জনসাধারণের রাস্তা ব্যবহারের অনুমতি ছিলো না, শরীরের ওপরটা ঢেকে রাখার কিংবা ছাতা

ব্যবহারেরও অনুমতি ছিলো না। তাদেরকে কথা বলতে হতো মুখের ওপর হাত রেখে যাতে যাদের সাথে কথা বলছে তারা তাদের দূষিত মুখের গন্ধ না পায়।

যখন বৃটিশরা মালাবারে আসলো, এক দল পারাভান পেলায়া ও পুলায়া (তাদের মধ্যে ছিলো ভেলুথার দাদা, কেলান) খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলো এবং এ্যাঙলো চার্চে যোগ দিলো, অস্পৃশ্যতার অপরাধ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে। অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে তারা পেলো সামান্য খাবার আর টাকা। তাদেরকে বলা হতো চাল খৃষ্টান, এটা বুঝতে তাদের বেশি দেরি হলো না যে তারা গরম কড়াই থেকে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে। তাদেরকে বাধ্য করা হলো আলাদা চার্চ গ্রহণ করতো, আলাদা পেশা, আলাদা যাজক। বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের দেওয়া হলো আলাদা উচ্চপদের খৃষ্টীয় যাজক। স্বাধীনতা লাভের পর তারা দেখলো তাদের সরকারী সুবিধা লাভের আশা ব্যর্থ, যেমন চাকরির নিশ্চয়তা, কমসুদে ব্যাংক ঋণ, কেননা অফিসের বিধি নিষেধ ছিলো, তারা খৃষ্টান তাই তাদের কোন জাত নেই। ব্যাপারটা ছিলো ঝাড়ু ছাড়াই পায়ের ছাপ মোছার মতো। অথবা আরও খারাপ, আদৌ পা ফেলারই অনুমতি ছিলো না।

মামাচিই প্রথম এবং প্রধান পতঙ্গবিদ হিসাবে দিল্লী থেকে ছুটিতে এসে লক্ষ্য করলেন হাতের কাজে ভেলুথার আশ্চর্য দক্ষতা। ভেলুথা তখন ছিলো এগারো বছরের, আম্মুর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। তাকে মনে হতো ক্ষুদে যাদুকর। সে মজার মজার খেলনা বানাতে পারতো, ছোট হাওয়াকল, ঘর্ঘর শব্দকরা খেলনা, শুকনা তালপাতার তৈরি গয়না রাখার বাক্স, সাবু গাছের কাণ্ড থেকে চেঁছে বের করতো নৌকা, কাজুবাদামের খোসা থেকে মূর্তি। সেগুলো সে নিয়ে আসতো আম্মুর জন্যে, হাতের তালুতে রেখে (যেভাবে তাকে শেখানো হয়েছিলো) যাতে আম্মুকে ওগুলো নেয়ার জন্যে তাকে স্পর্শ করতে না হয়। যদিও সে আম্মুর চেয়ে ছোট ছিলো তবুও আম্মুকে সে বলতো আম্মু কুট্টি (ছোট আম্মু)। মামাচি ভিল্লে পাপেনকে বললেন, ভেলুথাকে অস্পৃশ্যদের স্কুলে পাঠাতে, যেটা তাঁর শ্বশুর পুন্যান কুঞ্জু বানিয়েছিলেন।

ভেলুথার বয়স যখন চোদ্দ তখন জোহান ক্রেইন নামের ব্যাভারিয়া কাঠমিস্ত্রী সংঘের এক কাঠমিস্ত্রী এসেছিলেন কোট্টাইয়ামে। তিনি তিন বছর কাটিয়েছিলেন খৃষ্টান মিশন সমাজের সঙ্গে, এবং স্থানীয় কাঠমিস্ত্রীদের নিয়ে একটা কর্মশালা পরিচালনা করেছিলেন। প্রত্যেকদিন দুপুরে স্কুলের পর ভেলুথা বাসে করে কোট্টাইয়ামে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রেইনের সাথে কাজ করতো। তখন তার বয়স ষোল বছর। ভেলুথা হাইস্কুল শেষ করে ভালো কাঠমিস্ত্রী হয়ে উঠলো। তার ছিলো নিজস্ব কাঠের কাজের যন্ত্রপাতি এবং খাঁটি জার্মান নক্সা করার মতো মেধা। সে মামাচিকে কাঁঠাল কাঠ দিয়ে বানিয়ে দিলো একটা বাউহাউস খাওয়ার টেবিল, যার সঙ্গে ছিল কালো রঙের বারোটা চেয়ার এবং ঐতিহ্যবাহী ব্যাভারীয় ট্রলি। বেবি কোচাম্মার বাৎসরিক নাটকের জন্য সে বানিয়ে দিয়েছিলো একটা গদা, তারের কাঠামোর

দেবদূতের পাখা –ওগুলো খুব সহজেই বাচ্চাদের ব্যাগের মতো পিঠে আটকানো যেতো, কার্ডবোর্ড দিয়ে বানিয়েছিলো কৃত্রিম মেঘ যার মধ্যে থেকে গ্যাব্রিয়েল দেবদূত বের হতো এবং আলাদা করে খুলে রাখা যায় এরকম একটা জাবনার গামলা যেটাতে যিশু জন্ম নিতেন। যখন বেবি কোচাম্মার বাগানের দেবশিশুর মাথার রূপালী চক্রটা শুকিয়ে গিয়েছিলো তখন ডাক্তার ভেলুথা ওটার থলেটাকে সারিয়ে দিয়েছিলো।

কাঠের কাজের দক্ষতা ছাড়াও, ভেলুথা যন্ত্রপাতির ব্যাপারেও খুব পারদর্শী ছিলো। মামাচি (তাঁর অকাট্য বর্ণবাদী যুক্তি দিয়ে) প্রায়ই বলতেন, যদি ভেলুথা পারাভান না হতো তবে সে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারতো। সে ঠিক করতো রেডিও, ঘড়ি, জলের পাম্প। সে বাসার সব কলের লাইনের কাজ আর ইলেকট্রিকের ছোট খাট যন্ত্রপাতির দেখাশোনা করতো।

যখন মামাচি ঠিক করলেন পিছনের বারান্দাটা ঘিরে দেয়ার, তখন ভেলুথাই নক্সা করে তৈরি করলো টেনে দেয়া আর ভাঁজ করা যায় এমন একটা দরজার, যেটা পরে খুবই প্রচলিত হয়ে যায় এইমেনেমে। ভেলুথা কারখানার যন্ত্রপাতিগুলোকে সবচেয়ে বেশি জানতো।

যখন চাকো তার মাদ্রাজের চাকরি ছেড়ে এইমেনেমে আসলো –তার বোতলের ছিপি লাগানোর যন্ত্র 'ভারত' নিয়ে, ভেলুথাই সেটা জোড়া দিয়ে কাজের মতো করলো। ভেলুথাই দেখাশোনা করতো ফল টিনে ভরার এবং আনারস টুকরো করার অটোমেটিক যন্ত্রগুলো। ভেলুথা তেল দিয়ে জলের পাম্প আর ডিজেলে চলা জেনারেটর চালু রাখতো। ভেলুথা তৈরি করেছিলো চারদিকে অ্যালুমিনিয়াম পাত দিয়ে খুব সহজে পরিষ্কার করার মতো মসৃণ ফল কাটার যন্ত্র আর অল্প উঁচু ফল সিদ্ধ করার জন্যে বড় চুলো।

ভেলুথার বাবা, ভিল্লে পাপেন, অবশ্য ছিলো পুরনো যুগের পারাভান। তার দেখা ছিলো পুরনো হামা-দেয়া দিনগুলো এবং তার প্রতি এতকিছু করার জন্য মামাচি ও তার পরিবারের প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধ ছিলো ফুলে ওঠা নদীর মতো চওড়া আর গভীর। যখন পাথর কুচির কারখানায় তার দুর্ঘটনা ঘটে, মামাচি তার কাঁচের চোখের জন্য টাকা যোগাড় করে দিয়েছিলেন। তার মনে হতো যে সে ঋন এখনো শোধ করতে পারেনি। যদিও সে জানতো তাকে সেটা শোধ করতে হবে না, সে কখনো শোধ করতে পারবেও না –সে মনে করতো চোখটা তার নিজের নয়। তার কৃতজ্ঞতা তার হাসিটাকে লম্বা করেছিলো আর তার পিঠটাকে বাঁকা করে ফেলেছিলো।

ভিল্লে পাপেনের ভয় হতো তার ছোট ছেলের জন্যে। সে বলতে পারতো না কিসের ভয়! এমন কিছুর জন্যে, যে সব কথা ভেলুথা বলতো। অথবা করেছিলো। কি বলেছিলো তা নয় বরং যেভাবে সে বলেছিলো। কি করেছিলো সেটা নয় বরং যেভাবে করেছিলো সে জন্যেই।

হয়তো ওটা ছিলো শুধুই একটা দ্বিধার ব্যাপার। একটা না রাখা প্রতিশ্রুতি। তার হাঁটার ভঙ্গি। মাথা উঁচু করে রাখার ভঙ্গি। অযাচিত সরল উপদেশ দেয়ার প্রবণতা।

অথবা কারো উপদেশকে সে যেমন শান্তভাবে উপেক্ষা করতো কিন্তু তা বিদ্রোহের মতো হতো না।

যদিও এইসব গুণগুলো উঁচু জাতের জন্যে নিখুঁতভাবে গ্রহণযোগ্য হয়তোবা কাম্যও, ভিল্লে পাপেন মনে করতো ওগুলো কোন পারাভানের মধ্যে (হতেই হবে, আসলেই ঠিক) থাকলে সেটা ঔদ্ধত্য বলেই ধরতে হবে।

ভিল্লে পাপেন ভেলুথাকে সতর্ক করতে চেয়েছিলো। কিন্তু যেহেতু সে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারেনি কি তাকে অস্বস্তিতে ভোগাচ্ছিলো, ভেলুথা তার গোলমেলে পাকানো দুশ্চিন্তাকে ঠিকমতো ধরতে পারলোনা। তার কাছে মনে হলো যে তার বাবা, তার অল্প দিনে কাজ শেখা আর দক্ষতাকে হিংসা করছে। ভিল্লে পাপেনের স্বভাব খুব তাড়াতাড়ি হয়ে উঠলো বকবকানির আর ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বাধানোর। তার মায়ের আতংকের মধ্যে ভেলুথা বাড়ি যাওয়া বন্ধ করলো। সে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতো। নদী থেকে মাছ ধরে সেটা খোলা আগুনে রান্না করতো। নদীর পাড়ে খোলা আকাশের নিচে।

তারপর একদিন উধাও হয়ে গেলো। চার বছর কেউ জানতোনা সে ছিলো কোথায়! গুজব ছিলো যে ত্রিবান্দ্রামের সমাজকল্যাণ ও গৃহায়ন দপ্তরের একটা নির্মাণ অঞ্চলে সে কাজ করতো। তবে ইদানীং একটা গুজব শোনা যাচ্ছিলো যে, সে নক্সাল হয়ে গেছে। সে জেল খেটেছে। কেউ কেউ তাকে কুইলনে দেখেছে বলে বলতো।

তাকে খুঁজে পাওয়া কোনভাবেই সম্ভব হলো না, যখন তার মা, চেল্লা, যক্ষ্মা রোগে মারা গেলো। যখন তার বড় ভাই কুট্টাপেন নারকেল গাছ থেকে পড়ে তার মেরুদণ্ড ভাঙলো। সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে কাজ করার শক্তি হারিয়ে ফেললো। ভেলুথা এসব দুর্ঘটনার কথা শুনেছিলো ঘটনার প্রায় এক বছর পর।

তার এইমেনেমে ফেরার পর মাস পাঁচেক হয়ে গেলো। কিন্তু সে কখনো বলতো না এতদিন কোথায় ছিলো আর কি করেছে।

মামাচি ভেলুথাকে আবার কারখানায় কাঠমিস্ত্রীর আর সব যন্ত্রপাতি দেখাশোনার ভার দিলেন। ঘটনাটা কারখানার অন্যান্য উঁচুবর্ণের শ্রমিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। কারণ, তাদের মতে, পারাভানদের কাঠমিস্ত্রী হওয়ার কথা নয়। এবং অবশ্যই উড়নচণ্ডী পারাভানদের ফিরে কাজ দেওয়াও উচিত নয়।

অন্যদের খুশি রাখতে, এবং যেহেতু মামাচি জানতেন অন্য কেউ তাকে কাঠমিস্ত্রী হিসাবে কাজ দেবে না, মামাচি ভেলুথাকে এমন পারিশ্রমিক দিতেন যা ছিলো উঁচু বর্ণের কাঠমিস্ত্রীদের চেয়ে কম, কিন্তু পারাভানের তুলনায় বেশি। মামাচি তাকে বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করতেন (অবশ্য বাড়ির ভিতরের কোন কিছু ঠিক করা অথবা ভোজের সময়ের কথা আলাদা)। তিনি মনে করতেন যে ভেলুথার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাকে কারখানার ভিতরে থাকার এবং উঁচুজাতের লোকদের ব্যবহারের জিনিসগুলো স্পর্শ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে। তিনি বলতেন কোন পারাভানের জন্য এ অনেক পাওয়া।

যখন সে এইমেনেমে ফিরে আসলো বাড়ি থেকে কয়েক বছর দূরে থাকার পর, ভেলুথার কাজের তখনও সেই একই গতি। সেই একই নিশ্চিন্ত ভাব। ভিল্লে পাপেন তখন তাকে আগের চেয়ে বেশি ভয় পেতে শুরু করলো। কিন্তু এবার সে শান্তি নষ্ট করলো না। এবার কিছু বললো না।

অন্তত যতক্ষণ না সন্ত্রাস তাকে উত্তেজিত করেছিলো। যতক্ষণ না সে দেখলো, রাতের পর রাত, একটা ছোট নৌকা নদীর উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। যতক্ষণ না সে ওটাকে ভোরে ফিরে আসতে দেখলো। যতক্ষণ না সে দেখলো তার অস্পৃশ্য ছেলে কি স্পর্শ করেছে! স্পর্শের চেয়ে বেশি কিছু।

ভিতরে ঢুকেছে।

ভালোবেসেছে।

যখন সন্ত্রাস তাকে কব্জা করলো, ভিল্লে পাপেন মামাচির কাছে গেলো। সে তার বন্ধক দেয়া চোখ দিয়ে সোজাসুজি তাকালো। সে নিজেরটা দিয়ে কাঁদলো। একটা গাল চোখের পানিতে চক-চক করছিলো। আরেকটা শুকনো। সে তার নিজের মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাচ্ছিল যতক্ষন না মামাচি তাকে থামতে বললেন। শরীরের কাঁপুনি দেখে মনে হচ্ছিল তার ম্যালেরিয়া হয়েছে। মামাচি তাকে থামতে বললেও সে থামতে পারছিলো না, কারণ কেউ ভয়কে তাড়িয়ে দিতে পারে না। এমনকি কোনও পারাভানের ভয়কেও না। ভিল্লে পাপেন মামাচিকে বললো যা সে দেখেছে। সে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইলো একটা রাক্ষসের জন্ম দেওয়ার জন্যে। সে প্রস্তাব করলো খালি হাতে তার ছেলেকে হত্যা করার। যেটা সে সৃষ্টি করেছিলো সেটা ধ্বংস করার অনুমতি চাইলো।

পাশের ঘরে বেবি কোচাম্মা শব্দ পেয়ে দেখতে গেলেন কি জন্যে এতো হট্টগোল হচ্ছে। তিনি দেখতে পেলেন দুঃখ আর সমস্যা সামনে: এবং গোপনে –তাঁর মনের গহীনে, সাংঘাতিক উল্লসিত হলেন।

তিনি বললেন (অন্যান্য কথার সাথে) *'ও কি করে গন্ধটা সহ্য করলো? তুমি কি লক্ষ্য করোনি, ওদের একটা অন্যরকম গন্ধ আছে, এইসব পারাভানদের?'*

এবং তিনি নাটকীয়ভাবে নিজেকে কল্পনা করলেন, যেন একটা বাচ্চাকে জোর করে পালং শাক খাওয়ানো হচ্ছে। তিনি কোন পারাভানের গন্ধের চেয়ে এক আইরিশ যাজককে পছন্দ করছিলেন।

এত দূর! এত দূর পর্যন্ত।

•

ভেলুথা, ভিল্লে পাপেন আর কুট্টাপেন একটা ছোট লাল মাটির কুঁড়ে ঘরে থাকতো, এইমেনেমের বাড়ি থেকে নদীর পথে একটু ভাটির দিকে। নারকেল গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে তিন মিনিটের দৌড়ের পথ এসথা আর রাহেলের জন্যে। ওরা কেবল মাত্র পৌঁছেছে এইমেনেমে আম্মুর সঙ্গে এবং ভেলুথাকে মনে করতে পারছিলো যে সে কেমন দেখতে ছিলো –যাওয়ার সময়, তখন ওরা খুব ছোট ছিলো। কিন্তু তার

ফিরে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই ওদের সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। ওদের বারণ ছিলো ভেলুথার বাড়িতে যাওয়া। কিন্তু ওরা যেতো। তার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতো তাদের শরীরের নিচের অংশে ভর দিয়ে –শরীরের নিচের অংশ কথাটার সাথে একটা বিস্ময়ের চিহ্ন আর কারণ তারা বসে থাকতো জমিয়ে রাখা কাঠের ছিলকার ওপর এবং ভেবে অবাক হতো যে কিভাবে সে আগে থেকেই জানতো যে কোন্ কাঠের টুকরোর ভিতর কি ধরনের মসৃণ সব মূর্তি অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। ওরা খুব পছন্দ করতো দেখতে যে ভেলুথার হাতে পড়লে কাঠ কি সুন্দর নরম ও নমনীয় হয়ে যায় অনেকটা কাঁচের জিনিসপত্র তৈরির কিংবা প্লাস্টিকের নরম জিনিসের মতো। ভেলুথা তাদেরকে শেখাতো র‍্যাঁদা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। তার বাড়ি (এক উজ্জ্বল দিনে) থেকে গন্ধ আসতো কাঁচা কাঠের ছিলকা ও সুঁটির আর তেঁতুল দিয়ে রান্না করা লাল রঙের মাছের তরকারীর। এসথার মতে তা ছিলো জগতের সবচেয়ে মজার মাছের তরকারী।

ভেলুথাই এসথা আর রাহেলকে তাদের সবচেয়ে ভাগ্যবান মাছ ধরার ছিপ বানিয়ে দিয়েছিলো আর তাদেরকে শিখিয়েছিলো মাছ ধরা।

আর ঐ পরিষ্কার নীলাকাশের ডিসেম্বরের দিন, সেই ভেলুথাকেই, সে দেখেছিলো তার লাল সানগ্লাসের মধ্যে দিয়ে, কোচিনের বাইরে একটা লেভেল ক্রসিংয়ে লাল পতাকা হাতে মিছিল করতে।

পুলিশের ইস্পাত-তীক্ষ্ণ? বাঁশির শব্দ যেন ফুঁড়ে ফেলেছিলো শব্দের ছাতাটাকে। ছাতার চিড় ধরা গর্তগুলোর ভিতর দিয়ে রাহেল দেখতে পাচ্ছিলো লাল আকাশের টুকরো। আর লাল আকাশে তপ্ত লাল চিলগুলো উড়ছিলো, খুঁজছিলো ইঁদুর। তাদের নিমিলীত হলুদ চোখে ভাসছিলো একটা রাস্তা আর তার ওপর দিয়ে লাল পতাকাগুলো মিছিল করে চলছিলো। চলছিলো একটা কালো পিঠের ওপর একটা সাদা শার্ট যার ওপর ছিলো একটা জন্মদাগ।

মিছিল করে চলছিলো।

ভয়, ঘাম ও ট্যালকম পাউডার মিলে একটা আঠালো লেইয়ের মতো হয়ে গিয়েছিলো বেবি কোচাম্মার ঘাড়ের চর্বির বলিরেখাগুলোতে। থুথু ঘন হয়ে সাদা দলা জমেছিলো তাঁর ঠোঁটের কোণায়। তাঁর ধারণা তিনি মিছিলের মধ্যে একটা লোককে দেখেছেন রাজনের মতো, যার ছবি নক্সালদের খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিলো এ' ওজব ছিলো যে পালঘাট থেকে সে দক্ষিণে চলে গেছে। তাঁর ধারণা হলো সে তাঁর দিকে সরাসরি তাকিয়েছিলো।

লাল পতাকা হাতে একটা মানুষ এবং গিঁঠের মতো একটা মুখ, যেটা রাহেলের দরজাটা খুলে ফেললো কারণ ওটা লক করা ছিলো না। দরজার বাইরে রাস্তায় ছিলো মানুষে ভর্তি ওরা দেখার জন্যে থেমেছিলো।

'গরম লাগছে তোমার, বাবু?' দড়ির গিঁঠের মতো মানুষটা রাহেলকে নরম গলায় প্রশ্ন করলো মালায়লম ভাষায়। তারপর কর্কশস্বরে বললো, 'তোমার বাবাকে বলো তোমাকে একটা এয়ারকন্ডিশনার কিনে দিতে।' সে খোঁচা মারার ভঙ্গিতে চিৎকার

করলো খুশিতে তার নিজের বুদ্ধি ও সময় জ্ঞানের জন্যে। রাহেল তার দিকে তাকিয়ে হাসলো, খুশি হলো ভুল করে চাকোকে তার বাবা মনে করাতে। একটা স্বাভাবিক পরিবারের মতো।

'কোনো উত্তর দিসনা!' বেবি কোচাম্মা ভাঙাস্বরে ফিসফিস করে বললেন। 'নিচের দিকে তাকিয়ে থাক্! একদম নিচের দিকে তাকিয়ে থাক্!'

পতাকাওয়ালা লোকটা তার দিকে তাকালো। রাহেল গাড়ির মেঝের দিকে তাকিয়েছিলো। যেন লাজুক ভীতু বউ যাকে অপরিচিতি কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছে।

'কি খবর, বোন?' লোকটা সাবধানী ইংরেজিতে বললো, 'আপনার নামটা বলবেন দয়া করে?'

বেবি কোচাম্মা যখন জবাব দিলেন না, তিনি তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকালেন।

'ওনার কোন নাম নেই।'

'মোড়ালালী মারিয়াকুট্টি হলে কেমন হয়?' একজন খিল-খিল হাসতে হাসতে বললো, মোড়ালালী শব্দটার মানে মালায়লামে 'জমিদার'।

'এ, বি, সি, ডি, এক্স, ওয়াই, জেড,' অন্য কেউ বলতো, বেয়াড়া।

আরো ছাত্র ঘিরে ফেললো। তাদের সবার মাথায় রুমাল অথবা বম্বে ডাইংয়ের ছোট তোয়ালে বাঁধা, রোদের তাপ ঠেকানোর জন্য। তাদের মনে হচ্ছিল সিনেমার এক্সট্রাদের মতো যারা পথভ্রষ্ট হয়েছিলে মালায়লাম অনুবাদের '*সিন্দাবাদের শেষ অভিযান*'-এর মঞ্চ থেকে।

গিঁঠের মতো মানুষটা বেবি কোচাম্মাকে তার লাল পতাকাটা দিয়ে দিলো। 'এই যে,' সে বললো 'এটা ধরুন।'

বেবি কোচাম্মা ধরলেন, কিন্তু তখনো ছেলেটার দিকে তাকাচ্ছিলেন না।

ছেলেটা আদেশ দিলো 'নাড়ান।'

তাঁর ওটা করা ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। পতাকাটা থেকে নতুন কাপড় আর দোকানের গন্ধ বের হচ্ছিলো। কোঁকড়ানো ও ধূলিময়। তিনি পতাকাটাকে নাড়াতে চেষ্টা করলেন এমনভাবে যেন তিনি ওটাকে নাড়াচ্ছেন না।

'এখন বলুন *ইনকিলাব জিন্দাবাদ*'।

'*ইনকিলাব জিন্দাবাদ,*' বেবি কোচাম্মা ফিসফিস করে বললেন,

'লক্ষী মেয়ে।'

জনসমুদ্র থেকে হাসির একটা হর্‌রা উঠলো। একটা তীক্ষ্ম বাঁশীর আওয়াজ পাওয়া গেলো।

'তাহলে আসি,' লোকটা বেবি কোচাম্মাকে ইংরেজিতে এমনভাবে বললো যেন তারা সফল একটা ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন করতে পেরেছে। 'বিদায়!'

লোকটা আকাশীনীল রঙের দরজাটা জোরে লাগালো। বেবি কোচাম্মা কেঁপে উঠলেন। গাড়ির চারদিকে ভীড় করে থাকা লোকজন জমাট বাঁধা থেকে খুলে গিয়ে আবার মিছিল করতে করতে চলে গেলো।

বেবি কোচাম্মা লাল পতাকাটাকে গুটিয়ে পিছনের সিটের সরু তাকে রেখে দিলেন। আর জপমালাটা রাখলেন তাঁর ব্লাউজের মধ্যে স্তনের ভাঁজে। তারপর দ্রুত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এটাসেটা নিয়ে –চেষ্টা করছিলেন হারানো সম্মানের কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার করতে।

শেষের অল্প ক'জন মানুষ পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পর চাকো বললো, 'ঠিক আছে এখন সবাই জানালাগুলো নামিয়ে ফেলতে পারো।'

চাকো রাহেলকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই কি ঠিক চিনেছিস ওটা ভেলুথা?'

'কে?' রাহেল হঠাৎ সতর্ক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'তুই কি ঠিক চিনেছিলি ওটা ভেলুথাই?'

'হুমম... ?' রাহেল বললো, সে সময় নিতে চাইছিল এসথার প্রচণ্ডভাবে প্রেরিত চিন্তার সংকেতগুলোর রহস্য উদ্ধারের জন্য।

'আমি বলছি, তুই কি ঠিক জানিস যে লোকটাকে তুই দেখেছিস সেটা ভেলুথা? চাকো তৃতীয়বারের মতো বললো।'

'মম্... নন্না হ্যা ... ন্ ... না প্রায়,' রাহেল বললো।

চাকো জিজ্ঞেস করলো, 'প্রায় মানে, তুই কি সিওর এ ব্যাপারে?'

'না...লোকটা প্রায় ভেলুথার মতো,' রাহেল বললো। 'প্রায় তার মতো দেখতে ...'

'তো তুই তাহলে সিওর *না*?'

'প্রায় না।' রাহেল এসথার দিকে তাকালো সমর্থন চেয়ে।

'ওই ছিল,' বেবি কোচাম্মা বললেন। ত্রিবান্দ্রামে যাওয়ার পর থেকে ও এরকম হয়ে গেছে। ওরা সবাই ওখানে যায় আর ফিরে এসে মনে করে ওরা বড় বড় রাজনীতিবিদ হয়ে গেছে।

তাঁর ঐ রকম দূরদৃষ্টি মনে হলো না কাউকে প্রভাবিত করলো।

'আমাদের উচিত ওর দিকে খেয়াল রাখা,' বেবি কোচাম্মা বললেন। 'যদি কারখানার ভিতরে এই ইউনিয়ন ব্যাপারটা শুরু করে...আমি অবশ্য কিছু আলামত দেখতে পেয়েছি, কিছুটা উগ্রতা, কিছুটা অকৃতজ্ঞতা...আরেকদিন আমার গাছের গোড়ার পাথরগুলো সাজাতে সাহায্য করতে বললাম আর ও।'

'আমরা রওয়ানা হওয়ার আগে ভেলুথাকে আমি বাড়িতে দেখেছি,' এসথা জোর দিয়ে বললো। 'তাহলে কিভাবে সে হয়?'

'তার নিজের জন্যে,' বেবি কোচাম্মা বললেন, বিড় বিড় করে 'আমার মনে হয় ওটা ভেলুথা ছিলো না'। 'আর এসথাপ্পেন এর পরে আর কথার মাঝখানে কথা বলবিনা।'

বেবি কোচাম্মা অসন্তুষ্ট হলেন কারণ কেউ তাঁকে প্রশ্ন করলো না গাছের গোড়ার পাথর সাজানোর ব্যাপারটা কি?

পরের দিনগুলোতে বেবি কোচাম্মা লোকজনের মধ্যে অপমানিত হওয়ার ফলে তৈরি হওয়া সব রাগ একসাথে জড়ো করে, ভেলুথাকে দায়ী করলেন। তিনি ওটাকে

পেন্সিলের মতো চোখা করে তুললেন। তাঁর মনে হচ্ছিল ভেলুথাই মিছিলটার নেতা ছিলো। ঐ লোকটা যে তাকে মার্কসবাদী পতাকা নাড়াতে বাধ্য করেছিলো। আর ঐ লোকটা যে তার নাম দিয়েছিলো মোড়ালালী মারিয়াকুট্টি। এবং সব লোকজন যারা তাকে দেখে হেসেছিলো এ সবই হয়েছিলো ভেলুথার জন্যে।

তাকে তিনি ঘৃণা করতে শুরু করলেন।

আম্মু যেভাবে তার মাথাটা ধরেছিলো, তাতে রাহেল নিশ্চিত ছিলো যে সে তখনো রেগেছিলো। রাহেল তার ঘড়ির দিকে তাকালো। দু'টো বাজতে দশ মিনিট বাকি। তখনও কোনো ট্রেন আসেনি। সে তার থুতনিটা রাখলো জানালার চৌকাঠের ওপর। রাহেল অনুভব করছিলো ধূসর চাদরের মতো অনুভূতিটা। জানালার কাঁচের নিচে থাকা নরম রাবার তার থুতনির চামড়ায় চাপ দিচ্ছিলো। রাহেল সানগ্লাসটা খুলে ফেললো রাস্তার ওপর চটকে পড়ে থাকা মরা ব্যাঙটাকে ভালোভাবে দেখার জন্যে। ব্যাঙটা এতোটাই মরা আর এ্যাস্তো চ্যাপ্টা ছিলো যে ওটাকে দেখে একটা ব্যাঙের চেয়ে মনে হচ্ছিলো ব্যাঙের ছায়ার মতো। রাহেল কল্পনা করলো যদি মিস মিটেন চ্যাপ্টা হয়ে মিস মিটেন মাপের একটা দাগের মতো হয়ে যেতেন ঐ দুধের ট্রাকটার নিচে পড়ে, যেটা তাঁকে চাপা দিয়েছিলো।

পৃথিবীতে কালো বিড়াল বলে কিছু নেই, ভিল্লে পাপেন যমজদের বলেছিলো আস্তিকের আত্মবিশ্বাস নিয়ে। সে বলেছিলো পৃথিবীতে আছে কেবল কালো বিড়ালের মাপের গর্ত।

রাস্তার ওপর অনেক দাগ।

চ্যাপ্টা হওয়া মিস মিটেনের মাপের দাগ পৃথিবীতে।

চ্যাপ্টা হওয়া ব্যাঙের মাপের দাগ পৃথিবীতে।

চ্যাপ্টা হওয়া কাকগুলো চ্যাপ্টা হওয়া ব্যাঙ-মাপের দাগগুলোকে পৃথিবী থেকে লোপাট করতে চেয়েছিলো দাগ ছিলো তাদেরও।

চ্যাপ্টা হওয়া কুকুরগুলো পৃথিবীর চ্যাপ্টা হওয়া কাকের দাগগুলো খেয়ে ফেলেছিলো।

পালক। আম। থুথু।

কোচিন পর্যন্ত সারা রাস্তায়।

সূর্যটা প্লেমাউথের জানালা দিয়ে ঠিক রাহেলের ওপর পড়ছিলো। সে চোখ বন্ধ করলো তারপর আবার তাকালো। এমনকি তার চোখের পাপড়ির পিছনেও আলোটা ছিলো উজ্জ্বল ও উষ্ণ। আকাশটা ছিলো কমলা রঙের, এবং নারকেল গাছগুলো ছিলো ভিনদেশী সমুদ্র থেকে আসা ফুলের মতো, পাতাগুলো নাড়াচ্ছিলো নিরাপরাধ কোন মেঘকে ধরে খাওয়ার জন্য। একটা স্বচ্ছ ফোঁটা ফোঁটা দাগওয়ালা সাপ যার জিভটা কাঁটা চামচের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল আকাশে। তারপর একটা স্বচ্ছ রোমান সৈন্য একটা ফোঁটা ফোঁটা দাগওয়ালা ঘোড়ার উপর। কমিক্সে রোমান সৈন্যদের যেটা সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার, রাহেলের মতে, সেটা হলো তারা তাদের বর্ম

আর শিরস্ত্রাণ কী পরিমাণ কষ্ট করে যে পরে –তারপর, সব কিছুর পরেও তারা পাগুলো খোলা রাখে। এর কোন মানে হয়না। আবহাওয়ার জন্যে কিংবা অন্য যে কারণেই হোক।

আম্মু তাদেরকে জুলিয়াস সিজারের গল্প বলেছিলো এবং সভার মধ্যে কিভাবে ব্রুটাস 'তাকে ছুরি মেরেছিলো সে কথা বলেছিলো, সে ছিলো তার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। এবং কিভাবে সে মেঝের উপর পড়েছিলো পিঠে ছুরিবিঁধে আর বলেছিলো "*এটটুও? ব্রুটে?* তারপর সিজার পড়ে গিয়েছিলেন।"

'এটাই এখন দেখা যাচ্ছে,' আম্মু বললো, 'তুমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারো না, মা, বাবা, ভাই, স্বামী সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। কাউকেই না।'

ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে, সে বললো (যখন ওরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো), এটা এখনো দেখবার বিষয়। সে বললো এটা এমনও হতে পারে যেমন, এসথা বড় হয়ে হতে পারে একটা পুরুষ শাসিত সমাজের আজ্ঞাবহ শুয়োর।

রাতে, এসথা চাদর গায়ে জড়িয়ে দাঁড়াতো তার বিছানার ওপর আর বলতো "*তুমিও? ব্রুটে?* –তারপর সিজার পড়ে গেলেন।" এবং বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো হাটু না মুড়ে, যেন একটা ছুরিকাহত মৃতদেহ। কচু মারিয়া, মেঝেতে মাদুর পেতে হতো, বলতো মামাচির কাছে সে নালিশ করবে।

'তোমার মাকে বলো তোমাকে তোমার বাবার বাড়ি নিয়ে যেতে,' সে বললো, 'ঐখানে তুমি যত ইচ্ছে খাট ভাঙতে পারবে। এগুলো তোমার খাট না। এটা তোমার বাড়ি না।'

এসথা মরা অবস্থা থেকে উঠে, বিছানায় দাঁড়িয়ে বলতো, '*এটটু? কচু মারিয়া?*' –তারপর এসথা পড়ে যেতো, এবং আবার মরে যেতো।

কচু মারিয়া ধরেই নিয়েছিলো যে, *তুমিও (Ettu)* কথাটা ইংরেজিতে অশালীন কিছু এবং সে অপেক্ষা করছিলো একটা সুবিধামতো সুযোগের জন্যে যাতে মামাচির কাছে এসথার নামে নালিশ করতে পারে।

পাশের গাড়ির মহিলাটার মুখে লেগে ছিল বিস্কুটের গুঁড়ো। তার স্বামী বাঁকা বিস্কুট খেলো তারপর একটা সিগারেট ধরালো। সে দু'টো লম্বা ধোঁয়া ছাড়লো নাকের ফুটো দিয়ে আর কিছুক্ষণের জন্যে তাকে মনে হলো একটা বুনো শুয়োরের মতো। মিসেস শুয়োর রাহেলকে শিশুকণ্ঠ নকল করে নাম জানতে চাইলো।

রাহেল তাকে উপেক্ষা করে থুথুর বুড়বুড়ি ফোলালো।

আম্মু তাদের থুথু দিয়ে বুড়বুড়ি বানানোকে ঘেন্না করতো। সে বললো, একাজটা তাকে তাদের বাবার কথা মনে করিয়ে দেয়। তাদের বাবা। সে বললো তাদের বাবাও এরকম থুথুর বুড়বুড়ি ফোলাতো আর পা নাচাতো। আম্মুর মতে, কেবল কেরানিরা এরকম অসভ্যতা করে, ভালো বংশের কেউ ওরকম করে না।

ভালো বংশের কেউ থুথুর বুড়বুড়ি ফোলায় না কিংবা পা নাড়ায় না অথবা গলায় ঘর্ঘর আওয়াজও করে না।

যদিও বাবা কেরানি ছিলো না, আম্মু বললো সে প্রায়ই ঐরকম করতো।

যখন তারা একা থাকতো এসথা ও রাহেল ভান করতো যেন তারা কেরানি। তারা থুথুর বুড়বুড়ি ফোলাতো পা নাচাতো আর বড় মুরগির মতো কর কর শব্দ করতো। ওরা ওদের বাবাকে মনে করতো, যাকে তারা যুদ্ধের মধ্যে চিনেছিলো। সে একবার তাদেরকে সিগারেটে টান দিতে দিয়েছিলো আবার বিরক্তও হয়েছিলো কারণ তারা ধোঁয়া টেনে ভিতরে নিয়েছিলো আর ফিল্টারটাকে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিলো।

'এটা লাল লাঠি লজেন্স না!' সে বলেছিলো, আসলেই রেগে গিয়েছিলো।

ওরা বাবার রাগ মনে করলো। আর আম্মুর। ওদের মনে আছে একদিন ওদেরকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঠেলাঠেলি হয়েছিলো, আম্মুর কাছ থেকে বাবা ও বাবার কাছ থেকে আম্মুর দিকে বিলিয়ার্ড বলের মতো। আম্মু এসথাকে ঠেলে দিলো: 'এই যে তুমি একজনকে রাখো। আমি দু'জনকে দেখাশোনা করতে পারবো না।' পরে, যখন এসথা আম্মুকে ঐ ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছিলো আম্মু তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলো, যে ওর ওরকম উদ্ভট বাজে কল্পনা করার দরকার নেই।

ওদের দেখা বাবার একমাত্র ছবিতে (একবার আম্মু ওদের দেখার অনুমতি দিয়েছিলো), সে পরেছিলো একটা সাদা শার্ট আর চশমা। তাকে মনে হচ্ছিল সুদর্শন, তুখোড় ক্রিকেটারের মতো। এক হাতে এস্থাকে ধরেছিলো কাঁধের ওপরে রেখে। এসথা হাসছিলো, তার থুতনিটা ছিলো বাবার মাথার ওপর। অন্য হাতে সে রাহেলকে তার শরীরের সাথে জাপটে ধরে রেখেছিলো। রাহেলকে মনে হচ্ছিল বদমেজাজি, তার ছোট ছোট পাদু'টো দুলছিলো। কেউ ওদের গালে লাল রঙের ফুটকি এঁকে দিয়েছিলো।

আম্মু বলেছিলো, ওদেরকে রেখে গিয়েছিলো শুধু ছবিটা তোলার জন্যে এবং তখনও সে এতো বেশি মাতাল ছিলো যে আম্মু ভয় পাচ্ছিলো হয়তো ফেলে দেবে। আম্মু বললো সে ছবির ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়েছিলো, যদি সে তাদের ফেলে দেয় তাহলে ধরার জন্যে। তবুও, এসব কথা বাদ দিলে, এসথা ও রাহেলের মনে হয়েছিলো যে ছবিটা সুন্দরই।

'তুই কি ওটা বন্ধ করবি!' এত জোরে আম্মু বললো, যে মুরালীধরন, লাফ দিয়ে পাথরের ওপর থেকে নেমে প্লেমাউথের মধ্যে উঁকি মারলো, পিছিয়ে গেলো, ভয়ে তার পা কাঁপছিলো।

'কি?' রাহেল বললো, কিন্তু সে তখনই বুঝতে পারলো কি –তার থুথুর বুড়বুড়ি। 'সরি, আম্মু।'

'সরি বললেই মরা মানুষ জ্যান্ত হয় না,' বললো এসথা।

'আরে দুর!' চাকো বললো, 'তুই ওকে হুকুম করতে পারিস না। নিজের থুথু নিয়ে ও কি করবে।'

'নিজের চরকায় তেল দাও,' আম্মু ঝাঁঝিয়ে উঠলো।

'পিছনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়,' এসথা, পণ্ডিতের মতো, চাকোর কাছে ব্যাখ্যা করলো।

রাহেল তার সানগ্লাসটা চোখে দিলো। পৃথিবীটা হয়ে গেলো রাগের রঙধরা।

'ঐ সঙের মতো চশমাটা খুলে ফেল!' আম্মু বললো।

রাহেল তার সঙের মতো চশমাটা খুলে ফেললো।

'ফ্যাসিস্ট, যেভাবে তুই ওদের সঙ্গে ব্যবহার করিস,' চাকো বললো, 'বাচ্চাদেরও কিছু অধিকার আছে, ঈশ্বরের নামে।'

'খামোখা ঈশ্বরের নামটা ব্যবহার করো না,' বেবি কোচাম্মা বললেন।

'তা আমি করছি না,' চাকো বললো। 'আমি কথাটা বলছি ভালোর জন্যেই।'

'বাচ্চাদের মহান ত্রাণকর্তা হিসাবে ভক্তি করো না!' আম্মু বললো। 'যখন কাজের কথা আসে তখন তুমি আমার বা ওদের কারুরই ধার ধারো না।'

'আমার কি তা করা উচিত?' চাকো বললো। 'ওরা কি আমার দায়িত্বে?' সে বললো, আম্মু এসথা আর রাহেল তার ঘরের পাথরের মতো।

রাহেলের পায়ের পিছন ঘামে ভিজে গেলো। ওর চামড়া গাড়ির সিটের ফোমের ঢাকনার ওপর দিয়ে পিছলে গেলো। সে ও এসথা জানতো পাথর কাকে বলে। 'বাউন্টতে বিদ্রোহ,' ছবিতে যখন মানুষগুলো সমুদ্রে মারা যাচ্ছিল, তাদেরকে সাদা চাদরে জড়িয়ে গলায় পাথর বেঁধে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছিল জলে যাতে মৃতদেহগুলো আর ভেসে না ওঠে। এসথা বুঝতে পারছিলো না যে অভিযানে বেরুনোর সময় কি করে তারা ঠিক করে রেখেছিলো কতগুলো পাথর সঙ্গে নিতে হবে।

এসথা মাথাটা ফোমের ওপর রাখলো।

চুলের ফোলানো ভাঁজ গেলো নষ্ট হয়ে।

দূর থেকে একটা দূরপাল্লার ট্রেনের গুড়গুড় আওয়াজ ব্যাঙের দাগওয়ালা রাস্তার ওপর থেকে নামতে লাগলো। মিষ্টি আলু গাছের পাতারা রেললাইনের দু'ধার থেকে দল বেঁধে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলো। *হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।*

বীনা মল-এর ভিতরের ন্যাড়া তীর্থযাত্রীরা আরেকটা ভজন গাইতে শুরু করলো।

'আমি তোমাদের বলছি, এই হিন্দুরা,' বেবি কোচাম্মা ধর্ম ভক্তি নিয়েই বললেন। '*প্রাইভেসি* নিয়ে এদের কোন ধারণা নেই।'

'ওদের আছে সিঙ আর আঁশওয়ালা চামড়া,' তীব্র শ্লেষের সঙ্গে চাকো বললো। 'আর আমি শুনেছি ওদের বাচ্চা হয় ডিম ফুটে।'

রাহেলের কপালে দুটো উঁচু জায়গা আছে যেগুলো দেখে এসথা বলতো যে সেগুলো শিঙ হয়ে যাবে। অন্তঃত একটা হবেই কারণ ও ছিলো অর্ধেক হিন্দু। রাহেল খুব তাড়াতাড়ি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারলো না ওর শিং এর কথা, কারণ ও যা এসথাও তাই।

ট্রেনটা জোরে শব্দ করে পাশ দিয়ে চলে গেলো, ঘন কালো ধোঁয়ার নিচে দিয়ে। ট্রেনটার বত্রিশটা বগী আর দরজাগুলোয় ছিলো তরুণদের ভিড় যাদের চুলের ছাঁট শিরস্ত্রাণের মতো আর যারা চলেছে পৃথিবীর প্রান্তের উদ্দেশ্যে সেই সব মানুষদের অবস্থা দেখতে যারা পতিত হয়েছিলো। তাদের মধ্যে যারা লাফ দেয়ার আগে টান টান সোজা হতে গিয়ে কিনারা থেকে নিজেরাই পড়ে গিয়েছিলো। পড়ে গিয়েছিলো নিষ্ঠুর অন্ধকারের মধ্যে, তাদের মাথার চুলের ছাঁট ভিতর থেকে বাইরে চলে আসে।

ট্রেনটা এতো দ্রুত চলে গিয়েছিলো যে ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল, সবাই এত দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছিলো এতো অল্পের জন্যে। মিষ্টি আলু গাছের পাতারা ট্রেন চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ দুলছিলো, যেন তারা একমত হয়েছে পুরোপুরি এবং কোন সন্দেহই নেই তাদের।

একটা কয়লার গুঁড়োয় ছাওয়া কম্বল নোংরা আশির্বাদের মতো নেমে এলো আর ধীরে চলতে থাকা যানবাহনগুলোর জন্যে হয়ে উঠলো দম আটকানো।

চাকো প্লেমাউথটা স্টার্ট দিলো। বেবি কোচাম্মা চেষ্টা করলেন হাসিখুশী হতে। তিনি একটা গান ধরলেন।

'সেখানে ছিলো দুঃখের মতো একটা ঢং ঢং শব্দ
হলের ঘড়িটা থেকে
এবং গির্জার ঘন্টাগুলো থেকেও
এবং চারা গাছের বেড়ে ওঠার প্রতিদানে
একটা কিম্ভুত কিমাকার
ছোট্ট পাখী
হঠাৎ গেয়ে উঠলো'

তিনি এসথা ও রাহেলের দিকে তাকালেন, অপেক্ষা করছিলেন ওরা বলবে কু-কুউ।

ওরা বললো না।

বয়ে গেলো গাড়ির বাতাস। সবুজ গাছ আর টেলিফোনের খুঁটিগুলো উড়ে গেলো জানালার পাশ দিয়ে। স্থির হয়ে বসে থাকা পাখিরা দোল খাওয়া তারের ওপর থেকে পিছলে সরে বসলো, যেন এয়ারপোর্টের দাবি না করা মালপত্র।

একটা বিষণ্ন দিনের চাঁদ বিরাট থালার মতো ঝুলে রইলো আকাশে আর ওদের সঙ্গে সঙ্গেই চললো –এতো বড় যেন একটা বিয়ার গেলা মানুষের পেট।

৩

ঢ্যাঙা লালটিন, বেঁটে মোমবাত্তি

এইমেনেমের বাড়িটাকে ঢেকে ফেলেছিলো ধুলো-ময়লা। জমে জমে এমন হয়েছিলো যে মনে হচ্ছিল কোনো মধ্যযুগীয় বর্বর সেনাবাহিনী তছনছ করে গেছে শত্রুদুর্গ। সবগুলো জানালার চৌকাঠে পুরু ধুলোর আস্তরণ জমেছিলো।

চায়ের পটগুলোতে ভন ভনে ডাঁশ, ফুলদানীতে মরা পোকামাকড়।

মেঝে চটচটে, সাদা দেওয়ালগুলো কেমন যেন ধূসর। দরজার তামার কব্জা আর হাতলগুলো ময়লায় আঠালো।

প্রায় ব্যবহার না করা প্লাগপয়েন্টগুলো ধুলোয় ভরা। বাল্বগুলোতো তেলচিটে আস্তরণ। বড় বড় তেলাপোকাগুলো শুধু চক্‌চক্ করছিলো। বেবি কোচাম্মা এসব খেয়াল করা বেশ আগেই ছেড়ে দিয়েছেন। কচু মারিয়া, যে সব দেখাশোনা করতো এখন সেও আর ওসব খেয়াল করে না।

বেবি কোচাম্মা চেয়ার হেলান দিয়ে যেখানে বসেছিলেন সেখানে ছড়িয়েছিলো পচে যাওয়া বাদামের খোসা। টেলিভিশনের চাপিয়ে দেয়া গনতন্ত্রের সুবাদে বাড়ির মালকিন ও পরিচারিকা একই বাটি থেকে বাদাম খাচ্ছিল নির্বিকারচিত্তে। কচু মারিয়া বাদামগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিলো মুখের ভিতর। বেবি কোচাম্মা বেশ কায়দা করে মুখে রেখে খাচ্ছিলেন।

"*বেষ্ট অব ডোনাহুয়ে*" অনুষ্ঠানের স্টুডিওর দর্শকরা একটা ছবির ক্লিপিং দেখছিল মনিটরে যাতে এক কালো বাসকার গাইছিলো "*সান হোয়ার ওভার দ্য রেইনবো*" গানটি এক সাবওয়ে ষ্টেশনে বসে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল গানের কথাগুলো সে বিশ্বাস করে। বেবি কোচাম্মা তার সাথে ঠোঁট মেলালেন তাঁর পাতলা গলায় কিন্তু তাঁর স্বর ভারি হয়ে এসেছিলো চিবানো বাদামে। গানের কথা শুনে তিনি হাসছিলেন। কচু মারিয়া তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলেন, যেন তিনি পাগল হয়ে গেছেন এবং বেশি বেশি করে বাদাম নিচ্ছিলেন।

বাসকার গানের চড়া জায়গায় মাথাটাকে দোলাচ্ছিলো আর মুখটা টেলিভিশনের পর্দায় গোলাপী লাগছিলো। তাকে গায়কের মতো লাগছিলো তবে তার হারানো

দাঁত ও ঝ্যালঝেলে চামড়া মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল দুঃখ আর একাকিত্বের কথা। যখনই কোন ট্রেন আসছিলো ও থামছিলো সেও গান থামাচ্ছিলো।

ষ্টুডিওতে লাইট জ্বলে উঠলে ডোনাহুয়ে পরিচয় করিয়ে দিলো লোকটির সাথে এবং যেখানে থেমেছিলো ঠিক সেখান থেকেই আবার সে গাইতে শুরু করলো চড়া গলায় (দ্য হোয়ার অব সামহোয়ার)। এরপর ফিল ডোনাহুয়ে তার হাত ধরে ধন্যবাদ বলাতে লোকটি গান থামালো।

হাততালি দিয়ে লোকটিকে সম্মান দেখানোর সময় ষ্টুডিওর দর্শকদের মনে হলো খুব আন্তরিক।

কিছুক্ষণের জন্যে হলেও লোকটিকে সুখীই মনে হচ্ছিলো, ডোনাহুয়ের গান গাওয়াটা তার স্বপ্ন ছিলো। সে কথা সে বললো তবে গানটা শেষ করতে না পারার দুঃখ ছিল, সেটা সে বুঝিয়ে দিলো, বসলো গিয়ে পিছনের একটা সিটে। স্বপ্নগুলো বড়ও হয়, ছোটও হয়।

এসথার স্কুল থেকে যখন শিক্ষাসফরে কোথাও যেত তখন যে বিহারী কুলির সাথে দেখা হতো বার বার সে বলতো স্বপ্নের কথা "বড় মানুষগুলো লালটিন সাহেব, ছোট মানুষগুলো মোমবাতি।"

বড় মানুষটা লণ্ঠন, ছোট মানুষটা চর্বির লাঠি। সে শুধরে দিয়ে বলতো *বিশাল আকারের মানুষ ঝলমলে বাড়ি আর ছোটখাটো মানুষ হলো সাবওয়ে স্টেশন।* মাস্টাররা যখন তার সাথে দর কষাকষি করতো তখন তার বাঁকা পাগুলো আরও বাঁকা লাগতো।

নিষ্ঠুর ছেলেরা তার চলন ভঙ্গি নকল করতো। "ব্রাকেটের মধ্যে বল" –বলতো তাকে।

লম্বা লম্বা ফুলে ওঠা শিরাওয়ালা ছোট্ট মানুষটি অর্ধেক মজুরিতে কিংবা তার যা প্রাপ্য তার দশ ভাগের এক ভাগেরও কম টাকায় মোট বইতে রাজী হয়ে যেতো।

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। ধূসর আকাশে মেঘ গুলো টুকরা হয়েছিলো। এসথা রান্না ঘরের দরজায় আসলো। ভেজা ঘাসগুলো চকচক করছিলো। কুকুর ছানাটা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির ফোঁটগুলোকে লাগছিলো উজ্জ্বল পুঁতির মতো। বেবি কোচাম্মা টেলিভিশন থেকে চোখ তুলে ওপরে তাকালেন।

'এই যে ও এসেছে।' তিনি রাহেলকে বললেন।

গলার স্বর উঁচু রেখেই বললেন, 'এবার দেখো ও কিছু না বলেই সোজা ওর ঘরে ঢুকে যাবে।'

কুকুর ছানাটি এ সুযোগে ঘরে ঢুকতে গেলো, কচু মেঝে চাপড়ে তালুতে আওয়াজ করে আর মুখে *হুয়া! হুপ! পোড়া পিষ্টি!* বলে তাকে থামালো।

কুকুরটার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো, নিয়মটা সে জানতো –আর ঢুকলো না ঘরে।

বেবি কোচাম্মা আবার বললেন, ও সোজা ওর ঘরে ঢুকবে, কাপড় ধোবে ওর ছুঁচিবাই আছে। কিন্তু কোনো কথা বলবেনা।

তাঁর অভিজ্ঞতা ছিলো সার্কাসের জন্তু পোষ মানানোর ওয়ার্ড্রেনের মতো, ঘাসের ওপর জন্তুটা কেমন করবে তা তিনি আগেই বলে দিতে পারেন।

এসথার চুলগুলো ভিতরের দিকে গোটানো ছিলো। ভিতরে রূপালী চামড়া দেখা যাচ্ছিল, চিকন ধারায় বৃষ্টির জল পড়ছিলো তার মুখ ও ঘাড় বেয়ে। সে ঘরে ঢুকলো। বেবি কোচাম্মা বললেন, 'দেখলি তো?'

কচু মারিয়া এই সুযোগে চ্যানেল বদল করে একটু '*প্রাইম বডিস*' দেখে নিলো, রাহেল এসথার পিছনে পিছনে ওর ঘরে ঢুকলো। একসময় ছিলো আম্মুর ঘর। ঘরটাকে গোপনেই রাখা হয়েছিলো। কিছুই কোথাও সরানো হয়নি। কোনো গুটানো চাদর বা বেখেয়ালে ছুঁড়ে ফেলা জুতো, পুরানো চেয়ারে ভেজা তোয়ালে, অথবা আর্ধেক পড়া কোনো বই ছিলোনা। মনে হচ্ছিলো হাসপাতালের কোনো ঘর, কিছুক্ষণ আগেই নার্স গুছিয়ে গেছে। মেঝে পরিষ্কার, সাদা। আলমারিটা ভালো করে বন্ধ করা, জুতোগুলো সাজানো, ময়লার পাত্রটা খালি।

এসথার যে ছুঁচিবাই ছিলো ঘরটা দেখেই তা বোঝা যেতো। এসব গোছগাছ জীবনের একটা নক্সা তৈরি করেছিলো নীরবে। পরনির্ভরশীল জীবনের টুকরোকে যেন অনিচ্ছায় হলেও পছন্দ করতো সে। জানালার পাশের দেওয়ালে ইস্ত্রির টেবিলে একটা ইস্ত্রি রাখা। এক গাদা ভাঁজ করা দলা পাকানো কাপড় ইস্ত্রি হওয়ার জন্য পড়ে আছে। ঘরটা নিঃশব্দ।

সিলিং ফ্যানের পাখাগুলোতে ভুলতে না পারা খেলনাগুলোর ভূত লেপ্টে ছিলো। যেমন একটা পাথরের গুলতি, একটা কোয়ান্টাম কোয়ালা (মিস মিটেনের কাছ থেকে পাওয়া) যার একটা চোখের মণি ঢিলে হয়ে আছে, একটা ফোলানো হাঁস (পুলিশের সিগারেটে ফুটো হয়েছে), দুটো বলপেন যেগুলোর ভিতরে লন্ডনের রাস্তার আর বাসের ছবি ভরা, ওগুলো আবার নড়াচড়া করে।

এসথা কলের মুখ খুলে প্লাষ্টিকের বালতি ভরতে লাগলো। সে বাথরুমের আবছা আলোতে কাপড় খুললো। নিজেকে ভেজা জিনসের প্যান্ট থেকে বের করে আনলো, শক্ত ও নীল এবং ওর ভিতর থেকে বের হওয়া সহজ নয়। টি শার্টটা খুললো মাথা গলিয়ে। হাত দু'টো পেশীবহুল কিন্তু রোগা তার শরীরের উপর আড়াআড়ি রাখা। দরজায় তার বোনের আওয়াজ সে পায়নি। রাহেল দেখলো ওর পেট ভেতরে ঢুকে গেলো এবং তার বুকের খাঁচা উঁচু হয়ে উঠলো যখন সে তার টি শার্টটাকে শরীর থেকে টেনে বের করলো। ভিজে চামড়ার রঙ মনে হচ্ছিল মধুর মতো। ওর মুখ, ঘাড় ও গলার নিচের ভি আকারের তিনকোণা জায়গাটিকে দেহের অন্যান্য অংশ থেকে গাঢ় মনে হচ্ছিল। তার বাহুর একই অবস্থা। শার্টের হাতার অংশটুকুও বাইরে গাঢ় ভিতরে হালকা, যেন গাঢ় বাদামী মানুষ হালকা বাদামী কাপড় পরা। চকলেটে একটু কফি রঙের আভাস। উঁচু চোয়াল, গর্তের ভিতরে চোখ। সাদা টাইল্স এর বাথরুমে কোনো জেলে ঢুকেছে যেন, চোখে তাঁর সমুদ্রের গোপন রহস্য। *সেকি তাকে দেখেছে? সে কি উম্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিলো? সে কি জানতো যে তার বোনটি ওখানে ছিলো?*

ওরা কখনোই শরীর নিয়ে লজ্জা পেতো না কিংবা তারা লজ্জা কি সেটাই উপলব্ধি করতে পারতো না। এখন ওরা যথেষ্ট বড় হয়েছে।

বয়সী।

মরার জন্যও যথেষ্ট বয়স।

'বুড়ো' শব্দটা কেমন রাহেল ভাবলো আর মনে মনে বললো, *'বুড়ো'*।

রাহেল বাথরুমের দরজায়। মাংসহীন নিতম্ব (সিজারিয়ানই হবে তোমার –মাতাল এক স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ বলেছিলো তার স্বামীকে, এক পেট্রোল পাম্পে, হাওয়া বদলাতে যাওয়ার সময় ওখানে তারা থেমেছিলো)। তার রঙ ঝলসানো টি শার্টে মানচিত্রের ওপর একটা গিরগিটির ছবি আঁকা। লম্বা সুন্দর চুলে একটু লালচে মেহেদী রঙের ছটা তার পিঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নেমেছে। নাকে হীরেটা জ্বলজ্বল করছে মাঝে মাঝে। পাতলা একটা হালকা কমলা আভার সোনার চুড়ি, সুন্দর ডিজাইনের, চিক্‌চিক্ করছিলো তার কব্জিতে। সূতানলী দু'টো সাপ ফিসফিসিয়ে কথা বলছে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে। তার মায়ের গলিয়ে ফেলা বিয়ের আংটি। সরু তিনকোণা হাতের সাথে আলতোভাবে লেগে আছে।

প্রথম দেখলে মনে হয় তার মায়ের মুখটা। উঁচু চোয়াল, হাসলে গালে গভীর টোল পড়ে। কিন্তু সে লম্বা, কঠিন, সমান এবং কিছুটা তিনকোনা লম্বাটে আম্মুর চেয়ে। যারা মেয়েদের মধ্যে কঠিন ভাব এবং কোমলতা পছন্দ করে তাদের কাছে হয়তো অসুন্দর। শুধু তার চোখগুলোই নিখুঁত সুন্দর, বড়, উজ্জ্বল, ওগুলোর মধ্যে *ডুব দিয়ে হারিয়ে যাওয়া যায়*, বলেছিলো ল্যারি ম্যাক ক্যাসলিন তার মূল্য আবিষ্কার করে।

রাহেল তার ভাইয়ের নগ্নতার মধ্যে নিজের মিল খুঁজতে লাগলো। তার হাঁটুর আকারে, তার কাঁধের ভাঁজে, যে কোনাটায় তার কনুই হাতের সাথে মিলেছে। তার পায়ের আঙুলের নখ, সুন্দর স্তনের বোঁটা, ছেলেদের নিতম্ব কখনোই বেশি ফোলা হয় না। স্কুলের বইয়ের ব্যাগ দেখলে যেমন স্মৃতি তাড়া করে সেরকম ছোটবেলার কথা মনে পড়ে রাহেলের। টিকার দাগ মনে হলো পয়সার মতো জ্বলজ্বল করছে তার উরুতে, এসথারটা হাতে।

রাহেল এমন ভাবে এসথাকে দেখছিলো যেন কোন মা উৎসুকভাবে দেখছে তার ভেজা শিশুকে। এক বোন তার ভাইকে, এক নারী এক পুরুষকে, এক যমজ আরেক যমজকে।

একসঙ্গে ও বেশ ক'টা কল্পনার ঘুড়ি ওড়ালো আকাশে।

এসথা যেন নগ্ন আগন্তুক, যার সাথে হঠাৎ করে দেখা হয়েছে। জীবনের শুরুর আগে একমাত্র যাকে সে চিনতো। যে তার মায়ের জরায়ু থেকে পৃথিবীতে আসতে তাকে পথ দেখিয়েছে।

দুই মেরুতে থাকা অসহ্য। অনেক কিছু গরমিল থাকার পরেও।

বৃষ্টির একটা ফোঁটা এসথার কানের লতিতে ঝুলছিলো। আলোতে গাঢ়, রূপালী যেন ভারী পারার ফোঁটা। রাহেল কাছে গেলো। ছুঁলো। ঝরিয়ে দিলো।

এসথা ওর দিকে তাকালো না। সে আরও কুঁকড়ে গেলো। যেন তার ক্ষমতাবান শরীর সমস্ত অনুভূতি ছিনিয়ে নিয়ে গিঁট বেঁধে, ডিমের মতো, কোন গভীরতর শূন্যতায় ছুঁড়ে দিয়েছিলো।

নিঃশব্দে সে তার কাপড় চোপড় তুলে নিয়ে স্পাইডারওম্যানের মতো সরে পড়লো।

এসথা ভেজা কাপড়গুলো বালতিতে ভরে ছোট টুকরো করে কাটা নীল সাবান দিয়ে কাচতে লাগলো।

৪

অভিলাষ টকিজ

অভিলাষ টকিজ বিজ্ঞাপন দিতো কেরালার প্রথম ৭০ মিলিমিটার সিনেমাস্কোপ স্ক্রিনওয়ালা সিনেমা হল বলে। বাড়ির পথে পড়ত ওটা। এর বিশাল, অট্টালিকার সামনের দিকটা ছিলো সিমেন্ট দিয়ে তৈরি বাঁকা সিনেমাস্কোপ স্ক্রিনের মতো। ওপরে (সিমেন্ট দিয়ে লেখা, নিওন লাইটওয়ালা) ইংরেজি আর মালায়লাম ভাষায় লেখাছিলো *অভিলাষ টকিজ*।

পোস্টারগুলোতে লেখা ছিলো, **হিজ** এবং **হারস**, আম্মু, রাহেল আর বেবি কোচাম্মার জন্যে **হারস** আর একলা এসথার জন্যে **হিজ**। কারণ চাকো গিয়েছিলো হোটেল সী কুইনে বুকিং-এর জন্যে।

'ঠিক আছিস তো?' আম্মু ব্যস্ত হয়ে বললো।

এসথা মাথা নাড়ালো।

লাল ফরমাইকার দরজা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যেত আস্তে আস্তে, আম্মুর সঙ্গে সঙ্গে গেলো রাহেল তারপর বেবি কোচাম্মা, **হারস**-এ। পিছল মার্বেলের মেঝের ওপর দিয়ে ঢেউ তুলে আম্মু এলো বেগি আর চোখা জুতোপরা একা দাঁড়িয়ে থাকা এসথার কাছে (একটা চিরুনী নিয়ে)। এসথা লবির নোংরা মার্বেলের মেঝেয় একা দাঁড়িয়েছিলো, আয়নায় দেখলো লাল দরজাটা ওর বোনকে গিলে ফেললো। তারপর সে ঘুরে **হিজ** এর দিকে হাঁটা দিলো।

হারস এর মধ্যে আম্মু রাহেলকে বলেছিলো পটের ওপর উঁচু থেকে হিসি করতে। সে বললো পাবলিক পটগুলো নোংরা। টাকার মতোই। কে কখন ধরছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। কুষ্ঠ রুগী। কসাই। গাড়ির মেকানিক (পুঁজ। রক্ষ। গ্রিজ)।

একবার কচু মারিয়া ওকে কসাইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়েছিলো। রাহেল দেখেছিলো ওদের ফেরত দেওয়া সবুজ পাঁচ রুপীর নোটে মাংসের লাল একটা কণা লেগেছিলো। কচু মারিয়া কণাটা বুড়ো আঙুল দিয়ে ঝেড়ে ফেলেছিলো। লাল রস লেগেছিলো ওটায়। টাকাটা সে তার বুকে গুঁজে রেখেছিলো বডিসের মধ্যে। মাংসের গন্ধওয়ালা রক্তের টাকা।

রাহেল ছোট বলে পটের ওপর উঁচু জায়গাটায় পা তুলে উঠতে পারছিলো না, আম্মু আর বেবি কোচাম্মা তাকে ধরে তুললো। ওর পা দু'টো ছিলো ওদের হাতের ওপর। বাটা স্যান্ডেলে পায়রার পায়ের মতো। নিকার নামিয়ে উঁচুতে। কিছুক্ষণ কিছুই হলো না। আর রাহেল তাকালো আম্মু আর নানীর দিকে, চোখে ছিলো দুষ্টুমি (এখন কি?)

'কর্' আম্মু বললো স্‌স্‌স্‌...'

সসসস শব্দটা হলো সুউ...সুউ'র মতো। মমমম যেমন *"সাউন্ড অব মাইউজিক।"*

রাহেল খিলখিল করলো। আম্মু খিলখিল করলো। বেবি কোচাম্মা খিলখিল করলেন। যখন পড়া শুরু হলো তখন তাঁরা ওর উঁচুতে বসার জায়গাটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। ও শেষ করলে আম্মু টয়লেট পেপার দিয়েছিলো।

'তুই যাবি না আমি যাব?' বেবি কোচাম্মা আম্মুকে বললেন।

'যে কেউ গেলেই হয়,' আম্মু বললো, 'তুমিই যাওনা।'

রাহেল ওঁর হ্যান্ডব্যাগটা ধরলো। বেবি কোচাম্মা তাঁর লাট খাওয়া শাড়িটা তুললেন। রাহেল দেখছিলো ওর নানীর বিশাল পা দু'টো, কয়েক বছর পরে স্কুলের ইতিহাস বইতে ওদের পড়তে হয়েছিলো –

'সম্রাট বাবরের গাত্র বর্ণ ছিলো গমের মতো আর উরু দুইটি ছিল থামের মতো।'

–তখন এই দৃশ্যটা ওর মনে পড়ে গিয়েছিলো।

বেবি কোচাম্মা পটের ওপর উঠে বসেছিলেন ধাড়ি পাখির মতো। হাঁটুর নিচে নীল শিরাগুলো টান টান হয়ে ফুলে উঠেছিলো। মোটা হাঁটুর মালইচাকিতে টোল ছিলো। লোম ছিলো। ছোট দুর্বল পাতাগুলো যে কি করে এতো ভার বইতো! বেবি কোচাম্মা এক মুহূর্তের অর্ধেক অপেক্ষা করলেন। মাথা সামনে ঝোঁকালেন। বোকা হাসি। বুক নিচে দুলছিলো। ব্লাউজের ভিতরে তরমুজ। পাছা উঁচু আর খোলা। যখন শোঁ শোঁ বুড়বুড়ির শব্দ উঠলো তখন ও চোখ দিয়ে শুনছিলো। খাঁজের মধ্যে থেকে একটা হলুদ ঝরনা বুড়বুড়ি তুলে নেমে আসছিলো।

রাহেলের এসব ভালোই লেগেছিলো। হ্যান্ডব্যাগ রাখা। সবাই সবার সামনে হিসি করা। বন্ধুর মতো। ও তখনও জানতো না, এমন অনুভূতি কতো মজার। বন্ধুর মতো। এভাবে পরে আর কখনোই ওরা একসঙ্গে হয়নি। আম্মু, বেবি কোচাম্মা আর সে।

বেবি কোচাম্মা শেষ করার পর রাহেল ওর ঘড়িটা দেখলো। 'অনেকক্ষণ লাগিয়েছো বেবি কোচাম্মা,' ও বললো 'এখন দু'টো দশ।'

রুবাডুব ডুব (রাহেল ভাবল)
তিনটে মেয়ে এক গামলায়
তারি এক লহমায় বললো ধীরে।

ও ভাবল মানুষ নিটপিটে হয়। কুরিয়েন নিটপিটে। কুট্টি নিটপিটে। মল নিটপিটে। কোচাম্মা নিটাপিটে।

নিটপিটে কুট্টি। চটপটে ভার্গিস। আর কুরিয়াকোজ। তিন ভাইয়েরই খুশকি।

আম্মু ফিসফিসিয়ে সারলো। পটের কোনায় সরে গিয়েছিলো বলে শোনা গেলো না। ওর বাবার বদমেজাজের কথা মনে পড়তেই হারিয়ে গেলো। আম্মুর চোখটাই ভেসে উঠলো। হাসলে গভীর টোল পড়ে, কখনও রাগে বলে মনে হয় না। ভেলুথার জন্যে কিংবা থুথুর ফেনা তোলার জন্যে। ব্যাপারটা ভালোই।

এসথা একাই **হিজ**-এর ভিতর ইউরিন্যালে ন্যাপথালিন বল আর সিগারেটের টুকরোর মধ্যে হিসি করতে গেলো। পটের মধ্যে করা মানে হেরে যাওয়া। ইউরিন্যালে হিসি করার মতো লম্বা ছিলো না ও। লম্বা হতে চাইলো। লম্বা খুঁজতে লাগলো আর **হিজ**-এর এক কোনায় পেয়েও গেলো। একটা নোংরা ঝাড়ু, একটা নোংরা স্কোয়াশের বোতলে দুধ সাদা তরল (ফিনাইল), কালো কালো কি যেন ভাসছিলো। নেতিয়ে পড়েছিলো একটা ঘরমোছা বুরুশ আর ছিলো জংধরা দু'টো খালি টিনের ক্যান। প্যারাডাইস পিকল্‌সের কিছুরই হবে হয়তো। আনারসের টুকরোর কিংবা সিরাপের। অথবা গোল চাকার। আনারসের চাকা। নানীর ক্যানকেই সম্মান দেখানোর কথা মনে হলো ওর। এসথা একাই খালি ক্যান দু'টো নিয়ে বসালো ইউরিন্যালের সামনে। দু'টোর ওপর দু'পা রেখে সাবধান হিসি করলো– ফেনা তুলে। পুরুষ মানুষের মতো। সিগারেটের টুকরোগুলো তখন ফুলে উঠেছিলো, পুরো ভেজা আর খুলে খুলে যাচ্ছিল। ধরানো কঠিন। শেষ করে এসথা ক্যান দু'টোকে নিয়ে গেলো বেসিনের আয়নার সামনে। হাত ধুলো, চুলে পানি লাগালো। তারপর আম্মুর চিরুনীর মতো বড় একটা চিরুনী বের করলো ওর জন্য ওটা বড়ই ছিলো। চুলে টেরিকাটলো দেখেশুনে। পিছনে আঁচড়ালো তারপর সামনে আনলো, পাশে সরালো শেষমেশ। চিরুনীটা পকেটে রেখে ক্যানের ওপর থেকে নামলো, ওগুলোকে নিয়ে রাখলো বোতল, ঘরমোছা বুরুশ আর ঝাড়ুর কাছে। ওগুলোকে ও কুর্ণিশ করলো। সব কাজের জিনসগুলোকে। বোতলগুলো, ঝাড়ু, ক্যানগুলো আর নেতিয়ে পড়ে থাকা ঘরমোছা বুরুশ।

'বাও' বলে ও হাসলো, কারণ আরও ছোট বেলায় ওর ধারণা হয়েছিলো, যখন কেউ অভিবাদন জানাবে তখন তাকে বাও বলতে হবে। তোমাকে ওটা করার জন্যে মুখে বলতে হবে। ওগুলো এসথাকে অভিবাদন জানিয়েছিলো। আর এসথাও অভিবাদন জানিয়ে বলেছিলো 'বাও' আর এই দেখে ওগুলো নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করলে এসথা লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলো।

বাইরে এসে ও অপেক্ষা করছিলো ওর মায়ের জন্যে, বোনের জন্যে আর তার ছোট নানীর জন্যে। যখন ওরা বেরিয়ে আসলো আম্মু বললো–

'ওকে, এসথাপ্পেন?'

এসথা বললো ওকে, আর সাবধানে মাথাটা নাড়ালো যাতে টোরিকাটা ফাঁপানো চুল নষ্ট না হয়।

ওকে? ওকে।

ও চিরুনীটা মা'র হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে দিলো। হঠাৎ আম্মুর গোপন স্নেহ উথলে উঠলো– তার হাসিখুশি ছোট্ট ছেলেটার জন্যে, বেগি আর চোখা জুতো পরা এখুনি যে প্রথম বড়দের মতো কাজ সেরে আসলো। সে আদরের আঙুল চালিয়ে দিলো ওর চুলের মধ্যে। ওর ফাঁপানো চুলগুলো নষ্ট করলো।

স্টিলের এভারেডি টর্চ হাতে লোকটা বললো ছবি শুরু হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি। পুরনো লাল কার্পেট মোড়া লাল সিঁড়ি দিয়ে ওরা তাড়াতাড়ি উঠলো। লাল সিঁড়ির ধাপের লাল কোণায় লাল পিকের দাগ। টর্চওয়ালা লোকটা তার মানডু গুটিয়ে বাঁ হাতে অণ্ডকোষের নিচে গুঁজে রেখেছিলো। ওঠার সময় তার পায়ের গুলিগুলো কামানের গোলার মতো ফুলে উঠছিলো। টর্চটা সে ধরেছিলো ডান হাতে। তাড়াহুড়ো করছিলো।

'অনেকক্ষণ হলো আরম্ভ হয়ে গেছে,' সে বললো।

তাই শুরুটা ওরা দেখতে পেলো না। দেখতে পেলো না বেগুনী ভেলভেটের পর্দা উঠে যাওয়া, ওতে হলুদ বেনীর মধ্যে বাতিও লাগানো ছিলো। আস্তে আস্তে উঠতো আর বাজনা বাজতো:

বেবী এ্যালিফ্যান্ট ওয়াক ফরম হাটারি কিংবা করনেল বেগিস মার্চ।

আম্মু এসথার হাত ধরেছিলো। বেবি কোচাম্মা থপ থপ করে সিঁড়ি ভাঙছিলেন, তাঁর তরমুজগুলোর ভারে ঝুলে পড়েছিলেন– সেদিকে তাঁর খেয়াল ছিলো না, ছবির দিকে তাকিয়েছিলেন। বাচ্চাদের জন্যেই এমনটা করছেন, এরকম একটা ভাব ছিলো তাঁর। তাঁর মনে সব সময়ই কিছু হিসাব থাকতো– লোকজনের জন্য কতোটা কি করবেন সে ব্যাপারে– আর কেউ কিছু তাঁর জন্যে করতো না।

ওনার পছন্দ ছিলো সকাল বেলার প্রার্থনা এবং মনে করতেন ওগুলো বিফলে যায় না। আম্মু এসথা আর রাহেলকে বুঝিয়েছিলো সব লোকই নিজেরা যা ভালো মনে করে তাকেই সবচেয়ে ভালো বলে। রাহেল বলেছিলো ওর ভালো লাগে ক্রিস্টফার পামারকে। ক্যাপ্টেন ভন ট্র্যাপের অভিনয় করেছিলেন তিনি। চাকো ওটা বুঝতে পারেনি। সে ওঁকে বলতো ক্যাপ্টেন ভন ক্ল্যাপ ট্র্যাপ।

রাহেল ওখানে ছিল অস্থির মশার মতো। উড়ছিলো। হালকা। দু'টো করে সিঁড়ি। দু'টো নিচে। একটা উপরে। বেবি কোচাম্মা একটা লাল সিঁড়ি পার হতে হতে ও পাঁচটা উঠলো।

আই'ম পাপাই দ্য সেইলর ম্যান *দাম দাম।*
অই লিভ ইন আ ক্যারাভ্যান *দাম দাম।*
অই ওপ--য়েন দ্য ডোর
এ্যাক্ষ ফল অন দ্য ফ্লোর

আই'ম পাপাই দ্য সেইলর ম্যান *দাম দাম।*

দু'টো ওপরে, দু'টো নিচে, একটা ওপরে। লাফ, লাফ।
'রাহেল' আম্মু বললো, 'এখনও তুমি পড়া করোনি, করেছো?'
রাহেল শুধু : *অভিমান সব সময় অশ্রু ঝরায়।* *দাম দাম।*

ওরা গেলো প্রিন্সেস সার্কেলের লবিতে। রিফ্রেশমেন্ট কাউন্টারের সামনে দিয়ে হেঁটে পার হলো, ওখানে অপেক্ষায় ছিলো অরেঞ্জড্রিঙ্ক। আর অপেক্ষা করছিল লেমনড্রিঙ্ক। কমলারটা বেশি কমলা লেবুরটা বেশি লেবু । চকোলেটগুলোও নরম।

প্রিন্সেস সার্কেলের ভারি দরজাটা খুলে দিলো টর্চওয়ালা লোকটা। ফ্যান ঘোরা বাদামের গন্ধওয়ালা অন্ধকার। মানুষের নিঃশ্বাস আর চুলের তেলের গন্ধও ছিলো। আর পুরনো কার্পেট। আজগুবি '*সাউন্ড অব মিউজিক*।' গন্ধটা রাহেল পেলো, মনে করে রাখলো সম্পত্তির মতো। গন্ধটা সংগীতের মতো, স্মৃতিতে থাকলো। গভীর নিঃশ্বাস নিলো আর ভবিষ্যতের জন্যে বোতলে পুরে রেখেছিলো। টিকিটগুলো ছিলো এসথার কাছে। ছোট পুরুষ মানুষ। সে থাকতো এক ক্যারাভানে। *দাম দাম।*

টর্চওয়ালা লোকটা আলো ফেললো গোলাপী টিকিটগুলোর ওপর। জে সারিতে নম্বর ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এসথা, আম্মু, রাহেল, বেবি কোচাম্মা। পা সরিয়ে জায়গা করে দেওয়া বিরক্ত লোকজনের সামনে দিয়ে ওরা নিজেদের কুঁকড়ে এগুলো। চেয়ারের সিটগুলো টেনে নামাতে হতো। বেবি কোচাম্মা রাহেলের সিটটা টেনে নামিয়ে দিলে ও বেয়ে উঠলো। ওর ওজন বেশি ছিলো না তাই ওকে নিয়েই চেয়ারটা ভাঁজ হয়ে গিয়েছিলে স্যান্ডুইচ বানানোর মতো আর ও দেখছিলো দু'হাঁটুর মাঝখান দিয়ে। এসথার বুদ্ধি ছিলো দড়, ও বসেছিলো চেয়ারের সামনের দিকে।

ঘুরন্ত ফ্যানের ছায়া পড়ছিলো স্ক্রিনে ওখানে অবশ্য ছবি ছিলো না।

দূরে টর্চের আলো। সামনে দুনিয়া কাঁপানো ছবি।

ক্যামেরা তখন অস্ট্রিয়ার আকাশী নীল (গাড়ির রঙের) আকাশকে ধরেছিলো; সঙ্গে ছিলো গীর্জার ঘণ্টার দুঃখী আওয়াজ।

অনেক নিচে মাটিতে একটা বিশাল বাড়ির প্রাঙ্গনে পাথরে বাঁধানো চাতাল চকচক করছিলো। নানরা হেঁটে যাচ্ছিলো ওর ওপর দিয়ে। ধীর গতিতে, চুরুটের মতো। নিশ্চুপ নানরা রেভারেন্ড মাদারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো, তিনি চিঠিটা কখনও পড়েননি। ওরা পিঁপড়ে ধরা টোস্টের টুকরোর মতো জড়ো হয়েছিলো। রানী

চুরুটের চার পাশে অনেক চুরুট। ওদের হাঁটুতে লোম ছিলো না। ব্লাউজের ভিতরে তরমুজ ছিলো না। পুদিনার মতো ঘ্রাণ ছিলো ওদের নিঃশ্বাসে। রেভারেন্ড মাদারকে ওরা অভিযোগ জানাচ্ছিলো। সুমধুর সুরের অভিযোগ। জুলি এ্যানড্রেসের বিরুদ্ধে ছিলো তাদের অভিযোগ, তখনও সে পাহাড়ে ছিলো আর গাইছিলো :

পাহাড় জেগে ওঠে সঙ্গীতের শব্দে
আর আবার গাইলো; দেরি করছিল যাবার জন্যে।
সে গাছে চড়লো আর হাঁটু ছড়ে গেলো

নানরা নাকি সুরে কথা বলছিল সুরে সুরে।

তার পোশাকে এক ফোঁটা অশ্রু পড়েছে
সে নাচছে সবার সঙ্গে মেলার জন্যে
আর বাঁশি ফুঁকছে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে

দর্শকরা চারিদিকে তাকালো।
শ শশ তারা বললো।
শ শশ! শশশ! শশশ!

আর তার সন্ন্যাসীনীর উড়ানীর নিচে
তার চুলগুলো ঢেউ খেলানো!

সিনেমার বাইরে থেকে একটা আওয়াজ আসছিলো। স্পষ্ট আর সত্যি, ফ্যানের ঘর-ঘর শব্দের মধ্যে দিয়ে আর বাদামের গন্ধওয়ালা আঁধারের ভিতর থেকে। দর্শকদের মধ্যে এক নান ছিলো। বোতলের ছিপির মতো টুপি আঁটা। কালো মাথার চুলগুলো হয়ে গেলো মুখ আর গোঁফ।

ঠোঁট কামড়ে রেখেছিলো মনে হচ্ছিলো হাঙ্গর।

অনেকেই কার্ডের ওপর স্টিকার পছন্দ করতো।

'শশশ' ওরা একসঙ্গে বললো।

এসথা গান গাইছিলো। চুল ফোলানো এক নান। এক এলভিস পেলভিস নান। সে থামতে পারছিলো না ওকে দেখতে পেয়ে এক দর্শক বললো 'বের করে দাও ওকে।'

চুপ করো নয় বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও নয় চুপ করো। দর্শকটি ছিলো বিরাট এক পুরুষ মানুষ। এসথা ছিলো ছোট পুরুষ মানুষ। টিকিটওয়ালা।

'এসথা ঈশ্বরের দোহাই **চুপ** কর!' আম্মু হিস হিস করে বললো। তাই এসথা **চুপ** করলো। মুখ আর গোঁফ ঘুরে গেলো। কিন্তু তখুনি জানান না দিয়ে গানটা ফিরে আসলো আর এসথা থামাতে পারলো না।

'আম্মু আমি বাইরে গিয়ে গানটা গাই?' এসথা বললো (আম্মু ধমক লাগাবার আগেই), 'গান গাওয়া হলে ফিরে আসবো।' কিন্তু মনে করিসনা আমি তোকে বাইরে থেকে নিয়ে আসবো' আম্মু বললো, তুই আমাদের *সবাইকে* বেইজ্জত করেছিস।

কিন্তু এসথার কিছু করার ছিলো না। ও উঠলো বেরুনোর জন্যে। রেগে যাওয়া আম্মুকে পার হলো। দু'হাঁটুর ভিতর দিয়ে একমনে দেখতে থাকা রাহেলকে পার হলো। বেবি কোচাম্মাকে পার হলো। ঠ্যাং লম্বা করে রাখা লোকটাকে পার হলো। এপথে ওখানে। দরজার ওপরে লাল বাতিতে জ্বলছিল **'বাহির'**। এসথা **'বাহির** হলো।'

লবিতে অপেক্ষা করছিলো অরেঞ্জড্রিঙ্ক। লেমনড্রিঙ্ক অপেক্ষায় ছিলো। গলে যাওয়া চকোলেট অপেক্ষায় ছিলো। উজ্জ্বল নীল ফোম মোড়া গাড়ির সোফা অপেক্ষা করছিলো। অপেক্ষা করছিলো **'আসিতেছে'** লেখা পোস্টারগুলো।

উজ্জ্বল নীল ফোম মোড়া সোফায় একাই বসেছিলো এসথা, অভিলাষ টকিজের প্রিন্সেস সার্কেলের লবি, আর গান গাইলো। নান এর গলায়, পরিষ্কার জলের মতো স্বচ্ছ।

তবে কেন তুমি তাকে ধরে রাখ
আর শোনাও তোমার সব কথা?

রিফ্রেশমেন্ট কাউন্টারের ওপাশের লোকটি ক'টা টুল পর পর সাজিয়ে ঘুমিয়েছিলো, বিরতির অপেক্ষায় ছিলো, জেগে উঠলো। ঘুম জড়ানো চোখে দেখলো। বেগি আর চোখা জুতো পরা এসথাকে। আর ওর এলোমেলো হওয়া ফাঁপানো চুল। লোকটি মার্বেল পাথরের কাউন্টারটা মুছলো। একটা ময়লা রঙের ন্যাকড়া দিয়ে। অপেক্ষা করতে লাগলো। আর অপেক্ষায় থেকে সে মুছছিলো। মুছছিলো আর অপেক্ষা করছিলো। আর দেখছিলো এসথা গান গাচ্ছে।

কেমন করে তুমি বালিতে ধরে রাখ ঢেউ
ওহ কেমন করে তুমি মোছাও সঙ্কট মারি...আহ্‌র মতো?

এই এড়া চেরুক্কা! অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্কম্যান বললো, গলাটা তার ঘুমে ভারি হয়েছিলো। 'তুমি কি করছো জান?'

কেমন করে তুমি ধর একটা
চাঁদের কিরণ
তোমার হাতে?

এসথা গাইল।

এই! অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্কম্যান বললো। 'দেখ এখন আমার বিশ্রামের সময়। একটু পরই আমাকে উঠে কাজে লাগতে হবে। এখানে বসে তোমাকে ইংরেজী গান গাইতে দেবো না। বন্ধ কর।' তার সোনালী হাত ঘড়িটা প্রায় লুকিয়ে ছিলো তার হাতের কোঁকড়া লোমের মধ্যে। গলায় সোনার চেনটা লুকিয়ে ছিলো বুকের লোমের ভিতরে। তার সাদা টেরিলিনের শার্টের বোতামগুলো ছিলো খোলা, মোটা ভুঁড়িটা উঁকি মারছিলো। ওকে দেখতে লাগছিলো গয়না পরা হোঁৎকা ভালুকের মতো।

'আমি তোমার নামে লিখিত অভিযোগ করতে পারি।' এসথাকে বললো লোকটি। 'ভালো লাগবে সেটা?' এসথা গান থামিয়ে উঠে ফিরে যেতে গেলো।

এখন আমি জেগে গেছি। অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান বললো। এখন তুমি আমাকে বিশ্রামের সময় জাগিয়ে দিলে, এখন আমাকে বিরক্ত করছ। অন্তত একটা ড্রিঙ্ক তো খাও। এটুকু অন্তত কর!'

ওর হনুর হাড় বের করা মুখটায় ছিলো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দাঁতগুলো ছিলো পিয়ানোর হলুদ চাবির মত। কুঁত কুঁতে চোখে দেখছিলো এলভিস পেলভিসকে।

'না, ধন্যবাদ'। এলভিস ভদ্রভাবে বললো। আমার বাড়ির সবাই ভিতরে অপেক্ষা করছে। আর আমার পকেটমানি শেষ হয়ে গেছে।

পোরকেতমান্নি? অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্কম্যান বললো দাঁত বের করে। প্রথমে ইংরেজী গান তারপর *পোরকেতমান্নি*। থাক কোথায়? চাঁদে নাকি হে?

এসথা যাওয়ার জন্যে ঘুরলো।

এক মিনিট দাঁড়াও। কড়া গলায় বললো অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্কম্যান। শুধু এক মিনিট। এবার নরম গলায় বললো। আমার মনে হয় একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমাকে। ওর হলুদ দাঁতগুলোতে ছিলো চুম্বক। ওগুলো দেখছিলো, ওগুলো হাসছিলো। ওগুলো গান গাইছিলো, ওগুলো ঘ্রাণ নিচ্ছিলো, ওগুলো নড়াচড়া করছিলো, ওগুলো জাদু করছিলো।

'আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম থাকো কোথায় তুমি'। নোংরা রঙের ন্যাকড়াটা ঘোরাতে ঘোরাতে সে বললো।

'এইমেনেম' বললো এসথা। 'আমি এইমেনেমে থাকি। আমার নানী প্যারাডাইস পিকলস এন্ড প্রিজার্ভস-এর মালিক। উনি স্লিপিং পার্টনার'।

উনি এখন আছেন? অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্কম্যান বললো 'তা এখন তার সঙ্গে ঘুমায় কে?' নোংরা হাসি ছড়িয়ে বললো লোকটি। এসথা বুঝতে পারলো না। 'কিছু মনে করোনা, তুমি বুঝতে পারোনি।'

'এসো একটা ড্রিঙ্ক খাও' সে বলল 'মাগনা একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক এসো। এখানে এসো আর তোমার নানীর কথা বলো।'

এসথা গেলো। হলুদ দাঁতগুলোর টানে।

'এখানে কাউন্টারের পিছনে' অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান বললো। ওর গলার আওয়াজ ফিসফিসানিতে নেমে এলো। লুকিয়ে খাও, বিরতির আগে ড্রিঙ্ক বিক্রি নিষেধ। ওটা বিরাট অপরাধ।'

'শান্তি হয়,' একটু চুপ করে থেকে বললো সে।

এসথা রিফ্রেশমেন্ট কাউন্টারের পিছনে বসে গেলো মাগনা ড্রিঙ্ক খেতে। ও দেখলো তিনটে উঁচু টুল পর পর সাজানো, অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান ওখানে ঘুমায়। চকচকে জঙ্গল বের করে বসেছিলো সে।

'এখন যদি তুমি দয়া করে এটা একটু ধরো' সাদা ধুতির ভিতর থেকে এসথার হাতে তার নুনুটা ধরিয়ে দিয়ে অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান বললো। আমি তোমাকে ড্রিঙ্ক দিচ্ছি, অরেঞ্জ? লেমন?

এসথা ওটা ধরলো কারণ ধরতেই হতো।

'অরেঞ্জ? লেমন?' লোকটা বললো 'লেমনোরেঞ্জ?'

'লেমন প্লিজ,' এসথা নরম গলায় বললো।

সে একটা ঠাণ্ডা বোতল আর নল বের করলো। সে তাই এক হাতে ধরলো বোতলটা। আর এক হাতে ধরলো নুনুটা। শক্ত, গরম, শিরাওঠা। চন্দ্রকিরণ নয়।

অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যানের এক হাত এসথার হাতের ওপর চেপে বসলো। ওর বুড়ো আঙুলের নখটা ছিলো মেয়ে লোকের মত বড়। সে এসথার হাতটা ওপর-নিচে করতে লাগলো। প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর জোরে।

লেমনড্রিঙ্কটা ছিলো ঠাণ্ডা আর মিষ্টি। নুনুটা গরম আর শক্ত। পিয়ানোর চাবিগুলো দেখছিলো।

'তা তোমার নানী ফ্যাক্টরিটা চালায়?' অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান বললো। কিসের ফ্যাক্টরি?

'নানা জিনিসের' এসথা বললো না তাকিয়েই। নলটা মুখে রেখেই, স্কোয়াশ, আচার, জ্যাম, গুঁড়ো মশলা। আনারসের চাকা।

'ভালো' অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান বললো, 'খুব ভালো' ওর হাতটা এসথার হাতের ওপর আরও শক্ত হল। শক্ত আর ঘামে ভেজা। তখনো জোরে।

ফাস্ট ফাস্টার ফেস্ট (জোরে আরও জোরে মজা)
নেভার লেট ইট রেস্ট (কখনও থেমনা)
আনটিল দ্য ফাস্ট ইজ ফাস্টার (যতক্ষণ জোরে আরও জোরে হয়)
এ্যান্ড দ্য ফাস্টার'স ফেস্ট। (আর আরও জোরে থেকে মজা)

কাগজের নরম নলটা (ভয়ে আর থুথুতে প্রায় চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছিলো) দিয়ে তরল মিষ্টি লেবু উঠে আসছিলো তীব্র গতিতে। এসথা ফুঁ দিয়ে উল্টো বুড়বুড়ি তুলছিলো বোতলের ভিতরে (অন্য হাত তখন নড়ছিলো) এসথা বোতলের মধ্যে

বুড়বুড়ি তুলতে লাগলো। ড্রিঙ্কের মিষ্টি চটচটে লেবুর ফেনা উঠছিলো ও গিলছিলো না। মাথার মধ্যে তখন নানীর কারখানায় তৈরি জিনিসগুলোর ফর্দ তৈরি হচ্ছিলো :

আচার	**স্কোয়াশ**	**জ্যাম।**
আম	*কমলা*	*কলা*
কাঁচালঙ্কা	*আড়ুর*	*মিক্সড ফ্রুট।*
করল্লা আনারস	*গ্রেপফ্রুট*	*মারমালেড।*
রসুন আম		
লেবুর জারক		

তখন ভয়ঙ্কর-চোঁয়াড়ে মুখটা চুপসে গেলো আর এসথার হাতটা গেলো ভিজে আর গরম আর চটচটে। ডিমের সাদার মতো। সাদা ডিম সাদা। সিকিসিদ্ধ।

লেমনড্রিঙ্কটা ছিল ঠাণ্ডা আর মিষ্টি। নুনুটা তখন নরম লুদলুদে হয়ে গিয়েছিলো খুচরো পয়সা রাখার চামড়ার বটুয়ার মত। নোংরা রঙের ন্যাকড়াটা দিয়ে লোকটা এসথার অন্য হাতটা মুছিয়ে দিলো।

'এখন ড্রিঙ্কটা শেষ করো।' সে বললো, আর গদ গদ হয়ে এসথার পাছার একটা দিক টিপে দিলো, চোঙা প্যান্টে শক্ত হাত এবং বেগি আর চোখা জুতো। 'তুমি ওটা নষ্ট করোনা' সে বললো। 'ভেবে দেখ গরিব লোকজনের কিছুই নেই খাবার বা গেলার। ভাগ্যবান বড় লোকের ছেলে তুমি, পোরকেতমান্নি পাও আর নানীর ফ্যাক্টরির মালিক হবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তোমার, চিন্তা নেই। এখন ড্রিঙ্কটা শেষ কর।'

অভিলাষ টকিজের প্রিন্সেস সার্কেল লবির রিফ্রেশমেন্ট কাউন্টারের পিছনের হলটায় ছিলো কেরালার প্রথম ৭০ মিলিমিটার সিনেমাস্কোপ স্ক্রিন, এসথাপ্পেন ইয়াকো ফোঁস বোতলটা শেষ করলো, লেবুরগন্ধওয়ালা ভয়। তার লেবুওলেবু ছিলো সাঙ্ঘাতিক ঠাণ্ডা। দারুণ মিষ্টি। ফোঁস করা ঝাঁঝওর নাক দিয়ে নামল। চাইলে সে আর একটা বোতলও পেতো (মাগনা ফোঁস করা ভয়)। কিন্তু তখনো জানতো না। অন্য চটচটে হাতটা সে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো।

যেন ওটা দিয়ে কিছু ধরা যাবে না।

এসথা ড্রিঙ্কটা শেষ করার পর অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান বললো, 'শেষ? লক্ষ্মী ছেলে।'

খালি বোতল আর চ্যাপ্টা নলটা সে নিয়ে নিলো আর এসথাকে পাঠালো *দ্য সাউন্ড অব মিউজিকের মধ্যে।*

তেলতেলে অন্ধকারে ফিরে এসথা ওর অন্য হাতটা উঁচু করে রইলো (যেন একটা কমলা ধরেছিলো) সে কোনার দর্শকটিকে পার হল (যে পা নাড়াচ্ছিলো) পার হলো বেবি কোচাম্মাকে, পার হলো রাহেলকে (তখনও ভাঁজ হয়ে ছিলো) আম্মুকে পার হলো (তখনও বিরক্ত) এসথা বললো তখনও চটচটে কমলাটা ধরেছিলো।

আর ওখানে ছিলো ক্যাপ্টেন ক্ল্যাপ-ট্র্যাপ। ক্রিস্টফার পামার। উগ্র। বদমেজাজী। কাটা দাগওয়ালা মুখ। আর রক্তহিম করা পুলিশের বাঁশিওয়ালা। সাতটা বাচ্চা নিয়ে এক ক্যাপ্টেন। মনে হচ্ছিল তাদের ভালোবাসে না কিন্তু বাসে। সে তাকেও (জুলি এ্যানড্রেস) ভালোবাসে। সেও ভালোবাসে। পরিচ্ছন্ন ছিলো ওরা, সাদা বাচ্চারা আর ওদের ছিলো এই, ডার, ড্রাউন্স বিছানা। যে বাড়িতে ওরা থাকতো সেখানে ছিলো হ্রদ আর বাগান, চওড়া সিঁড়ি, দরজাগুলো সাদা, জানালাগুলোও, পর্দাগুলো ফুল ছাপা।

পরিচ্ছন্ন সাদা বাচ্চাগুলো এমনকি বড়টাও বাজ পড়লে ভয় পাচ্ছিলো। ওদের আগলে রাখতে জুলি এ্যানড্রেস সবাইকে নিজের পরিপাটি বিছানায় বসিয়েছিলো আর মিষ্টি একটা গান গাইছিলো। কতগুলো জিনিস ছিলো তার প্রিয়।

১. নীল সাটিনের পাড় দেওয়া সাদা জামা পরা মেয়েরা।
২. চাঁদের দিকে উড়ে যাওয়া বুনো হাঁস।
৩. ঝকঝকে পিতলের কেতলি
৪. দরজার ঘন্টি আর স্লেজের ঘন্টি আর নুডলসের সঙ্গে হল্যান্ডের মদ।
৫. ইত্যাদি।

আর তখন অভিলাষ টকিজের দুই ভ্রূণের যমজদের মনে কিছু প্রশ্ন খোঁচাতে লাগলো। ওরা উত্তর চাইলো, যেমন :

ক. ক্যাপ্টেন ভন ক্ল্যাপ-ট্র্যাপ কি ঠ্যাং নাড়াতো?
না।

খ. ক্যাপ্টেন ভন ক্ল্যাপ-ট্র্যাপ কি থুথুর ফেনা ওড়াতো? অমন করতো?
নিশ্চই না।

গ. সে কি গব গব করে খেতো?
না।

ওহ্ ক্যাপ্টেন ভন ট্র্যাপ, ক্যাপ্টেন ভন ট্র্যাপ আপনি কি এই গন্ধওয়ালা সিনেমা হলে বসা ছোট্ট মানুষটাকে ভালোবাসতে পারেন?

একটু আগে সে অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যানের নুনু ধরেছিলো তার হাত দিয়ে? তবু আপনি তাকে ভালোবাসবেন? আর তার যমজ বোনটি? লাভ ইন টোকিওর মধ্যে ঝর্না আটকে চশমা চোখে দিয়ে যে চেয়ারে দুলছিলো? তাকেও কি আপনি ভালোবাসবেন?

ক্যাপ্টেন ভন ট্র্যাপের নিজের কিছু প্রশ্ন ছিলো।

ক. বাচ্চা দুটো কি পরিচ্ছন্ন সাদা চামড়ার?
না (তবে সোফি মল)

খ. ওরা কি থুথুর বুদবুদ ওড়ায়?

হ্যাঁ (তবে সোফি মল করে না)

গ. ওরা কি পা নাচায়? কেরানিদের মতো?

হ্যাঁ (তবে সোফিমল করে না)

ঘ. ওরা দু'জনই কিংবা একজনও কি অপরিচিত লোকের নুনু ধরে?

না.....না।

(তবে সোফি মল ধরেনি)

তাহলে আমি দুঃখিত ক্যাপ্টেন ভন ক্ল্যাপ-ট্র্যাপ বললেন। 'আর দরকার নেই আমি ওদের ভালোবাসতে পারি না। আমি ওদের বাবা হতে পারি না। ওহ্ নো'

ক্যাপ্টেন ভন ক্ল্যাপ-ট্র্যাপ পারলেন না।

এসথা নিচু হয়ে হাঁটুর ওপর মাথা রাখলো।

'কি হলো?' আম্মু বললো। 'আবার তুই মুখ গোমড়া করে আছিস, আমি এবার তোকে সোজা বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। সোজা হয়ে বস্। দেখ্। কি জন্যে এসেছিস্ এখানে?'

ড্রিঙ্কটা শেষ করো।

ছবি দেখ্।

গরিব লোকদের কথা ভাবো।

ভাগ্যবান বড় লোকের ছেলে পোরকেতমান্নি আছে, ভয় নেই।

এসথা সোজা হয়ে বসলো। দেখতে লাগলো। ওর পেট ফুলে উঠলো। সবুজ ঢেউ খেলানো, ঘন জলীয়, ফোলা, সমুদ্র শ্যাওলার মত ভাসমান, ভিত্তিহীন-সন্দেহজনক অনুভূতি হলো ওর।

'আম্মু?' ডাকলো ও।

আবার **কি? কি** শব্দটা চাপড়ের মত, খেঁকিয়ে উঠলো, থুথু ছিটালো,

'বমি পাচ্ছে।' এসথা বললো।

'শুধু মনে হচ্ছে– না করবি?' আম্মুর গলায় উদ্বেগ।

জানি না।

যাবো? চেষ্টা করবি? আম্মু বললো। ভালো লাগতে পারে।

ঠিক আছে। এসথা বললো।

ঠিক আছে? ঠিক আছে।

'কোথায় যাচ্ছিস তোরা,' বেবি কোচাম্মা জানতে চাইলেন।

'এসথা বমি করতে চাইছে' আম্মু বললো।

'তোমরা কোথায় যাও,' রাহেল প্রশ্ন করলো।

'বমি পাচ্ছে' এসথা বললো।

'আমি যাব দেখতে?' রাহেল বললো।

'না'। আম্মু বললো।

আবার দর্শকটিকে পার হল (পা দোলানো লোকটাকে)। আগেরবার গান গাইতে। এবার বমি করার চেষ্টায়। **'বাহির'** দিয়ে বাইরে যাওয়া। বাইরে মার্বেল পাথরের লবি, অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান লজেন্স খাচ্ছিলো। চিবানোর ঢেউ উঠছিলো গালে। চাক চাক আওয়াজ করছিলো এমন করে যে মনে হচ্ছিলো বেসিনে জল পড়ছে। কাউন্টারের ওপরে ছিলো প্যারি কোম্পানির একটা সবুজ র‍্যাপার, এ লোকটির জন্যে ছিল মুফতে পাওয়া, লজেন্স কোম্পানির উপহার। একটা ময়লা বোয়েমে সে লজেন্সগুলো সাজিয়ে রেখেছিলো। মার্বেল পাথরের কাউন্টারটা সে ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে মুছেই যাচ্ছিলো। ন্যাকড়াটা সে ধরেছিলো তার লোমশ ঘড়ি পরা হাতে। যখন সে মসৃণ কাঁধওয়ালা উজ্জ্বল মহিলা আর তার সঙ্গে ছোট ছেলেটাকে দেখলো, তখন তার মুখে একটা ছায়া ঘনালো। ভাঁজ করা পিয়ানো হাসি হাসলো।

'আবার এসেছো এত্তো তাড়াতাড়ি'? বললো সে।

এসথা ওয়াক তুলতে শুরু করেছিলো। আম্মু তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলো প্রিন্সেস সার্কেলের **হারস** বাথরুমে। ওকে ধরে রেখেছিলো, ও চ্যাপ্টা হয়েছিলো নোংরা বেসিন আর আম্মুর শরীরের সঙ্গে। পা দুটো নেতিয়ে পড়েছিলো। বেসিনে ছিলো স্টিলের ট্যাপকল আর জং ধরা দাগও ছিলো ওতে। বাদামী ময়লা আর চুলের মত চিড় ধরেছিলো শহরের রাস্তার ম্যাপের মতো।

এসথা খিঁচুনি দিতে লাগলো; কেউ কিছু বললো না। শুধু চিন্তা। ওগুলো উঠে আসছিলো আর নেমে যাচ্ছিলো। আম্মু দেখতে পাচ্ছিলো না। বেসিনের শহরের ওপর ওগুলো মেঘের মত ভাসছিলো। কিন্তু বেসিনের নারী পুরুষরা তাদের নিয়মে বেসিন কাজে ব্যস্ত ছিলো। বেসিন গাড়ি, বেসিন বাস, চারিদিকে ঘুরছিলো। বেসিন জীবন সচল ছিলো।

হলো না? আম্মু বললো।

'না,' বললো এসথা।

'না?' না।

'তাহলে তোর মুখটা ধো' বললো আম্মু। জল সবসময়ই ভালো। মুখ ধুয়ে চল্ একটা ঠাণ্ডা লেমনড্রিঙ্ক খাবি।'

এসথা হাত মুখ ধুলো আর মুখ এবং হাত। ওর চোখের পাতা ভিজে লেপ্টে ছিলো।

অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান সবুজ মিষ্টি র‍্যাপারটা ভাঁজ করছিলো, ভাঁজগুলোর ঠিক করছিলো ওর বড়ো নখওয়ালা রঙ করা বুড়ো আঙুলটা দিয়ে। একটা গোল করা পত্রিকা দিয়ে ও একটা মাছি তাড়াচ্ছিল। ঠিক ঠিক ওটাকে ধরাশায়ী করলো কাউন্টারের পাশে মেঝের ওপর, ওটা চিৎ হয়ে পড়েছিলো আর নিরুপায় পাগুলো নাড়াচ্ছিলো।

'ছেলেটা লক্ষ্মী' –সে আম্মুকে বললো, 'সুন্দর গান গায়।'

'আমার ছেলে' আম্মু বললো।

'সত্যি'? অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান বললো আর আম্মুর দিকে তাকালো তার দাঁত দিয়ে। 'সত্যি? আপনাকে অত বয়স্ক মনে হচ্ছে না।'

'ওর শরীরটা ভালো ঠেকছেনা।' আম্মু বললো, 'মনে হয় একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খেলে ভালো লাগবে।'

'নিশ্চয়ই,' লোকটা বললো 'ওফকোর্স ওফকোউর্স, ওরেঞ্জ ও লেমন? লেমনোরেঞ্জ?'

ভয় ধরানো ভয়ানক প্রশ্ন।

'না, থ্যাঙ্ক ইউ' এসথা আম্মুর দিকে তাকিয়ে বললো। সবুজ ঢেউ খেলানো, সমুদ্র শৈবালের মত ভিত্তিহীন-সন্দেহজনক।

'আপনাকে কি দেব?' অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান বললো আম্মুকে।

'কোকা-কোলাফানটা? আইস্‌সক্রিমরোজমিল্ক?'

'না আমার লাগবে না, থ্যাঙ্ক ইউ' আম্মু বললো। গভীর টোলপড়া উজ্জ্বল মহিলা।

এই যে লোকটা বললো একমুঠো লজেন্স নিয়ে বিনম্র এয়ারহোস্টেসের মতো। 'এগুলো তোমার জন্যে ছোট্ট মনি।'

'না *থ্যাঙ্ক* ইউ' এসথা আম্মুর দিকে চেয়ে বললো।

'নে ওগুলো এসথা' আম্মু বললো 'অমন অভদ্রতা করে না।'

এসথা নিলো।

থ্যাঙ্ক ইউ বল্, আম্মু বললো।

'থ্যাঙ্ক ইউ' এসথা বললো (লজেন্সের জন্যে, সাদা ডিম সাদার জন্য)

নো মেনসন, অরেঞ্জড্রিঙ্ক-লেমনড্রিঙ্ক ম্যান ইংরেজিতে বললো।

'তো!' সে বললো, 'মনি বললো আপনারা এইমেনেম থেকে এসেছেন'।

'হ্যাঁ,' আম্মু বললো।

'আমি প্রায়ই ওখানে যাই,' অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান বললো। 'আমার বউ-এর বাপের বাড়ি এইমেনেমে। আমি চিনি আপনাদের ফ্যাক্টরিটা। প্যারাডাইস পিকলস তাই না? ও আমাকে বলেছে, আপনার লক্ষ্মী ছেলে।'

সে জানতো কোথায় এসথাকে পাওয়া যায়। ওটাই সে বোঝাতে চাইলো। ওটা ছিলো একটা হুঁশিয়ারী।

আম্মু তার ছেলের বোতামের মত উজ্জ্বল চোখগুলোর দিকে তাকালো।

'আমাদের যেতে হবে,' সে বললো, আর থাকা ঠিক হবে না। 'ওদের মামাতো বোন কাল আসছে।' সে আঙ্কেলকে বললো। আর সঙ্গে যোগ করলো, 'লণ্ডন থেকে।'

'লণ্ডন থেকে'? নতুন একটা সমীহ দেখা দিলো আঙ্কেলের চোখে। লণ্ডনের সঙ্গে যোগাযোগওয়ালা পরিবারটির জন্যে।

এসথা এখানে আঙ্কেলের কাছে থাক্ 'আমি বেবি কোচাম্মা আর রাহেলকে নিয়ে আসছি।' আম্মু বললো।

'এসো' আঙ্কেল বললো 'এসো আমার কাছে বসো এই উঁচু টুলটায়।'

'না আম্মু, না আম্মু না আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

আম্মু আশ্চর্য হলো। তার এমনিতে শান্ত ছেলেটার এমন জেদী চিৎকার শুনে। দুঃখ প্রকাশ করল সে অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক আঙ্কেলের কাছে।

'ও এমন করে না, ঠিক আছে আয় এসথাপ্পেন।'

ওরা আবার সেই গন্ধের মধ্যে ঢুকলো। ফ্যানের ছায়া। মাথাগুলোর পিছন। গলা। কলার। চুল। বেনী। খোঁপা। ঝুঁটি।

লাভ-ইন-টোকিওর মধ্যে বাঁধা একটা ঝর্না। একটা পুঁচকে মেয়ে আর এক প্রাক্তন নান।

ক্যাপ্টেন ভন ট্র্যাপের সাত পিপারমিন্ট বাচ্চা তখন পিপারমিন্ট স্নান করছিলো আর ওরা দাঁড়িয়েছিলো এক পিপারমিন্ট লাইনে, ওদের চুল গড়িয়ে নেমেছিলো, গান গাচ্ছিল গোবেচারা পিপারমিন্ট কণ্ঠে, ঐ মেয়েলোকটার দিকে তাকিয়ে যাকে ক্যাপ্টেন ক'দিন পরেই বিয়ে করবে। বাদামী চুলের ব্যারনেস তখন হীরের মত ঝলকাচ্ছিল।

পাহাড়গুলো জীবন্ত
সঙ্গীতের সুর মুর্চ্ছনায়।

'আমাদের যেতে হবে,' বেবি কোচাম্মা আর রাহেলকে বললো আম্মু।

'কিন্তু আম্মু!' রাহেল বললো, 'আসল ঘটনাই তো এখনও ঘটেনি। এখনও তাকে কিস্ করেনি! এখনও সে হিটলারের পতাকা ছেঁড়েনি। এমনকি পোস্টম্যান রল্‌ফও এখনও বিট্রে করে নি।'

'এসথার শরীর খারাপ' বললো আম্মু 'চলে আয়।'

'নাৎসী সৈন্যরা এখনও আসেনি।'

আর আম্মু বললো 'ওঠ্'।

হাই অন এ হিস ওয়াজ অব লোনলি গ্যাদারও। গানটা এখনও ওরা গায়নি।

'সোফি মলের জন্যে এসথার ভালো থাকা দরকার না?'

বেবি কোচাম্মা বললেন।

'ও ভালো থাকবে না,' রাহেল বিড় বিড় করে বললো।

'কি বললি?' বেবি কোচাম্মা হিসহিসিয়ে বললেন, তবে আসলে রাগ করেননি।

'কিছু না' রাহেল বললো।

'আমি শুনতে পেয়েছি,' বেবি কোচাম্মা বললেন।

বাইরে আঙ্কেল বোয়েমগুলো সাজাচ্ছিল। নোংরা রঙের ন্যাকড়া দিয়ে ছিটে ছিটে জলের দাগ মুছছিলো, ওগুলো হয়েছিলো ওদের জলে ভেজা হাত ঝাড়াঝাড়িতে।

বিরতীর জন্যে সে তৈরি হচ্ছিল। সে তখন পরিচ্ছন্ন অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান আঙ্কেল হয়ে গেছে। ওর ভালুক শরীরের মধ্যে তখন আটকে গিয়েছিলো এক এয়ারহোস্টেসের হৃদয়।

'তাহলে যাচ্ছেন?' বললো সে।

'হ্যাঁ,' আম্মু বললো। 'একটা ট্যাক্সি কোথায় পাব?'

'গেটের বাইরে, রাস্তার বাঁ দিকে বলতে বলতে সে তাকালো রাহেলের দিকে। আপনি বলেননি আপনার একটা মেয়েও আছে। আর একটা লজেন্স বের করে সে রাহেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, 'নাও খুকি তোমার জন্যে।'

'আমারটা নে' তাড়াতাড়ি বললো এসথা। লোকটার কাছে রাহেলকে যেতে দিতে চাচ্ছিল না ও।

কিন্তু ততক্ষণে রাহেল ওর দিকে তাকিয়েছে। ও যখন লোকটার কাছে পৌছালো সে তখন তার সেই বিখ্যাত পিয়ানো হাসি হাসলো, তার তীক্ষ্ণ চাউনি ওকে টেনে রেখেছিলো, ও কুঁকড়ে গিয়েছিলো। এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার ও আগে দেখেনি। ও ঘুরে এসথার দিকে তাকালো।

পিছনে হেঁটে ও ফিরে এলো লোমশ লোকটার কাছ থেকে।

এসথা ওর প্যারি লজেন্সগুলো ওর হাতে গুঁজে দিলো আর ও পরিচিত আঙ্গুলগুলোর ছোঁয়া পেলো, ওগুলো তখন ছিলো মরামানুষের মতো ঠাণ্ডা।

'বা-ই মন' অঙ্কেল এসথাকে বললো। 'তোমার সঙ্গে এইমেনেমে দেখা হবে।'

তো, সেই লাল সিঁড়িতে আবার। এবার রাহেল ল্যাগব্যাগ করতে লাগলো। আস্তে। যেন একটন ইঁটের নিচে পড়েছিলো, বলতে চাচ্ছিল – না, আমি যাব না।

সুন্দর লোক ঐ অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান আম্মু বললো।

'ছিঃ বেবি' কোচাম্মা বললেন।

'দেখতে না, তবে অবাক কাণ্ড, এসথার সঙ্গে ও খাতির জমিয়েছিলো,' আম্মু বললো।

'তাহলে তুমি ওকে বিয়ে করছো না কেন?' রাহেল তড়বড়িয়ে বললো। সময় থমকে গেলো লাল সিঁড়িতে। এসথা থামলো। বেবি কোচাম্মা থামলেন।

'রাহেল'! আম্মু বললো। রাহেল জমে গিয়েছিলো। কথাটা বলার জন্যে তখন ওর দুঃখ হচ্ছিলো। ও বুঝতেই পারেনি কোত্থেকে কথাটা উঠে এসেছিলো। ও জানতই না ওগুলো ওর ভিতরে ছিলো। কিন্তু এখন বেরিয়ে এসেছে আর ভিতরে পাঠানো যাবে না। সরকারি অফিসের কেরানিদের মতো ওগুলো লাল সিঁড়ির ওপর ঝুলে ছিলো। কয়েকটা দাঁড়িয়ে, কয়েকটা বসে তাদের পা নাড়াচ্ছিলো।

'রাহেল?' আম্মু বললো, 'তুমি বুঝেছ এখন তুমি কি করলে?'

ভয়তরাসে চোখ দুটো আর একটা ঝর্না আম্মুর দিকে ফিরলো।

'ঠিক আছে ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' আম্মু বললো শুধু আমার প্রশ্নের জবাব দে, দিবি?

'কি'? রাহেল মিনমিন করে বললো।

'বুঝেছিস তুই কি করেছিস?' আম্মু বললো।

ভয়তরাসে চোখ দু'টো আর একটা ঝর্না তাকালো আম্মুর দিকে।

'তুই জানিস মানুষকে দুঃখ দিলে কি হয়?' আম্মু বললো। 'যখন তুই কাউকে দুঃখ দিবি তখন তারা আর তোকে ভালোবাসবে না। বেয়াড়া কথাগুলো তাই করেছে। ওগুলোর জন্যে তোর আদর কমে যাবে।'

একটা ঠাণ্ডা মথ অন্যরকম লোমশ ভারি পাখা ছড়িয়ে রাহেলের মনের ওপর এসে নামলো। ওটার বরফের মত ঠাণ্ডা পাগুলো ওকে স্পর্শ করলো। ওর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। ছ'টা কাঁটা, ওর বেখেয়ালী মনে। আম্মু ওকে কম আদর করবে। তখন ওরা গেট পার হলো, রাস্তায় উঠলো আর ডান দিকে ঘুরলো। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। এক দুঃখী মা, এক প্রাক্তন নান, একটা গরম শিশু আর একটা ঠাণ্ডা। ছ'টা কাঁটা দিয়ে ওঠা লোম আর একটা মথ।

ট্যাক্সিটায় ছিল ঘুমের গন্ধ। পুরনো কাপড় গুটিয়েছিলো। ভেজা ভেজা তোয়ালে ছিলো পিছনে। ট্যাক্সি ড্রাইভারটির ঘরই ছিলো ওটা। ও থাকত এর ভেতরেই। এই একটাই জায়গা ছিলো তার নিজের গন্ধ জমিয়ে রাখার। সিটগুলোকে করে ফেলেছিলো কাটাছেঁড়া। হলুদ স্পঞ্জের একটা দলা বের হয়েছিলো পিছনের সিট থেকে, কাঁপছিলো –জড়িসে ফোঁপড়া হওয়া কলজের মত। ছোট একটা ইঁদুর নিয়ে ড্রাইভারটা খুব অস্বস্তিতে ছিলো। ওর নাকটা ছিলো রোমান, খাড়া –সামনে বাঁকা অ[illegible] ছাট্ট করে ছাঁটা রিচার্ড গোঁফ। এত্তো বাঁটকু ছিলো যে রাস্তা দেখতো স্টিয়ারিং এর ভিতর দিয়ে। গাড়ির ভিড়ে ওর ট্যাক্সিটাকে মনে হত যাত্রী আছে কিন্তু ড্রাইভার নেই। খুব জোরে চালাতো ও, এঁকে বেঁকে, খানাখন্দের ওপর দিয়ে, অন্য গাড়িগুলোকে চমকে দিয়ে, ওগুলোকে লেন ছাড়তে বাধ্য করতো। জেব্রাক্রসিংয়ে এ্যাকসিলারেটরে চাপ দিতো। লাফিয়ে উঠতো।

'একটা কুশন বা বালিশ রাখো না কেন?' বেবি কোচাম্মা তাকে বেশ মোলায়েম স্বরে উপদেশ দিলেন, 'দেখতে ভালো লাগতো।'

'নিজের চরকায় তেল দিন সিস্টার।' ড্রাইভারটা চড়া গলায় বললো। গাড়ি চলছিলো কালির মত সাগরের পাড় দিয়ে, এসথা জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়েছিলো। মুখে লাগছিলো গরম নোনা বাতাস। মনে হচ্ছিল চুলগুলো উপড়ে নিয়ে যাবে। ও বুঝেছিলো, আম্মু যদি জানত যে অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যানের সঙ্গে ও কি করেছে তাহলে লোকটাকে অত ভালো বলতো না। অনেক ক[illegible] ওর মনে হচ্ছিল লজ্জার একটা ঠাণ্ডা পাথর ওর পেটের মধ্যে জমে আছে আর ওকে অসুস্থ করে তুলছে। নদীতে যেতে ইচ্ছে হলো ওর। কারণ জল সব সময়ই ভালো।

জ্বলা-নেভা নিয়ন বাতির রাত গাড়ির জানালা থেকে সরে যাচ্ছিল। গরম ছিলো ট্যাক্সির ভিতরটা, চুপচাপ বেবি কোচাম্মা রাগে ফুঁসছিলেন। উনি এরকম বাজে ব্যাপার পছন্দ করেন না। প্রত্যেকবার কোনো পথের কুকুর সামনে দেখলেই ড্রাইভারটা ওটাকে মারার চেষ্টা করছিলো।

রাহেলের মনের মথটা মখমলের পাখনা মেলে দিলো আর শিরশিরে ঠাণ্ডা ওর হাড় কাঁপিয়ে দিলো।

হোটেল সীকুইনের কার পার্কে আকাশীনীল প্লেমাউথটা অন্য ছোট গাড়িগুলোর সঙ্গে গুজ-গুজ করছিলো। *হসিলপ হস্লিপ হসনু স্নাহ*। ছোট মহিলাদের পার্টিতে এক মোটা মহিলা। লেজের পাখনা বাগিয়ে।

'রুম নম্বর ৩১২ আর ৩২৭,' রিসিপশনের লোকটা বললো। 'এয়ারকন্ডিশন ছাড়া জোড়া বিছানা, রিপিয়ারিং-এর জন্যে লিফটটা চলছে না।' যে বেলবয়টা ওদের ওপরে নিয়ে গেলো সে ছেলেও ছিলো না, ঘন্টিও ছিলো না তার কাছে। ওর চোখ দু'টো ছিলো আধবোঁজা আর পরনের মেরুন রঙের কোটটার দু'টো বোতাম ছিলো না। ভিতর থেকে ছাইরঙের শার্টটা উঁকি মারছিলো। বারান্দাওয়ালা টুপিটা ছিলো এক দিকে কাৎ হয়ে, প্লাস্টিকের আঁটো ফিতেটা হনুর ওপর কেটে বসেছিলো। বয়স্ক একটা লোককে অমন একটা টুপি পরানোর কোনো দরকার ছিলো না, ওতে তার বয়স ঢাকা পড়েনি বরং ঝুলে পড়া চোয়ালের চামড়ায় নিয়তির হিসাব কষা ছিলো।

আরও অনেকগুলো লাল সিঁড়ি ছিলো ওঠার জন্যে। একই লাল কার্পেট সিনেমা হল থেকে ওদের পিছু নিয়েছিলো। যাদুই উড়ন্ত কার্পেট।

চাকো রুমেই ছিলো। ভোজ সারছিলো। মুরগির রোস্ট, ফিঙ্গার চিপস, সুইট কর্ণ এন্ড চিকেন স্যুপ, দুটো পরোটা আর ভ্যানিলা আইসক্রিম, সঙ্গে চকোলেট সস। সস ছিলো সস বোটে (সসের বাটিতে)। চাকো প্রায়ই বলতো বেশি খেয়ে মরতে চায় সে। মামাচি বলতেন ওটা হল অবদমন করে রাখা দুঃখের লক্ষণ। চাকো বলতো আসলে ব্যাপারটা তা নয়। সে বলতো চোখের লোভ।

এত তাড়াতাড়ি সবার ফিরে আসা দেখে চাকো থতমত খেয়ে গেলো, তবে ভাব দেখালো অন্যরকম। খেতে লাগলো। আগেই ঠিক করা ছিলো, এসথা শোবে চাকোর সঙ্গে। রাহেল-আম্মু আর বেবি কোচাম্মার সঙ্গে। কিন্তু এখন এসথার শরীর ভালো না বলে আদরটা ফিরে এলো (আম্মু ওকে কম আদর করত)। এখন রাহেলকে চাকোর সঙ্গে হতে হবে আর এসথা শোবে আম্মু আর বেবি কোচাম্মার সঙ্গে।

আম্মু স্যুটকেস থেকে রাহেলের পাজামা আর টুথব্রাস বের করে বিছানায় রাখলো।

'এখানে' আম্মু বললো।

দুটো ক্লিক শব্দ হল স্যুটকেস বন্ধ করার।

ক্লিক আর ক্লিক।

'আম্মু,' রাহেল বললো 'শাস্তি হিসেবে আমি আজ খাবো না না?' শাস্তি বদল করতে চাচ্ছিলো ও। না খাওয়ার বদলে-আম্মু যদি তাকে আদর করে।

'তুমি যা ভালো মনে করো' আম্মু বললো, 'তবে আমি তোমাকে খেতে বলছি, যদি বড়ো হতে চাও। চাকোর কাছ থেকে তুমি একটু মুরগি নিতে পারো।'

'মেবি অ্যান্ড মেবি নট,' চাকো বললো।

'কিন্তু আমার শাস্তি?' রাহেল বললো, 'তুমি তো আমাকে শাস্তি দিলে না।'

'কিছু কিছু শাস্তি এমনিই হয়ে যায়। বেবি কোচাম্মা বললেন। যদিও তিনি যা বললেন তা রাহেল বুঝতে পারেনি। কিছু কিছু শাস্তি এমনিই হয়ে যায়। আলামারীওয়ালা শোয়ার ঘরের মত। শাস্তি কাকে বলে ওরা জেনেছিলো ক'দিন পরেই —ওদের আকার তখন বদলে গিয়েছিলো। কেউ হয়েছিলো আলমারীওয়ালা শোয়ার ঘরের মত বিরাট। ওগুলোর মধ্যেই সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত। অন্ধকার তাকের মধ্যে ঘুরে ফিরে। বেবি কোচাম্মার গুডনাইট চুমুতে রাহেলের গালে খানিকটা থুথু লেগে গেলো। কাঁধ উঁচিয়ে ওটা মুছলো ও।

'গুডনাইট গড ব্লেস,' আম্মু বললো। তবে ওটা সে বলেছিলো পিছন ফিরে। ততক্ষণে সে চলে গিয়েছিলো।

'গুডনাইট' এসথা বললো, ওর বোনের আদরের জন্যে। রাহেল একলা দেখলো সবার চলে যাওয়া, হোটেলের করিডোর দিয়ে ওরা হেঁটে গেলো নিঃশব্দে ভূতের মত।

রাহেল হোটেল রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো। মনমরা। সোফি মল যখন আসলো তখনও ওর মনের অবস্থা ওরকমই ছিলো। আম্মু তাকে কম আদর করবে বলে মন খারাপ হয়েছিলো। আর অভিলাষ টকিজে অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্ক ম্যান এসথাকে যা করেছিলো সে জন্যেও।

একটা জ্বালা ধরানো বাতাসের ঝাপটা এসে লাগলো ওর চোখে। চাকো মুরগির একটা রান আর কটা ফিঙ্গার চিপস দিলো একটা কোয়ার্টার প্লেটে।

'নো থ্যাঙ্ক ইউ,' বললো রাহেল। ভাবল শাস্তিটা নিজেরই নেওয়া দরকার। আম্মু তাহলে আদর করে দেবে।

'চকোলেট সস দিয়ে আইসক্রিম, খা?' চাকো বললো।

'নো থ্যাঙ্ক ইউ,' বললো রাহেল।

'ফাইন,' চাকো বললো। কিন্তু তুই বুঝলিনা কি হারালি। সে সব মুরগি আর আইসক্রিম খেয়ে ফেললো। রাহেল পাজামা বদলালো।

'তোর বলার দরকার নেই কি জন্যে তোর শাস্তি দরকার,' চাকো বললো, 'আমি ওসব শুনতে পারবো না।' সে চকোলেট সসের বাটি থেকে বাকি সসটুকু পরোটা দিয়ে খেতে লাগলো। মিষ্টির ওপর মিষ্টি ভালো লাগলো না। কি হয়েছিলো? 'মশার' কামড় চুলকাতে চুলকাতে রক্ত বের করেছিলি? না ট্যাক্সি ড্রাইভারকে থ্যাঙ্ক ইউ বলিস নি?'

'তার চেয়েও খারাপ,' আম্মুর বিশ্বাস রেখে বললো রাহেল।

'আমাকে বলিস না,' চাকো বললো 'আমি শুনতে চাই না।' সে রুম সার্ভিসকে ডাকলো। ক্লান্ত বেয়ারাটা এসে প্লেট আর হাড্ডিগুলো নিয়ে গেলো। ও চেষ্টা করছিলো খাবারের ঘ্রাণ নিতে কিন্তু ওসব তখন হালকা বাদামী হোটেলের পর্দার ভাঁজে লুকিয়ে পড়েছিলো।

এক না খাওয়া ভাগ্নি আর তার ভোজ খাওয়া মামা হোটেল সী কুইনের বাথরুমে দাঁত মাজলো একসঙ্গে। রাহেলের পরনে ছিলো একটা লম্বা জামা আর কয়েদীদের মত লম্বা দাগ ওয়ালা পাজামা, চাকো পরেছিলো সূতীর জামা আর হাফপ্যান্ট। তার জামা ঠেলে ভুঁড়ি বেরিয়েছিলো আর এক পরতা চামড়ার মতো পেটের কাছের বোতামটা ছেঁড়ার মত হয়েছিলো। রাহেল যখন তার ছ্যাতরানো টুথব্রাশটা ঘষেই যাচ্ছিল তখন চাকো ওকে বারণ করেনি।

সে ফ্যাসিস্ট ছিলো না।

ওরা পর পর থুথু ফেলেছিলো। রাহেল মন দিয়ে দেখছিলো সাদা বিনাকা টুথপেস্টের ফেনা বেসিনের ভিতর পিছলে নেমে যেতে, দেখছিলো যতদূর পারে।

কোনো রঙ কিংবা আশ্চর্য কোনো বস্তু যদি তার দাঁত থেকে বেরোয়!

আজ রাতে কিছুই না। অন্যরকম কিছু না। শুধু বিনাকার ফেনা।

চাকো বড়ো বাতিটা নিভিয়ে দিলো।

রাহেল ওর চুল থেকে লাভ ইন টোকিও আর সানগ্লাসটা খুললো বিছানায় বসে। ওর ঝর্নাটা একটু দুললো তারপর খাড়া হয়ে রইলো। চাকো শুলো বেডসাইড ল্যাম্পের আলোর মধ্যে। অন্ধকার মঞ্চে এক মোটা মানুষ। বিছানার পায়ের কাছে দলা মোচড়া হয়ে পড়ে থাকা শার্টটা তুললো। পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করলো, সোফি মলের ছবিটা দেখলো, ওটা দু'বছর আগে মার্গারেট কোচাম্মা পাঠিয়েছিলো।

রাহেল তাকে দেখছিলো। আর তার ঠাণ্ডা মথটা আবার পাখা মেলে দিয়েছিলো। আস্তে খুলছিলো, আস্তে বন্ধ করছিলো। পূর্বপুরুষের অলস উত্তরাধিকার। চাকো ওয়ালেটটা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিলো। অন্ধকারে একটা চারমিনার ধরিয়ে ভাবতে লাগল-মেয়েটা তার দেখতে এখন কেমন হয়েছে। ন' বছর হলো। শেষ যখন দেখেছিলো ও ছিলো লাল আর তুলতুলে। ক্ষুদে মানুষ। তিন সপ্তাহ পরে ওর বউ মার্গারেট কাঁদতে কাঁদতে তাকে জো'র কথা বলেছিলো।

মার্গারেট চাকোকে বলেছিলো সে আর তার সঙ্গে থাকতে পারবে না। তার নিজের মতো থাকা দরকার। যদিও চাকো তখন তার আলমারীর তাকেই জামাকাপড় রাখতো। ওটাই তাকে সে জানিয়েছিলো।

সে তাকে ডিভোর্সের কথা বলেছিলো।

সে যাওয়ার আগের শেষ রাতটা ছিল যন্ত্রণার। চাকো বিছানায় শুতো না, একটা টর্চ নিয়ে বাচ্চাটাকে দেখতো। ওকে বুঝতে ব্যস্ত। ওকে স্মৃতিতে গেঁথে নিতে চাইতো। যাতে যখনই ভাববে তখনই মুখটা ঠিক চিনতে পারে। তার মনে ছিলো শুধু ওর বাদামী মাথাটার কথা, ওর মুখের আকৃতি আর নড়া চড়া করা ঠোঁট দু'টো। পা দু'টোর আকার খুঁজতো, চেনার মত একটা তিল। অর্থহীন হলেও ও দেখতে চাইতো জো'র সঙ্গে কোনো মিল আছে কিনা বাচ্চাটার। বাচ্চাটা বিরক্তি প্রকাশ করতো তর্জনী চুষে, বিশেষ করে চাকো যখন টর্চের আলো ফেলতো। ওর জামার

নিচে নাভীটা উঁচু হয়ে ছিলো পাহাড়ের ওপরে গম্বুজওয়ালা মন্যুমেন্টের মতো। চাকো পেটে কান ঠেকিয়ে শুনতো ভিতরের আশ্চর্য সব শব্দ। তথ্য আদান প্রদান হতো। নতুন প্রত্যঙ্গগুলো পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতো। নতুন একটা সরকার নতুন নিয়ম চালু করছিলো। আচরণবিধি ঠিক হচ্ছিলো, কে কি করবে তা নির্ধারণ করার কাজ চলছিলো।

ওর গন্ধ ছিলো দুধ আর পেসাবে মেশানো। চাকো আশ্চর্য হয়ে ভাবতো কেমন করে মানুষ এত ছোট্ট, এত বৈশিষ্ট্যহীন এতো পলকা থাকে। আবার কি করে বড়ো মানুষদের আদর যত্ন বুঝতে পারে?

যখন সে চলে আসে তখন মনে হয়েছিলো কি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। অনেক বড় কিছু।

কিন্তু সে এখন মৃত। গাড়ি এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। দরজার হাতলের মতো মৃত। ব্রহ্মাণ্ডে জো'র মাপের একটা গর্ত। চাকোর ছবিতে সোফি মল ছিলো সাত বছরের। সাদা আর নীল। গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট আর সিরিয়ান খৃস্টানের কোনো ছাপ ছিলো না। তারপরও মামাচি ছবিটা দেখে বলেছিলেন ওর নাকটা হয়েছে পাপাচির মত। 'চাকো?' অন্ধকার বিছানা থেকে রাহেল ডাকলো। 'একটা প্রশ্ন করবো।'

'দুটো কর,' চাকো বললো।

'চাকো পৃথিবীতে তুমি সোফি মলকে কি সবচেয়ে বেশি ভালোবাস?'

'ও আমার মেয়ে'। চাকো বললো। রাহেল ওটা মেনে নিলো।

'চাকো নিজেদের বাচ্চাদের কি সবারই সবচেয়ে ভালোবাসা *দরকার?*'

'অমন কোনো নিয়ম নেই' চাকো বললো। তবে লোকজন তাই করে।'

চাকো, ধরো, রাহেল বললো মনে কর, এমনি বলছি, এমন হতে পারে যে আম্মু সোফি মলকে বেশি ভালোবাসে আমার আর এসথার চেয়ে কিংবা তুমি সোফি মলের চেয়ে বেশি আমাকে, এমনি ধরো।'

'সব কিছুই হতে পারে, মানুষের স্বভাব।' চাকো বললো তার বই পড়ার মতো গলায়। অন্ধকারে হঠাৎ করে ঝর্নার মত চুলওয়ালা ভাগ্নিটার স্পর্শকাতরতার কথা অনুভব করলো। 'ভালোবাসা। পাগলামী। আশা। *অসীম আনন্দ।*'

এই চারটে জিনিস মানুষের স্বভাবে আছে, রাহেল ভাবল *অসীম আনন্দ কথাটা* সবচেয়ে দুঃখের। কারণ সম্ভবত চাকোর বলার ধরণের জন্যে।

অসীম আনন্দ। এর মধ্যে কেমন একটা গীর্জার ভাব আছে। যেন বিষণ্ণ একটা মরা মাছ, গায়ে পাখনাওয়ালা। একটা ঠাণ্ডা মথ ঠাণ্ডা পাগুলো তুললো।

রাতের মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উঠছিলো। আর একটা মোটা লোক আর একটা ছোট মেয়ে চুপচাপ শুয়েছিলো।

কয়েকটা ঘর পরে, বেবি নানীর নাক ডাকছিলো, এসথা জেগেছিলো। আম্মু ঘুমাচ্ছিল, জানালার নীল কাঁচের মধ্যে দিয়ে রাস্তার ম্লান নীল আলোয় তাকে খুব সুন্দর লাগছিলো। ঘুমের মধ্যে সে হাসছিলো, ঘন নীল জলের মধ্যে থেকে

ডলফিনের লাফিয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে। ঐ হাসিতে আর ক'দিন পরেই একটা বোমা ফাটার কোনো ইঙ্গিত ছিলো না।

এসথা একা হেঁটে গেলো বাথরুমে। বমি করলো, স্বচ্ছ, তিতো, লেবুর মতো, উজ্জ্বল, ঝাঁঝালো তরল। ছোট্ট একটা মানুষের ভয়ের সঙ্গে লড়াই করার প্রথম গলা জ্বলা স্বাদ। দাম দাম।

একটু ভালো লাগছিলো। পায় জুতো গলালো, ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো, করিডোর ধরে হাঁটতে লাগলো, জুতোর ফিতে লটপট করতে লাগলো, গিয়ে দাঁড়ালো রাহেলের দরজায়। রাহেল একটা চেয়ার টেনে ওর উপর উঠে দরজা খুলে দিলো।

অপ্রশস্ত হোটেলের বিছানায় সে বেলাভূমিতে পড়ে থাকা তিমির মত হয়ে রইলো। ভাবছিলো ওটাতো ভেলুথাও হতে পারত, রাহেল তো ওকে আসার পথে দেখেছিলো। সে এটা ভাবতে চায় নি। ভেলুথা তার অনেক কাজ করেছে। ও অচ্ছুৎ পারাভান কিন্তু মেধাবী। উজ্জ্বল ভবিষ্যত। তার আশ্চর্য লাগলো ভেলুথা কবে মার্কসবাদী পার্টির কার্ড পাওয়া সদস্য হলো! আর কবে সে কমরেড কে এন এম পিল্লাইয়ের পাল্লায় পড়লো!

এ বছরের প্রথম দিকে কমরেড পিল্লাইয়ের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ অন্যদিকে মোড় নিয়েছিলো। দু'জন স্থানীয় পার্টি সদস্য– কমরেড গুহাম মেনন আর কমরেড জি কট্টুকরনকে নক্সাল সন্দেহে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো। কমরেড গুহাম লোকসভার আগামী মার্চের উপনির্বাচনে কোট্টাইয়াম থেকে সম্ভাব্য প্রার্থী ছিলেন। তাঁর বহিষ্কার পার্টিতে শূন্যতার সৃষ্টি করেছিলো। আর ঐ শূন্যতা পূরণের জন্যে লাইন দিয়েছিলেন অনেকেই। কমরেড কে এন এম পিল্লাইও ছিলেন তাঁদের একজন।

কমরেড পিল্লাই তখন থেকেই প্যারাডাইস পিকলস-এ কি হচ্ছে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন –ফুটবল ম্যাচের অতিরিক্ত খেলোয়াড়ের মতো সাইড লাইনে বসে। একটা নতুন শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরি করেন। ছোট্ট হলেও এটাকে তাঁর অঞ্চলের ভোট ব্যাংক হিসাবে দেখতেন। লোকসভায় যাওয়ার সিঁড়ি বলে মনে করতেন।

তখন থেকেই প্যারাডাইস পিকলসে কমরেড কমরেড। (আম্মু এমন করেই বলত)। কাজের সময়ে বাইরে সমাবেশ টমাবেশ হতো কিন্তু ভয় পাওয়ার মত কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবাই বুঝতো, একবার দাবি দাওয়া যখন উঠেছে আর চাকোর হাতে যখন নিয়ন্ত্রণটা গেলো তখন ঋণে ডুবে লাল বাতি জ্বলতে আর দেরি হবে না।

তখন থেকেই টাকা পয়সা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। ট্রেডইউনিয়ন নির্ধারিত নূন্যতম মজুরির চেয়ে শ্রমিকদের কম মজুরিতে খাটানো হতো। আর চাকোই ব্যাপারটা ওদের মাথায় ঢুকিয়েছিলো আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো বিষয়টা সে তাড়াতাড়ি দেখবে, তাদের মজুরি ঠিক করে দেবে। সে মনে করতো ওরা তাকে বিশ্বাস করে আর মনে করে, সে তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে আন্তরিক।

তবে কেউ কেউ অন্যভাবে দেখত বিষয়টাকে। এক সন্ধ্যায় ফ্যাক্টরির কাজ শেষ হওয়ার পর কমরেড কে এন এম পিল্লাই প্যারাডাইস পিকলসের মজুরদের নিয়ে গেলেন তাঁর প্রেস-এ। তিনি তাঁর খ্যানখেনে গলায় বিপ্লবের কথা শোনালেন তাদের। তিনি বেশ চালাকির সঙ্গেই মালায়লাম ভাষায় মাওবাদী তত্ত্ব আর স্থানীয় সমস্যাকে মিলিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

'দুনিয়ার মানুষকে' –তিনি গলা চড়িয়ে বললেন 'সাহসী হতে হবে যুদ্ধ করার জন্যে বাধা দূর করার জন্যে, ঢেউ-এর পর ঢেউয়ের মত এগিয়ে যেতে হবে। এ দুনিয়ার মালিক মানুষ। সব রকম দানবদের ধ্বংস করতে হবে। যা আপনাদের ন্যায্য পাওনা, তা দাবি করতে হবে। বাৎসরিক বোনাস। প্রভিডেন্ট ফান্ড। এ্যাকসিডেন্ট ইন্সিওরেন্স।' এই বক্তৃতাটা লোকসভায় যাওয়ার রিহার্সালের একটা অংশ ছিলো মাত্র। যেন লাখ লাখ উত্তাল জনতার উদ্দেশে তিনি বক্তৃতা করছিলেন। তবে ওদের সমাবেশটা ছিলো বেখাপ্পা। তাঁর গলায় ছিলো সবুজ ধান ক্ষেত আর লাল ব্যানার ভেসে যাচ্ছিল নীল আকাশে, আর ছোট্ট ঘরটায় ছিলো ছাপার কালির গন্ধ।

কমরেড পিল্লাই কখনো সোজাসুজি চাকোর বিরুদ্ধে নামেননি। তাঁর বক্তৃতাতেও তিনি ব্যক্তিগত সমস্ত আক্রমণ এড়িয়ে গিয়ে নিজেকে বড় কাজের লোক হিসাবে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। বিপ্লবের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া দানবদের এক একটা খুঁটি হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি ওর নাম ধরে কিছুই বলেন নি। যেন চাকোর মতো অনেক লোকই আছে, সে বহুবচন। এই কৌশলেই তিনি আসল কাজটা করলেন, মানুষটি এবং তার কাজ সম্বন্ধে কিছু বললেন না। তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক লেনদেনও উহ্য রইলো। তিনি প্যারাডাইস পিকলসের লেবেল ছাপতেন। এ থেকে যে আয়টা হত তা তাঁর খুবই দরকার ছিলো। তিনি নিজে চাকোকে দু'ভাবে দেখতেন আগে মক্কেল চাকো, তারপর কর্তৃপক্ষ চাকো। আলাদা দু'টো মানুষ। আবার কমরেড চাকোর সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

কমরেড পিল্লাইয়ের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো ভেলুথা। প্যারাডাইস পিকলসে যত মজুর ছিলো তাদের মধ্যে একলা তারই পার্টির সদস্য –কার্ড ছিল, আর ওটার ব্যবস্থা কমরেড পিল্লাই-ই করেছিলেন। তিনি জানতেন ফ্যাক্টরীর সব উঁচু বর্ণের মজুররা ভেলুথাকে হিংসা করতো পুরোনো জাতপাতর কারণে। কমরেড পিল্লাই সাবধানে ঐ চক্রটা আলগা করে ফেলেছিলেন আর সুযোগ খুঁজছিলেন পিষে সব সমান করে দেবার।

তিনি সবসময় মজুরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ফ্যাক্টরিতে কখন কি হচ্ছে তার খবর রাখাটা তাঁর দৈনন্দিন কাজে পরিণত হয়েছিলো। তিনি তাদের মজুরির ব্যাপারে উত্তেজিত করতেন, বলতেন যখন তাদের নিজেদের জনতার সরকার ক্ষমতায় আসবে তখনই ন্যায্য মজুরি তারা পাবে।

মামাচিকে প্রত্যেকদিন সকালে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতো পুন্যাচেন। ও ছিলো অ্যাকাউন্টেন্ট সে-ই একদিন খবর নিয়ে আসলো মজুররা মজুরি বাড়ানোর দাবি তোলার কথা বলাবলি করছে। মামাচি রেগে গেলেন। বললেন 'ওদেরকে

কাগজটা পড়তে বলো, দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। কাজ নেই মানুষ না খেয়ে মরছে, ওদের এ কাজ থাকার জন্যে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করা উচিত।'

ফ্যাক্টরির সব বাজে কাজের দায় সবসময় মামাচিকেই সামলাতে হতো, চাকোকে নয়, ঐ খবরটার ব্যাপারেও তাই হয়েছিলো। সম্ভবত মামাচি ঠিকমতই জানতেন স্থানীয় প্রথাগুলো। তিনি ছিলেন মোড়লালী (জমিদারনী)। তিনি তাঁর খেলা খেলতেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া হতো কম। সরাসরি আঁচ করা যেতো। আর চাকো ছিলো অন্যরকম, সে ভাবতো সে বাড়ির কর্তা সে, বুক ঠুকে বলতো, *আমার* আচার *আমার* জ্যাম *আমার* মশলার গুঁড়ো। সে অন্য নিয়মে বিষয়গুলো সামলাতে যেতো আর অদৃশ্য সীমাটা অতিক্রম করতো।

মামাচি চাকোকে সাবধান করতেন। সে এক কান দিয়ে শুনতো আর এক কান দিয়ে বের করে দিতো। তাই প্যারাডাইস পিকলসের চাতালে যা হতো তা ছিলো বিপ্লবের জন্যে চাকোর অনুশীলন, কমরেড কমরেড কমরেড খেলা।

ঐ রাতে হোটেলের সরু বিছানায় শুয়ে সে ভাবছিলো, তার ফ্যাক্টরিতে কমরেড পিল্লাই একটা ব্যক্তিগত শ্রমিক উইনিয়ন বানিয়েছেন। ওদের নিয়ে নির্বাচন করবেন। ওরা প্রতিনিধি নির্বাচন করবে তাঁকে। একটা বুদ্ধি তার মাথায় খেললো, এ নিয়ে কমরেড সুমাথির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তার চেয়ে ভালো কমরেড লাকিকুট্টির সঙ্গে কথা বলা, ওঁর চুলগুলো বেশ সুন্দর।

তার চিন্তা আবার ফিরে এসেছিলো সোফি মল আর মারগারেট কোচাম্মাকে ঘিরে। ভালবাসার নিঃশ্বাস বুকে আটকে গিয়েছিলো। সে জেগে রইলো আর এয়ারপোর্টে যাওয়ার প্রহর গুণতে লাগলো।

পাশের বিছানায় তার ভাগ্নে ভাগ্নি দু'টো জড়াজড়ি করে শুয়েছিলো। উষ্ণ আলিঙ্গনে একটা শীতল শিশু, একটা গরম। সে আর ও। আমার আর আমাদের। অনাগত বিপর্যয়ের আশঙ্কা যে ওরা করেনি তা নয়, অপেক্ষা করছিলো।

ওরা ওদের নদীর স্বপ্ন দেখছিলো।

নুয়ে পড়া নারকেল গাছ, নদীর দিকে লক্ষ্য রাখতো নারকেলের চোখ দিয়ে, নৌকাগুলো নিঃশব্দে পিছলে যেতো। সকালে উজানে। সন্ধ্যায় ভাটিতে। মাঝিদের বাঁশের লগি আর নৌকার তেলালো কাঠে ঠোকাঠুকির মৃদু ভোঁতা আওয়াজ উঠতো অন্ধকারে।

তখন উষ্ণ ছিলো, জল, ধূসর সবুজ, ঢেউ খেলানো সিল্কের মতো।

ওতে মাছ ছিলো।

আকাশ আর বৃক্ষ ছিলো।

আর রাতে থাকতো ভাঙা হলুদ চাঁদ।

অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো ওরা। খাবারের ঘ্রাণ পর্দা বেয়ে উঠতে উঠতে সী কুইনের জানালা গলে বেরিয়ে গেলো খাবারের গন্ধওয়ালা সাগারের রাত্রির সঙ্গে নাচতে।

তখন ঘড়িতে বাজে দু'টো দশ।

৫

ঈশ্বরের নিজের দেশ

কয়েক বছর পরে রাহেল নদীটার কাছে ফিরেছিলো, ভয়ঙ্কর করোটির হাসি দিয়ে ওটা তাকে স্বাগত জানিয়েছিলো, দাঁতের জায়গায় ছিলো গর্ত আর শীর্ণ একটা হাত উঠে এসেছিলো হাসপাতালের বিছানা থেকে।

দু'টোই হয়েছিলো।

ওটা শুকিয়েছিলো। আর সে যৌবনবতী হয়েছিলো।

ভাটিতে একটা বাঁধ তৈরি হয়েছিলো নোনা জল আটকানোর জন্যে, তার বদলে পাওয়া গিয়েছিলো ধান চাষীদের ভোট। বাঁধটা আরব সাগর থেকে উঠে আসা নোনা জল আটকাত। ফলে এখন বছরে দু'টো ফসল ফলছে —একটার জায়গায়। বেশি ধান পাওয়া যাচ্ছে একটা নদীর বদলে।

জুন মাস এসে গিয়েছিলো। আর বৃষ্টিও হচ্ছিলো। তবু নদীটা ছিলো শীর্ণ নালার মতো। চিকন ফিতের মত ঘোলা জল কাদা থকথকে দু'পাড় ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছিলো, মাঝে মাঝে মরা মাছের রূপালী মৃতদেহ ভাসছিলো ঝিলিক দিয়ে। পরগাছারা শুঁষে নিচ্ছিল নদীটাকে, জলের নিচে তাদের লোমশ শিকড় সরু শুঁড়ের মতো দুলছিলো। ব্রোঞ্জ রঙের ডানাওয়ালা কাদা খোঁচারা হেঁটে পেরিয়ে যাচ্ছিলো নদীটা। সাবধানে, লাফিয়ে লাফিয়ে।

এক সময় এর ভয় জাগানোর ক্ষমতা ছিলো। জীবন বদলে দিতো। কিন্তু এখন তার দাঁত উপড়ে ফেলা হয়েছে। শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তার। নিস্তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল বাগানের নালার মতো, সাগরের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো আবর্জনা। আগাছার মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছিলো চক্‌চকে প্লাস্টিকের ব্যাগ, গরম দেশের বুনো ফুলও দেখা যাচ্ছিলো মাঝে মাঝে।

যে পাথুরে সিঁড়িগুলো দিয়ে লোকজন সোজাসুজি জলে নামতো স্নান করতে, জেলেরা যেতো মাছ ধরতে, সেগুলো এখন পুরোটাই ডাঙার ওপর, কোথাও নিয়ে যায় না কাউকে। বিমূর্ত অর্থহীন প্রত্ননিদর্শনের মত ওটা মুখ ব্যাদান করে আছে। ভাঙা খাঁজ থেকে মাথা বের করেছে ফার্ন।

নদীর অন্যপাড়ের চেহারাও গেছে বদলে। কাদায় পিচ্ছিল পাড়ে মাটির দেওয়ালের কুঁড়েঘর উঠেছে। বেরিয়ে পড়া নদীর খাড়ি পার হয়ে এসে বাচ্চারা পাছা উঁচু করে বসে মলত্যাগ করছে, ছোটগুলো তাদের গাঢ় বাদামী জিনিস ত্যাগ করে একটু ভিতরে। সন্ধ্যার দিকে নদীটা একটু ফুলে ওঠে। দিনমানে জমা ক্লেদ কিছুটা সাগরে ধুয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। পাড়ের কাদায় ঢেউ চিহ্ন রেখে যায়। উজানে পরিচ্ছন্ন মায়েরা কাপড় কাচে, থালা বাসন ধোয়, কারখানার ময়লা মেশা জলে লোকজন স্নান করে। ঘষে ঘষে সাবান মাখে। গলা জলে নেমে তারা যখন স্নান করে তখন মনে হয় বাগানের নালার ওপর বসানো আবক্ষ কতগুলো মূর্তি।

গরমের দিনে আঁশটে গন্ধ ওঠে নদীটা থেকে আর পুরো এইমেনেমকে ঢেকে ফেলে টুপির মত।

আরও ভিতরে বেশ দূরে একটা পাঁচ তারা হোটেল কোম্পানি কিনে নিয়েছিলো অন্ধকারের হৃদয়টাকে।

ইতিহাসের বাড়িতে (যেখানে পূর্বসূরীরা মানচিত্রের ঘ্রাণ নেয় তীক্ষ্ণ পায়ের নখ গেঁথে, ফিসফিসিয়ে কথা বলে) তখন আর নদী পেরিয়েই গিয়ে ওঠা যেতো না। এইমেনেমের দিকে পিছন ফিরানো ছিলো বাড়িটা। হোটেলের অতিথিরা আসত কোচিন থেকে স্পীডবোটে চড়ে। জলের ওপর ফেনা উঠতো ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো আর রংধনু রঙের তেলের আস্তরণ ভাসতো পিছনে।

হোটেলের দৃশ্যটা ছিলো চমৎকার কিন্তু এখানেও জল ছিলো ঘোলা আর দুষিত। সুন্দর অক্ষরে অনেক কিছুই লেখা ছিলো হোটেল সম্বন্ধে কিন্তু *সাঁতার কাটার* কোন বিষয় তাতে ছিলো না। উঁচু একটা দেওয়াল তুলে কারি সাইপুর জমিদারীর বাইরের বস্তিকে দৃশ্যের বাইরে রাখার চেষ্টা করেছিলো হোটেল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দুর্গন্ধের ব্যাপারে তারা কিছুই করতে পারেনি।

তবে সাঁতার কাটার জন্যে একটা সুইমিংপুল ছিলো। আর তাদের খাবারের মেন্যুতে ছিলো তন্দুরি, রূপচাঁদা আর ক্রিপে সুজেট।

গাছগুলো তখনও সবুজ ছিলো, আকাশ নীল তবে অন্য কিছুও ছিলো। তাই তারা আগ বাড়িয়ে তাদের গন্ধবিধূর স্বর্গের নামকরণ করেছিল –"ঈশ্বরের নিজের দেশ।" তাদের ব্রোসিয়ারে ওভাবেই লেখা ছিলো। কারণ হোটেলের লোকগুলো দারিদ্র্যের গন্ধ ঠিকই টের পেতো। তবে খুব একটা গ্রাহ্য করতো না, অন্য সবকিছু সুশৃঙ্খল রাখতো। একটু শীত শীত ভাব আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঠিকমতো থাকলেই চলে যেতো তাদের।

কারি সাইপুর হোটেলটা মেরামত আর রঙ করা হয়েছে। এখন ওটা বিরাট এক প্রকল্পের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কয়েকটা খাল কেটে আর ব্রিজ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। খালগুলোতে ভাসানো হয়েছে ছোট ছোট নৌকা। চওড়া বারান্দা আর মোটা খুঁটিওয়ালা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের বাংলোটিকে ঘিরে ছোট ছোট কতগুলো কাঠের বাড়ি ছিলো, পূর্বসূরীদের বাড়ি। হোটেল কোম্পানিটি এগুলো সব

প্রাচীন পরিবারগুলোর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলো এবং অন্ধকারের হৃদপিণ্ডে প্রাণ সঞ্চার করেছিলো।

ধনী পর্যটকদের খেলার জন্য ছিলো খেলনা ইতিহাস। যেমন ছিলো জোসেফের স্বপ্নে দেখা ধানের আঁটি, ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক দেশী চাষীর আর্জি জানানোর জীবন্ত দৃশ্য তৈরি করা হয়েছিলো। ইতিহাসের বাড়িটার সঙ্গে পার্থক্য রাখা হয়েছিলো অন্য বাড়িগুলোর। হোটেল কর্তৃপক্ষ বলতো "ঐতিহ্য।"

হোটেলের লোকজন অতিথিদের বলতো সবচেয়ে পুরনো কাছারি বাড়িটার কথা, যেটাতে ছিলো বিশাল নিশ্ছিদ্র গুদামঘর, ওতে এতো ধান রাখা যেতো যে কোন সেনাবাহিনীর এক বছর চলে যেতো। ওটা ছিলো কেরালার মাও সেতুং কমরেড ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের পূর্বপুরুষের বাড়ি –ওরা বিশেষভাবে ইঙ্গিত করে বলতো কথাটা। আসবাবপত্র এবং অন্যান্য জিনিসগুলো দেখানোর জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছিলো যার মধ্যে ছিলো একটা ছেঁড়া ছাতা, একটা কাঠের গহনার বাক্স, একটা ভাঙা ঘোড়ার গাড়ি। সব জিনিসের ওপর লেবেল মারা ছিলো কিংবা প্ল্যাকার্ড লাগানো ছিলো, লেখা ছিলো –'ঐতিহ্যবাহী কেরালা ছাতা এবং ঐতিহ্যবাহী কনের গহনার বাক্স।'

ওরকমই ছিলো ব্যাপারটা, ইতিহাস এবং সাহিত্যকে বাণিজ্যের জন্য মেলানো হয়েছিল। যেন কুটজ এবং কার্ল মার্কস ধনী অতিথিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন নৌকা থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই।

কমরেড নাম্বুদ্রিপাদের বাড়িটা ব্যবহার হচ্ছিলো হোটেলের খাওয়ার ঘর হিসাবে। অর্ধ-সূর্যস্নাত পর্যটকরা সাঁতার কাটতো পোশাক পরেই, ঝিনুকের খোলে পরিবেশিত নারকেলের পানিতে চুমুক দিতো। পুরনো কম্যুনিস্টরা তখন রঙবেরঙের কাপড় পরে বেয়ারার কাজ করতো, ট্রেতে পানীয় নিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতো।

সন্ধ্যায় অতিথিদের আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্বাদ দেওয়ার জন্যে কথাকলি নাচের আয়োজন করা হতো (হোটেলের লোকজন শিল্পীদের বলতো কোন রকমে সেরে দিতে), নাচের দৃশ্যগুলো কাটছাঁট করা হতো। ছ'ঘণ্টার পরিবেশনাকে কেটে ছেঁটে কুড়ি মিনিটে নামিয়ে আনা হতো।

সুইমিংপুলের পাশে হতো নাচ। ঢুলিরা ঢোল বাজাতো, নাচিয়েরা নাচতো আর অতিথিরা সুইমিংপুলে তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে হুটোপুটি করতো। যখন নদী তীরে কুন্তী তার গোপন কথা কর্ণকে বলতো তখন জোড় বাঁধা যুবক-যুবতীরা একে অন্যের গায়ে সূর্যস্নানের তেল মালিশ করতো। কিশোরী কন্যাদের সঙ্গে বাবারা আধা-যৌন জলকেলি করতো, পুথনা কৃষ্ণকে তার বিষাক্ত স্তন্যদান করতো। ভীম দুঃশাসনকে হত্যা করতো আর তার রক্তে দ্রৌপদীর চুল ভেজাতো।

ইতিহাস বাড়ির পিছনের বারান্দাটিকে (যেখানে উঁচু জাতের পুলিশরা জড়ো হয়েছিলো আর একটা প্লাস্টিকের ফোলানো রাজহাঁস ফাটিয়েছিলো) বানানো হয়েছিলো খোলামেলা রান্নাঘর। জঘন্য কাবাব আর কাস্টার্ড তৈরি হতো। ভয় চলে

গিয়েছিলো। সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠতো খাবারের ঘ্রাণ। নিঃস্তব্ধতার মধ্যে মোরগগুলো কক্‌কক্ করতো। আদা রসুন বাটার শব্দ উঠত। নোংরা স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলোকে হত্যা করা হতো —শুয়োর, ছাগল। মাংস কাটা হতো। মাছের আঁশ ছাড়ানো হতো।

কিছু যেন ছিল মাটি চাপা দেওয়া। ঘাসের নিচে। তেইশ বছরের জুন-বৃষ্টির নিচে।

ছোট্ট একটা বিস্মৃত জিনিস।

পৃথিবীর যাতে কিছুই যায় আসে না।

রঙ দিয়ে সময় লেখা একটা বাচ্চার হাতঘড়ি।

দু'টো বাজতে দশ মিনিট বাকি।

রাহেল হাঁটছিলো আর তার পিছন পিছন চলছিলো এক দঙ্গল বাচ্চা কাচ্চা।

"হ্যালো হিপ্পি" —ওরা বলছিল পঁচিশ বছর অনেক সময়, "তোমার নাম কি?"

কেউ একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারলো। তার ছেলেবেলাটা উড়ে গেলো, ছোট হাত ধরে রাখতে পারলো না।

এইমেনেমের বাড়িতে ফেরার পথে রাহেল বড় রাস্তায় উঠলো। এখানেও বাড়িগুলো ছিলো শ্যাওলা ধরা, গাছের নিচে ছিলো বলেই অমন হয়েছিলো। সরু একটা পথ নেমে গিয়েছিলো বড় রাস্তা থেকে। গাড়ি চলার মতো ছিলো না। এইমেনেমের পল্লী শান্ত ছিলো এজন্যেই। সত্যি বলতে কি শহরটার আয়তনের তুলনায় মানুষ ছিলো বেশি। শান্ত, নিস্তব্ধ সবুজের মধ্যে থেকে যে কোন সময় একদল লোক জড়ো করা যেত ডাক দিলেই। একবার এক বেখেয়ালি বাস ড্রাইভারকে ওরা পিটিয়ে মেরেছিলো। বিরোধী দলের ডাকা বন্‌ধের সময় একটা গাড়ির কাঁচ ভাঙচুর করেছিলো। কোট্টাইয়ামের সবচেয়ে ভাল বেকারি থেকে বেবি কোচাম্মার ক্রিমবন কেনা হতো, তাঁর জন্য বিদেশী ইনস্যুলিনও আসতো ওখান থেকেই।

লাকি প্রেসের বাইরে, কমরেড কে এম এস পিল্লাই দাঁড়িয়েছিলেন। বাড়ির দেয়ালের একপাশে ছিলেন তিনি, অন্য পাশে আর একটি লোক। কমরেড পিল্লাইয়ের হাত দুটো বুকের ওপর রাখা ছিলো। মাঝে মাঝে তিনি মৃদু চাপড় মারছিলেন বাহুতে। মনে হচ্ছিলো যেন কেউ ধার চাইছে আর তিনি না করছেন। দেয়ালের বাইরে দাঁড়ানো লোকটার হাতে ছিলো একগাদা ফটো। সেগুলো সে প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে খুলে দেখাচ্ছিলো। বেশিরভাগ ছবিই ছিলো কমরেড কে এন এম পিল্লাইয়ের ছেলে লেনিনের। দিল্লিতে থাকে। ডাচ আর জার্মান দূতাবাসের বিদ্যুৎ, জল আর রঙ করার কাজগুলো করে। তার রাজনৈতিক পরিচয় মক্কেলরা যাতে না পায় সে জন্য নামটা সে একটু বদলে নিয়েছিলো; নিজেকে সে বলতো লোভিন এখন পি লভিন।

রাহেল আনমনে হেঁটে যাচ্ছিল। ও বুঝতেও পারেনি সে কি করতে যাচ্ছে।

আঈও রাহেল মল! ডাকলেন কমরেড কে এন এম পিল্লাই, তাকে চিনতে পেরেছিলেন আগেই।

'অরবহুমিল্লি? কমরেড কাকা?'

'উআর,' বললো রাহেল।

ওকি তাঁকে চিনতে পেরেছিলো? পেরেছিলো নিশ্চই। আর কোন প্রশ্নোত্তর না হলেও নীরব একটা কথা হয়ে গিয়েছিলো। দুজনেই জানত অনেক কিছু ভুলে যেতে হবে। অনেক কিছু আবার ভেলা যাবে না, ধুলো ভরা তাকে খড়ভরা মরা পাখি সাজিয়ে রাখার মতো –চোখ মেলে ওগুলো থাকবে।

তা! কমরেড পিল্লাই বললেন, 'আমি মনে করেছিলাম তুমি *আমাইরিকাতেই* আছ?'

না, আমি এখানেই রাহেল বললো।

'আচ্ছা আচ্ছা' খানিকটা তাড়াহুড়োয় বললেন 'কিন্তু আমাইরিকাতেই তো থাকার কথা ছিলো?'

কমরেড পিল্লাই ভাঁজ করা হাত খুললেন, দেয়ালের ওপর দিয়ে তাঁর খোলা বুকের বোঁটা দু'টো রাহেলের দিকে উঁকি মারছিলো সেন্ট বার্নার্ডের চোখের মতো।

'চিনতে পারছ?' ফটো হাতে লোকটিকে থুতনি নাচিয়ে প্রশ্ন করলেন কমরেড পিল্লাই।

লোকটি মাথা নাড়লো।

'ঐ যে বুড়ি প্যারাডাইস পিকলস কোচাম্মার মেয়ের মেয়ে,' বললেন কমরেড পিল্লাই। লোকটি বুঝতে পারলো না। বাইরের লোক। আচার খায় না। কমরেড পিল্লাই অন্যভাবে চেষ্টা করলেন।

'পুন্নান কুঞ্জু?' তিনি প্রশ্ন করলেন। আকাশে অবছায়ায় দেবতার হাত খেলে গেলো, ফটো হাতে অচেনা লোকটির মাথায় সবকিছু খোলাসা হলো। সে মাথা নাড়লো সবজান্তার মতো।

'পুন্নান কুঞ্জুর ছেলে? বিনান জন ইপে?'

'ঐ যে দিল্লিতে থাকতো?' কমরেড পিল্লাই বললেন।

'উআর, উআর উআর' লোকটি বললো।

'তার মেয়ের মেয়ে এখন আমাইরিকায় (আমেরিকা উচ্চারণ ওভাবেই করতেন তিনি) থাকে।'

লোকটি মাথা নাড়তে লাগলো যেন রাহেলের পূর্বপুরুষরা সব তার সামনে এসে পড়ল।

'উআর, উআর উআর। এখন আমাইরিকায় থাকে তাই না।'

ওটা আসলে প্রশ্নই না। অন্যরকম একটা সম্মান।

তাঁর মনে পড়লো কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির কথা। ঘটনা মনে নেই, তবে মনে পড়লো যৌনতা আর মৃত্যুর ব্যাপার ছিলো। খবরের কাগজে ছাপাও হয়েছিলো। একটু চুপ করে থেকে হালকা হাত নেড়ে লোকটি কমরেড পিল্লাইয়ের হাতে ফটোর ব্যাগটা দিলো।

ঠিক আছে কমরেড, আমি যাই।

সে বাস ধরার জন্যে চলে গেলো।

'তাহলে।' কমরেড পিল্লাই হাসলেন সার্চলাইটের মত তিনি রাহেলের দিকে ফিরলেন সবটুকু মনযোগ নিঙড়ে। তাঁর দাঁতের মাড়ীগুলো ছিলো উজ্জ্বল গোলাপী। সারাজীবন নিরামিষভোজী থাকার ফলে। তাঁর চেহারা এমন যে দেখলে মনেই হয় না, কখনও তিনি ছোট ছিলেন। কিন্তু ছিলেন। মনে হয় যেন তিনি এমন মধ্যবয়সী হয়েই জন্মেছেন, এমন কাঁচাপাকা চুল নিয়েই।

'মোলের কর্তা?' তিনি জানতে চাইলেন।

'আসেনি'।

'না।'

'নাম?'

'ল্যারি লরেন্স'

'উআর, লরেন্স,' এমনভাবে মাথা নাড়লেন কমরেড পিল্লাই যেন তিনি সায় দিলেন। তাঁর মতামত যেন খুব জরুরি। আবার বললেন

'কোন ছেলেপিলে?'

'না,' রাহেল জবাব দিলো

'এখনও পরিকল্পনায় আছো না চাচ্ছ?'

'না'

'একটা কিছু তো হবেই, ছেলে বা মেয়ে।' কমরেড পিল্লাই বললেন 'দু'টো তো তুমি নেবেই।'

'ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে'। বিস্ময়ে চুপ করে যাবে, ভেবেছিলো রাহেল।

'ডিভোর্স?' তাঁর কণ্ঠস্বর এত উঁচু হয়ে উঠলো যে প্রশ্নের সীমা ছাড়ালো। এমনভাবে তিনি শব্দটা উচ্চারণ করলেন যেন মনে হলো কোন মৃত্যু সংবাদ শুনেছেন।

'খুব খারাপ কথা' ধাতস্থ হয়ে তিনি বললেন।

কোন কারণে আবার তাঁর মুখ দিয়ে শুদ্ধ উচ্চারণে বের হল--

'খু-উব খারাপ।'

কমরেড পিল্লাইয়ের মনে হলো বুর্জোয়াদের উত্তরসূরীরা পূর্বপুরুষদের দায় শুধছে।

একটা পাগল, আর একটা স্বামী ছাড়া, মনে হয় উচ্ছন্নে গেছে।

এই মনে হওয়াটা হল আসল বিপ্লব। খৃস্টান বুর্জোয়ারা নিজেদের ধ্বংস করছে।

কমরেড পিল্লাই তাঁর গলা খাটো করে এমনভাবে বললেন যেন অন্য কেউ শুনে ফেলবে ।

'আর মন?' ফিসফিস করে তিনি বললেন 'সে কেমন আছে?'

'ভালো,' বললো 'ও ভালই আছে'

ভালো, রোগা মধুরঙা। সে তার কাপড় কাচে টুকরো সাবান দিয়ে।

'এইও পাআভাম'। কমরেড পিল্লাই ফিসফিসিয়ে বললেন, 'হতভাগা'

রাহেল আশ্চর্য হলো তাকে এত প্রশ্ন করে তাঁর কি লাভ হলো, এতো ঘনিষ্ঠভাবে প্রশ্ন করলেন অথচ তাঁর উত্তরকে পাত্তাই দিলেন না। নিশ্চই তিনি সত্যি কথাটা শুনতে চাননি কিন্তু অন্য কিসে যেন তিনি বিচলিত।

'লেনিন এখন দিল্লিতে,' কমরেড পিল্লাই তাঁর গর্ব লুকাতে পারলেন না; 'বিদেশী দূতাবাসগুলোতে কাজ করে। 'দেখ!'

রাহেলের হাতে তিনি সে সেলোফ্যানের ব্যাগটা দিলেন। ছবিগুলোর বেশির-ভাগই ছিলো লেনিন ও তার পরিবারের। তার বউ, তার বাচ্চা, তার নতুন বাজাজ স্কুটার। একটা ছবিতে লেনিন গোলাপী একটা লোকের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিলো।

'জার্মান ফাস্ট সেক্রেটারি' কমরেড পিল্লাই বললেন।

ফটোতে তাদের খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিলো, লেনিন আর তার বউ। কিস্তিতে কেনা ডি ডি এ ফ্ল্যাটের ড্রইংরুমে নতুন একটা রেফ্রিজারেটর ছিলো।

রাহেলের মনে পড়লো লেনিনকে নিয়ে একটা ঘটনার কথা। তার আর এসথার আসল বন্ধু ছিলো সে-ই। সে আর এসথা ছিলো তখন পাঁচ বছরের আর লেনিন ছিলো তিন-চার বছরের বড়। কোট্টাইয়ামের শিশু রোগ বিশেজ্ঞ ডা. ভার্গিস। ভার্গিসের চেম্বারে একদিন তাদের দেখা হয়েছিলো। রাহেলের সঙ্গে ছিলো আম্মু আর এসথা। লেনিন গিয়েছিলো তাঁর মা কল্যাণীর সঙ্গে। রাহেল আর লেনিনের সমস্যা ছিলো একই। নাকে তাদের কিছু ঢুকেছিলো।

এমন কাকতালীয় ব্যাপার সহজে ঘটে না তবে সেদিন ঘটেছিলো। রাজনৈতিকভাবে দুই মেরুর দুই পরিবারের বাচ্চাদের একই সমস্যা। একজন ছিলো আত্মগর্বী পতঙ্গ বিশারদের নাতনী, আর একজন ছিলো তৃণমূল পর্যায়ের মার্কসবাদী পার্টিকর্মীর ছেলে। সেজন্য রাহেলের নাকে ঢুকেছিলো একটা কাঁচের পুঁতি আর লেনিনের একটা সবুজ বিচি।

ওয়েটিং রুম ছিলো ভর্তি।

ডাক্তারের পর্দার ওপার থেকে নানান রকম অসুস্থতার শব্দ আসছিলো। কোন কোন বাচ্চা হাঁউমাউ করে চেঁচাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কাঁচ আর ধাতব আওয়াজ উঠছিল, ফিসফিসানি আর ফুটন্ত পানির শব্দ হচ্ছিলো। *'ডাক্তার আছে ডাক্তার নেই'* —লেখা দেয়ালে ঝোলানো একটা কাঠের টুকরো নিয়ে খেলছিলো একটা ছোট ছেলে। তামার পাত মোড়ানো বস্তুটা দুলছিলো। ছোট্ট একটা বাচ্চা জ্বরের ঘোরে মায়ের বুকে হেঁচকি তুলছিলো। ভারি বাতাসে সিলিং ফ্যানটা ঘুরছিলো আস্তে আস্তে, যেন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটা বিরাট আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল যন্ত্রটা।

কেউ কোন পত্রিকা পড়ছিলো না'

ময়লা একটা পর্দা ঝুলছিলো দরজায়, তাতে রাস্তাটা আড়াল হয়েছিলো। ওর তলা দিয়ে স্লিপ- স্ল্যাপ করে যাওয়া আসা করছিল চটি পরা পাগুলো। একটা

নির্বিকার শব্দ মথিত জগত, নাক নিয়ে যাদের কোন চিন্তা ছিলো না। আম্মু আর কল্যাণী তাদের বাচ্চা বদল করে চেষ্টা করছিলো নাকে ঢুকে থাকা জিনিসগুলো বের করার জন্যে। মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে, পিছনে নিয়ে নানান কসরৎ করছিলো তারা। আলোর কাছে নিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলো কি আছে নাকের ভিতর।

একজন দেখতে পেয়েছিলো কিন্তু আর একজন পায় নি। ট্যাক্সির মত হলুদ একটা শার্ট আর কালো হাফপ্যান্ট পরে ছিলো লেনিন, বসেছিলো নাইলনের শাড়ি পরা মায়ের কোলে। শাড়ির ফুলগুলোর মধ্যে যে আড়মোড়া হয়ে বসেছিলো। বাঁ হাতের তর্জনীটা সে বার বার তার খোলা নাকটার মধ্যে ঢোকাচ্ছিলো আর মুখ দিয়ে আওয়াজ করে নিশ্বাস নিচ্ছিল। আয়ুর্বেদী তেলে তার মাথার চুল চপ চপ করছিলো। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তার হাতে ছিলো চকলেটের প্যাকেট। একটার পর একটা খেয়ে যাচ্ছিল। দুনিয়াতে সবকিছুই ভালো। ওই বয়সে তার পক্ষে ঠিকমত বোঝার কথাও নয়, ওয়েটিং রুমের পরিস্থিতি আর পর্দার পিছনের চীৎকারের কারণ কিংবা ডাক্তার ভি ভি'র ভয়ও তেমন ছিলো না। একটা লোমশ ইঁদুর বেশ কবার যাওয়া আসা করলো ডাক্তারের ঘর থেকে ওয়েটিং রুমের আলমারীটার তলায়।

একটা নার্স আসলো, আবার চলে গেলো ছাপা পর্দাওয়ালা ডাক্তারের ঘরে। বিদঘুটে সব অস্ত্র ছিল তার হাতে। ছোট একটা ভায়াল, রক্তমাখা চারকোণা একটা কাঁচ, চকচকে একটা টেস্টটিউবে পেসাব ভরা, স্টেইনলেস স্টিলের ট্রেতে ফোটানো পানিতে ধোঁয়া সূঁচ। তার পায়ের লোমগুলো দেখে মনে হচ্ছিল স্বচ্ছ বাদামী মোজার ওপর তার পেঁচানো। চকচকে কালো চুলের ক্লিপ যেন সোজা করা কিলবিলে সাপ, তেলালো চুলের সঙ্গে নার্সের টুপিটাকে আটকে রেখেছিলো।

তার চোখে যেন ইঁদুর না দেখার ফিল্টার লাগানো ছিলো। কারণ লোমশ ইঁদুরটা তার পায়ের ফাঁক দিয়ে যাওয়া আসা করছিলো। কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছিলো না। নিচু পুরুষালী স্বরে সে নাম ডাকছিলো, 'এ নিনাম...এস কুসুমালতা.. বিভি রোশিনি... এন আম্বাদি।' ঘুরপাক খাওয়া অস্বস্তিকর বাতাসকে সে তোয়াক্কা করছিলো না।

এসথার চোখ ভয়ে বড় বড় হয়ে গিয়েছিলো, সে *ডাক্তার আছে ডাক্তার নেই* তে মোহিত হয়েছিলো।

রাহেলের ভয় লাগলো না।

'আম্মু আর একবার দেখি?'

আম্মু মাথার পেছনটা চেপে ধরলো এক হাতে।

খোলা নাকটা চেপে ধরল রুমাল দিয়ে। ওয়েটিং রুমের সব চোখ তখন রাহেলের দিকে। জীবনে এমন প্রদর্শনী সে আর করেনি। এসথাও নাক ফোলাতে লাগলো। তার মাথার সামনের দিকটার রক্ত জমে গেলো একটা বড় করে নিশ্বাস নিলো।

রাহেল সব শক্তি সঞ্চয় করলো, মনে মনে বলতে লাগলো 'ঈশ্বর দয়া করে ওটা বের করে দাও।' পা থেকে মাথা পর্যন্ত আর হৃদপিণ্ডের সমস্ত শক্তি এক করে সে নাক ঝাড়লো মায়ের রুমালে।

আর খানিকটা সর্দির সাথে জিনিসটা বেরিয়ে এলো, একটা ভেজা পুঁতি। যেন ঝিনুক থেকে বেরিয়ে আসা মহামূল্যবান মুক্তো। বাচ্চারা ওটা দেখতে এগিয়ে এলো। কাঠের টুকরো নিয়ে খেলছিলো যে কদাকার ছেলেটা সেও থেমে গেলো।

'আমিও সহজেই পারবো' লেনিন বললো।

'চেষ্টা করে দেখ, না পারলে চড় খাবি,' ওর মা বললো।

'মিস রাহেল' চারিদিকে তাকিয়ে নার্স ডাকলো।

'ওটা বেরিয়ে গেছে' আম্মু নার্সকে বললো।

নার্সটার কোন ধারনা ছিলো না, সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো।

'ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি' আম্মু বললো, পুঁতিটা বেরিয়ে গেছে।

'এরপরে' নার্স বললো তার ইঁদুর না দেখা চশমা নাড়িয়ে–

'এস ভি এস কুরুপ।'

ঘ্যান ঘ্যানে বাচ্চাটা এবার চীৎকার জুড়ে দিলো, তার মা তাকে ডাক্তারের ঘরের দিকে ঠেলে দিলো।

রাহেল আর এসথা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। ছোট্ট লেনিন রইলো ডাক্তারের কামরায়। ডাক্তার ভার্গিস ভার্গিসের ঠাণ্ডা ইস্পাতের যন্ত্রপাতি দিয়ে তার বন্ধ নাক খোলানোর জন্যে। তার মা তাকে বলছিলো নরম কিছু দিয়ে কাজটা হবে।

ঐ রকম ছিলো লেনিন।

এখন তার একটা বাড়ি আছে একটা বাজাজ স্কুটার আছে, আছে একটা বউ আর বাচ্চা।

ছবি ভর্তি ব্যাগটা রাহেল ফেরত দিলো কমরেড পিল্লাইকে এবং বিদায় নিতে চাইলো।

'এক মিনিট' কমরেড পিল্লাই বললেন। তাঁকে মনে হচ্ছিল, পথে খেলা দেখানো যাদুকরের মতো। তার খোলা বুকের স্তনবৃন্ত দিয়ে তিনি মানুষকে টেনে রাখছেন তারপর তাদেরকে দেখতে বাধ্য করছেন তাঁর ছেলের ছবি। তিনি ছবির বড় একটা প্যাকেটের মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগলেন।

'ওরকুন্নমদো?'

ওটা ছিলো পুরনো সাদা-কালো ছবি। চাকো তুলেছিলো ক্রিসমাসে মার্গারেট কোচাম্মার কিনে দেওয়া রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা দিয়ে। ছবিতে চার জন ছিলো। লেনিন, এসথা সোফি মল আর রাহেল। এইমেনেমের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলো। পিছনে ছিলো বেবি কোচাম্মার ক্রিসমাস বাড়ি। একটা কার্ডবোর্ডের তারা ঝুলছিলো বাল্বের সঙ্গে। লেনিন রাহেল এবং এসথাকে মনে হচ্ছিলো গাড়ির

হেড লাইটের সামনে পড়া হতভম্ব জন্তুর মত। হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু সেঁটে ছিলো। মুখে হাসি জমে গিয়েছিলো, হাতগুলো খাড়া ঝুলছিলো, বুকটান করে ওরা ফটো তোলার জন্য দাঁড়িয়েছিলো। যেন একটু পাশে সরলে পাপ হতো।

একমাত্র সোফি মল তার জৈবিক বাবার তোলা ছবিতে ছিলো প্রাণবন্ত। সুন্দর করে তাকিয়েছিলো সে। তার গোলাপী শিরাওয়ালা চোখের পাতাগুলো (সাদা-কালো ছবিতে ধূসর লাগছিলো) উজ্জ্বল হয়েছিলো। তার গায়ে ছিলো হলদেটে লেবুরঙা জামা। দাঁতের ফাঁক দিয়ে সে জিভ বের করে রেখেছিলো, সামনে ধরা ছিলো মামাচির রূপোর ঘটিটা। (ওটা সে এসেই হাইজ্যাক করেছিলো, ওটাতেই সে জল খেত)। আর এক হাতে ছিলো মোমবাতি। এক পায়ের হাঁটুর ওপর গুটিয়ে রেখেছিলো ডেনিম বেলবটম, হাঁটুতে একটা মুখ আঁকা ছিলো। ছবিটা তোলার কিছুক্ষণ আগেই সে এসথা আর রাহেলকে বোঝাচ্ছিল তাদের জারজ হওয়ার সম্ভাবনা কতটা ছিলো! জারজ বলতে সত্যি কি বোঝায় তাও সে বলেছিলো (ছবিটা দেখে রাহেলের এসব মনে পড়ে গিয়েছিলো)। এক ধরনের চেতনা, যদিও যৌনতার বিষয়টি খুব একটা পরিষ্কার ছিলো না কিভাবে হলো তা বোঝাতে চেয়েছিলো...

তার মারা যাওয়ার একদিন আগে।

সোফি মল।

ঘটিতে জল খাওয়া

কফিন–গাড়িতে চড়া।

সে বোম্বে-কোচিন ফ্লাইটে এসেছিলো। মাথায় হ্যাট, পরনে ছিলো বেলবটম আর প্রথম থেকেই সে সবার ভালোবাসা পেয়েছিলো।

৬

কোচিনের ক্যাঙ্গারু

কোচিন এয়ারপোর্টে রাহেল গিয়েছিলো বড় বড় ছোপওয়ালা ঢেউ তোলা নিকারবোকার পরে। কি করতে হবে তার মহড়া হয়ে গিয়েছিলো। দিনটা ছিলো খেলার। সোফি মল কি ভাববে? সেই এক সপ্তাহ্‌র চিন্তার শেষ পর্ব ছিলো ওটা।

সকাল বেলা হোটেল সী কুইনে আম্মু রাহেলকে আগে থেকে ঠিক করে রাখা এয়ারপোর্ট পোশাকটা পরতে সাহায্য করেছিলো। আম্মু রাতে স্বপ্ন দেখেছিলো ডলফিন আর ঘননীল–। আম্মু তাকে পরিয়েছিলো বকরম দিয়ে ফোলানো একটা নীলচে রূপালী স্কার্ট। হলুদ লেসের কাজ করা আর দু'কাঁধে ছিল দু'টো ফুলকরা। আম্মু সাধারণত ও ধরনের কাপড় পছন্দ করে না। রাহেলের ভয় হলো সানগ্লাসের সঙ্গে ড্রেসটা মানাবে কিনা।

তারপর আম্মু বের করেছিলো রাহেলের নিকারটা। পাগুলো যখন নিকারের মধ্যে ঢোকাচ্ছিলো তখন রাহেল আম্মুর কাঁধে দু'হাত রেখেছিলো। ইলাস্টিকটা তার পেটের চামড়ার ওপর আস্তে করে বসে গেলো।

'থ্যাঙ্ক ইউ আম্মু' রাহেল বললো।

'থ্যাঙ্ক ইউ' আম্মুর বললো।

আম্মু হেসে বললো 'ঠিক আছে, আমার লক্ষ্মী সোনামণি,' হাসছিলো কিন্তু যন্ত্রণাও ছিলো।

'ঠিক আছে আমার সোনামণি।'

রাহেলের হৃদয়ের মথটা পা ওঠালো, আবার নামালো। ছোট্ট পাগুলো ছিলো ঠাণ্ডা।

একটু আগে মা তাকে আদর করেছে।

সী কুইন হোটেল রুমটায় ছিলো ডিম আর কফির ঘ্রাণ।

গাড়ি পর্যন্ত যেতে যেতে এসথা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো ফোটানো জল ভরা ঈগেলে ভ্যাকাম ফ্লাস্কটি। ঈগেল ভ্যাকাম ফ্লাস্কে ছিলো একটা ঈগল পাখি। দু'ডানা ছড়িয়ে,

তার থাবার নিচে ছিলো একটা গ্লোব, যমজরা মনে করতো ঐ ঈগল পাখিটা সারাদিন আকাশে উড়ে বেড়ায় আর রাতে তাদের ফ্লাস্কের চারিদিকে ঘোরে। প্যাঁচাদের মতো নিঃশব্দে সে ওড়ে, ডানায় জ্যোৎস্না মেখে।

চোখা কলারওয়ালা একটা লাল শার্ট পরেছিলো এসথা আর কালো চোঙা একটা প্যান্ট। তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিলো, সাদাটে দেখাচ্ছিল। কড়া সেদ্ধ ডিমের মতো।

কি মনে করে হঠাৎ এসথা বললো, রাহেলকে বোকা বোকা লাগছে, রাহেল ওকে একটা চড় মারল, সেও মারল পাল্টা। এয়ারপোর্টে ওরা কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলেনি।

চাকো সবসময় মাণ্ডু পরতো কিন্তু সেদিন পরেছিলো বেখাপ্পা আটসাঁট স্যুট। মুখে ঝুলিয়ে রেখেছিলো হাসি। আম্মু তার টাইটা ঠিক করে দিয়েছিলো। ওটা বার বার বেঁকে যাচ্ছিলো বেয়াড়াভাবে। মনে হচ্ছিলো যেন ওটার খিদে পেয়েছিলো নাস্তা খাওয়ার পর ঠিক হলো।

আম্মু বললো, 'হঠাৎ তোমার কি হল জনগণের মানুষ?' গালে টোল ফেলে কথাগুলো বললো সে, চাকো ছিলো খোশ মেজাজে। আনন্দেও ছিলো সে।

চাকো তাকে চড় মারেনি।

আম্মুর পাল্টা মারেনি।

সী কুইনের ফুলের দোকান থেকে চাকো দু'টো লাল গোলাপ কিনেছিলো আর খুব আলতো করে ধরে রেখেছিলো।

বড়।

প্রিয়।

কেরালা পর্যটন উন্নয়ন করপোরেশনের দোকান ছিলো একটা এয়ারপোর্টে। ওখানে ছিলো এয়ার ইন্ডিয়ার তিন মহারাজা ছোট, বড়, মাঝারি। চন্দন কাঠের হাতি ছিলো, (ছোট, বড়, মাঝারি) কথাকলি নাচিয়েদের মুখোশ ছিলো (ছোট, বড়, মাঝারি)।

বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিলো চন্দন আর টেরিকটনের সুঘ্রাণ।

অ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জে ছিলো সিমেন্টের তৈরি চারটি ক্যাঙ্গারু। ওদের পেটের থলিতে লেখা ছিলো 'আমাকে ব্যবহার করুন।' তাদের পেটের থলিতে সিমেন্টের বাচ্চা থাকার বদলে ছিলো সিগারেটের টুকরো, ম্যাচের কাঠি, বোতলের ছিপি, চিনাবাদামের খোসা, বাতিল মোচড়ানো কাগজ, কাগজের ক্যাপ আর তেলাপোকা।

পানের পিকে ক্যাঙ্গারুদের পেট এমন লাল হয়েছিলো যে মনে হচ্ছিল আহত হয়ে রক্ত ঝরছে।

কানের খাড়া কোনাগুলো ছিলো গোলাপী রঙের। মনে হচ্ছিলো ছুঁলেই ওরা ব্যাটারির স্বরে 'মা-মা' বলে ডেকে উঠবে।

সোফি মলের প্লেন যখন বোম্বে কোচিনের নীলাকাশে দেখা দিল ভিড়টা তখন রেলিঙে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সবাই চাইল আরও ভালো করে দেখতে।

এই অ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জটা ছিলো কোলাকুলি আর ভালোবাসার জায়গা, কারণ এখানকার প্রবাসী লোকজন এই ফ্লাইটেই দেশে ফিরতো।

তাদের পরিবারের লোকজন এখানে জড়ো হতো। কেরালার দূর-দূরান্ত থেকে তারা বাসে চড়ে আসতো। রাশ্মি থেকে, কুমিলি থেকে, ভিজহিনজাম থেকে, উঝাভুর থেকে। কেউ কেউ এয়ারপোর্টের পাশেই রাত কাটাতো, সঙ্গে আনা খাবার খেতো। ফিরে যেতে যেতে চিবাতো চিপ্‌স আর খেতো দলা পাকানো ভিলাই ছাতু।

সবাই যেতো সেখানে, কালা আম্মুমাস, কান্তাকিরোস, বাতে কুঁজো আপ্পুপান, তাদের দজ্জাল বউরা, বক বক করা চাচা-মামারা, ছুটে বেড়ানো বাচ্চারা। কিছু কিছু ব্যাপার ছিলো চোখে পড়ার মতো। এক মাস্টারনী তখনও সৌদি ভিসার অপেক্ষায় ছিলো, তার ননদ ছিলো যৌতুকের অপেক্ষায়। তার স্বামীটি ছিলো রড মিস্ত্রি।

'বেশির ভাগই মেথর অচ্ছুৎ' বেবি কোচাম্মা বিড় বিড় করে বললেন। তাঁর চোখ ছিলো একটা মহিলার ওপর, সে তাঁর বাচ্চার নুনুটা একটা খালি বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে পেসাব করাতে চেষ্টা করছিলো, বাচ্চাটা খুব মজা পাচ্ছিলো, সে আসল কাজটা না করে হাসছিলো আর হাত নাড়াচ্ছিলো।

সিসস্...মা টি আওয়াজ করেই চলেছিলো। প্রথমদিকে আস্তে আস্তে তারপর জোরে জোরে জন্তুর মতো। কিন্তু তার ছানাটি তখন পোপ হয়ে গেছে। সে হাসে আর হাত নাড়ে, হাসে আর হাত নাড়ে। বোতলে নুনু ঢুকিয়ে।

রাহেল আর এসথাকে বেবি কোচাম্মা বললেন, 'মনে রাখবে তোমরা হচ্ছ ভারতের দূত, তোমাদেরকে দেখেই ওরা তোমাদের দেশ সম্বন্ধে প্রথম ধারণাটা পাবে।' দুই ডিমের যমজ দূত। তাদের মহামান্য দূত এ (লভিস) পেলভিস এবং দূত এস (টিক) ইনসেক্ট।

লেস লাগানো কড়কড়ে নতুন কাপড় আর লাভ-ইন-টোকিও দিয়ে চুল বাঁধা, চশমা পরা রাহেলকে মনে হচ্ছিলো এয়ারপোর্টের পরী, রুচিশীল। তার পিছনটা ঘামছিলো (আর এসথার ওরকম হয়েছিলো হলুদ চার্চে শেষকৃত্যের সময়) উদ্বেগ ছিলো। সে দেখলো ইস্পাতের মতো ঝক ঝকে পাখিটাকে, যার মধ্যে ছিলো তার মামাতো বোন, সে দেখলো কী মসৃণভাবে ওটা এসে নামলো এয়ারপোর্টে।

গোড়ালি আর পাতা
গোড়ালি আর পাতা।

অনেকটা দৌড়ে।

এয়ারপোর্টের ময়লা তাদের বাচ্চার থলিতে।

সবচেয়ে ছোটটির মাথা ছিলো ইংরেজি সিনেমার অফিস ফেরতা লোকের মতো আলগা টাই পরা। মাঝখানেরটির সামনে পড়েছিলো আধপোড়া একটা সিগারেট। সে দেখলো একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ ভরা পুরনো কাজু বাদাম। সবচেয়ে বড়টি

কথাকলি নাচিয়েদের মতো মাথা হেলিয়ে যেন বলছিলো, 'নমস্তে কেরালা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছে।' আর একটা ক্যাঙ্গারু যেন উল্টো করে বলছিলো কথাগুলো।

ব্যস্ত হয়ে রাষ্ট্রদূত রাহেল যেন সাংবাদিকদের এড়িয়ে তার সঙ্গীদূত– ভাইকে নিয়ে এগোলো।

'এসথা দ্যাখ্! দ্যাখ্ এসথা দ্যাখ্'

রাষ্ট্রদূত এসথা দেখলো না। চাইলোও না। সে তাকিয়েছিলো সিঁড়ির দিকে, হাতে ছিলো জল ভর্তি ঈগেল ফ্লাস্ক। চিন্তা করছিলো অরেঞ্জড্রিঙ্ক আর লেমনড্রিঙ্ক কোথায় পাওয়া যায়! এইমেনেমের কারখানায়, মীনাচল নদীর পাড়ে! আম্মু তার হ্যান্ডব্যাগ জাপটে ধরে দেখছিলো। চাকোর হাতে ছিলো গোলাপ দু'টো, বেবি কোচাম্মা তাঁর গলার আঁচিল খুঁটছিলেন।

বোম্বে-কোচিনের লোকজন নেমে এলো। ঠাণ্ডা বাতাস থেকে গরম বাতাসে। লাউঞ্জের দিকে আসতে আসতে আড়মোড়া ভাঙছিলো তারা।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছালো। ফেরত প্রবাসীরা। ওয়্যাশ এ্যান্ড ওয়্যার স্যুট আর রঙধনু রঙা চশমা পরা। তাদের অভিজাত স্যুটকেসে লেগেছিলো দারিদ্র্য। কুঁড়ে ঘর পাকা করার স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলো কেউ, কেউ এনেছিলো বাপ-মায়ের বাথরুমের জন্য গীজার। পারলে সেপটিকট্যাঙ্ক কিম্বা নর্দমাও নিয়ে আসতো। ম্যাক্সি আর হাই হিল। রঙ চড়ানো মুখ আর লিপস্টিক। ম্যাক্সির নড়াচড়া আর ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলা। বন্ধ আলমারীর চাবি সামলানো। কাপ্পা আর ছাতু খাওয়ার জন্যে উতলা হয়ে ওঠা, অনেকদিন খায় না। ভালোবাসা আর লজ্জার নানান দৃশ্য নানান পরিবারের। প্রায় একই রকম।

'কেমন কাপড় চোপড় তারা পরে এসেছে! এয়ারপোর্টে আসার জন্যে নিশ্চয়ই আরও কিছু ছিলো। মালায়ালীজদের এমন উঁচু দাঁত কেন?'

এয়ারপোর্টটা যেন লোকাল বাস ডিপো হয়ে যায়। পাখি হেগে দেয় বিল্ডিংটার যেখানে সেখানে, পানের পিকের দাগ ধরে ক্যাঙ্গারুদের গায়।

'ওহো! ইন্ডিয়ায় আসা মানে কুকুরের কাছে যাওয়া।'

লম্বা বাস জার্নি, এয়ারপোর্টে রাত কাটানো, দেখা হওয়া, ভালোবাসা, লজ্জা, বিরাগ সব কিছুই বাড়তে থাকে আর বিদেশ ফেরতারা জানতেও পারে না কখন তারা ইতিহাসের বাড়ির বাইরে ফাঁদে আটকে গেছে। তাদের স্বপ্ন আবার দেখা হচ্ছে।

ওয়াশ এ্যান্ড ওয়্যার স্যুট আর চকচকে স্যুটকেস নিয়ে আসলো সোফি মল।

ঘটিতে জল খাওয়া।

কফিনের গাড়িতে চড়া।

রানওয়ে দিয়ে সে হেঁটে এলো লন্ডনের গন্ধ ছিলো তার চুলে। গোড়ালি ছুঁয়ে ছিল বেলবটমের বেল। স্ট্র হ্যাটের নিচে দিয়ে ঝুলেছিলো লম্বা চুল। মায়ের এক হাত ধরে ছিলো, অন্যটা দোলাচ্ছিল সৈন্যদের মতো (লেফ লেফ, লেফরাইটলেফ)

এক ছিলো
মেয়ে
লম্বা আর
রোগা আর
সুন্দর
চুল তার
চুল তার
সুন্দর রঙ
আদার ঘ্রাণ (লেফট লেফট রাইট)
এক ছিলো
মেয়ে

মার্গারেট কোচাম্মা তাকে থামতে বললো।

সে থামলো।

আম্মু বললো, 'রাহেল ওকে দেখতে পাচ্ছ?'

আম্মু ঘুরে তার ফুলে ওঠা জামায় ঢেউ তোলা মেয়েকে খুঁজতে লাগলো সিমেন্টের থামের মধ্যে। দূরে দেখতে পেয়ে তাকে টেনে আনলো জোর করে। চাকো বললো সে রাহেলকে কাঁধে চড়িয়ে দেখাতে পারবে না কারণ তার হাত জোড়া। দু'টো লাল গোলাপ

বড়।

প্রিয়।

সোফি মল যখন এ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জে এসে পৌছাল রাহেল খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বেশ জোরে চিমটি মারলো এসথাকে। দুই নখের ভিতর তার চামড়া। এসথা তাকে একটা চীনা বালা দিয়েছিলো, ওটার মধ্যে তার দু'টো হাতই ঢুকে যেতো, ব্যথা অবশ্য একটু লাগতো। রাহেলের চামড়া ছিলো পাতলা একটুতেই ব্যথা পেতো। তারপর জিভ দিয়ে জায়গাটা চাটতো, তখন নোনতা লাগতো। একটু পরে কব্জিতে লাগা থুথুটা ঠাণ্ডা হয়ে যেতো, অবাক লাগতো।

আম্মু দেখেও দেখতনা। লোহার লম্বা রেলিঙ আলাদা করে রেখেছিলো দেখা করতে আসা এবং দেখা দিতে আসা লোকজনকে। অভিনন্দন জানাতে আসা এবং অভিনন্দিত হতে আসা লোকজনকে। চাকো অস্থির হয়ে উঠেছিলো, তার আঁটসাট স্যুটের মধ্যে থেকে যেন ফেটে বেরুচ্ছিল। টাইটা আবার এক পাশে বেঁকে গিয়েছিলো যেন তার নতুন মেয়ে আর পুরনো বউকে সালাম জানাচ্ছিল।

মনে মনে এসথা বললো 'বউ'

'হ্যালো লেডিস' বইপড়ার ভঙ্গিতে উঁচু স্বরে বললো চাকো (যেমন সে আগের রাতে বলেছিলো, *ভালোবাসা, পাগলামী, আশা, অসীম আনন্দ*) কেমন হলো জার্নিটা?

অনেকেরই অনেক কিছু বলার ছিলো, কিন্তু ঐরকম সময়ে ছোট কথাগুলোই বলা হয়, বড় কথাগুলো থেকে যায় ভিতরেই না বলা।

মার্গারেট কোচাম্মা সোফি মলক বললো।

'হ্যালো বলো কেমন আছো জিজ্ঞেস করো'

'হ্যালো কেমন আছো,' লোহার রেলিঙ-এর কাছ থেকে বললো সোফি মল। সবাইকে।

'একটা তোমার জন্যে আর একটা তোমার জন্যে।' ফুল দু'টো বাড়িয়ে ধরে বললো চাকো।

'এ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ,' মার্গারেট কোচাম্মা সোফি মলকে বললো।

'অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ।' সোফি মল বললো চাকোকে, যেন তার মায়ের কথার ভেংচি কাটা প্রতিধ্বনি করলো সঙ্গে সঙ্গে।

মার্গারেট কোচাম্মা তাকে ছোট একটা থাবড়া দিলো।

'ওয়েলকাম তোমাদের,' চাকো বললো 'এখন সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিই। পরস্পরের দিকে যারা তাকিয়েছিলো তাদের জন্যে দরকার ছিলো ভিতরের খবরটা, কারণ মার্গারেট কোচাম্মার কিছুই জানতে বাকি ছিলো না, চাকো বললো, 'আমার স্ত্রী মার্গারেট।'

মার্গারেট হাসলো গোলাপটা তার দিকে তুলে নাড়ালো। মনে হয় তার ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠে বললো, 'প্রাক্তন স্ত্রী চাকো!' তার ঠোঁট দু'টো কথাটা তৈরি করেছিলো কিন্তু গলা বললো না। যে কেউ তখন চাকোকে দেখলে ভাবতো মার্গারেটের মতো বউ পেয়ে গর্বিত আর সুখী সে। সাদা। হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুলের ফুলছাপা ফ্রক ছিলো তার পরনে। আর বাদামী ফিতে দিয়ে পিছনে বাঁধা ছিলো। হাতেও ছিলো ওরকম ফিতে।

কিন্তু তার চারদিকের বাতাস ছিলো বিষণ্ন। আর তার চোখের হাসির আড়ালে দুঃখ নীল হয়ে ঝিলিক দিচ্ছিলো। কারণ হয়তো ছিলো গাড়ি এ্যাকসিডেন্ট কিংবা মহাবিশ্বের কোন গর্তের জন্য।

'হ্যালো সবাইকে' সে বললো আমার মনে হচ্ছে অনেক বছর থেকে সবাইকে চিনি।

'হ্যালো ওয়োল!'

চাকো বললো 'আমার মেয়ে সোফি' ছোট করে হাসলো সে, খানিকটা নার্ভাসও ছিলো, হয়ত ভয় পাচ্ছিলো মার্গারেট কোচাম্মাকে। যদি সে বলে 'প্রাক্তন মেয়ে।' কিন্তু সে বলেনি; বোঝাপড়ার হাসি ছিলো তাদের মুখে। এসথা বুঝতে পারেনি তার মাথা জুড়ে ছিলো অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্কম্যানের হাসি।

'ইল্লো,' সোফি মল বললো।

এসথার চেয়ে সে লম্বা ছিলো, বড়ও ছিলো। চোখ দু'টো ছিলো নীল–ধূসর নীল। ফ্যাকাশে ত্বক ছিল সৈকতের বালির মত। তবে তার চুলগুলো ছিলো সুন্দর হ্যাটের নিচে দিয়ে ঝুলেছিলো। গাঢ় লালচে বাদামী। আর হ্যাঁ (ও হ্যাঁ!) তার নাক ছিলো পাপাচির মতো যেন ভিতরে অপেক্ষা করছিলো। এক অভিজাত পতঙ্গবিশারদের নাকের মধ্যে নাক। এক মথ প্রেয়সীর নাক। সে তার প্রিয় মেড ইন ইংল্যান্ড গোগো ব্যাগটা বয়ে আনছিলো।

'আম্মু, আমার বোন,' চাকো বললো।

বড় মানুষদের মতোই 'হ্যালো,' বললো আম্মু মার্গারেট কোচাম্মাকে এবং সোফি মলকে বললো 'হেল-ওহ' রাহেল তীক্ষ্ণ চোখে কিছুটা ঈর্ষা নিয়ে দেখছিলো আম্মু সোফি মলকে কতোটা আদর করে। ঝাঁঝিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো কিন্তু পারলো না।

হাসির হর্‌রা বয়ে গেল সারা এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ জুড়ে হালকা-দমকা বাতাসের মতো। কারণ মালায়লাম সিনেমায় জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা আদুর বাসি এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছেছিলো (বোম্বে-কোচিন)। তার সঙ্গে ছিলো অনেকগুলো ছোট বড় পোঁটলা পুঁটলি। ওগুলো সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিল সে আর তাই লোকজনের হাসির খোরাক হয়েছিলো। সে তার পোঁটলা পুঁটলিগুলো নামিয়ে, বলতে লাগলো,

'এনডে দেইভোমে! এইসাধনমাগাল!'

এসথা হো হো করে হেসে উঠল।

'আম্মু দেখ আদুর বাসি সব ফেলে দিয়েছে।'

এসথা আম্মুকে বললো–

'নিজের জিনিসগুলোও ঠিকমত বইতে পারছে না।'

বেবি কোচাম্মা বললেন 'ও খুব চেষ্টা করছে'

নতুন ব্রিটিশ উচ্চারণ শোনা গেল তাঁর মুখে

'জাস্ট *ইগনো-ওর* হিম'

মার্গারেট কোচাম্মা ও সোফি মলকে তিনি বললেন 'লোকটা সিনেমায় অভিনয় করে।' তিনি 'ম্যাকটর'-এর মতো উচ্চারণ করলেন শব্দটা আরও বললেন ও লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এরকম করে। তিনি চেষ্টা করলেন তাকে এড়িয়ে যেতে। দৃষ্টি যাতে আকৃষ্ট না হয় সে চেষ্টা চালিয়ে গেলেন।

বেবি কোচাম্মা ভুল করেছিলেন। আদুর বাসি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা *করেনি*। সে শুধু আগেই আকৃষ্ট দৃষ্টিকে ধরে রাখতে চেয়েছিলো।

'আমার বেবি ফুফু,' চাকো বললো।

সোফি মল খানিকটা হকচকিয়ে গেলো। সে তার পুঁতির মত চোখ পিটপিটিয়ে তাঁকে দেখতে লাগলো। সে শুধু জানত গরুর বেবি হয়, কুকুরের বেবি হয়, ভালুকেরও বেবি হয়– (সে লক্ষ্য করলো রাহেল হলো একটা বাদুড়ের বেবি)। কিন্তু ফুফু বেবি তাকে বেশ ধাঁধায় ফেলে দিলো।

সোফি মলকে বেবি কোচাম্মা প্রশ্ন করলেন,

'এরিয়েল কে তা জান?' '*দ্য টেমপেস্টের এরিয়েল?*'

সোফি মল বললো, সে জানে না।

বেবি কোচাম্মা আবার প্রশ্ন করলেন,

"কোত্থেকে মৌমাছিরা মধু খায় জানো?"

সোফি মল বললো, জানে না।

"গরুর নাকের ঘন্টি?"

সোফি মল বললো, সে জানে না।

বেবি কোচাম্মা আবার জোর দিয়ে বললেন, 'সেক্সপীয়রের *দ্য টেমপেস্ট?* বেবি কোচাম্মা প্রথমেই তাঁর পরিচিতি দিয়ে রাখলেন, তাঁর চিন্তাভাবনা কত উঁচুদরের– অন্তত মেথর-টেথরদের মতো যে নয়– তা বুঝিয়ে দিতে চাইলেন।

তিনি রাষ্ট্রদূত ই-পেলভিস এবং রাষ্ট্রদূত এস-ইনসেক্ট-এর কাছে কিছু বললেন। রাষ্ট্রদূত রাহেল বিড় বিড় করে কি যেন বললো কাঁঠালের মাছির মতো একটা নীলাভ সবুজ বুদবুদ এয়ারপোর্টের বাতাসে ফাটলো। পুয়াট্! শব্দটা ওরকমই হলো।

বেবি কোচাম্মা দেখলেন। বুঝলেন কাজটা এসথাই করেছে।

এখন ভিআইপিদের জন্যে চাকো বললো

(তার বই পড়ার ঢঙে)

আমার ভাগ্নে এসথাপ্পেন।

'এলভিস প্রিসলি,' বেবি কোচাম্মা খানিকটা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন। 'আমার ভয় হচ্ছে সবাই আমরা সময়ের চেয়ে খানিকটা পিছিয়ে আছি।' সবাই তাকালো এসথার দিকে, হেসেও উঠলো। রাষ্ট্রদূত এসথার আত্মার তলা থেকে, তার চোখা জুতোর ভিতর থেকে রাগ উঠে আসলো, ঘুরতে লাগলো হৃদপিণ্ডটা জড়িয়ে।

'হাউ ডু হাউ ডু এসথাপ্পেন?' মার্গারেট কোচাম্মা বললো।

'ফাইনেথাঙ্ক্যু,' ভকলো গলায় এসথা বললো।

'এসথা,' আম্মু নরম গলায় বললো যখন কেউ 'হাউ ডু ইউ ডু' বলে তখন তোমার বলা উচিত 'হাউ ডু ইউ ডু।'

'ফাইন থ্যাঙ্ক ইউ না।'

'আবার বল, হাউ ডু ইউ ডু?'

রাষ্ট্রদূত এসথা আম্মুর দিকে তাকালো।

'বল্' আম্মু আবার বললো এসথাকে 'হাউ ডু ইউ ডু?'

এসথার ঢুলু ঢুলু চোখ স্থির হয়ে গেলো।

মালায়লামে আম্মু বললো 'শুনছিস না আমি কি বলছি?'

রাষ্ট্রদূত এসথা অনুভব করলো তার ওপর একজোড়া নীলধূসরশীতল চোখের দৃষ্টি এবং অভিজাত পতঙ্গ বিশারদের নাক। তার মধ্যে কোন হাউ ডু ইউ ডু ছিলো না।

এসথাপ্পেন! এবার রাগে চাপা স্বরে বললো আম্মু, তবে রাগটা হৃদপিণ্ডের কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেলো। সে বুঝলো তার প্রভাব প্রতিপত্তির মধ্যে গণবিদ্রোহ

দেখা দিয়েছে। সে চাচ্ছিলো একটা ভাল সুযোগ। ইন্দো-ব্রিটিশ স্বভাবের প্রতিযোগিতায় তার ছেলেমেয়ের জন্যে একটা পুরস্কার।

চাকো আম্মুকে মালায়লামে বললো 'পরে এখন না।'

আম্মুর রাগী চোখ এসথাকে বললো, *ঠিক আছে পরে।*

পরে, শব্দটা হয়ে উঠেছিলো হিংস্র-ভয়াবহ।

পড়েছিলো। ভীত।

শ্যাওলা ধরা কুয়োর মধ্যে গম্ভীর আওয়াজের ঘন্টা– শীতল কিন্তু লোমশ। মথের পায়ের মতো।

নাটকটা খারাপ হয়ে গেলো। বর্ষাকালের আচারের মতো। আমার ভাগ্নি। চাকো বললো। কোথায় রাহেল? চারিদিকে খুঁজলো সে কিন্তু পেলো না। রাষ্ট্রদূত রাহেল জীবনের এই ঘনঘন পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিলো না। তাই সে এয়ারপোর্টের একটা নোংরা পর্দার মধ্যে নিজেকে পেঁচিয়ে রেখেছিলো। সসেজের মতো। একটা সসেজ বাটা স্যান্ডেলওয়ালা।

'দূর ওর দিকে নজর দিও না' আম্মু বললো, 'ও চাচ্ছে সবাই ওকে দেখুক।'

আম্মুও ভুল ভেবেছিলো। শুধু একা রাহেলই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়নি। যতোটুকু প্রাপ্য ততোটুকুই চেয়েছিলো।

এয়ারপোর্টের নোংরা পর্দাটার কাছে গিয়ে মার্গারেট কোচাম্মা বললো, 'হ্যালো রাহেল।' ফাঁপা আওয়াজে পর্দাটা উত্তর দিলো।

'হাউ ডু **ইউ** ডু?'

'তুমি বেরিয়ে আসবে না, হ্যালো বলতে?' মাস্টারনীর মতো কিন্তু নরম গলায় বললো মার্গারেট কোচাম্মা (যার চোখ প্রেত দেখেছিলো– সেই মিস মিটেনের মতোই তার মনে হল কণ্ঠস্বরটা)।

রাষ্ট্রদূত রাহেল বেরিয়ে আসলো না, কারণ সে বেরোতে পারছিলো না। সবকিছু অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলো। ভয় আর শীতলতা এসথা ও তাকে– দু'জনকেই গ্রাস করেছিলো।

লোমশ মথ আর বরফের মতো প্রজাপতিতে ভরে গিয়েছিলো। ভোঁতা আওয়াজ আর শ্যাওলা।

আর একটা বেজি।

এয়ারপোর্টের নোংরা পর্দার মধ্যে তবু কিছুটা আরাম ছিলো, অন্ধকার এবং বর্ম। 'দূর ছাড়ো ওকে।' আম্মু বললো চাপা হেসে। রাহেলের মন ভরে গিয়েছিলো পাথরে আর ছিলো নীল ধূসরনীল একজোড়া চোখ।

আম্মু এখন তাকে কম ভালোবাসছে। 'মালপত্র এসে গেছে!' চাকো চেঁচিয়ে উঠলো, খুশি হলো প্রসঙ্গান্তরে যেতে পেরে।

'এসো সোফি কিনস তোমাদের ব্যাগগুলো দেখ।'

সোফিকিনস।

রেলিং এর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসথা লক্ষ্য করলো। ভীড় ঠেলে একপাশ দিয়ে যাচ্ছিল। চাকোর স্যুট আর বেঁকে থাকা টাই অনুসরণ করছিলো ওরা। চাকো ফেটে পড়ছিলো। কারণ তার ভুড়িটা ছিলো অস্বাভাবিক। চাকোর হাঁটার ভঙ্গিটা এমন ছিলো যে মনে হতো সে পাহাড়ে উঠছে। সে কথা বলতো অবশ্য জীবনের পিচ্ছিল পথে নামার ব্যাপারেই। রেলিঙ-এর একপাশ দিয়ে সে হাঁটছিলো, অন্যপাশ দিয়ে মার্গারেট কোচাম্মা আর সোফি মল।

সোফিকিনস।

টুপি পরা তকমা আঁটা যে লোকটি বসেছিলো, সেও চাকোর স্যুট আর বাঁকা টাইকে সম্মান দেখিয়ে মালপত্র ছাড়ানোর বিভাগে যেতে দিলো।

ওখানে তাদের মধ্যে কোন রেলিং ছিলো না, চাকো মার্গারেট কোচাম্মাকে চুমু খেলো আর সোফি মলকে কোলে নিলো।

'শেষবার আমি যখন ওকে কোলে নিয়েছিলাম তখন ও আমার শার্ট ভিজিয়ে দিয়েছিলো। আর কলমগুলো ধরতে চাচ্ছিলো।' চাকো হাসতে হাসতে বললো। সে তার নীলধূসরনীল চোখে চুমু খেল, তার পতঙ্গবিশারদ নাকে, হ্যাটপরা লালচে বাদামী চুলে। তখন সোফিমল চাকোকে বললো, 'উম্ম...এক্সকিউজ মি? তুমি কি মনে করো এখন তুমি আমাকে নামাতে পারবে? আমাকে কেউ কোলে নেয়না তো!'

চাকো তাকে নামিয়ে দিলো।

রাষ্ট্রদূত এসথা দেখলো (বিস্ফোরিত চোখে) চাকোর স্যুট হঠাৎ ঢিলে হয়ে গেছে, এখন কম আঁটসাট। চাকো যখন ব্যাগগুলোর কাছে গেল তখন নোংরা পর্দার মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত বস্তুটা একটা ফোকর খুঁজে পেলো।

এসথা দেখলো বেবি কোচাম্মার গলার তিলটা বড় হয়ে কাঁপছে। *দার ধুম, দার ধুম*। ওটার রঙ বদলে যাচ্ছে, লালচে, সবুজ, কালচে নীল, সরষে হলুদ।

চায়ের জন্যে যমজ
হতেই হবে

'ঠিক আছে অনেক হয়েছে দু'জনেই ওখান থেকে বেরিয়ে এসো।' আম্মু বললো।

পর্দার মধ্যে রাহেল চোখ মুছলো। আর ভাবল রোদ, সবুজ নদী, জলের গভীরে সাঁতার কাটা মাছ, মাছরাঙার ডানা, ফড়িং (পিছনেও ছিল)। সে ভাবল ভেলুথার বানিয়ে দেওয়া সবচেয়ে ভাগ্যবান ছিপটার কথা। হলুদ বাঁশ, ফাৎনা আর সবসময় বোকা একটা মাছ। সে ভেলুথার কথাও ভাবলো আর মনে হলো সে তাদের সঙ্গে আছে।

তখন এসথা তাকে বের করে আনলো। সিমেন্টের ক্যাঙ্গারুগুলো দেখছিলো।

আম্মু তাদের দেখছিলো। বাতাস শান্ত ছিলো শুধু বেবি কোচাম্মার জ্যান্ত তিলটা ওঠানামা করছিলো।

'তাহলে' আম্মু বললো।

এবং সত্যিই একটা প্রশ্ন ছিলো *'তাহলে?'*

কোন উত্তর ছিলো না।

রাষ্ট্রদূত এসথা নিচের দিকে তাকালো এবং দেখলো জুতো (যেখান থেকে তার রাগ উঠে এসেছিল) জোড়া চকচকে আর চোখা। রাষ্ট্রদূত রাহেল নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো তার বাটার স্যান্ডেল জোড়ার সামনের দিকটা খুলে যাচ্ছে। যেন অন্য কারুর পায়ে লাগার চেষ্টা করছে। আর সে ঠেকাতে পারছে না। কিছুক্ষণের মধ্যে হয়ত সামনের দিকটা থাকবে না আর তাকে লেভেল ক্রসিঙের কুষ্ঠ রোগীটার মতো পায়ে ব্যান্ডেজ জড়াতে হবে।

'আর যদি কখনও,' আম্মু বললো, 'আমি বলছি কখনও যদি আবার মানুষের সামনে আমার কথা না শোন, তবে তোমাকে এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেবো যেখানে গিয়ে একেবারেই সভ্য হওয়া শিখতে পারবে মনের সুখে। বুঝতে পেরেছ?'

আম্মু যখন সত্যি রেগে যায় তখন সে বলে *'মনের সুখে।'* মনের সুখের ব্যাপারটা সে বলে সুখের এমন গভীরতা বোঝাতে যার মধ্যে মরা মানুষের ব্যাপারও থাকে।

'বুঝতে পেরেছো?' আবার বললো আম্মু।

ভয়ার্ত চোখ আর একটা ঝরনা তাকালো আম্মুর দিকে।

ঢুলুঢুলু চোখ আর একটা বিস্মিত মুখ তাকাল আম্মুর দিকে।

দু'টো মাথা নড়লো তিনবার করে।

'হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি।'

কিন্তু বেবি কোচাম্মা এটুকুতে সন্তুষ্ট হলেন না কারণ পরিস্থিতির মৌলিক অবনতি ঘটেছিলো। তিনি মাথা ঝাঁকালেন।

'ধরো' তিনি বললেন

'ধরো'

আম্মু তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। 'অর্থহীন' বেবি কোচাম্মা বললেন, 'ওরা নির্লজ্জ। বেয়াড়া। অকৃতজ্ঞ। দিন দিন জংলী হচ্ছে। তুমি ওদেব চালাতে পারবে না।' আম্মু এসথা আর রাহেলের দিকে ফিরলো তার চোখ দু'টো মণির মতো জ্বলছিলো।

'সবাই বলে বাচ্চাদের জন্য *বাবা* দরকার, আর আমি বলি—না। আমার বাচ্চাদের জন্য দরকার নেই। জান কেন?'

দু'টো মাথা নড়লো।

'কেন বল্ আমাকে,' আম্মু বললো।

একসঙ্গে না— একটু আগে পরে। এসথাপ্পেন আর রাহেল বললো 'কারণ তুমি আমাদের আম্মু আর তুমিই আমাদের বাবা তুমি আমাদের ভালোবাস।'

'ডবলের চেয়ে বেশি' আম্মু বললো। 'মনে কর আমি তোমাদের কি বলেছিলাম। লোকজন কী ভাববে। আর যখন তোরা আমার কথা শুনিস না লোকজনের সামনে, তখন অন্যরকম মনে করে সবাই।'

'রাষ্ট্রদূতের অর্ধেক মাত্র হয়েছো তোমরা' বেবি কোচাম্মা বললেন।

রাষ্ট্রদূত ই পেলভিস আর রাষ্ট্রদূত এস ইনসেন্ট তাদের মণ্ডু দু'টো ঝুলিয়ে রাখলো।

'আর একটা কথা রাহেল,' আম্মু বললো, 'আমার মনে হয় এখনই তোমার জানা উচিত **'ক্লিন'** আর **'ডার্টির'** মধ্যে তফাতটা। বিশেষ করে এই দেশে।'

রাষ্ট্রদূত রাহেল নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো 'তোমার কাপড় চোপড় এখন **ক্লিন**–ছিলো' আম্মু বললো। ঐ পর্দাটা **ডার্টি** ছিল। ঐ ক্যাঙ্গারুগুলো **ডার্টি**। তোমার হাতগুলো ডার্টি।'

আম্মুর ক্লিন আর ডার্টি বলার ধরন দেখে রাহেল ঘাবড়ে গেলো। জোরে জোরে সে বলছিলো। যেন কোন কালার সঙ্গে কথা বলছে। এখন আমি চাই, তোমরা গিয়ে ঠিকমতো 'হ্যালো' বলো। আম্মু বললো।

দু'টো মাথা দু'বার নড়লো।

রাষ্ট্রদূত এসথা আর রাষ্ট্রদূত রাহেল গেলো সোফি মলের দিকে।

'তুই জানিস *মনের সুখে* ভালো ব্যবহার শিখতে কোথায় পাঠায়?' এসথা রাহেলকে ফিস ফিস করে বললো। 'সরকারের কাছে।' রাহেলও ফিসফিসিয়ে বললো, কারণ সে জানত।

'হাউ ডু ইউ ডু' এসথা বেশ জোরেই সোফি মলকে বললো যাতে আম্মু শুনতে পায়।

'জাস্ট লাইক এ লাড্ডু ওয়ান পিস টু,' সোফি মল চুপি চুপি এসথাকে বললো। কথাটা সে শিখেছিলো তার পাকিস্তানী ক্লাসমেটের কাছ থেকে।

এসথা আম্মুর দিকে তাকালো।

আম্মুর চোখ বলছিলো, *'ওর কথায় কিছু মনে করিস না যতক্ষণ না তুই আসল কাজটা করতে পারিস।'*

এয়ারপোর্টের কার পার্কের দিকে যেতে যেতে, গরম বাতাস তাদের কাপড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো আর ফোলানো নিকারটা নেতিয়ে গেলো। বাচ্চারা পিছনে পড়ে ছিলো। ওরা গাড়ি আর ট্যাক্সির মধ্যে থেকে হাত নাড়াচ্ছিল।

'মা তোমাদের মারে ?' সোফি মল প্রশ্ন করলো।

রাহেল আর এসথা বুঝতে পারল না ওর মধ্যে কূটনীতির ব্যাপারটা। ওরা কিছু বললো না 'আমায় মারে।' সোফি মল বেশ আন্তরিকভাবে বললো, এমন কি চড়ও মারে।

'আমাদের মারে না' এসথা বিশ্বস্ততার সঙ্গে বললো।

'লাকি' সোফি মল বললো।

লাকি রিচ বয় উইথ পোরকেতমান্নি। এ্যান্ড এ্যা গ্র্যান্ড মাদারস ফ্যাকটরী টু ইন–হোরিট। নো ওয়ারিস।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে গেলো এয়ারপোর্টের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রতীক অনশন ধর্মঘট। পেরিয়ে গেলো যারা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের অনশন দেখছিলো।

আর পেরিয়ে গেলো যে মানুষজন অন্যদের দেখছিলো।

একটা ছোট টিনের সাইনবোর্ড ঝুলছিলো একটা বট গাছে, যাতে লেখা ছিলো,

'ফর ভিডি সেক্স কমপ্লেইনস, কনট্যাক্ট ডা. ও. কে. জয়।'

'কাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাস?' সোফিমলকে প্রশ্ন করলো রাহেল।

'জো'। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো সোফি মল। আমার বাবা, দু'মাস আগে মারা গেছে। আমরা এখানে এসেছি শোক সামলাতে।

'কিন্তু চাকো তোমার বাবা।' এসথা বললো।

'ও আমার *আসল* বাবা।' সোফিমল বললো, জো আমার বাবা। ও কখনও মারেনি হয়ত দু'একবার।'

'মরে গিয়ে উনি কিভাবে মারলেন?' এসথা বেশ যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন করলো।

'*তোমাদের* বাবা কোথায়?' সোফি মল জানতে চাইলো।

সে... রাহেল সাহায্যের জন্যে এসথার দিকে তাকাল।

'...এখানে নেই' এসথা বললো।

'আমি তোমাকে আমার লিস্টটা বলব?' রাহেল সোফি মলকে জিজ্ঞাসা করলো।

'ইফ ইউ লাইক,' সোফি মল বললো।

রাহেলের তালিকাটায় ছিলো নামগুলো পরপর সাজানোর চেষ্টা, গোলমেলে একটা ব্যাপার ছিলো, কারণ ভালোবাসা আর শাসনের নিরিখে সে নামগুলো বার বার বদলাচ্ছিলো। তখন সবটাই ওর মনের সত্যিকার প্রকাশ ছিলো না।

'প্রথম আম্মু আর চাকো,' রাহেল বললো, 'তারপর মামাচি'– আমাদের নানী এসথা ঠিক করেছিলো।

'তোমার ভাইয়ের *চেয়ে* বেশি?' সোফি মল বেমক্কা প্রশ্ন করলো।

'আমরা ওকে হিসাব করি না,' রাহেল বললো, 'আর ও শুধু বদলে যায়, আম্মু বলেছে'।

'ওটা কেমন? সবসময় বদলে যাওয়া কি করে?' সোফি মল প্রশ্ন করলো।

'বেয়াড়া মর্দা শুয়োরের মতো' রাহেল বললো।

'খুব বাজে,' এসথা বললো।

'যাই হোক মামাচির পরে ভেলুথা, আর তারপর'–

'ভেলুথা কে,' সোফি মল জানতে চাইলো।

একটা লোক ওকে আমরা ভালোবাসি, রাহেল বললো।

'আর ভেলুথার পরে তুমি'।

'আমি? আমাকে তুমি কেন ভালোবাস?' সোফিমল বললো।

'কারণ তুমি আমার মামাতো বোন তাই– ওটা করতে হয়' রাহেল খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বললো।

'কিন্তু তুমিতো আমাকে ঠিকমতো চেনোই না,' সোফি মল বললো। 'আর আমি তো তোমাকে ভালোবাসি না,' 'ভালোবাসবে, যখন তুমি চিনতে পারবে' রাহেল বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বললো।

'ওরকম হয় নাকি?' এসথা বললো।

'হবে না কেন?' সোফি মল বললো।

'কারণ' এসথা বললো ও মনে হয় বামন, বাড়ছেই না, যদিও বামনের ব্যাপারটা এর মধ্যে আসেই না।

'আমি বামন না' রাহেল বললো।

'তুই তাই' এসথা বললো।

'না আমি না' রাহেল বললো।

'হ্যাঁ তুই'।

'হ্যাঁ তুই,' আমরা যমজ, এসথা ব্যাখ্যা করল সোফি মলকে। 'কিন্তু দেখো ও কত্তোটুকু' রাহেল বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বুক উঁচিয়ে এসথার পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো, সোফিমলকে দেখানোর জন্যে, কতোটা বেঁটে সে। এয়ারপোর্টের কার পার্কেই এসব হচ্ছিল।

'তুমি একটু লম্বা ঠিকই' সোফি মল বললো, 'বামনের চেয়ে একটু লম্বা, তবে মানুষের চেয়ে বেঁটে।

আপোস হল কিনা বোঝা গেলো না তবে সবাই চুপ করে গেলো।

এ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জের দরজায় লালমুখো ক্যাঙ্গারুর মতো একটা ছায়া তার সিমেন্টের থাবা নাড়লো শুধু রাহেলের দিকে। সিমেন্টের চুমু বাতাসে ঘুরতে লাগলো ছোট হেলিকপ্টারের মতো।

'তোমরা জানো কি করে চলতি গাড়ির মধ্যে দিয়ে ছুটতে হয়।' সোফি মল প্রশ্ন করল।

'না ইন্ডিয়াতে আমরা এমন করি না' রাষ্ট্রদূত এসথা বললো।

'ওয়েল আমরা ইংল্যান্ডে করি' সোফি মল বললো, 'সব মডেলরা করে। টেলিভিশনে, লুক-ইটস্ ইজি।'

তিনজন সোফি মলের পিছন পিছন ছুটতে লাগল এঁকেবেঁকে গাড়ির মধ্যে দিয়ে, ফ্যাশন মডেলদের মতো ঈগেল ফ্লাস্ক আর মেড ইন ইংল্যান্ড গো গো ব্যাগগুলো ওদের পিছনে বাড়ি খাচ্ছিলো।

বামনরা হাঁটতে হাঁটতে বড় হচ্ছিল।

ছায়ারা তাদের পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। স্বচ্ছ নীল আকাশে ছিল রূপালী প্লেন, আলোক রশ্মির মধ্যে মথের মতো।

আকাশীনীল রঙের লেজ পাখনাওয়ালা প্লেমাউথটা দেখে সোফি মল হেসে ফেললো।

একেবারে হাঙ্গরের মতো দেঁতোহাসি।

প্যারাডাইস পিকলস গাড়ির হাসি।

গাড়ির ছাদের ক্যারিয়ারে আচারের বোতলের ছবি আর পণ্যের তালিকা দেখে মার্গারেট কোচাম্মা বললো 'ওহ্ ডিয়ার' আমার মনে হচ্ছে আমি বিজ্ঞাপনের মধ্যে ঢুকে গেছি! আর বললো 'ওহ ডিয়ার অ লট।'

ওহডিয়ার ওহ্ ডিয়ারোহ্ডিয়ার!

'আমি জানতাম না তোমরা আনারসের স্লাইস করো। সোফি আনারস ভালোবাসে। ঠিক না সোফি?'

'মাঝে মাঝে,' সোফি বললো। 'কখনও ভাল লাগে না।' মার্গারেট কোচাম্মা বিজ্ঞাপন বেয়ে উঠলো, পিছনে, হাতায় বাদামী ফিতে ওয়ালা ফুলছাপা জামা পরে, জামার নিচে ছিলো পা। সোফি মল বসল সামনে চাকো আর মার্গারেট কোচাম্মার মাঝখানে। সিটের ওপর দিয়ে শুধু তার হ্যাটটা উঁকি মারছিলো। তাদের মেয়ে বলে। রাহেল আর এসথা বসেছিলো পিছনে। মালপত্র রাখা হয়েছিলো গাড়ির বুটে! *বুট* শব্দটা মজার কিন্তু *স্টারডিটা* ভালো নয় (গাঁট্টা গোঁট্টা) ভয়ঙ্কর।

ইত্তুমানুরের কাছে ওরা দেখতে পেলো রাস্তায় একটা হাতি মরে পড়ে আছে। বিদ্যুতের মোটা তার ছিঁড়ে পড়ে ছিলো রাস্তায়। ইত্তুমানুর পৌরসভার এক ইঞ্জিনিয়ার ঐ মৃতদেহ সরানোর কাজ তত্ত্বাবধান করছিলো হম্বিতম্বি করে। তাদেরকে বেশ তৎপর মনে হলো। কারণটা হয়ত এই যে, ভবিষ্যতে সব সরকারই এই পাচিদেরম পশু দেহ সৎকার বিভাগটা রাখবে এবং কাজের মূল্যায়নও হবে। একটা দমকলের গাড়ি ছিলো দাঁড়িয়ে, ফায়ারম্যানরা কি করবে বুঝতে পারছিলো না, পৌরসভার লোকটা চেঁচাচ্ছিলো। জয় আইসক্রিমের একটা ঠেলা গাড়ি ছিলো ভিড়ের কাছে, একটা লোক বাদাম বিক্রি করছিলো, কাগজের কোন তৈরি করে। কোনগুলো সে এমন চালাকি করে বানিয়েছিলো যে আট-ন'টার বেশি বাদাম যেন না ধরে।

সোফি মল বললো 'দেখ একটা মরা হাতি'। চাকো গাড়ি থামিয়ে প্রশ্ন করলো হাতিটা কচু থোমবান (ছোট জোকার) নাকি! ওটা এইমেনেমের মন্দিরের হাতি, মাসে একবার করে এইমেনেমের বাড়িতে আসত একটা নারকেল চাইতে। ওরা বললো, না-ওটা না।

স্বস্তি পেলো এই ভেবে যে বাইরের হাতি, চেনা হাতি নয়। গাড়ি আবার চললো

'থ্যাং গড,' বললো এসথা।

'থ্যাংক গড,' শুধরে দিলেন বেবি কোচাম্মা। পথে সোফি মল চিনতে শিখলো কাঁচা রাবার। তখন সে দুর্গন্ধ পেয়েছিলো একটা ট্রাক থেকে। ওটা চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও সে নাকে আঙুল দিয়ে রেখেছিলো।

বেবি কোচাম্মা বললেন গাড়ির গান গাইতে। এসথা আর রাহেল নিচু গলায় গান ধরল ধীর লয়ে। এ গানটা তাদের শেখানো হয়নি এক সপ্তাহ্ প্রস্তুতির সময়। রাষ্ট্রদূত ই পেলভিস আর রাষ্ট্রদূত এস ইনসেক্ট গাইলো

রিজ অয়েস ইন দ্য লো-আরড অর-অলয়েজ
অ্যান্ড এগেইন আই সে রি-জঅইস

তাদের উচ্চারণ মোটামুটি ভালোই ছিলো। প্লেমাউথটা ছুটে চললো সবুজ দুপুরের উষ্ণতার মধ্যে দিয়ে ছাদে আচারের কথা প্রচার করতে করতে। আকাশী-নীল-আকাশ ছিলো ওটার লেজে। এইমেনেমে ঢোকার মুখে ওরা হালকা সবুজ একটা প্রজাপতির সঙ্গে ধাক্কা খেলো (কিংবা প্রজাপতিটাই তাদের ধাক্কা দিয়েছিলো)।

৭

উইজডম এক্সারসাইজ নোটবুক

পাপাচির পড়ার ঘরে ফ্রেমে আটকানো প্রজাপতি আর মথগুলো খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিলো, কারণ কাঁচ লাগানো কাঠের ফ্রেমটার কাঠ কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছিলো ঘুণপোকা, কাঠের ধুলো জমেছিলো স্তূপ হয়ে, জোড়ার তারকাঁটাগুলো নগ্ন হয়ে খুলে মুখ ব্যাদান করে ছিলো। নিষ্ঠুর। পুরো ঘরটাই ছিলো নোনা আর ছ্যাতলা পড়া। একটা বিশাল উজ্জ্বল সবুজ হাসিমুখ সন্তের ছবি ঝুলছিলো দেওয়ালে গাঁথা কাঠের কিলক থেকে। চকচকে কালো রঙের একসারি ডেঁয়ো পিঁপড়ে জানালায় চৌকাঠের ফুটোর ভিতর দিয়ে ঢুকছিলো। ওগুলোর পিছনদিক উঁচু হয়েছিলো বাসবি বার্কলের নৃত্যপটিয়সীদের মতো। সূর্যের আলোর উল্টো দিকে ওগুলোকে ছায়াছায়া মনে হচ্ছিলো। ফুলো ফুলো সুন্দর।

ঝাপসা নোংরা কাঁচের একটা বইয়ের আলমারির মাথায় উঠেছিলো রাহেল (টেবিলের ওপর টুল রেখে তার ওপর উঠে)। মেঝের ধুলোয় পড়েছিলো ওর স্পষ্ট পায়ের ছাপ। ওগুলো দরজা থেকে এসেছিলো টেবিলের কাছে (টেবিলটাকে ঠেলে নেয়া হয়েছিল বুকসেলফের কাছে), গিয়েছিলো টুলের কাছে (ঘষটে আনা হয়েছিলো টেবিলের কাছে) তোলা হয়েছিলো টেবিলের ওপর। ও কিছু খুঁজছিলো। ওর জীবনের এখন একটা আকার-আকৃতি হয়েছে। ওর চোখের নিচে বাঁকা চাঁদ আর দিগন্তে উঁকি মারছে নানান জিনিস।

একেবারে ওপরের তাকে ছিলো পাপাচির চামড়া বাঁধানো এক সেট বই *দ্য ইনসেক্ট ওয়েলথ অব ইন্ডিয়া*, প্রত্যেকটা এমনভাবে বাঁধা ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো ঢেউটিন। রূপালী কাগজ কাটা পোকা বইগুলোর পাতা ফুটো করেছিলো, প্রজাতি থেকে প্রজাতি ফুটো হয়ে গিয়েছিলো। তথ্য লেখা জায়গাগুলোর চেহারা হয়েছিলো নক্সাকরা লেসের মতো।

রাহেল বইয়ের সারির পিছনে হাত ঢোকালো, লুকানো কি একটা বের করে আনলো।

একটা মসৃণ আর একটা কাঁটাওয়ালা সাগরের ঝিনুক।

কনট্যাক্ট লেন্সের প্লাস্টিকের খাপ একটা।

একটা কমলা রঙের নল, একছড়া পুঁতির মালায় একটা রূপোর ক্রুশ। বেবি কোচাম্মার জিনিস।

সবগুলো জিনিস ও আলোয় ধরলো। প্রত্যেকটা পুঁতি সূর্যের আলো টেনে নিলো।

পড়ার ঘরে কোনাকুনি এসে ঢুকছিলো সূর্যের আলো, তাতে ওর ছায়াটাও পড়ে ছিলো তেরছা হয়ে। রাহেল আলোর মালাটা নিয়ে দরজার দিকে ফিরলো।

'ভাবতো ওটা এখনো এখানে আছে, তুই ফিরে যাওয়ার পর আমি চুরি করেছিলাম।'

ফিরে যাওয়া। শব্দটা মুখ ফস্‌কে সহজেই বেরিয়ে গেলো। যদিও যমজরা শব্দটা প্রায়ই বলতো। দেওয়া নেওয়ার মতো, লাইব্রেরির বইয়ের মতো।

এসথা মুখ তুলে তাকালো না, ওর মন জুড়ে ছিলো ট্রেন। ও দরজায় দাঁড়িয়েছিলো আলো আড়াল করে। ব্রহ্মাণ্ডে এসথা মাপের একটা গর্ত।

বইগুলোর পিছনে রাহেলের অস্থির আঙুলগুলো আরো কিছু খুঁজছিলো। আরও কিছু ছিলো একই জায়গায়, মনে পড়লো। সে ওটা বের করে আনলো। শার্টের হাতায় ধুলো মুছলো। স্বচ্ছ প্লাস্টিকে মোড়া একটা চ্যাপ্টা প্যাকেট। ছেঁড়া সাদা একটা কাগজের টুকরোয় আম্মুর হাতের লেখা *এসথাপ্পেন ও রাহেল।*

চারটে মলিন নোটবুক ছিলো ওটার মধ্যে। ওগুলোর মলাটে লেখা ছিলো উইজডম এক্সারসাইজ নোটবুক, নাম, স্কুল/কলেজ, ক্লাস, বিষয় এসব লেখার জায়গা ছিলো। দু'টোতে তার নাম লেখা ছিলো আর দু'টোতে ছিলো এসথার নাম লেখা।

একটার পিছনের মলাটে শিশু-হস্তাক্ষরে ছিলো কিছু একটা লেখা। অক্ষরগুলো ছিলো আঁকাবাঁকা আর শব্দগুলোর মধ্যে কোন ফাঁক ছিলো না, তবে চেষ্টা ছিলো সোজা করার, মনে হচ্ছিলো জ্যান্ত পেন্সিলের ইচ্ছে মতো লেখা। তবে আবেগের একটা ব্যাপার স্পষ্ট ছিলো : *আমি মিস মিটেনকে ঘৃণা করি, মনে হয় ওনার কাপড়চোপড় ছেঁড়া।* খাতাটার সামনের মলাটে এসথা নিজের নামটা থুথু দিয়ে ঘষে তুলে ফেলেছিলো কাগজশুদ্ধ। ওই খাবলানো জায়গাটায় ও লিখেছিলো *অপরিচিত। এসথাপ্পেন অপরিচিত।* (ওর শেষের নামটা কিছুদিন ছিলো না, তখন আম্মু ঠিক করতে পারছিলো না ওদের বাবার পদবি লাগাবে না নিজের বাবার পদবি লাগাবে) ক্লাসের জায়গায় লেখা ছিলো : ৬ বছর। বিষয়ের জায়গায় লেখা ছিলো : গল্প লেখা।

রাহেল পায়ের ওপর পা তুলে বসলো (টেবিলের ওপর টুলের ওপর)।

'এসথাপ্পেন অপরিচিতি,' ও বললো, তারপর খাতাটা খুলে জোরে জোরে পড়তে লাগলো।

যখন ইউলিসিস বাড়ি ফিরে আসলো, তখন ছেলেকে দেখে বাবা বললো, আমি ভেবেছিলাম তুমি আর ফিরে আসবে না। অনেক রাজপুত্র এসেছিলো আর সবাই

পেন লোপকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো কিন্তু পেন লোপ বলেছিলো, যে বারোটা চাকতি ভেদ করতে পারবে তাকেই আমি বিয়ে করবো। আর সবাই বিফল হলো। তখন ইউলিসিস ভিখিরীর সাজে প্রাসাদে গেলো আর চেষ্টা করতে চাইলো। সব লোকজন হাসলো আর বললো চেষ্টা করো না পারবে না। ইউলিসিস পুত্র সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললো ওকে চেষ্টা করতে দাও, সে ধনুক তুলে নিলো আর সোজা বারোটা চাকতি ভেদ করলো।

নিচে কতগুলো ভুল শোধরানোর নকশা ছিলো আগের পড়ার।

Ferus	Learned	Niethe	Carriages	Bridge	Bearer	Fastened
Ferus	*Learned*	*Niether*	*Carriages*	*Bridge*	*Bearer*	*Fastened*
Ferus	*Learned*	*niether*	*Carriages*	*Bridge*	*Bearer*	*Fastened*
Ferus	*Learned*	*Nieter*	*Carriages*	*Bridge*	*Bearer*	*Fastched*

পড়তে পড়তে রাহেল হেসে উঠলো আগে নিরাপত্তা ও ঘোষণা করলো। আম্মু লাল কালিতে আঁকাবাঁকা লাইন টেনে কয়েকটা শব্দ লিখেছিলো, *মারজিন? আর ভবিষ্যতে দয়া করে জড়ানো হাতের লেখা লিখবে।*

'যখন আমরা শহরের রাস্তায় হাঁটি' সাবধানী এসথার গল্প এভাবেই শুরু হয়েছিলো, *তখন আমাদের উচিত ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটলে দুর্ঘটনার ভয় থাকে না কারণ ওখানে যানবাহন চলে না কিন্তু বড়ো রাস্তায় অনেক মারাত্মক যানবাহন থাকে ওগুলো আপনাকে ধাক্কা দিতে পারে, অজ্ঞান করে দিতে পারে পঙ্গু করে দিতে পারে। অপনার মাথা ফাটলে অথবা মেরুদণ্ড ভাঙলে আপনি হতভাগ্য হয়ে পড়বেন। পুলিশরা যানবাহন নিয়ন্ত্রন করে তাদের কয়েকজনের পক্ষে অচলদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। বাস থেকে নামার আগে অবশ্য কন্ডাক্টারকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে না হলে আহত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ডাক্তার তখন ব্যস্ত থাকতে পারেন। ড্রাইভারের কাজটার ঝুকি খুব বেশি। তার পরিবার আশঙ্কায় থাকে* কারণ যে কোনো সময় সে মারা যেতে পারে।

'অসুস্থ ছেলে' রাহেল এসথাকে বললো। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে গলায় কি যেন বাধলো, স্বর নেমে গেলো। গলা খাঁকারি দিয়ে দলাটা নামালো আবার স্বর ফিরে আসলো। এসথার পরের গল্প ছিলো *ছোট আম্মু।*

জড়ানো হাতের লেখায় কয়েকটা অক্ষর এঁকেবেঁকে গিয়েছিলো, দাড়ি-কমা জায়গামতো ছিলো না। দরজার ছায়াটা ঠায় দাঁড়িয়েছিলো।

শনিবারে আমরা কোট্টাইয়ামের একটা বইয়ের দোকানে গিয়েছিলাম আম্মুর জন্যে উপহার কিনতে আম্মুর ১৭ নভেম্বর ছিলো জন্মদিন। আমরা তাকে একটা ডায়েরি দিয়েছিলাম। আমরা ওটা লুকিয়ে রেখেছিলাম আলমারিতে। তারপর যখন রাতে

শুরু হয়েছিলো তখন আমরা বলেছিলাম তোমার উপহারটা দেখতে চাও সে বলেছিলো হ্যাঁ আমি দেখতে চাই। আর আমরা কাগজে লিখলাম ছোট্ট একটা আম্মুর জন্যে ভালোবাসা দিয়ে এসথা আর রাহেল আর আম্মু বললো কি সুন্দর উপহারটা আমি এমনই চেয়েছিলাম তখন আমরা একটু কথা বললাম কথা বলালাম ডায়েরিটা নিয়ে তারপর আমরা তাকে চুমু খেয়ে বিছানায় গেলাম।

আমরা দুজন কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা ছোট একটা স্বপ্নও দেখেছিলাম। একটু পরে আমি উঠলাম খুব কষ্ট পেয়েছিলো আর আমি আম্মুর ঘরে গিয়ে বললাম তেষ্টা পেয়েছে। আম্মু জল দিলো আমি আমার বিছানায় যাচ্ছিলাম আম্মু আমার দিকে তাকালো আর আমার সঙ্গে শুলো। আমি আম্মুর পিঠে শুয়েছিলাম আর আম্মুর সঙ্গে কথা বলছিলাম আম্মু ঘুমিয়ে গিয়েছিলো। একটু পরে আমি আবার উঠেছিলাম আবার কথা বলেছিলাম আম্মু ঘুমিয়ে গিয়েছিলো। একটু পরে আমি আবার উঠেছিলাম আবার কথা বলেছিলাম তারপর মাঝ রাতের খাওয়া দাওয়া হয়েছিলো। আমরা কমলা কফি কলা খেয়েছিলাম। একটু পরে রাহেল আসলো আমরা আরও দুটো কলা খেলাম আর আম্মুকে চুমু দিলাম কারণ তার জন্মদিন ছিলো তারপর আমরা হ্যাপি বার্থডে গাইলাম। সকালে আমরা নতুন কাপড় পেলাম আম্মুর কাছ থেকে ফিরতি উপহার রাহেল হলো মহারানী আর আমি হলাম ছোট্ট নেহেরু।

আম্মু ভুল বানানগুলো শুধরে দিয়েছিলো আর নিচে লিখে দিয়েছিলো :

আমি যদি কারুর সঙ্গে কথা বলি তাহলে আমাকে খুব জরুরী হলেই কেবল ডাকবে। তখন তোমাকে বলতে হবে 'এক্সকিউজ মি'।

এই আদেশটা না মানলে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দেবো। দয়া করে, ভুলগুলো সংশোধন করো।

ছোট্ট আম্মু।

নিজে কখনোই ভুল সংশোধন শেষ করেনি। তাকে ব্যাগ গুছিয়ে চলে যেতে হয়েছিলো। কারণ তার কোনো দাঁড়ানোর জায়গা ছিলো না। চাকো বলেছিলো সে অনেককিছুই এরই মধ্যে ধ্বংস করেছিলো।

হাঁপানি নিয়ে সে এইমেনেমে ফিরেছিলো তার বুকে ছিলো ঘড়ঘড়ানি, মনে হতো দূর থেকে কেউ তার বুকের ভিতরে বসে চীৎকার করছে।

এসথা এই দৃশ্য দেখেনি।

ছন্নছাড়া। অসুস্থ। বিষণ্ন।

ঐ শেষবারই আম্মু এইমেনেমে এসেছিলো। নাজারেথ কনভেন্ট থেকে রাহেলকে তখন মাত্র বের করে দেওয়া হয়েছে (গোবর সাজানোর জন্যে আর বড়দের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার জন্যে) আম্মু তার শেষ চাকরিটা খুইয়ে এসেছিলো– ছোট একটা হোটেলে রিসিপশনিস্টের চাকরি ছিলো ওটা। কারণ সে অসুস্থ ছিলো

বেশ ক'দিন কাজে যেতে পারেনি। হোটেল কর্তৃপক্ষ মানেনি জবাব দিয়ে দিয়েছিলো। তারা চাচ্ছিলো স্বাস্থ্যবতী রিসেপশনিস্ট।

ঐ শেষবার এসে আম্মু রাহেলের সঙ্গে তার ঘরে একটা সকাল কাটিয়েছিলো। তার সামান্য শেষ বেতনের টাকা নিয়ে সে মেয়ের জন্যে বাদামী কাগজে মোড়া উপহার কিনে এনেছিলো। প্যাকেটের ওপরে ছিলো লাল লাল হৃদপিন্ডের ছবি ছাপা। ওতে ছিলো এক প্যাকেট সিগারেট লজেন্স, একটিন ফ্যান্টম পেন্সিল। আর ছবিওয়ালা একটা কিশোর ক্ল্যাসিকস্ *পল বানিয়ান*। ওগুলো ছিলো সাত বছর বয়সের মত উপহার কিন্তু রাহেল তখন এগার বছরের। আম্মু যেন সময়কে অস্বীকার করতে চেয়েছিলো, তার বাচ্চারা ছোট্ট থাকবে এটাই সে চেয়েছিলো, সময়ের স্রোতকে সে মানতে চায়নি, চেয়েছিলো ছোট্ট হয়েই ওরা তার সঙ্গে থাকুক। যেখান থেকে তাদের ছাড়া ছাড়ি হয়েছিলো সেখানেই তারা ফিরতে চেয়েছিলো। আবার সাত থেকে শুরু। আম্মু রাহেলকে বলেছিলো এসথার জন্যেও সে একটা কমিকস্ বই কিনে রেখেছে কিন্তু আর একটা চাকরী না পাওয়া পর্যন্ত সে দিতে পারবে না। তিনটে ঘর ভাড়া নেওয়ার মতো বেতনের একটা চাকরী খুঁজছিলো সে, যাতে ওরা সবাই এক সঙ্গে থাকতে পারে। তারপর সে কলকাতায় গিয়ে এসথাকে নিয়ে আসবে, তখন এসথাকে কমিকস দেবার কথা বলেছিলো। আম্মু বলেছিলো আর বেশি দেরি হবে না। যে কোন দিন হতে পারে। ক'দিন পরে ভাড়া আর কোনো সমস্যা হবে না। সে বলেছিলো, জাতিসংঘের একটা চাকরির জন্যে সে দরখাস্ত করেছে ওটা হয়ে গেলে ওরা হেগ-এ চলে যাবে তখন ডাচ আয়াও রাখতে পারবে। আম্মু বললো, না হলে ইন্ডিয়ায় যদি থাকতেই হয় তাহলে একটা স্কুল খুলবে। শিক্ষকতা না জাতিসংঘের চাকরী দুটোর মধ্যে কোনটা করবে সহজে ঠিক করতে পারছে না, পছন্দের ওপর নির্ভর করছে সুযোগ, বলেছিলো আম্মু।

ক'দিনের জন্যে, সিদ্ধান্তটা নেওয়া পর্যন্ত সে এসথার উপহারটা দেবে না।

সারাটা সকাল আম্মু বকবক করেই যাচ্ছিলো। রাহেলকে প্রশ্ন করছিলো কিন্তু উত্তর দিতে দিচ্ছিলো না। রাহেল কিছু বলতে গেলেই আম্মু বাধা দিচ্ছিলো। নতুন প্রশ্ন করছিলো। তবে ভয় হচ্ছিলো বড়দের মতো কিছু যদি বলে বসে। সময় যদি জমে যায়। ভয় তাকে কথা বলছিলো। শ্বাসকষ্টের সঙ্গে সঙ্গে সে চালিয়ে যাচ্ছিল। শুকিয়ে গিয়েছিলো, রাহেল যে মাকে চিনতো সে আর নেই। গোলগাল মুখ আর ছিলো না। মুখের চামড়ায় মেছতার মতো দাগ ধরেছিলো ছোপ ছোপ টিকার দাগের মতো। হাসলে টোল পড়ছিলো কিন্তু মনে হচ্ছিলো আঘাতের চিহ্ন। তার কোঁকড়া চুল উজ্জ্বল ছিলো না। দুলছিলো ভাঙা মুখের দুপাশে। নিঃশ্বাস বয়ে বেড়াচ্ছিল হ্যান্ডব্যাগে করে– একটা কাঁচের ইনহেলার। বাদামি ফেনা তোলা। প্রত্যেকটা শ্বাস টানতে তাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছিলো ফুসফুসের সঙ্গে, জেতার জন্যে কুঁকড়ে যাচ্ছিল বারবার। রাহেল দেখছিলো তার শ্বাসটানা। যতবার সে শ্বাস নিচ্ছিলো কণ্ঠার হাড়টা বের হয়ে পড়ছিলো, অন্ধকার গর্ত হচ্ছিলো কাঁধের নিচে।

ঘন কফ ঝাড়ছিলো রুমালে, ওটা সে রাহেলকে দেখিয়েছিলো।

সব সময় পরীক্ষা করানো দরকার তোমার, সে ফিসফিস করে খসখসে গলায় বলেছিলো। খাতার পাতার মতো একটা কাগজ বের করে বলেছিলো 'যখন এতে ফেললে সাদা হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে পাকেনি, যখন হলুদ আর পচা গন্ধ হবে তখন বুঝতে হবে পেকেছে। আর বের করতে হবে। কফের দলাগুলো ফলের মতো পাকা বা কাঁচা, তোমাকে বলতে হবে।'

দুপুরে খাবার সময় সে ট্রাক ড্রাইভারের মতো বসেছিলো হঠাৎ বলেছিলো 'এক্সকিউজ মি,' স্বরটা ছিলো অস্বাভাবিক। রাহেল বুঝতে পারলো তার ভুরুতে নতুন ঘন লোম, গজিয়েছে। মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে আম্মু হাসলো, সে বললো, তার মনে হচ্ছে সে যেন রাস্তায় খাড়া মাইলস্টোনের মতো হয়ে গেছে, পাখিরা হেগে যাচ্ছে তার কিচ্ছু করার নেই, বেখাপ্পা উজ্জ্বলতা ছিলো তার চোখে।

মামাচি প্রশ্ন করলেন, সে মদ খায় কিনা আর মাঝে মাঝে রাহেলকে দেখতে আসলে ভালো হয়।

আম্মু টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েছিলো। কাউকে গুডবাই পর্যন্ত বলেনি। চাকো রাহেলকে বলেছিলো ও চলে যাচ্ছে দেখ্। কিন্তু রাহেল ওঠেনি, ভাব করছিলো যেন শোনেইনি, সে মাছ বেছেই যাচ্ছিল। সে ভাবছিলো কফের কথা। তখন মাকে ঘেন্না করেছিলো। তাকে ঘেন্না করেছিলো।

আর কখনো তাকে সে দেখেনি।

আলেপ্পোর ভারত লজের একটা অন্ধকার ঘরে আম্মু মারা গিয়েছিলো। ওখানে সে গিয়েছিলো কারুর সেক্রেটারি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। মারা গিয়েছিলো একলা। একটা শব্দ তোলা সিলিং ফ্যান ছিলো শুধু। এসথা ছিলো না পিঠে চড়ার জন্যে, কথা বলার জন্যে।

বয়স হয়েছিলো একত্রিশ। বেশি বয়সী নয়। কমও নয়।

তবে মরার মতো যথেষ্ট।

সে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠতো, মনে হতো একটা পুলিশের লোক কাঁচি নিয়ে তেড়ে আসছে তার চুল কেটে নিতে। ওরা ওরকম করতো কোট্টাইয়ামে বাজার থেকে বেশ্যাদের ধরে এনে। ঐভাবে চিহ্ন দিয়ে দিয়ে দিতো, যাতে সবাই বুঝতে পারে কোত্থেকে তারা এসেছে। ওরা বেশ্যা। নতুন পুলিশ যারা আসতো তাদের তাই চিনে চিনে পেটাতে অসুবিধা হতো না। আম্মু সব সময় দেখতো মেয়েলোকগুলো ন্যাড়া মাথায় শুন্য চোখে কিরকম অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকতো! তেল দেওয়া লম্বা চুল না থাকলেই চিহ্নিত হয়ে যাওয়া। আর চুল না থাকায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো ওরা।

ঐ রাতে আম্মু বসেছিলো একটা আশ্চর্য বিছানায়, এক আশ্চর্য ঘরে, এক আশ্চর্য শহরে। সে জানতো না কোথায় সে আছে, কিছুই চিনতে পারছিলো না। শুধু ভয়টাই

ছিলো। তার ভিতরে দূরের মানুষটা চীৎকার শুরু করেছিলো। এবার তার শক্ত মুঠো ঢিলে হলো না। ছায়াগুলো বাদুড়ের মতো তার কণ্ঠার হাড়ে ঝুলে পড়লো।

সকালে মেথর তাকে আবিস্কার করেছিলো। ফ্যান বন্ধ করতে গিয়েছিলো সে।

এক চোখের নিচে নীল কালশিটে পড়ে গিয়েছিলো। চোখটা বড়ো বুদবুদের মতো বেরিয়ে ছিলো। তার ফুসফুস যা পারেনি চোখ সেই চেষ্টা করেছিলো। মাঝে মাঝে মধ্যরাতে তার বুকের মধ্যে বসে থাকা দূরের মানুষটা চীৎকার থামাতো। এক দঙ্গল পিঁপড়ে মরা তেলা পোকা নিয়ে দরজার নিচে দিয়ে বেরিয়ে যেতো, বুঝিয়ে দিতো মৃতদেহকে কি করা হয়।

চার্চ আম্মুকে কবর দিতে চাইলো না। অনেক হিসাব নিকাশ কষে চাকো তার মরাদেহটা ইলেকট্রিক চুল্লীতে (ক্রিমেটোরিয়াম) নিয়ে গেলো পোড়াতে। স্ট্রেচারে করে, ময়লা একটা বিছানায় চাদর দিয়ে তাকে জড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। রাহেলের মনে হচ্ছিল রোমান সিনেটর হয়ে গেছে আম্মু। *এট্ টু আম্মু*, চিন্তা করে এসথার কথা মনে পড়ায় সে হাসলো। উজ্জ্বল ব্যস্ত রাস্তায় মরা এক রোমান সিনেটরকে গাড়ি চড়িয়ে নিয়ে যাওয়াটা খুব সহজ ছিলো না। একটা ভ্যানের মেঝেতে তাকে শুইয়ে নেওয়া হয়েছিলো। নীল জানালার বাইরে লোকজনকে মনে হচ্ছিলো কাগজ কাটা মানুষের মতো– কাগজ কাটা জীবনওয়ালা। আসল জীবন ছিলো ভ্যানের ভিতরে। আসল মৃত্যুও। রাস্তার উঁচু নিচু আর গর্তে পড়ে গাড়ির ঝাঁকিতে আম্মু স্ট্রেচার থেকে পড়ে গিয়েছিলো, মাথাটা ঠুকে গিয়েছিলো মেঝের একটা লোহার বল্টুর সঙ্গে। সে উহ্ও করেনি জেগেও ওঠেনি। রাহেলের মাথা ভোঁ ভোঁ করছিলো। বাকি দিনটা তাকে কিছু শোনাতে চাকোকে চিৎকার করতে হয়েছিলো।

ক্রিমেটোরিয়ামের অবস্থাও ছিলো রেল স্টেশনের মতো। পার্থক্য ছিলো শুধু মানুষ ছিলো না। না ট্রেন, না ভিড়। ভিখিরী, বেওয়ারিশ লাশ আর পুলিশী হেফাজতে মৃতদের এখানে দাহ করা হতো। যাদের পিঠে চড়ার মতো, কথা বলার মতো কেউ ছিলো না, তাদের এখানে দাহ করা হতো। যখন আম্মুর পালা আসলো চাকো তখন রাহেলের হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিলো। ও চায়নি কেউ ওর হাত ধরুক। ও চাইল ক্রিমেটোরিয়ামের ঘামে পিচ্ছিল হাতটা ছাড়াতে।

পরিবারের আর কেউ ওখানে ছিলো না।

ইস্পাতের দরজাটা উঠে গেল আর ভিতরের লাল আগুনের হুঙ্কার গর্জন শোনা গেলো। তাপ এসে লাগলো ওদের গায়ে যেন কোন হিংস্র জন্তুর নিঃশ্বাস। রাহেলের আম্মুকে দেওয়া হলো ওটার খাবার হিসাবে। তার চুল, তার চামড়া, তার হাসি। তার কথা। যেমন করে সে কিপলিং এর ছড়া বলে তার বাচ্চাদের বিছানায় দিতো তেমন করেই।

উই বি অব ওয়ান ব্লাড ই এ্যান্ড আই।

তার গুডনাইট চুমু যেভাবে সে এক হাতে ওদের মুখগুলো ধরতো (নরম গাল, মাছের মুখ) চুল আঁচড়ে দেওয়ার সময়। যেমন করে সে রাহেলকে নিকার পরাতো। *বাঁ পা, ডান পা*। সবকিছুই জন্তুটাকে দেওয়া হলো, ওটা সন্তুষ্ট হলো। সে ওদের আম্মু ছিলো *আর* বাবা আর সে ওদের দ্বিগুণ ভালোবাসতো।

ফার্ণেসের দরজাটা ঝনাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলো। অশ্রু ছিল না। ক্রিমেটোরিয়ামের লোকটা চলে গেলো এক কাপ চা খেতে, কুড়ি মিনিটের মধ্যে ফিরলো না। ততক্ষণ চাকো আর রাহেল অপেক্ষা করেছিলো গোলাপি একটা রশিদের কাগজের জন্যে– যেটা দিয়ে ওরা আম্মুর দেহাবশেষ পাবে। তার ছাই, হাড়ের গিঁট, হাসির দাঁত। সবকিছু ছিলো একটা মাটির ভাঁড়ে। রশিদ নম্বর ছিলো কিউ ৪৯৮৬৭৩।

রাহেল চাকোকে প্রশ্ন করেছিলো ক্রিমেটোরিয়ামের লোকজন কি করে বোঝে কার ছাই কোন্‌টা। চাকো বলেছিলো নিশ্চয়ই এদের কোনো ব্যবস্থা আছে।

এসথা ওদের সঙ্গে থাকলে সেই রশিদটা রাখতো। সেই ছিলো সব নথি রাখার লোক। বাসের টিকিট, ব্যাংকের রশিদ, ক্যাশ মেমো, চেক বইয়ের মুড়ি। *ছোট্ট* মানুষ থাকতো ক্যারাভানে। দাম দাম।

কিন্তু এসথা ওদের সঙ্গে ছিলো না। সবাই বলেছিলো এটাই ঠিক। ওকে বরং লিখে জানাও। মামাচি বলেছিলেন রাহেলকেও লিখতে হবে। কি লিখবে?

মাই ডিয়ার এসথা, হাউ আর ইউ? আই এ্যাম ওয়েল আম্মু ডায়েড ইয়েস্টারডে। রাহেল কখনো লেখেনি। কতগুলো ব্যাপার আছে করা যায় না, যেমন নিজের অঙ্গকে চিঠি লেখা যায় না। হাতকে। চুলকে। বা মনকে।

পাপাচির পড়ার ঘরে রাহেল (বড়ও না ছোটও না) মেঝের ধুলোয় দাঁড়িয়ে উইজডম এক্সারসাইজ বুক থেকে মাথা তুলে দেখলো এসথাপ্পেন অ-চেনা চলে গেছে।

ও দেখলো এসথার পিঠটা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তখন মাঝ সকাল, আবার বৃষ্টি আসছিলো। বৃষ্টি আসার আগ-মুহূর্তের আলোয় সবুজ হয়ে উঠেছিলো ভয়ঙ্কর।

দূরে একটা মোরগ ডেকে উঠলো, ওটার আওয়াজ দু'ভাগ হয়ে গেলো। যেন পুরনো জুতো থেকে তলাটা খুলে পড়ে গেলো।

রাহেল দাঁড়িয়ে রইলো তার মলিন উইজডম নোটবুক নিয়ে। এক পুরনো বাড়ির সামনের বারান্দায়, বোতাম চোখের বাইসনের মাথার নিচে। যেখানে বহু বছর আগে "*বাড়িতে স্বাগতম আমাদের সোফি মল*" নাটক অভিনীত হয়েছিলো, যেদিন সোফি মল এসেছিলো।

একদিনেই সবকিছু বদলে গিয়েছিলো।

৮

বাড়িতে স্বাগতম, আমাদের সোফিমল

এইমেনেমের বাড়িটা ছিলো বেশ জাঁকালো আর প্রাচীন, কিন্তু কেমন যেন অন্যরকম। যেন বাড়ির ভিতরের জন্যে ওটার তেমন কিছু করার ছিলো না। ঠিক যেন কোন অচল বুড়ো, জল পড়া চোখে বাচ্চাদের খেলতে দেখছিলো আর তাদের তীক্ষ্ণ চীৎকার ও জীবনের প্রতি প্রাণমন সঁপে দেওয়া উচ্ছাসে ক্ষণিকের সুখ উপভোগ করছিলো।

ঢালু খাড়া হয়ে নেমে যাওয়া টালির ছাদটা বয়স ও বৃষ্টিতে হয়ে গেছে ময়লা আর শ্যাওলা ছাওয়া। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা কাঠের ফ্রেমের তিনকোনা ধারগুলো চালের কোণায় বসানো হয়েছিলো। আলো আসতো কোনাকুনি, ওগুলোর ভিতর দিয়ে। মেঝেতে পড়ে বিচিত্র এক রহস্যময়তার সৃষ্টি করতো। নেকড়ে, ফুল আর গোসাপের মতো গেছো সরিসৃপগুলো, আকাশের সূর্যের চলার সঙ্গে সঙ্গে আকার বদল করতো। গোধূলী-লগ্নে নিয়মমতো ওরা মরে যেতো।

দরজা দু'টোর চারটে করে খাড়া তক্তার তৈরী কপাট ছিল যাতে আগের কালের ভদ্রমহিলারা নিচের অর্ধেকটা বন্ধ রেখে ওর উপর কনুই চেপে হেলান দিয়ে ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে দরকষাকষি করার সময় কোমরের নিচের দিকটা আড়ালে রাখতে পারতো। কার্পেট বা চুড়ি কেনার সময় ওরা নিচের দিকটা খোলা রেখে আড়াল করতে পারতো বুক । কায়দা করে।

গাড়ি রাখার জায়গা থেকে ন'টা সিঁড়ি উঠে গেছে সামনের বারান্দা পর্যন্ত। এই প্রশস্ততা বারান্দাটাকে দিয়েছিল মঞ্চের মর্যাদা আর সবকিছুই, যা ওখানে ঘটেছিলো সবই পেয়েছিলো অভিনয়ের অলৌকিকতা। বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছিলো বেবি কোচাম্মার সাজানো বাগানটা, আর নুড়ি পাথর বিছানো গাড়ির রাস্তাটা ওটার চারপাশ ঘিরেছিলো আর ঢালু মসৃণ করা পাহাড়টার নিচের দিক যার ওপর দাঁড়িয়েছিলো বাড়িটা ।

বারান্দাটা ছিলো লম্বা চওড়া, ভর দুপুরেও ওটা ঠান্ডা থাকতো সূর্যের তাপ বেশি থাকলেও।

যখন লাল সিমেন্টের মেঝেটা তৈরী করা হয়েছিলো তখন প্রায় ন'শ ডিমের সাদা নাল ওটার মধ্যে দেওয়া হয়েছিলো, ফলে ওটা পেয়েছিলো ঝকঝকে পালিশ।

বোতামের চোখওয়ালা শুকনো বাইসনের দু'পাশে ছিলো তার শ্বশুর আর শাশুড়ির ছবি। মামাচি একটা বেতের টেবিল সামনে নিয়ে বেতের চেয়ারে বসেছিলেন। টেবিলের ওপর ছিলো একটা ফুলদানী, ওতে ছিল একটা প্যাঁচানো বেগুনী অর্কিড।

দুপুরটা ছিলো নিস্তব্ধ আর গরম। বাতাস ছিলো অপেক্ষায়।

মামাচি একটা চক্‌চকে বেহালা ধরেছিলেন তাঁর থুতনির নিচে। তাঁর পঞ্চাশ দশকের ঝাপসা সানগ্লাস ছিলো কালো; একদিকে কাৎ হয়ে, ওটার ফ্রেমের কোনায় লাগানো ছিলো গণ্ডারের হাড়। তাঁর শাড়ীটা ছিলো মাড় দেওয়া আর সুগন্ধি মাখানো, হালকা সাদা আর সোনালি। তাঁর হীরের কানের দুলগুলো জ্বলজ্বল করছিলো তাঁর কানে যেন ক্ষুদ্র ঝাড়বাতি– তাঁর রুবির আংটিগুলো ছিলো ঢিলে। তাঁর ফ্যাকাসে, মসৃণ চামড়ায় ছিলো ভাঁজ, যেন ঠাণ্ডা দুধের সরের মতো আর ক্ষুদে ক্ষুদে লাল তিলের ছিটেওয়ালা। তিনি ছিলেন সুন্দরী, বুড়ি, বাইতাড়া, রাজকীয়। এক অন্ধ বিধবা মা।

তাঁর দুরদর্শিতা ছিলো কম কিন্তু ভালোই পরতেন কারখানা চালাতে, তবে বাতিক ছিলো। প্রথম বছরগুলোতে মামাচি তাঁর ভ্রুর পড়া সবগুলো চুল একটা, ফুল তোলা ছোট বটুয়ায় ভরে রেখেছিলেন ড্রেসিং টেবিলের ওপর। যখন অনেকগুলো জমেছিলো, তখন সেগুলো দিয়ে তিনি জাল দিয়ে বাঁধা একটা খোঁপা, বানিয়েছিলেন। ওটা তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন একটা তালা দেওয়া দেরাজে তাঁর গয়নার সঙ্গে। কয়েক বছর পরে, যখন তাঁর চুল পাতলা আর সাদা হয়ে যেতে শুরু করলো, তখন সেটাকে মোটাসোটা করার জন্যে, তিনি তাঁর ঘন কালো খোঁপাকে কাঁটা দিয়ে আটকাতেন ছোট ও সাদা চুল ভর্তি মাথায়। তাঁর বইতে এটা ছিলো নিখুঁত এবং অনুমোদিত, যেহেতু সবগুলো চুলই তাঁর ছিলো। রাতে, তিনি তাঁর খোঁপা খুলে ফেলতেন আর নাতি নাতনীদের বলতেন তাঁর বাকি চুলগুলোকে নিয়ে এঁটে, তেল দেওয়া বেনী বাঁধতে, যা দেখতে হতো ছাইরঙের ইঁদুরের লেজের মতো। নাতি নাতনীরা পালা করে তাঁর অগুন্তি তিল গুনতো সঙ্গে সঙ্গে বেনীটাও বাঁধতো।

মামাচি মাথার চাঁদি, দুর্গন্ধওয়ালা চুলে লুকাতেন সাবধানে, বাঁকা বেয়াড়া দাগগুলো। ওগুলো ছিলো পুরানো মারের দাগ, পুরানো বিয়েটার ফল। পিতলের ফুলদানীর বাড়ির দাগ।

তিনি বাজাতেন লেটমেন্টে'র একটা প্রচলিত সুর, যা হ্যান্ডেল এর জল তরঙ্গের খানিকটা। তাঁর কাৎ হয়ে থাকা সানগ্লাসের পিছনে ছিল বন্ধ অকেজো চোখগুলো, কিন্তু তিনি দেখতে পেতেন সুরটা, তাঁর বেহালা ছেড়ে দুপুরের ওপর চড়ে বসতো ধোঁয়ার মতো।

তাঁর মাথার ভিতরে, ওটা ছিলো ঘরের মতো। ঢাকা থাকতো কালো পর্দায়, যেন উজ্জ্বল দিনের গায়ে লটকানো।

যখন তিনি বাজাতেন তাঁর মন ফিরে যেতো ফেলে আসা বছর গুলোতে– যখন তিনি নিজেই বাজারের জন্যে আচার বানাতেন। তখন তাঁর মনে পড়তো প্রথম দিকের কথা, কী সুন্দর ছিলো ওগুলো দেখতে। বোতলে ভরা ছিপি আঁটা, এবং রাখা থাকত একটা তাঁর বিছানার কাছে টেবিলের ওপর, যাতে সকালে ঘুম থেকে জেগেই ওগুলো ছুঁতে পারেন। প্রথম রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু জেগে গেলেন মাঝরাতের একটু পরেই। তিনি ওগুলোকে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন এবং তার খোঁজারু আঙুলগুলো তেলে মাখামাখি হলো। আচারের বোতলগুলো দাঁড়িয়েছিলো জমে থাকা তেলের মধ্যে। সব জায়গায় তেল আর তেল। তাঁর ফ্লাস্কের নিচে গোল দাগ। তাঁর বাইবেলের নিচে, তাঁর বিছানার পাশের টেবিলের ওপর পুরোটা জুড়ে। আচার হওয়া আমগুলো তেল শুঁষে ফুলে গিয়েছিলো তাই বোতল থেকে তেল উপচে গড়িয়ে পড়েছিলো।

মামাচি, এজন্যে চাকোর কিনে দেওয়া বইটার সাহায্য নিলেন। বইটার নাম ছিলো, "*বাড়ির জন্যে সংরক্ষণ*" কিন্তু ওটাতে কোনও সমাধান মেলেনি। তিনি বিষয়টা জানিয়ে অনম্যা চান্দির ভগ্নিপতিকে একটা চিঠি লিখলেন, তিনি ছিলেন বোম্বের পদ্মা পিকল্‌সের রাজ্য ব্যবস্থাপক। তিনি তাঁকে উপদেশ দিলেন তাঁর (মামাচি) সংরক্ষকের পরিমাণ এবং নুন বাড়িয়ে দিতে। ওতে উপকার হলো, কিন্তু সমস্যাটা পুরোপুরি গেলো না। এখনও এত বছর পরেও, প্যারাডাইসের আচারের বোতল থেকে তেল চুঁয়ে পড়ে। যদিও তা দেখা যায় না কিন্তু তেল এখনও চোঁয়ায় এবং দূরের পথে যেতে যেতে লেবেলগুলো হয়ে যায় তেলতেলে আর সচ্ছ। আচারগুলো নিজেরাও কিছুটা নুনকটার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

মামাচি ভাবছিলেন তিনি কি কখনও নিখুঁত সংরক্ষনের কারসাজিটা পুরোপুরি ধরতে পারবেন, এবং সোফি মল কি খেতে পছন্দ করবে? বরফে জমানো আঙ্গুর রস। একটা গ্লাসে ঠাণ্ডা বেগুনী রস। একটা গ্লাসে।

তখন তিনি চিন্তা করলেন মার্গারেট কোচাম্মার কথা, আর হতাশায় মনমরা তাঁর বাজানো জলবৎ তরলং নোটগুলো, হ্যান্ডেলের সুরের, হয়ে গেলো চড়া আর রাগী।

মামাচি কখনো মার্গারেট কোচাম্মাকে দেখেননি, কিন্তু তাকে ঘেন্না করতেন। সে যে জন্যেই হোক। সোফি মলকে তিনি দোকানদারের মেয়েই মনে করতেন। মামাচির পৃথিবীটা ছিল ওরকমই। যদি তাঁকে কোট্টাইয়ামের কোন বিয়েতে দাওয়াত করা হতো, তিনি যার সাথেই থাকতেন সারাটা সময় তাকে বলতেন, "বরের নানা ছিলো আমার বাবার কাঠমিস্ত্রী। কুঞ্জুকুট্টি ইপেনকে চেনেন? তার নানীর বোন ত্রিবান্দ্রামের এক ওঁচা দাই। একসময়ে আমার স্বামীর পরিবার ছিলো পুরো পাহাড়টার মালিক।"

অবশ্যই মামাচি মার্গারেট কোচাম্মাকে ঘেন্না করতেন– ইংল্যান্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেও হয়ত! শুধু কোচাম্মার খেটে খাওয়া অতীতের জন্যেই মামাচি তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, তা নয়।

মামাচি মার্গারেট কোচাম্মাকে ঘেন্নাই করতেন, কারণ সে ছিলো চাকোর বউ, আর সে চাকোকে ছেড়ে গিয়েছিলো। অবশ্য আরও বেশীই ঘেন্না করতেন যদি সে চাকোর সঙ্গে থাকতো।

যেদিন চাকো পাপাচিকে বাধা দিয়েছিলো পেটাতে (আর পাপাচি তাঁর চেয়ারটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছিলেন তার বদলে), সেদিনই মামাচি তাঁর গিন্নিবান্নির মালপত্র বাক্সবন্দি করে সেগুলো দিলেন চাকোর তদারকিতে। তার পর থেকে চাকো হয়ে গেলো মামাচির মেয়েলী সব অনুভূতির আধার। তাঁর প্রিয় পুরুষ। তাঁর একমাত্র ভালোবাসা।

মামাচি কারখানার মেয়ে মজুরদের সঙ্গে চাকোর লাম্পট্যের ব্যাপারটা জানতেন তবে তা নিয়ে কষ্ট পাওয়া বন্ধ করেছিলেন। যেদিন বেবি কোচাম্মা বিষয়টা তুললেন উত্তেজনায় ঠোঁট শক্ত হয়ে গেলো মামাচির।

'সে পুরুষ মানুষের চাহিদাকে অস্বীকার করতে পারেনা।' –মামাচি বললেন কড়া গলায়, নির্বিকারচিত্তে।

বেবি কোচাম্মা আশ্চর্য হয়ে মেনে নিয়েছিলেন এ ব্যাখ্যাটা, আর পুরুষের চাহিদা সম্পর্কে এই হেঁয়ালী, গোপন রগরগে ধারণাটা আবছা হলেও পরোক্ষ অনুমোদন পেয়েছিলো এইমেনেমের বাড়িতে। মামাচি বা বেবি কোচাম্মা কেউ কোন স্ববিরোধিতা দেখলোনা চাকোর মার্কসবাদী মন ও জমিদারী কাম তৃষ্ণার মধ্যে। তাঁরা শুধুমাত্র চিন্তিত ছিলেন নক্সালদের নিয়ে। ধারনা ছিলো যে ওরা ভালো পরিবারের পুরুষদের জোর করে বিয়ে দিতো চাকরানীদের সঙ্গে, যাদের তাঁরা (ভালো পরিবারের পুরুষরা) পেট বানাতেন। অবশ্য, তাঁরা দূর থেকে সন্দেহ করতেন– সেই ক্ষেপণাস্ত্রটা, যখন ওটাকে ছোঁড়া হবে, সেটা চিরকালের জন্যে ধ্বংস করবে পরিবারের সুনাম, আর সেটা আসবে একেবারেই অজানা কোনো জায়গা থেকে হঠাৎ করে।

মামাচি চাকোর ঘরে যাওয়ার জন্যে একটা আলাদা পথ বানিয়ে দিয়েছিলেন। ওটা ছিলো বাড়ির পূর্ব দিকে, যাতে তার 'চাহিদা' পূরনের জিনিসগুলো বাড়ির মধ্যে দিয়ে কাপড়-চোপড় মাটিতে লটপটিয়ে না হাঁটে। মামাচি গোপনে টাকা দিতেন– যাতে ওরা খুশি থাকে। তারা তা নিতো কারণ তাদের দরকার ছিলো। তাদের ছিলো ছোট কাচ্চা-বাচ্চা আর বুড়ো বাবা-মা কিংবা মরদ, যারা তাদের সব রোজগার খরচ করে ফেলতো শুঁড়িখানায় তাড়ি গিলে। এ ব্যবস্থাটা মামাচির পছন্দ হয়েছিলো কারণ তিনি মনে করতেন পারিশ্রমিক দিয়েই সমস্যা মিটছে। টাকাই যৌনতাকে বিচ্ছিন্ন করতো ভালোবাসা থেকে। চাহিদাকে অনুভূতি থেকে।

অবশ্য মার্গারেট কোচাম্মা ছিলো অন্য রকমের– সব দিক দিয়েই। যদিও এর থেকে তার বের হওয়ার কোন পথ ছিলোনা (যদিও তিনি একবার চেষ্টা করেছিলেন

কচু মারিয়াকে দিয়ে বিছানার চাদর গুলোর ওপর কোন দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করাতে), মামাচি চেয়েছিলেন মার্গারেট কোচাম্মা যেন আবার চাকোর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়তে না পারে। যখন মার্গারেট কোচাম্মা এইমেনেমে ছিলো, মামাচি তখন নিজের বিগড়ে যাওয়া অনুভূতিগুলো সামলাতে পেরেছিলেন। মার্গারেট কোচাম্মার পাত্রে ফেলে রাখা ময়লা কাপড়গুলোর পকেটে টাকা রেখে দিতেন। মার্গারেট কোচাম্মা কখনো টাকাগুলো ফেরত দেয়নি কারণ সে নিজেই কখনো তা পায়নি। মার্গারেট কোচাম্মার কাপড়ের পকেটগুলো নিত্যদিনই খালি হতো অনিয়ান ধোপার হাতে, মামাচি সেটাও জানতেন, কিন্তু পছন্দ করতেন। মার্গারেট কোচাম্মার নিঃস্তব্ধতাকে ব্যখ্যা করতেন– মৌন সম্মতি হিসাবে। মামাচি তাঁর ছেলের জন্যে মার্গারেট কোচাম্মার উপকারগুলোর পারিশ্রমিক হিসাবে এটাকে কল্পনা করতেন। মামাচি মার্গারেট কোচাম্মাকে শুধু আর একটা 'মাগী' হিসাবে ভাবতেই পছন্দ করতেন। অনিয়ান ধোপা তার প্রত্যেক দিনের বখশিশ পেয়ে খুশীই ছিলো, অবশ্য মার্গারেট কোচাম্মার কাছে পুরো ব্যপারটাই ছিলো অজানা।

কুয়োর ওপরের দাঁড় থেকে একটা নোংরা প্যাঁচা তার মরচের মতো লাল রঙের পাখা নেড়ে ডেকে উঠলো হুপ্ হুপ্ করে।

একটা কাক একটুকরো সাবান চুরি করে এনেছিলো, ওটা তার ঠোঁটে লেগেছিলো বুদবুদের মতো।

অ কার, ধোঁয়াটে রান্নাঘরে, বেঁটে কচু মারিয়া ডিঙি মেরে দাঁড়িয়ে উঁচু, দু' থাকওয়ালা 'বাড়িতে স্বাগতম আমাদের সোফি মল' কেকটার ওপরে চকলেটের নক্সা করছিলো। যদিও সে সব দিনে বেশীরভাগ সিরিয়ান খৃষ্টান মেয়েই শাড়ী পরতে শুরু করেছিলো, কচু মারিয়া তখনও পরাতো রঙ ছাড়া একটা ভি গলার হাফহাতা সাদা চাট্টা আর সাদা ধুতি। ওটা ভাঁজ হয়েছিলো একটা কুঁচি দেওয়া কাপড়ের পাখার মতো, তার পিছন দিকে। কচু মারিয়ার পাছাটা ছিলো থ্যাবড়া, নীল আর সাদা দাগ কাটা, কুঁচি দেওয়া ধুতির মধ্যে বিচ্ছিরি রকম বেমানান; চাকরানীর আলখা ার মতো, সেটা মামাচি তাকে বাড়ির ভিতরে পরতে জোরাজুরি করতেন।

ওর ছিলো খাটো, মোটা হাত, আর আঙুলগুলো যেন তরকারীতে মাংসের লম্বা টুকরো এবং একটা বোঁচা মাংসল নাক, যেটার ফুটোগুলো ছিল বিরাট। তার চামড়ার গভীর ভাঁজগুলো তার নাকটাকে লাগিয়ে রেখেছিলো তার থুতনির কোণায়। তার মাথাটা ছিলো শরীরের তুলনায় অনেক বড়। তাকে দেখতে লাগতো বোতলে ভরা ভ্রূণের মতো যেন প্রাণীবিজ্ঞান গবেষণাগারে ফরমাল ডিহাইড ভরা কাঁচের জার থেকে পালিয়ে এসেছে।

সে ভেজা নগদ টাকা রাখতো তার শক্ত করে বাঁধা ব্রেসিয়ারের মধ্যে। অখৃষ্টানের মতো স্তনগুলোকে সমান করার চেষ্টাও ছিলো। কুনুক্কু কানের দুলগুলো ছিলো পুরু সোনার। তার কানের লতিগুলোর ফুটো মোটা হয়ে গিয়েছিলো ভারি

ফাঁসের মতো, সেগুলো তার ঘাড়ের চারপাশে দুলতো, তার কানের দুলগুলো তাদের মধ্যে বসেছিলো মেরি– গোতে ঘোরা গোমড়া মুখো বাচ্চার মতো (অবশ্য পুরো ঘুরতো না)। একবার তার ডান দিকের লতি টুকরো হয়ে গিয়েছিলো আর সেলাই করেছিলেন ডাক্তার ভার্গিস ভার্গিস। কচু মারিয়া কুনুক্কু পরতো, কারণ যদি সে তা না পরতো তাহলে কিভাবে লোকজন জানবে যে তার চাকরী রাধুনির হলেও (মাসিক বেতন পঁচাত্তর টাকা) সে সিরিয়ান খৃষ্টান, মার থোমাইট? পিলাইয়া নয়, অথবা পুলাইয়া না, অথবা পারাভান না। ছোঁয়া খাওয়ার মতো উঁচু জাতের খৃষ্টান (যাদের কাছে খৃষ্ট ধর্ম গড়িয়ে পড়েছিলো চা'র ব্যাগ থেকে ছড়িয়ে পড়া চা-এর মতো)। টুকরা হওয়া, পিছনে সেলাই করা কানের লতি যার সেলাই ছিলো পিছনেই– তখনকার জন্যে ছিলো ভালোই।

কচু মারিয়া তখনও টেলিভিশনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়নি। হাল্ক হোগান আসক্তিটা ছিল না তখনও, এমনকি টেলিভিশন সেটও সে দেখেনি। টেলিভিশনের যে আদৌ স্ক্রিন আছে তাই সে বিশ্বাস করতোনা। যদি কেউ তাকে বলতো যে, সেটা আছে, কচু মারিয়া মনে মনে ভাবতো যে, সে তাকে অপমান করছে, তার কম বুদ্ধির জন্যে। অন্য লোকদের বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে ব্যাখ্যার ব্যাপারে কচু মারিয়া সতর্ক ছিলো। প্রায়ই সে ওগুলোকে ধরে নিতো ইচ্ছে করে বিপদে পড়া হিসাবে। তার শিক্ষার কমতি এবং (আগেকার) ধোঁকা খাওয়ার ভয় ছিলো তার এজন্যে। তাই কেউ কিছু বললে তার বিশ্বাস হতো না। কয়েক মাস আগে, জুলাই মাসে রাহেল যখন তাকে বললো যে, নীল আর্মস্ট্রং নামের এক আমেরিকান নভোচারী চাঁদের পিঠে হেঁটেছে সে হেসেছিলো আর মুখ ঝামটা দিয়ে বলেছিলো, একজন মালায়ালী সার্কাসের কসরৎওয়ালা নাম যার ও মুথাচেন, হাতের ওপর সূর্য নাচিয়েছে, তার নাকের ওপর পেনসিল খাড়া করে রেখে। সে হারতে রাজি ছিল না। আমেরিকানদেরও সে দেখেনি, তাই মনে করতো নীল আর্মস্ট্রং হয়তোবা কল্পনার একটা আজগুবি নাম। কিন্তু চাঁদের ওপর হাঁটাটা! একেবারে অসম্ভব, কখনো নয়। পরের দিন *মালায়ালী মনোরমা* পত্রিকায় ছাপা অস্পষ্ট ধুসর ছবিটাকেও সে বিশ্বাস করেনি, পড়তে তো পারতই না।

এসথা, যখন বলতো, *'এট্টু কচু মারিয়া!'* সে ধরেই নিত ও তাকে ইংরেজীতে গালাগালি করছে। সে মনে করতো ওটার মানে হবে এরকম, *'কচু মারিয়া, তুমি কুচ্ছিৎ কালো বামন।'* সে অপেক্ষা করছিল, এসথার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্যে একটা ভাল সুযোগের।

সে ততক্ষণে শেষ করেছিলো লম্বা কেকটা জমানো। তারপর সে তার মাথাটা ঘুরিয়ে নিলো পিছন দিকে আর কেকের ওপরের নক্সা থেকে বেরিয়ে থাকা খানিকটা ক্রিম টিপে বের করে নিজের জিভে ফেলে দিলো। চকোলেটের প্যাঁচানো দলাগুলো কচু মারিয়ার গোলাপী জিভের ওপর পড়ে থাকলো। তখন মামাচি চেঁচিয়ে উঠলেন বারান্দা থেকে ('কচু মারিয়া! আমি গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি!') তার মুখ ছিলো

চকোলেটে ভরা তাই সে উত্তর দিতে পারছিলোনা। যখন সে গেলা শেষ করলো তখন জিভটা দাঁতের ওপর দিয়ে চালালো তারপর পর-পর কয়েকবার চকাশ চকাশ করে শব্দ করলো জিভ দিয়ে, যেন তখুনি টক কিছু খেয়েছে।

দূরের আকাশীনীল রঙের গাড়ির ইঞ্জিন (বাস স্টপেজের পাশ দিয়ে, স্কুলের পাশ দিয়ে, হলুদ চার্চের পাশ দিয়ে আর রাবার গাছের মধ্যে দিয়ে লাল রঙের উচু রাস্তা দিয়ে) একটা গুন গুন শব্দ পাঠালো অন্ধকার ঝুলেভরা প্যারাডাইস পিকলসের চাতালের ওপর দিয়ে।

চাকোসার ভানু। ফিস্‌ফিস্‌ কথাটা ছড়িয়ে পড়লো। আচার বানানো (আর রস নিঙড়ানো, ফালি করে কাটা, সেদ্ধ করা, ঘোঁটা, ঘষা, নুন দেওয়া, শুকানো, ওজন করা ও বোতলে ছিপি মারা) বন্ধ হয়ে গেলো।

'চাকো সাহেব আসছে,' ফিসফিসানি চলতে থাকলো। টুকরা করার চাকুগুলো নিচে নামিয়ে রাখা হলো। আধ-কাটা তরকারীগুলো ফেলে রাখা হলো, বড় ইস্পাতের থালার ওপর। নিঃসঙ্গ চালকুমড়ো, অর্ধেক আনারস। রঙীন রাবারের অঙ্গুঠীগুলো (উজ্জ্বল, যেন উত্তেজিত পুরু কনডম) খুলে ফেলা হলো। আচার লেগে থাকা হাত গুলো ধুয়ে ফেলা হলো আর নীলাভ রূপালী এ্যাপ্রণের ওপরটা মোছা হলো। ধুতি-যেগুলো ময়লা না লাগার জন্যে জামা উঁচু করে গোঁজা হয়েছিলো, সেগুলোকে ছেড়ে দেয়া হলো। রেশমী কাপড়ের তৈরী সচ্ছ পর্দাওয়ালা স্প্রিং লাগানো কব্জাওয়ালা দরজাগুলো শব্দ করে নিজেরাই বন্ধ হয়ে গেলো।

আর গাড়ির রাস্তার একদিকে, পুরানো কুয়োর পিছনে, কদম ফুলের গাছের ছায়ায়, চুপচাপ নিশ্চুপ নীল জামা পরা এক সৈন্যদল জড়ো হলো সবুজ উষ্ণতা দেখতে।

নীল জামা পরা, সাদা টুপিওয়ালা, যেন একটা উজ্জ্বল নীল আর সাদা পতাকার সমাবেশ।

আচ্চু, জোসে, ইয়াকো, অনিয়েন, এলাইয়েন, কুট্টান, বিজয়ান, বাওয়া, জয়, সুমাথি, অর্মল, অনম্মা, কনাকাম্মা, লাথা, সুশীলা, বিজয়ামা, জলিকুট্টি, মলিকুট্টি, লুসিকুট্টি, বীনা মল (বাসের নামের মতোই নামওয়ালা মেয়েরা)। প্রথম দিকে বিরক্ত হওয়ার ঘড়-ঘড় শব্দ করলো, ওটা লুকিয়েছিলো আনুগত্যের একটা ঘন আস্তরণের নিচে।

নীলাকাশী রঙের প্লেমাউথ নুড়ি পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে খচ্‌মচ্‌ আওয়াজ তুলে ছোট শামুক আর এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা টুকরা লাল আর হলুদ ছোট পাথরগুলোকে গুঁড়িয়ে দিতে দিতে এসে পৌছালো গেটের কাছে। ছেলে-মেয়েরা হোঁচট খেতে খেতে দৌড়ে আসলো।

তাদের ঢলে পড়া চুলের ঝর্নাগুলো আর
মসৃণ চুলের ভাঁজগুলো নিয়ে।

কোঁকড়ানো হলুদ বেলবটম প্যান্ট আর একটা অতিপ্রিয় গো-গো ব্যাগ নিয়ে নামলো সে। জেট প্লেনে চড়ার ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছিলো ও। তারপর গোড়ালী ফোলা বয়স্কারা নামলেন। তাঁরা অনেকক্ষণ বসে থাকায় ছিলেন জবুথবু। তোমরা কি এসেছো? মামাচি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর কোনা তোলা কালো চশমাটাকে নতুন শব্দ গুলোর দিকে ঘুরিয়ে নিলেন, যে শব্দগুলো গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার আর গাড়ির ভিতর থেকে বের হওয়ার। তিনি তাঁর বেহালাটাকে নিচে নামালেন।

'মামাচি!' রাহেল বললো তার সুন্দর অন্ধ নানীকে। 'এসথা বমি করেছিলো! সাউণ্ড অব মিউজিকের মধ্যে আর ...'

আম্মু তার মেয়েকে আলতো করে ছুঁলো। তার কাঁধের ওপর এই ছোঁয়াটার মানে ছিলো, চুপ কর্... রাহেল আম্মুর দিকে তাকালো আর দেখতে পেলো যে সে অভিনয়ে ব্যস্ত। তবে তার অভিনয়ের অংশটা খুব ছোট।

সে ছিলো শুধু প্রকৃতির দৃশ্যটার অংশ। একটা ফুলই হয়তোবা। অথবা একটা গাছ। একটা মুখ ভিড়ের মধ্যে। শহুরে।

কেউ রাহেলকে শুভেচ্ছা জানালো না। এমনকি সবুজ গরমে নীল সেনাবাহিনীটাও নয়।

'সে কোথায়?' মামাচি গাড়ির শব্দগুলোকে জিজ্ঞেস করলো। 'আমার সোফি মল কোথায়?' এখানে এসো যাতে আমি তোমাকে দেখতে পারি।

যা তিনি কথা বলছিলেন থেমে থাকা সুর যেটা ঝুলে ছিলো তাঁর ওপর ওটা। যেন কেঁপে ওঠা দীপ্তি, মন্দিরের হাতির ওপরের ছাতার মতো, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে শান্ত ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো ধুলোর মতো।

তাঁর চাকো, 'আমাদের জনগণের মানুষটার কি হলো?' পেট পুরে খাওয়ায় ফুলে ওঠা পেটটা স্যুট টাই নিয়ে মার্গারেট কোচাম্মা আর সোফি মলকে পথ দেখিয়ে বিজয়ীর মতো এগিয়ে চললো ন'টা সিড়ির ওপর দিয়ে যেন তারা তার সদ্য জেতা দু'টো টেনিস ট্রফি।

আরেকবার, শুধুমাত্র ছোট ছোট কথাগুলোই বলা হলো। বড় ব্যাপারগুলো ভিতরে ওঁৎ পেতে বসে থাকলো না বলা অবস্থায়।

'কি খবর, মামাচি?' মার্গারেট কোচাম্মা বললো– তাঁর নরম মাস্টারনীর (যে মাঝে মাঝে চড়ও মারতো) স্বরে। 'ধন্যবাদ আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্যে। কিছু দিনের জন্যে কোথাও যাওয়া আমাদের খুব দরকার ছিলো।'

মামাচি গন্ধ পেলেন সস্তা সেন্টের– সেটাও টকে গিয়েছিলো প্লেনের ঘামের সঙ্গে মিশে। (তাঁর নিজের ছিলো এক শিশি ডিওর সেন্ট, যেটা খুব সাবধানে বন্ধ করা ছিলো নরম সবুজ চামড়ার থলেতে, আলমারীর মধ্যে)।

মার্গারেট কোচাম্মা হাতে নিলেন মামাচির হাত। আঙুলগুলো ছিলো নরম, চুনীর আংটিগুলো শক্ত।

'কি খবর, মার্গারেট?' মামাচি বললেন (না নরম, না কঠিন), কালো চশমা তখনও তাঁর চোখে। 'এইমেনেমে স্বাগতম, আমি দুঃখিত, তোমাকে আমি দেখতে

পাচ্ছিনা বলে। তুমি হয়তো জানো আমি প্রায় পুরোপুরিই অন্ধ।' তিনি বললেন শান্ত স্বরে।

'ওহ্, সেটা ঠিক আছে,' মার্গারেট কোচাম্মা বললো, 'আমি বুঝতে পারছি আমাকে দেখতে খুবই খারাপ লাগছে।' সে হাসলো বোকারমতো, বুঝতে পারছিলো না এটা ঠিকমতো জবাব হলো কিনা?

'ভুল,' চাকো বললো। সে মামাচির দিকে ঘুরলো, একটা গর্বের হাসি হাসলো যেটা তার মা দেখতে পেলোনা। 'ও আগের মতোই সুন্দর আছে।'

'জো'র ব্যাপারটা শুনে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি,' মামাচি বললেন। তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল তিনি খুব বেশী কষ্ট পাননি।

তখন কিছুক্ষণের জন্যে সেখানে 'জো'র জন্যে কষ্ট পাওয়ার' ব্যাপারটা সবকিছুকে থামিয়ে দিলো।

'আমার সোফি মল কোথায়?' মামাচি বললেন, 'এখানে এসো তোমাকে তোমার দাদীকে দেখতে দাও।'

সোফি মলকে মামাচির দিকে এগিয়ে দেওয়া হলো। মামাচি তাঁর কালো সানগ্লাসটা তুললেন তাঁর চুলের মধ্যে। যেগুলোকে দেখতে লাগছিলো খাড়া হয়ে ওঠা বিড়ালের চোখের মতো, যা ছাতা ধরা মোষের মাথার উপর বসানো ছিলো। ছাতা ধরা মোষটা বললো, 'না, কোন ভাবেই নয়।' ছাতা ধরা মোষের ভাষায়।

তাঁর চোখে কুর্ণিয়া লাগানোর পরও মামাচি শুধু দেখতে পেতেন আলো আর ছায়া। যদি কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতো, তবে তিনি বলতে পারতেন যে কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কে দাঁড়িয়ে আছে, তা বলতে পারতেন না। তিনি চেক পড়তে পারতেন, অথবা রশিদ, কিংবা ব্যাংক নোট, যদি সেটাকে তাঁর চোখের পাতার খুব কাছে ধরা হতো পাপড়ি ছোঁয়ার মতো করে। তারপর সেটাকে শক্ত করে ধরে, তাঁর চোখটা নোটের সাথে পিটপিট করতেন, যেন এক শব্দ থেকে আর এক শব্দে গড়িয়ে যেতেন।

শহুরে লোকজন (পরীদের মতো জামা পরা) মামাচিকে দেখলো, সোফি মলকে তিনি তাঁর চোখের কাছে এনে দেখতে লাগলেন। একটা চেকের মতো ওকে পড়তে লাগলেন। তিনি ব্যাংক নোটের মতো ওকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। মামাচি (তার ভালো চোখটা দিয়ে) লালচে বাদামী চুল (যা প্রায় সোনালী) দু'টা ফোলা আর খুদে খুদে দাগওয়ালা চোয়ালের গর্তের (যা প্রায় লাল) নীলাভ-ধূসর-নীল চোখ গুলো ছুঁয়ে দেখলেন।

'পাপাচির নাক,' মামাচি বললেন। 'আমাকে বলো, তুমি কি সুন্দরী?' তিনি সোফি মলকে জিজ্ঞেস করলেন।'

'হ্যাঁ,' সোফি মল বললো।

'আর লম্বা?'

'আমার বয়সের জন্যে ঠিক লম্বা,' সোফি মল বললো।

'অনেক লম্বা,' বেবি কোচাম্মা বললেন। এসথার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা।'

'ও ওর চেয়ে বয়সে বড়,' আম্মু বললো।

'তবুও ... ' বেবি কোচাম্মা বললেন।

একটু দূরের পথ দিয়ে, সবসময় যে পথ ব্যবহার করতো ভেলুথা সে পথের চেয়ে সরু একটা পথ দিয়ে গেলো, ওটা ছিলো রাবার গাছ গুলোর ভিতর দিয়ে। তার শরীরের ওপর দিকটা ছিলো উদোম। একটা প্যাঁচানো বিদ্যুতের তারের গোছা কাঠের উপর ঝুলিয়ে রেখেছিলো। সে পরেছিলো তার গভীর নীল আর কালো রঙে ছাপা ধুতি, ঢিলে করে গুটিয়ে রেখেছিলো হাঁটুর ওপর। তার পিঠে, তার ভাগ্যপত্র যেটা এসেছিলো জন্ম-দাগের বৃক্ষ থেকে (যার জন্যে সময়মতো বর্ষা শুরু হতো) সেই শরতের পাতাঝরা রাতে ওটা ওরকমই ছিলো।

গাছগুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে গাড়ির রাস্তায় ওঠার আগে, ভেলুথাকে রাহেল দেখে ফেললো আর খেলা ছেড়ে গেলো ভেলুথার কাছে।

আম্মু রাহেলকে যেতে দেখলো।

মঞ্চের বাইরে থেকে, সে তাদেরকে দেখলো অভিনয় করতে, সারা শরীরে লেগে ছিলো আহ্বান। ভেলুথা নতজানু হয়ে অভিবাদন জানালো– যেমন তাকে শেখানো হয়েছিলো, তার ধুতিটাকে একটা স্কার্টের মতো ছড়িয়ে, রাজার প্রাতঃরাশে সে যেন এক ইংরেজ গোয়ালিনী। রাহেল নিজে ঝুঁকলো (এবং বললো 'ঝোঁকো')। তার ছোট আঙুল গুলো জড়ো করে একটা আংটার মতো বানিয়ে হাত মেলালো রাশভারী ভাবে– মিটিং-এ থাকা ব্যাংকের অফিসারের মতো চেহারা করে।

ঘন সবুজ গাছ পালার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে আসা টুকরো টুকরো সূর্যের আলোয় আম্মু দেখলো ভেলুথা তার মেয়েকে তুলে নিলো খুব সহজেই, যেন সে একটা বাতাসে ফুলানো বাচ্চা বেলুন। যখন ভেলুথা তাকে ওপরে ছুঁড়ে মারলো আর রাহেল তার হাতে এসে পড়লো, আম্মু দেখতে পেলো রাহেলের মুখে বাতাসে ভাসা বাচ্চার সুখী মুখ।

সে দেখলো ভেলুথার পেটের কাছের কোনার পেশীগুলো ফুলে উঠেলো– জেগে উঠলো তার চামড়ার নীচে, যেন একটা চকোলেটের টুকরো ভাঙার খাঁজ। অবাক হলো, কিভাবে তার শরীর বদলে যাচ্ছিলো– এতো নিঃশব্দে, মসৃণ পেশীওয়ালা থেকে একটা পুরুষের শরীরে। দেহ রেখায় ও সামর্থ্যে। এক সাঁতারুর শরীরে। এক সাতারু-কাঠমিস্ত্রির শরীরে। যেন একটা বেশী মোম ঘষা শরীর বা বার্ণিশ দিয়ে পালিশ করা।

ভেলুথার ছিলো উঁচু চোয়াল আর হঠাৎ ফুটে ওঠা সাদা হাসি।

ভেলুথার হাসিটাই তখন আম্মুকে মনে করিয়ে দিলো তার ছোট বেলার রূপটাকে। ভিল্লে পাপেনকে নারকেল গুনতে যে সাহায্য করতো। ছোট ছোট উপহার ধরে থাকতো, যেগুলো সে বানাতো আম্মুর জন্যে। তার হাতের তালুতে রেখে দিত যাতে সেগুলো নেওয়ার সময় তাকে ছুঁতে না হয়। নৌকা, বাক্স, ছোট ছোট হাওয়াকল। তাকে বলতো *আম্মু কুট্টি*। ছোট আম্মু। যদিও আম্মু ভেলুথার

চেয়ে ছোটই ছিল। এবার যখন তাকে দেখলো, এটা না ভেবে সে থাকতে পারলো না, যে লোকটাতে সে এখন পরিণত হয়েছে তা ছোটবেলার খুব কম জিনিসই বয়ে এনেছে। শুধু তার হাসিটাই একমাত্র জিনিস যেটা সে নিয়ে এসেছে তার শৈশব থেকে যৌবনে।

যদিও আম্মু ভাবলো, রাহেল যেন মিছিলে ভেলুথাকেই দেখে থাকে। সে আশা করছিলো, যেন ভেলুথাই হয়, যে পতাকা আর মুঠোপাকানো হাত ছুঁড়ছিলো। সে আশা করছিলো তার হাসি খুশী আলখাল্লার নিচে একটা রাগ যেন বেঁচে থাকে, ফিটফাট আর ফরমায়েশি দুনিয়ার বিরুদ্ধে– যার বিরুদ্ধে আম্মুর নিজেরও রাগ ছিলো পুরো মাত্রায়।

সে আশা করেছিলো ওটা যেন ভেলুথাই হয়।

সে অবাক হলো তার মেয়ের সঙ্গে ভেলুথার মাখামাখির সহজভাব দেখে। আম্মু অবাক হলো যে ভেলুথার মতো একটা অধিজগৎ আছে তার মেয়ের– যেখানে সে নেই। একটা ছোঁয়া দিয়ে বোঝা হাসি আর অট্টহাসির জগৎ, যেখানে তার মায়ের কোন জায়গা নেই। আম্মু অস্পষ্টভাবে চিনতে পারলো, তার ধারনাগুলো একটা আলতো বেগুনী রঙের হিংসা দিয়ে আঁকা। সে অবশ্য নিজেকে ভাবতে অনুমতি দিলো না যে কাকে সে হিংসা করে। ঐ লোকটাকে নাকি তার নিজের সন্তানকে। অথবা তাদের জগৎ– যেটা ছিলো বাঁকা আঙুলের আর হঠাৎ হাসির।

লোকটা দাঁড়িয়ে ছিলো রাবার গাছের ছায়ায় এবং সূর্যের আলোর মুদ্রা খেলছিলো তার শরীর জুড়ে, তার মেয়েকে ঝলকালো আর আম্মুর চোখে ধরা পড়লো। বহু শতাব্দী যেন দেখল সে একটা বিলীয়মান মুহূর্তে। ইতিহাস ছিলো ভুল পা ফেলা, অরক্ষিত। ধরা পড়ে যাওয়া সাপের পুরানো চামড়ার মতো চামড়া ছাড়ানো। তার চিহ্নগুলো, ক্ষত চিহ্নগুলো, তার জখমগুলো পুরনো যুদ্ধ থেকে আনা আর পিছনের দিনগুলো সব খুলে পড়লো। তার অনুপস্থিতি একটা দেহজ্যোতি রেখে গিয়েছিলো, একটা সহজবোধ্য কেঁপে ওঠা চক্‌চক্ করা যেটা এতই সহজ ছিলো যে, সেটা যে কেউ দেখতে পেতো একটা নদীর জল কিংবা আকাশের সূর্যের মতো। এতই সহজ যেমন উষ্ণতা অনুভব করা যায় কোন কোন গরম দিনে, অথবা একটা মাছের টান দেয়ার মতো শক্ত করে বাঁধা সুতোয়। এতই অবশ্যম্ভাবী যে কেউ লক্ষ্য করলোনা।

ঐ ছোট্ট মুহূর্তে, ভেলুথা ওপরে তাকালো আর দেখলো সেই সব জিনিস যে সব সে আগে কখনো দেখেনি। সেই জিনিসগুলো, যেগুলো সীমার বাইরে ছিলো এতোদিন। ইতিহাসের চোখের ঠুলি পরানোর জন্যে গোপন করে রাখা হয়েছিলো।

মামুলি বিষয়গুলো।

যেমন সে দেখলো রাহেলের মা এক মহিলা।

আম্মু যখন হাসতো তার গালে টোল পড়তো আর হাসিটা চোখ থেকে চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষন ধরে টোলগুলো থেকে যেতো। ভেলুথা দেখলো তার বাদামী হাতগুলো ফোলা শক্ত আর নিখুঁত। তার কাঁধগুলো চক্‌চক্ করতো, কিন্তু তার চোখগুলো থাকতো অন্য কোথাও। সে দেখলো, আগে যেমন সে আম্মুকে

উপহারগুলো দিতো, সেগুলো তখন আর সোজা বাড়িয়ে দেওয়া হাতের তালুর ওপর আলতো করে রেখে দিতে হচ্ছিলো না, যাতে তাকে ছুঁতে না হয়। তার নৌকা ও বাক্সগুলো। তার ছোট্ট হাওয়াকলগুলো। সে দেখলো যে, সে-ই একমাত্র উপহারদাতা নয়। আম্মুও তার জন্যে উপহার এনেছে।

এই জানাটা তার মধ্যে ঢুকে গেলো অবলীলায়, যেন একটা চাকুর ধারালো কোনা। একই সঙ্গে ঠান্ডা ও গরম। এক মুহূর্ত সময় নিলো।

আম্মু যা দেখলো ভেলুথা তাই দেখলো। সে তাকালো অন্যদিকে। সেও তাকালো। ইতিহাসের দানবরা তাদের দাবী নিয়ে ফিরে আসলো। মুড়ে ফেলতে চাইলো পুরনো দাগওয়ালা পশুর চামড়ায় এবং টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগলো পিছনে যেখানে ওরা থাকতো। যেখানে ভালোবাসার আইনগুলো লেখা ছিলো এমন করে– কাকে ভালাবাসা যাবে। এবং কিভাবে। আর কতটুকু।

আম্মু বারান্দা পর্যন্ত হেঁটে উঠলো, অভিনয়ে ফিরে যেতে। কাঁপছিলো সে।

ভেলুথা নিচে তাকালো তার হাতে ধরা রাষ্ট্রদূত--এস. ইনসেক্ট রাহেল এর দিকে। সে তাকে নিচে নামিয়ে রাখলো। সেও কাঁপছিলো।

'তোমাকে দেখো!' ভেলুথা বললো, তার মজার– ফুলে ওঠা জামার দিকে তাকিয়ে। 'এত সুন্দর! বিয়ে করবে নাকি?'

রাহেল তার দিকে হঠাৎ ঝাঁপ দিলো আর তাকে কাতুকুতু দিতে লাগলো নিষ্ঠুরভাবে। *ইকিলি, ইকিলি, ইকিলি*!

রাহেল বললো, 'আমি তোমাকে কালকে *দেখেছি*।'

'কোথায়?' ভেলুথা তার গলাটা চড়িয়ে আকাশ থেকে পড়ার মতো করে বললো।

'মিথ্যুক,' রাহেল বললো, 'মিথ্যুক আর ঢং করছে। আমি তোমাকেই দেখেছি। তুমি কমিউনিষ্ট ছিলে আর তোমার গায়ে ছিলো একটা শার্ট আর হাতে একটা পতাকা। আর তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়েছিলে?'

'*এক্সয়োকাশতাম*' ভেলুথা বললো। 'আমি কি এমন করতে পারি?' *তুমিই* বলো। 'ভেলুথা সেটা *কখনো* করবে?' ওটা নিশ্চয়ই আমার অনেক আগে হারিয়ে যাওয়া যমজ ভাই হবে।'

'কোন্ আগে হারিয়ে যাওয়া যমজ ভাই?'

'উরুমবান শিলী, ... সে কোচিনে থাকে।'

'কে উরুমবান?' তখন সে দেখলো চোখের পলক ফেলা। 'মিথ্যুক! তোমার কোনো যমজ ভাই নেই! ওটা *উরুমবান* ছিলোনা! ওটা ছিলে *তুমি*।'

ভেলুথা হাসলো, তার সুন্দর হাসিটা বেরিয়ে আসলো। সত্যিই প্রাণ খুলে হেসেছিলো।

'আমি না,' সে বললো, 'আমি অসুখে বিছানায় পড়েছিলাম।'

'দেখ্ছো, তুমি হাসছো!' রাহেল বললো, 'তার মানে ওটা তুমিই ছিলে। হাসি মানে, ওটা তুমিই ছিলে।'

'ওটা কেবল ইংরেজীর নিয়মের জন্যে!' ভেলুথা বললো, 'মালায়লামে আমার মাস্টার বলতেন সবসময়, 'হাসি মানে ওটা আমি ছিলামনা।'

রাহেল একমুহূর্ত সময় নিলো সেটাকে বুঝতে। আবার সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, *ইকিলি ইকিলি ইকিলি!*

তখনও হাসতে হাসতে ভেলুথা অভিনয়ের মধ্যে সোফিকে খুঁজলো। 'আমাদের সোফি মল কোথায়? তাকে একবার দেখে আসি চলো। তুমি কি ওকে এনেছো মনে করে, নাকি ওকে পিছনে ফেলে এসেছো?'

'ওদিকে তাকিওনা,' রাহেল খুব গম্ভীরভাবে বললো।

সে দাঁড়ালো সিমেন্টের রেলিং-এ যেটা রাবার গাছগুলো থেকে গাড়ির রাস্তাটাকে আলাদা করেছিলো, আর ভেলুথার চোখের ওপর তার হাতগুলো রাখলো।

'কেন?' ভেলুথা জিজ্ঞেস করলো।

'কারণ,' রাহেল বললো, 'আমি চাইনা তুমি ওটা করো।'

'এসথা কোথায়?' ভেলুথা বললো, এক রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে (একটা লেগে থাকা পোকার ছদ্মবেশে, একটা এয়ারপোর্টে ঘুরে বেড়ানো পরীর ছদ্মবেশে) যে ঝুলে ছিলো তার পিঠে, তার পা গুলো জড়ানো ছিলো তার কোমরে, তার চোখগুলোকে ঢেকে রেখেছিলো তার আঠালো হাতগুলো দিয়ে।

'আমি ওকে দেখলাম না।'

'ওহ! আমরা ওকে কোচিনে বিক্রি করে দিয়েছি,' রাহেল বললো হাসতে হাসতে। 'একবস্তা চাল আর একটা টর্চের বদলে।'

তার শক্ত জামার ঢেউগুলো কাঁটার মতো বিঁধছিলো ভেলুথার পিঠে। ফিতের ফুলগুলো আর একটা সৌভাগ্যের পাতা ফুটলো কালো পিঠটার উপর।

কিন্তু যখন রাহেল এসথাকে খুঁজলো অভিনয়ের মধ্যে, রাহেল দেখলো, সে ওখানে নেই।

অভিনয়ের ভিতরে, কচু মারিয়া ঢুকলো, বেঁটে, লম্বা কেকের পিছনে।

'কেক এসে গেছে,' কচু মারিয়া বললো, একটু গলা চড়িয়ে, মামাচিকে।

কচু মারিয়া সবসময়ই একটু জোরে কথা বলতো মামাচির সঙ্গে, কারণ সে মনে করতো চোখে না দেখা সবসময়ই অন্য ইন্দ্রিয়গুলোকেও নষ্ট করে।

'*কভো*, কচু মারিয়া?' মামাচি বললেন, 'তুই কি আমাদের সোফি মলকে দেখতে পাচ্ছিস ?'

'হ্যাঁ, কোচাম্মা,' কচু মারিয়া বেশ জোরে বললো। 'আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি।'

সে সোফির দিকে তাকিয়ে থাকলো, মুখে বেশ লম্বা হাসি। সে সোফির সমান লম্বা ছিলো। সিরিয়ান খৃষ্টানদের চেয়ে অনেক বেঁটে।

'গায়ের রঙ ওর মায়ের মতো,' কচু মারিয়া বললো।

'পাপাচির নাক,' মামাচি বিশ্বাস নিয়েই বললেন।

'আমি তা জানিনা, কিন্তু ও খুব সুন্দরী,' কচু মারিয়া চেঁচিয়ে উঠলো, '*সুন্দরী কুট্টি*। ও একটা ছোট্ট পরী।'

ছোট্ট পরীরা ছিলো সাগরের বেলাভূমি-রঙের আর পরতো বেলবটম।

ছোট ছোট দৈত্যগুলো ছিলো কাদার মতো বাদামী, এয়ারপোর্টের পরীদের মতো জামা আর কপালে ছিলো উঁচু কোনা যেগুলো কখনও কখনও শিং হয়ে যেতো। চুলের ঝর্নায় বাঁধা ছিলো "লাভ ইন টোকিও" পিছন থেকে চোখে পড়ার মতো।

আর যদি কেউ লক্ষ্য করতো কষ্ট করে, তাদের চোখে শয়তান দেখতে পেতো।

কচু মারিয়া সোফির দু'হাতই তার হাতে নিলো, তালুগুলো ওপরের দিকে, তুলে ধরলো মুখের দিকে আর গভীরভাবে শ্বাস টানলো।

'ও কি করছে?' সোফি জানতে চাইলো। লন্ডনের নরম হাতগুলো আটকে ছিলো এইমেনেমের নিষ্ঠুর হাতে।

'কে ও আর সে কেন আমার হাত শুঁকছে?'

'ও হলো রাধুনী,' চাকো বললো, 'এটা হচ্ছে– সে তোমাকে কিস্ করছে।'

'কিস্ করছে?' সোফি মল ছিলো একটু দিশেহারা কিন্তু কৌতূহলী।

'কি মজার ব্যপার!' মার্গারেট কোচাম্মা বললেন। 'এটা এক ধরনের গ নেয়া! এটা কি পুরুষ আর মহিলারা করে?'

সে আসলে কথাটা এভাবে বলতে চায়নি, কিন্তু বলে সে লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। এক ভাগ্য বিড়ম্বিত মাস্টারনীর মতো আকারের একটা গর্ত ব্রহ্মাণ্ডে।

'ওহ্, এতোটা সময় ধরে?' আম্মু বললো, আর কথাটা বের হয়ে আসলো একটু জোরেই যতটা সে চেয়েছিলো তার চেয়ে জোরে ভেংচি কেটে বিড় বিড় করে বললো। 'ঐ ভাবে আমরা বাচ্চা পয়দা করি।'

চাকো তাকে থাপ্পড় মারলোনা।

তাই সেও তাকে ফেরত দিলোনা।

'আমার মনে হয় তোর আমার স্ত্রীর কাছে মাফ চাওয়া উচিত, আম্মু,' চাকো বললো, রক্ষক ও মালিকানার গন্ধ মেশানো একটা অনুযোগ (আশা করেছিলো যেন মার্গারেট কোচাম্মা না বলে, 'প্রাক্তন-স্ত্রী চাকো!' এবং একটা গোলাপ তার দিকে নাড়ে)।

'ওহ্ না!' মার্গারেট কোচাম্মা বললো, 'এটা আমারই দোষ! আমি কথাটা ঠিকমত বলিনি ... আমি যা বোঝাতে চেয়েছিলাম– আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, এটা ভাবতে খুব চমৎকার যে–।'

'এটা ভুল না ঠিকই প্রশ্ন ছিলো,' চাকো বললো। 'আমি মনে করি আম্মুর মাফ চাওয়া উচিত।'

'আমাদের কি এরকম করা উচিত ? যেন, আমরা কোন অভিশপ্ত ঈশ্বর ছেড়ে যাওয়া জংলী, এইমাত্র আবিস্কার করলে নাকি ?' আম্মু জিজ্ঞেস করলো।

'হায় !' মার্গারেট কোচাম্মা বললো।

রাগের নিস্তব্ধতার অভিনয়ের (নীল সেনাদল তখনও সবুজ উষ্ণতা থেকে) মধ্যে আম্মু প্লেমা থের দিকে ফিরে গেলো। তার স্যুটকেসটা বের করলো, দরজাটাকে জোরে শব্দ করে লাগালো, আর তার ঘরের দিকে হেঁটে গেলো, তার কাঁধগুলো চক্-চক্ করছিলো। 'সবাইকে ভাবনায় ফেলার কোত্থেকে যে এতো বেয়াদবি শিখেছে?'

আর সত্যি বলতে কি, ওটা ছোট ভাবনার বিষয় ছিলোনা।

কারণ আম্মুর না ছিলো সেই ধরনের শিক্ষা, কিংবা বই-পত্র পড়া, না ছিলো ঐ ধরনের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা, যে জন্যে সে ওরকম ব্যবহার করতেই পারে।

সে ঐ ধরনের একটা প্রাণী ছিলো।

ছোট বেলায়, সে খুব তাড়াতাড়ি শিখেছিলো বাবা ভালুক মা ভালুকের গল্পগুলোকে পাত্তা না দিতে, যেগুলো তাকে পড়তে দেয়া হয়েছিলো। সে জানতো, বাবা ভালুক পিতলের ফুলদানী দিয়ে মারতো মা ভালুককে। মা ভালুক ঐ সব মার সহ্য করতো চুপ করে।

তার বয়স বাড়ার বছরগুলোতে, আম্মু দেখেছিলো তার বাবার ফন্দি-ফিকির। বাবা ছিলেন শহুরে দেখা করতে আসা লোকজনের সঙ্গে হাসিখুশি আর যদি তারা সাদা হতো তবে প্রায় বিগলিত হয়ে যেতেন। তিনি দান করতেন এতিমখানায় ও কুষ্ঠ চিকিৎসালয়ে। তিনি কষ্ট করতেন লোকজনের সামনে চেহারা ঠিক রাখতে– অভিজাত দয়ালু, নীতিবান লোক হিসাবে। কিন্তু একা নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে হয়ে যেতেন রাক্ষসের মতো সন্দেহ-বাতিকে ভোগা অকর্মা, দুশ্চরিত্র। আর নষ্টামিও ছিল তাঁর। সন্তান ও স্ত্রী মার খেত, অপমানিত হতো আর বন্ধু ও আত্মীয়দের হিংসার উদ্রেক করার মতো অপূর্ব স্বামী ও বাবা থাকার যন্ত্রণাও ভোগ করতো সবাই।

আম্মু দিল্লীতে থাকতে ঠান্ডা শীতের রাতগুলো সহ্য করতো তাদের বাড়ির পাশের মেহেদী ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে (যদি তাদেরকে ভালো পরিবারের লোকজন দেখে ফেলে) থেকে, কারণ এমনও হয়েছে পাপাচি কাজ থেকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন এবং পিটিয়েছেন তাকে এবং মামাচিকে এমনকি তাদেরকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিয়েছেন।

এরকম এক রাতে, আম্মুর বয়স তখন ন' বছর। মা'র সাথে ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিলো, দেখছিলো পাপাচির ফিটফাট কালো-ছায়া অস্থিরভাবে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জানালার আলোতে দেখা যাচ্ছিলো। মেয়ে আর বউকে পিটিয়ে খুশি না হয়ে (চাকো তখন স্কুলে), তিনি ছিঁড়ে ফেলছিলেন পর্দাগুলো, আসবাব-পত্রে জোরে জোরে লাথি মারছিলেন আর একটা টেবিল ল্যাম্প আছড়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। আলো নিভে যাওয়ার একঘন্টা পর, মামাচির ভয়ার্ত নিষেধ না শুনে ছোট্ট আম্মু লুকিয়ে ঢুকলো বাড়ির ভিতরে ভেন্টিলেটারের মধ্যে দিয়ে তার নতুন গামবুট জোড়া উদ্ধার করতে, যেটা সে ভালোবাসতো অন্য সব কিছুর চেয়ে। সে ওগুলোকে একটা কাগজের প্যাকেটে জড়িয়ে লুকিয়ে বসবার ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো।

পাপাচি তার মেহগনির রকিং চেয়ারে বসেছিলেন। অন্ধকারে বসে দুলছিলেন, তিনি আম্মুকে ধরলেন, একটা কথাও বললেন না। তিনি তাকে আবার মারলেন তার হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা ঘোড়ায় চড়ার চাবুকটা (যেটা তাঁর কোলের উপর রাখা ছিলো ছবি তোলার সময়) দিয়ে। আম্মু কাঁদলো না। যখন তাকে মারা শেষ হলো তিনি তাকে দিয়েই সেলাইয়ের আলমারী থেকে আনালেন মামাচির ছোট ফুটোওয়ালা কাঁচিটা। আম্মু দেখলো, মহান পতঙ্গবিশারদ মা'র কাঁচিটা দিয়ে টুকরা টুকরা করলেন তার নতুন গামবুট জোড়া। কালো কালো রাবারের ফালি পড়ে থাকলো মেঝের উপর।

কাঁচি থেকে শব্দ হচ্ছিল কচ্-কচ্ করে। আম্মু দেখেও দেখছিলোনা তার মা'র জানালার কাছে এগিয়ে আসা ভীত মুখটাকে। দশ মিনিট লাগলো তার শখের গামবুট জোড়াকে মসৃণ ফালি করতে। শেষ ফালিটা পড়লো মেঝের ওপর, আর বাবা তার দিকে তাকালেন শীতল, কঠিন চোখে, আবার দুলতে থাকলেন। চারপাশে একসমুদ্র প্যাঁচানো, রাবারের সাপে ঘেরা।

আম্মু যখন বড় হলো, সে বাঁচতে শিখলো এই শান্ত হিসাব করা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে। সে তার ভিতরে গড়ে তুললো একটা অহংকারী অনুভূতি অবিচারের এবং জেদী, বেপরোয়া দাগ, যেটা ছোট কারো ভিতর বেড়ে ওঠে– যাদের বড় কেউ সারাজীবন অতিষ্ঠ করেছে। সে ঝগড়া কোঁদল অথবা কারো মুখোমুখি হওয়াকে পরওয়া করতো না। সত্যি বলতে, এটা নিয়ে তর্ক করা যায় যে, সে তাদেরকে খুঁজে বের করতো, হয়তো উপভোগও করতো।

'ও কি চলে গেছে?' মামাচি জিজ্ঞেস করলেন তাঁর পাশের নিরবতাকে।

'চলে গেছে,' কচু মারিয়া বললো উঁচু গলায়।

'ভারতে কি তোমরা "অভিশপ্ত?" –কথাটা বলতে অনুমতি চাচ্ছি?' সোফি মল প্রশ্ন করলো।

'ও বলেছে "অভিশপ্ত"?' চাকো জিজ্ঞেস করলো।

'বলেছে,' সোফি মল বললো। 'ফুপু আম্মু'। সে বললো, 'কোনো অভিশপ্ত ঈশ্বর ছেড়ে যাওয়া জংলী।'

'কেকটা কেটে সবাইকে এক টুকরা করে দে,' মামাচি বললেন।

'কারণ ইংল্যান্ডে আমরা বলতে পারি না,' সোফি মল চাকোকে বললো।

'কি না বলতে?' চাকো জিজ্ঞেস করলো।

'অভিশপ্ত বলতে' সোফি মল বললো।

মামাচি বাইরে তাকালেন রোদ জ্বলা দুপুরের দিকে, দৃষ্টিহীন। 'এখানে কি সবাই আছে?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, কোচাম্মা,' নীল সেনাদল সবুজ উষ্ণতায় বললো– 'আমরা সবাই এখানে।' অভিনয়ের বাইরে, রাহেল ভেলুথাকে বললো: 'আমরা এখানে নেই, আমরা কি আছি? আমরা অভিনয়ও করিনি।'

'তা একেবারেই ঠিক,' ভেলুথা বললো। 'আমরা' খেলিওনি। কিন্তু আমি যা জানতে চাচ্ছি সেটা হলো আমাদের এসথাপেনচাচেন কুট্টাপেন পিটার মন কোথায়?'

আর সেটা হয়ে গেলো রাবার গাছগুলোর ভিতরে খুশী হওয়া দমবন্ধ করা দোমড়ানো আর তালগোল পাকানো নাচ।

ওহ্ এস্থাপাপেচাচেন কুট্টাপেন পিটার মন,
কোথায়? ওহ্ তুমি গেলে কোথায়?

আর দোমড়ানো চামড়া থেকে হয়ে গেল বেগুনী প্রিমরোজ ফুল।

আমরা তাকে এখানে খুঁজি, আমরা তাকে ওখানে খুঁজি,
ঐ ফ্রেঞ্চিস খোঁজে তাকে সব জায়গায়।
সে কি স্বর্গে আছে? সেকি নরকে আছে?
এসথা-পেন কি উবে গিয়েছিল?

কচু মারিয়া একটুকরা ছোট কেক কাটলো মামাচির অনুমতি নিয়ে, তাঁকেই দিলো আগে।

'প্রত্যেকের জন্যে একটুকরা করে,' মামাচি কচু মারিয়াকে হুকুম দিলেন, টুকরোটা আলতো করে তাঁর চুনী আংটিওয়ালা আঙুলগুলো দিয়ে ধরে দেখার চেষ্টা করলেন ওটা ঠিকমতো ছোট হয়েছে কিনা।

কচু মারিয়া বাকি কেকটাকে টুকরা করলো ছ্যাড়াবেড়া করে, কষ্ট করে, মুখ দিয়ে দম নিতে নিতে, যেন সে আগুনে ঝলসানো ভেড়ার মাংস কাটছিলো। সে টুকরাগুলোকে একটা বড় রূপোর থালায় রাখলো। মামাচি তাঁর বেহালায় বাজালেন, *বাড়িতে স্বাগতম, আমাদের সোফি মল* সুর। একটা ক্লান্ত করা, চকোলেট স্বাদের সুর। আঠালো মিষ্টি আর গলে যাওয়া বাদামী চকোলেটের ঢেউ, চকোলেটের বেলাভূমিতে।

সুরটার মাঝখানে, চাকো তার গলা চড়ালো তার চকোলেট শব্দটার সময়ে 'মাম্মা!' সে বললো (তার বই পড়ার মতো নীচু স্বরে)। 'মাম্মা! যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট বেহালা!'

মামাচি বাজানো থামিয়ে চাকোর দিকে তাকালেন, বেহালার ছড়টা বাতাসের মধ্যে থেমে থাকলো।

'যথেষ্ট? তোমার কি মনে হয় যথেষ্ট হয়েছে, চাকো ?'

'তার চেয়ে বেশী,' চাকো বললো।

'যথেষ্ট হলে যথেষ্ট,' মামাচি বিড় বিড় করে বললেন, 'আমার মনে হয় আমি এখন থামবো।' যেন হঠাৎ করে চিন্তাটা তাঁর মাথায় আসলো।

তিনি তাঁর বেহালাটা রেখে দিলেন তাঁর কালো বেহালার বাক্সে। ওটা স্যুটকেসের মতো বন্ধ হয়ে গেলো, এবং সুরটাও বন্ধ হলো তার সঙ্গে সঙ্গেই।

ক্লিক। এবং ক্লিক।

মামাচি তাঁর কালো চশমাটা আবার পরলেন। এবং উষ্ণ দিনের ওপর দিয়ে পর্দা টানলেন।

আম্মু বাড়ি থেকে বের হয়ে আসলো আর রাহেলকে ডাকলো।

'রাহেল! আমি বলছি তুমি তোমার দুপুরের ঘুমটা এখনি ঘুমাবে! তোমার কেক খাওয়া শেষ হলে ভিতরে এসো!'

রাহেলের মনটা চুপসে গেলো। দুপুরের ঘুম! সে ওটা ঘেন্না করতো।

আম্মু ভিতরে ফিরে গেলো।

ভেলুথা রাহেলকে নামিয়ে দিলো, আর রাহেল রাস্তার ধারে দাঁড়ালো ছেড়ে যাওয়া, নাটকের চৌহদ্দিতে একটা ঘুম ঢুলু ঢুলু করছিলো, উজ্জ্বল দিনটা ছিলো ধোঁয়াটে।

'আর দয়া করে ঐ লোকটার সাথে মাখামাখি বন্ধ কর!' বেবি কোচাম্মা রাহেলকে বললেন।

'বেশি?' মামাচি বললেন, 'কে বেশি মাখামাখি করছে, চাকো?'

'রাহেল,' বেবি কোচাম্মা বললেন।

'কার সাথে বেশি?'

'কাদের সাথে?' চাকো শুধরে দিলো মাকে।

'ঠিক আছে, কার সাথে কে বেশি করছে?' মামাচি জিজ্ঞেস করলেন।

'তোমার পছন্দের ভেলুথা– আর কার সাথে?' বেবি কোচাম্মা বললেন এবং চাকোকেও– 'ওকে জিজ্ঞেস করো গতকাল সে কোথায় ছিলো। বিড়ালের গলায় ঘন্টিটা একবারেই পরিয়ে দাও সবার জন্যে।'

'এখন না,' চাকো বললেন।

'বেশি মাখামাখি কি?' সোফি মল জিজ্ঞেস করলো মার্গারেট কোচাম্মাকে, সে উত্তর দিলোনা।

'ভেলুথা? ভেলুথা কি এখানে আছিস? তুই কি এখানে আছিস?' মামাচি জিজ্ঞেস করলেন দুপুরকে।

'হ্যাঁ, কোচাম্মা।' ভেলুথা বাগানের ভিতর থেকে বের হয়ে আসলো নাটকের মধ্যে।

'তুই কি বের করতে পেরেছিস ওটা কি ছিলো?' মামাচি জিজ্ঞেস করলেন।

'পাম্পের ভাল্বের ভিতরের ওয়াসারটা,' ভেলুথা বললো। 'আমি ওটাকে পাল্টে দিয়েছি। এখন ওটা কাজ করছে।'

'তাহলে ওটাকে চালু করে দে,' মামাচি বললেন। 'ট্যাংকটা খালি।'

'ঐ লোকটা আমাদের নেমেসিস হবে,' বেবি কোচাম্মা বললেন। তিনি শুধু মাত্র ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হওয়ার জন্য নয় বা কোনো হঠাৎ– পয়গম্বরের দৃষ্টি পাওয়ার জন্যেও নয়। শুধু তাকে বিপদে ফেলার জন্যে। কেউ তাঁকে কোন পাত্তা দিলোনা।

'আমার কথাটা লিখে রাখো,' তিনি বললেন তেতো গলায়।

কচু মারিয়া রাহেলের কাছে গেলো কেকের থালা নিয়ে 'দেখতে পাচ্ছো ওকে!।' সে সোফি মলকে বোঝালো। 'যখন ও বড় হবে, ও হবে আমাদের কোচাম্মা এবং ও আমাদের বেতন বাড়িয়ে দেবে আর আমাদের নাইলনের শাড়ী দেবে ওনাম-এর জন্যে।' কচু মারিয়া জমাতো শাড়ীগুলো, যদিও সে নিজে কখনো শাড়ী পরেনি, এবং হয়তো কখনো পরবেও না।

'তাতে কি?' রাহেল বললো। 'ততদিনে আমি আফ্রিকাতে চলে যাবো।'

'আফ্রিকা?' কচু মারিয়া নাঁক কোঁচকালো। 'আফ্রিকা!' কুচ্ছিৎ কালো লোকজন আর মশায় ভর্তি।'

'তুমি কেবল একাই কুচ্ছিৎ,' রাহেল বললো, আর যোগ করলো 'স্টুপিড্ ডোয়ার্ফ'–(বোকা বামন)।

'তুমি কি বললে?' কচু মারিয়া বললো ভয় দেখানোর মতো করে। 'আমাকে কিছু বলোনা। আমি জানি। আমি শুনেছি। আমি মামাচিকে বলে দেবো। একটু রোসো!'

রাহেল পুরানো কুয়াটার দিকে এগিয়ে গেলো যেখানে সবসময় থাকতো পিঁপড়ে, টকো পাদের মতো গন্ধ বেরুতো ওগুলোর। কচু মারিয়া কেকের থালা নিয়ে তার পিছন পিছন গেলো।

রাহেল বললো, তার ঐ বোকা কেকটার একটুও দরকার নেই।

'*কুসুম্বি*,' কচু মারিয়া বললো। 'হিংসুটে লোকজন সোজা নরকে যায়।'

'কে হিংসুটে?'

'আমি জানিনা। তুমি আমাকে বলো।' কচু মারিয়া বললো, একটা কুঁচি দেওয়া আলখাল্লা আর একটা টকো মন নিয়ে।

রাহেল ওর সানগ্লাস চোখে দিলো আর নাটকে ফিরে তাকালো। সবকিছুই কেমন যেন রাগ করার রঙ ধরানো। সোফি মল, মার্গারেট কোচাম্মা আর চাকোর মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিলো ওকে চড় লাগানো উচিত। রাহেল পুরো এক সারি ফুলোফুলো পিঁপড়ে পেলো। ওরা চার্চের দিকে যাচ্ছিলো। সবগুলোই লাল জামা পরে। ওগুলোকে মারতে হবে চার্চে পৌছানোর আগেই। একটা পাথর দিয়ে থেঁতলিয়ে রস নিঙড়ালো। চার্চে কোনো গন্ধওয়ালা পিপড়া থাকতে পারেনা।

পিপড়াগুলো অজ্ঞান হওয়ার মতো খচ্‌মচ্ শব্দ করলো মরার সময়। যেন একটা বামন খাচ্ছিলো সেঁকা রুটি, আর একটা মচ্‌মচে বিস্কুট।

পিঁপড়ের মতো চার্চটা থাকবে খালি এবং পিপড়ের মতো যাজক অপেক্ষা করবে তার হাস্যকর পিঁপড়ের মতো যাজক কাপড়ে ধুনী দোলাতে দোলাতে একটা রূপোর পাত্রে। এবং কেউ হবেনা উপেক্ষিত।

তার অপেক্ষা করার পর একটা ন্যায্য পরিমাণে পিঁপড়ের মতো সময়ে তার কপালে পড়বে একটা হাস্যকর পিঁপড়ের মতো যাজকের ভ্রুকুটি এবং তাঁরা মাথা নাড়বেন দুঃখের সঙ্গে। সে তাকাবে উজ্জ্বল চোখে জ্বলজ্বল করা পিঁপড়ের মতো দাগওয়ালা জানালা দিয়ে এবং যখন সেগুলো দেখা শেষ হবে। সে চার্চটাকে বন্ধ করে দেবে একটা বিরাট চাবি দিয়ে এবং সেটাকে দেবে অন্ধকার করে। তখন সে

তার বাড়িতে বউয়ের কাছে যাবে এবং (যদি সে তখন মরে না যায়) তারা ঘুমাবে পিঁপড়ের মতো দুপুরের ঘুম।

সোফি মল, টুপি পরা, বেল বটম পরা এবং প্রথম থেকেই ভালোবাসা পাওয়া, নাটক থেকে হেঁটে বের হয়ে গেলো– রাহেল কি করছে কুয়োর পিছনে, দেখতে। কিন্তু নাটকটা তার সঙ্গে সঙ্গে গেলো। হাঁটলো যখন সে হাঁটলো থামলো, যখন সে থামলো, স্নেহান্ধ হাসিগুলো তাকে অনুসরণ করলো। কচু মারিয়া কেকের থালাটা জড়ালো তার ভক্তিভরা নতমুখী হাসি দিয়ে, তখন সোফি মল বসে পড়লো উবু হয়ে, কুয়োর পাশের প্যাঁচ প্যাঁচে কাদায় (হলুদাভ ঘন্টার নীচে যেটা এখন কাদায় ভেজা)।

সোফি মল পরীক্ষা করলো গন্ধওয়ালা পিঁপড়েগুলোকে ধন্বন্তরীর মতো উদাসীনতায়। পাথরটার উপর প্রলেপ ছিলো থেঁতলানো লাল মৃতদেহের এবং ক'টা নিস্তেজভাবে নড়াচড়া করা পা'র।

কচু মারিয়া দেখছিলো কেক-এর ছোট টুকরোগুলো নিয়ে। স্নেহপরায়ণ হাসি হাসছিলো স্নেহপরায়ণ ভাবেই।

ছোট মেয়েরা খেলছিলো।

মিষ্টি।

একটা সাগরের বেলাভূমি রঙের।

একটা বাদামী।

একজন যাকে ভালোবাসা হতো।

একজন যাকে একটু কম ভালোবাসা হতো।

'একটাকে জ্যান্ত ছেড়ে দাও যাতে ওটা একা থাকার কষ্ট পায়।' সোফি মল উপদেশ দিলো।

রাহেল কান দিলো না তার কথায়, সবগুলোকে মেরে ফেললো। তারপর তার ঢেউতোলা, এয়ারপোর্ট ফ্রকের ভিতরে, মানানসই হাঁটু সোজা করে (তখন আর কোঁকড়ানো ছিলোনা) এবং বেমানান সানগ্লাস পরে দৌড়ে পালালো। সবুজ রঙের উষ্ণতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

স্নেহপরায়ণ হাসিগুলো সোফি মলের ওপর পড়ে থাকলো। ছোট একটা জায়গায় পড়া আলোর মতো, হয়তোবা মনে করতে করতে যে মিষ্টি মামাতো-ফুফাতো ভাই বোনরা লুকোচুরি খেলছে, যেরকম ওরা খেলতেই পারে।

৯

মিসেস পিল্লাই, মিসেস ইয়াপেন, মিসেস রাজাগোপালান

গাছ গুলো থেকে সে দিনের জন্যে দরকারী সব সবুজ চুঁইয়ে গেছে। মৌসুমী আকাশের নিচে গাঢ় রঙের তাল পাতাগুলো ঝুঁকে আছে চিরুনীর মতো ছেতরে। কমলা রঙের সূর্যটা পিছলে যাচ্ছিলো তাদের উদ্যত বাঁকা দাঁতের মধ্যে দিয়ে।

এক ঝাঁক ফল খাওয়া বাদুড় দ্রুত উড়ে গেলো হাল্কা অন্ধকারের মধ্যে।

অযত্নে ফেলে রাখা বাগানের মধ্যে, রাহেলকে দেখছিলো, লকলকে জিভ বের করা ঝুলে থাকা বামনরা আর ভুলো বাচ্চার মতো ডানাওয়ালা স্বর্গীয় মূর্তি, উবু হয়ে ছিলো একটা বদ্ধ ডোবায় আর ব্যাঙগুলো লাফাচ্ছিলো এক পাথর থেকে আর এক নোংরা পাথরে। সুন্দর, কদাকার ব্যাঙগুলো।

রোগা, আঁচিলওয়ালা আর ক্যাঁকোঁ করে।

স্নেহ আর চুমুর কাঙাল রাজকুমাররা তাদের ভিতরে ছিলো বন্দী; ওরা ছিলো জুন মাঠের লম্বা ঘাসে ওৎ পেতে থাকা সাপদের খাবার। পাতার মর্মর ধ্বনি। হঠাৎ ঝাঁপ দেওয়া। আর কোনো ব্যাঙ নেই এক পাথর থেকে আর এক নোংরা পাথরে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। আর কোন রাজকুমার নেই চুমু খাওয়ার মতো।

তার আসার পর এটাই প্রথম রাত যে রাতে বৃষ্টি হলোনা।

এখন, রাহেল ভাবলো, এটা যদি ওয়াশিংটন হতো, আমি আমার কাজের পথে থাকতাম। বাসে চড়ে। ল্যাম্প পোষ্ট। তেলের ধোঁয়া। আমার কেবিনের বুলেট প্রুফ কাঁচে লোকজনের নিঃশ্বাসের ধোঁয়া। ধাতব থালায় রেখে আমার দিকে ঠেলে দেওয়া ধাতব পয়সার ধাতব শব্দ। আমার আঙুলে টাকার গন্ধ। সময় জানওয়ালা ভদ্র মাতালটা যে ঠিক দশটায় পৌঁছাতো:

'এই যে! কালো কুত্তী! আমার নুনু চোষ!'

তার কাছে সাতশ' ডলার। আর সাপের মাথাওয়ালা একটা সোনার চুড়ি। কিন্তু বেবি কোচাম্মা এর মধ্যেই তাকে জিজ্ঞেস করেছেন কতদিন সে থাকতে চায়। আর এসথাকে নিয়ে তার পরিকল্পনা কি।

তার কোনো পরিকল্পনা নেই।

কোনো পরিকল্পনা নেই।

কোনো নিচু জাতের অহংকার।

সে ফিরে তাকালো অস্পষ্ট, কানাওয়ালা, ছাদওয়ালা বাড়ি মতো পৃথিবীর গর্তটার দিকে আর কল্পনা করলো রূপালী বাটিটার মধ্যে বাস করার কথা। যেটা বেবি কোচাম্মা ছাদের ওপর লাগিয়েছিলেন। মানুষের থাকার জন্যে ওটাকে যথেষ্ট বড়ই মনে হতো। অবশ্যই ওটা অনেক লোকের বাড়ির চেয়ে বড়। বড়। যেমন, কচু মারিয়ার– গাদাগাদি করে থাকার বাড়ির চেয়ে।

সে আর এসথা যদি সেখানে শুতো, জড়াড়ড়ি করে একটা ভ্রূণের মতো একটা অগভীর ইস্পাতের জরায়ুর মধ্যে, হাল্ক হোগান আর ব্যাম ব্যাম বিগেলো নামের কুস্তিগীররা যা করতো! যদি বাটিটা কেউ ভরে রাখতো তবে তারা কোথায় যেতো? তারা কি ধোঁয়া বের হওয়ার সুড়ঙ্গ দিয়ে বেবি কোচাম্মার জীবনে আর টিভিতে ঢুকতো পিছলে? তারা কি পুরানো উনুনের ওপর পড়তো *হিয়াহ্!* অওয়াজ করে? তাদের পেশী আর চুমকী বসানো জামা নিয়ে? রোগা লোকগুলো– কি দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও বিপদের জায়গা থেকে পালাচ্ছিলো– পিছলে ঢুকবে দরজার ফাটাগুলো দিয়ে? গণহত্যা কি পিছলে ঢুকবে টাইলস এর ভিতর দিয়ে?

আকাশটা গাঢ় ছিলো টেলিভিশনের। বিশেষ চশমা পরলে দেখা যেতো সেগুলো ঘুরছে আকাশে বাদুড় আর বাড়ি ফেরা পাখিদের মধ্যে– স্বর্ণকেশী, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ফুটবল, খাদ্য প্রদর্শনী, অভ্যুত্থান, স্প্রে করে শক্ত করা চুলের সাজ-সজ্জা, নক্সা করা বুকের অলংকার। এইমেনেমের ওপর ভাসমান মেঘ আকাশে লাফ দিচ্ছে। আকাশে নানান আকার সৃষ্টি করছে। চাকা। হাওয়াকল। ফুটন্ত-অফুটন্ত ফুল।

হিয়াহ্।

রাহেল ফিরে আসলো, মনোযোগ দিয়ে বিচার করলো ব্যাঙগুলো নিয়ে।

মোটা, হলুদ, একটা পাথর থেকে আর একটা নোংরা পাথরে, সে একটাকে আলতো ভাবে ছুঁলো। ওটা চোখের পাপড়িগুলো উপরের দিকে তুললো। খুব মজার ভাব করে নিশ্চিন্তে তাকালো।

চোখটেপা জালিকা, রাহেল মনে করলো সে আর এস্থা একটা পুরো দিন খরচ করেছিলো বলতে বলতে। সে, এসথা আর সোফি মল।

নিকটিটাটিং
ইকটিটাটিং
টিটাটিং
ইটাটিং
টাটিং
আটিং
টিং
ইং

ওরা, ওদের তিন জনেরই, সেদিন পরনে ছিলো শাড়ী (পুরনো, অর্ধেক ছেঁড়া), এসথা ছিলো বস্ত্র বিশারদ। সোফি মলের কুঁচিগুলো সে করে দিয়েছিলো। রাহেলের পাল্লুটা ঠিকঠাক করে দিয়েছিলো আর তার নিজেরটাও পরেছিলো।

তাদের কপালে ছিলো লাল টিপ। আম্মুর নিষেধ করা সুর্মাটা ধুয়ে তুলে ফেলার চেষ্টায় ওরা সেটা আরো লেপ্টে ফেলেছিলো চোখের ওপর, আর সব মিলিয়ে ওদের লাগছিলো তিনটে রেকুনের মতো, ওরা পার হতে চাচ্ছিল হিন্দু মেয়েদের মতো। ওটা ছিলো সোফি মলের আসার এক সপ্তাহ্ পরে। তার মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে। ততদিনে তার অভিনয় সে শেষ করেছে নিঁখুতভাবে। দুই যমজকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখেছে আর তাদের আশার সবকিছুই পূরণ হয়েছে।

সে করেছে :

ক. চাকোকে জানিয়েছে যে, যদিও সে তার আসল বাবা, সে তাকে জো'র চেয়ে কম ভালোবাসতো– (সবসময় যাকে কাছে পাওয়া যায় তার জন্যেই এমন হয়েছে)।

খ. মামাচির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ওটা হলো, সে রাহেল আর এসথার বদলে বহাল হবে ইঁদুরের লেজের মতো মামাচির রাতের বেনী বাঁধার দায়িত্বে আর তিল গোনার কাজে লাগবে।

গ. (এবং সবচেয়ে দরকারি)– চালাকি করে বুঝে নিয়েছে তাঁর মেজাজ, আর শুধু প্রত্যাখ্যানই নয়, কিন্তু সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং খুব রুক্ষ–ভাবে, বেবি কোচাম্মারা সবাই তার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছেন আর ছোট ছোট লোভ ছিলো তাঁদের।

যদিও এগুলো যথেষ্ট নয় তবু, মেলে ধরেছে মানুষ হিসাবে। একদিন যমজেরা একটা লুকানো নদী থেকে বেড়িয়ে ফিরে আসলো (যা থেকে সোফি মল বাদ পড়েছিলো), এবং তাকে পেলো বাগানে, কাঁদছিলো। বেবি কোচাম্মার লতানো ডাঁটার থোকার ওপর বসেছিলো। 'একা লাগছে,' ওভাবেই সে বললো। পর দিন এসথা আর রাহেল সোফি মলকে তাদের সাথে নিয়ে গেলো ভেলুথার সঙ্গে দেখা করতে।

ওরা ভেলুথার সঙ্গে দেখা করলো শাড়ী পরে, নিজেদেরকে লাল কাদা ও লম্বা ঘাসের (*নিকটিটাটিং, ইকটিটাটিং টাটিং টিং ইং*) মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে গেলো আর নিজেদের পরিচয় দিলো মিসেস পিল্লাই, মিসেস ইয়াপেন, ও মিসেস রাজাগোপালান বলে। ভেলুথা নিজেকে আর তার অচল ভাইকে পরিচয় করালো, কুট্টাপেন (যদিও সে গভীর ঘুমে মগ্ন ছিলো) বলে। সে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানালো সর্বোচ্চ সৌজন্যে। সে তাদের সবাইকে কোচাম্মা বলে ডাকলো আর তাজা ডাবের জল দিল। সে তাদের সঙ্গে আবহাওয়া নিয়ে কথা বললো। নদী নিয়েও। আসলেই তার মনে হতো যে নারকেল গাছগুলো একটু একটু করে খাটো হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেক বছর। যেমন এইমেনেমের মহিলারা। সে তার কটকটে মুরগীর সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলো। সে তার কাঠের কাজের যন্ত্রপাতি দেখালো ওদের, আর ওদের সবাইকে ছুরি দিয়ে চেঁছে একটা করে চামচ বানিয়ে দিলো।

এখন কেবল এতো বছর পরে, রাহেল প্রাপ্তবয়স্ক দৃষ্টিতে তার সেই ভালো ব্যবহারের মাধুর্য দেখতে পেলো। একটা প্রাপ্তবয়স্ক লোক তিনটে রেকুনকে খুশী করছে, তাদের সাথে আসল মহিলার মতোই ব্যবহার করছে। তাদের ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করছে আর তাদের মিথ্যে গল্পে সায় দিচ্ছে, যাতে প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো হেলা ফেলা করা না হয়, সে ব্যাপারটা নিশ্চিত করেই কথা বলছে।

অথবা স্নেহ।

সবকিছুর পরেও একটা গল্পকে খুব সহজেই টুকরো-টুকরো করা যায়। চিন্তার একটা শিকলকে। একটা স্বপ্নের টুকরোকে নষ্ট করা যায়। চিনেমাটির জিনিসের মতো সাবধানে এখান থেকে ওখানে বয়ে নিয়ে যেতে হয়।

ওটা হতে দেওয়া, ওর সাথে বেড়ানো, যেমন ভেলুথা করতো, সেটাই ছিলো কঠিন।

সন্ত্রাসের তিন দিন আগে। সে তাদেরকে তার নখগুলো লাল করতে দিয়েছিলো আম্মুর ফেলে দেওয়া লাল কিউটেক্স নেলপলিশ দিয়ে। যেদিন ইতিহাস বাড়ির পিছনের বারান্দায় তাদের সঙ্গে দেখা করেছিলো সেদিন সে ওরকমই ছিলো। এক কাঠমিস্ত্রী যার নখগুলো ছিলো বিশ্রিরকম চকচকে লাল। উঁচুবর্ণের পুলিশের দঙ্গল তাদের দেখছিলো আর হাসছিলো।

'এটা কি?' একজন বললো, 'এসি-ডিসি?' (কিম্ভুত কিমাকার সাজে বাজনদারের দল?)

আরেকজন তার বুটটা ওঠালো যেটার গোড়ালীর খাঁজে গেঁথেছিলো একটা কেন্নো। গা'র রং মরচের মতো বাদামী। দশ লাখ পাওয়ালা।

ডানাওয়ালা দেবশিশুর ঘাড় থেকে শেষ লম্বা আকারের আলোর রশ্মিটা গড়িয়ে পড়লো। অন্ধকার গিলে ফেললো বাগানটা। একটা অজগরের মতো। বাড়িতে আলো জ্বলে উঠলো।

রাহেল এসথাকে তার ঘরে দেখতে পাচ্ছিলো, তার নিপাট বিছানার উপর বসা। সে জানালার গরাদের মধ্যে দিয়ে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিলো। এসথা রাহেলকে দেখতে পাচ্ছিলোনা, তার বাইরে অন্ধকারে বসে থাকার জন্যে, ভিতরের আলোর দিকে ফেরানো ছিলো তার মুখ।

একজোড়া অভিনেতা থেমে যাওয়া নিষিদ্ধ একটা আবছা নাটকে অভিনয় করেছিলো যার কাহিনীর বা বর্ণনার ছিটে-ফোঁটাও তাদের মনে ছিলোনা। তাদের অভিনীত অংশের ভুলের মতো, কারুর দুঃখকে কমাতে চাচ্ছিলো। অন্য কারুর দুঃখে সান্তনা দিচ্ছিলো।

ক্ষমতাহীন, যে কোনোভাবেই হোক, নাটক বদলে। অল্প খরচে, কোনো সস্তা ভূত ঝাড়ার মন্ত্র এক কল্পিত ডিগ্রীধারী ওঝার কাছ থেকে কিনতে গিয়েছিলো, যে তাদের নিচে বসাতো আর বলতো, অনেক ফিকিরের একটার মতো, 'তোমরা পাপী

নও। তোমাদের বিরুদ্ধে পাপ করা হয়েছে। তোমরা ছিলে শুধুমাত্র শিশু। তোমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলোনা। তোমরা হলে শিকার, তোমরা অপরাধী নও।'

এটা হয়তো সাহায্য করতো যদি ওরা ঐ ফাঁকটা পার হতে পারতো। যদি ওরা অল্প সময়ের জন্য হলেও, করতে পারতো, অপরাধ করার সময়ে অপরাধের কারণে টুপি মাথায় দিতো। তখন ওরা সেটার ওপর একটা মুখ বসাতে পারতো, এবং মিনতি করে ক্রোধকে আনতে পারতো যা ঘটেছে তার জন্যে। অথবা প্রতিকার খুঁজতে পারতো। এবং ঘটনাচক্রে, হয়তো, মন্ত্র ফুঁকে ঝাড়তে পারতো স্মৃতিগুলোকে, যেগুলো তাদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো।

কিন্তু রাগ তাদের কাছে ছিলোনা আর তাদের কাছে কোন সুখও ছিলোনা যা তারা এই সব অন্যান্য জিনিসগুলোর উপর চাপাতে পারে। যেগুলো ছিলো তাদের আঠালো অন্য হাতে ধরা, যেন ভেবে নেওয়া একটা কমলালেবু। কোন জায়গা ছিলোনা ওটাকে ফেলে রাখার জন্যে। ওটা ওদের ছিলোনা– যে বিলিয়ে দেবে। ওটাকে ধরে রাখতে হবে, সাবধানে এবং সবসময়।

এসথাপেন আর রাহেল দু'জনেই জানতো যে সেখানে ঐ দিন বেশ ক'জন অপরাধী (তারা নিজেরা ছাড়া) ছিলো। কিন্তু মাত্র একজন ছিলো শিকার। তার ছিলো রক্ত-লাল নখ, আর পিঠে একটা বাদামী পাতার মতো জন্মদাগ, যার জন্যে সময়মতো বর্ষাকাল আসতো।

সে ব্রহ্মাণ্ডে একটা গর্ত ফেলে গিয়েছিল যেটা দিয়ে গলগল করে আসতো অন্ধকার যেন তরল আলকাতরা। যেটার ভিতর দিয়ে তাদের মা অনুসরণ করতো। তাদের দিকে ফিরে বিদায় নেওয়ার জন্যে হাত পর্যন্ত নাড়াতো না। সে তাদেরকে পিছনে ফেলে গেলো, অন্ধকারের মধ্যে পাক খাওয়া ঘূর্ণীতে, নোঙর ছাড়া, এক তলাহীন জায়গায়।

কয়েকঘন্টা পর, চাঁদ উঠলো আর অন্ধকারের অজগরকে বাধ্য করলো শেষ করতে যা সে গিলছিলো। বাগানটা আবার বের হলো। পুরোটা উগরে দিলো। রাহেল ওটার উপর বসে থাকলো।

বাতাসের গতি বদলে গেলো আর তার জন্যে ঢোলের আওয়াজ বয়ে আনলো। একটা উপহার। একটা কাহিনীর প্রতিশ্রুতি। *অনেক অনেকদিন আগে*, তারা বললো, *সেখানে বাস করতো এক*

রাহেল তার মাথা তুললো আর শুনলো।

পরিষ্কার রাতে চেনড়ার আওয়াজ ভেসে আসলো প্রায় এক কিলোমিটার পথ বেয়ে এইমেনেমের মন্দির থেকে কথাকলি নাচের খবর নিয়ে।

রাহেল গিয়েছিলো। খাড়া ছাদ আর সাদা দেয়ালের স্মৃতি তাড়িত হয়ে। জ্বলতে থাকা পিতলের প্রদীপ, কালো তেল মাখানো কাঠের পাশ দিয়ে। সে গিয়েছিলো একটা বৃদ্ধ হাতির সঙ্গে দেখা করার আশায় যে কোট্টাইয়াম-কোচিন মহাসড়কে

বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে মারা যায়নি। সে রান্নাঘরের কাছে থামলো একটা নারকেলের জন্যে।

তার বাইরে বেরুনোর পথে, সে লক্ষ্য করলো যে কারখানার একটা দরজা কব্জা থেকে খুলে ঝুলে আছে। সে সেটাকে একদিকে সরিয়ে রেখে ভিতরে ঢুকলো। আর্দ্রতায় বাতাস ভারি হয়েছিলো, এতোটা আর্দ্র যাতে মাছ সাঁতার কাটতে পারে।

তার জুতোর নিচে মেঝেটা ছিলো বর্ষাকালের ময়লায় মসৃণ আর চকচকে। একটা ছোট, বাদুড়, অস্থির– ওড়াউড়ি করছিলো ছাদের কড়িকাঠের মধ্যে।

নীচু সিমেন্টের তৈরী আচারের চৌবাচ্চাগুলো অন্ধকারের মধ্যে কালো ছায়ার মতো দেখাচ্ছিলো ফলে কারখানার মেঝেটাকে লাগছিলো একটা ছাদওয়ালা কবরস্থানের মতো, গোলকরা মৃতদের জন্যে।

প্যারাডাইস পিকলস এ্যাণ্ড প্রিজার্ভস-এর জাগতিক অবশেষ।

যেখানে অনেক আগে, যে দিন সোফি মল এসেছিলো, রাষ্ট্রদূত ই. পেল্‌ভিস নেড়েছিলেন এক পাত্র বেগুনী রঙের জ্যাম এবং দুটো চিন্তা মাথায় এনেছিলেন। যেখানে একটা লাল, কাঁচা-আম-আকারের গোপন ব্যাপারকে আচার বানিয়ে, বোতলে ছিপি আটকে রেখে দেয়া হয়েছিলো।

আসলেই সত্যি। একদিনেই সবকিছু বদলে যেতে পারে।

১০

নৌকায় নদী

সামনের বারান্দায় 'আমাদের সোফিমলের বাড়ি আসা'র নাটক শেষ হওয়ার পর কচু মারিয়া সবাইকে কেক দিলো। সবুজ গরমে এক নীল সৈন্যকেও দিলো, রাষ্ট্রদূত ই. পেলভিস/এস, পিনপারনেল (এলোমেলো চুল), বেগি আর চোখা জুতো পরা। দরজার বদলে ঝ্যালঝেলে কাপড়ের পর্দা ঠেলে সে বেরিয়ে এসেছিলো স্যাঁতসেতে উঠোনে। প্যারাডাইস পিকলসের উঠোন, আচারের গন্ধে ভরা। সে সিমেন্টের তৈরি বড় বড় আচারের চৌবাচ্চার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলো একটা চিন্তার জায়গা খুঁজতে। ওউসা, থাকতো ওখানে, ক্রিসমাসের গাছ বানানোর লাঠি, কালো হয়ে যাওয়া একটা আড়িকাঠ স্কাইলাইটের কাছাকাছি, ওর ওপর বসে প্যাঁচাটা ওকে হাঁটতে দেখতো (মাঝে মাঝে প্যারাডাইসের জিনিসপত্রে কিছু গন্ধ যোগ করতো)।

সে পেরিয়ে গেলো বড় বড় গামলায় ভেসে থাকা হলুদ লেবু, মাঝে মাঝে ওগুলোকে নেড়ে দিতে হতো (না হলে কালো ছাতা পড়ত মনে হতো টলটল স্যুপের মধ্যে ব্যাঙের ছাতা)।

পেরিয়ে গেলো কাটা সবুজ আম। ওগুলোকে হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো (দৃষ্টি কাড়ার মতো ওগুলোর এমন কিছু ছিলো না)।

পেরিয়ে গেলো কর্কের ছিপি আঁটা সিরকার বোতল।

পেরিয়ে গেলো পেকটিন আর অন্যান্য সংরক্ষক রাখার তাক।

পেরিয়ে গেলো চালকুমড়ো রাখার বড় বড় ট্রেগুলোকে ওগুলোর মধ্যে ছিলো ছুরি আর অঙ্গুঠি।

রসুন আর ছোট ছোট পিঁয়াজ ভর্তি পেট মোটা বস্তাগুলো পেরিয়ে গেলো।

পেরিয়ে গেলো মণকে মণ টাল দিয়ে রাখা সবুজ ভুট্টা।

পেরিয়ে গেলো মেঝেয় রাখা কলার গাদা (ওগুলোকে রাখা হয়েছিলো শুয়রগুলোকে খাওয়ানোর জন্য)।

পেরিয়ে গেলো লেবেল ভর্তি আলমারীটা।

পেরিয়ে গেলো লেই।

পেরিয়ে গেলো লেই মাখানোর তুলি।

পেরিয়ে গেলো সাবানের ফেনা ভর্তি বালতি যাতে ভাসছিলো খালি বোতল।

পেরিয়ে গেলো লেমন স্কোয়াশ।

আঙুর মাড়াইয়ের যন্ত্র।

এবং ফিরলো।

ভিতরে ছিলো অন্ধকার, নোংরা পর্দা ভেদ করে যতটুকু আলো আসছিলো তাতে অন্ধকার কিছুটা পাতলা লাগছিলো। স্কাইলাইট থেকে ধূসর একটা আলোর গাদ্দা (যা ওউসার সহ্য হতো না) এসে পড়েছিলো। সিরকা আর হিঙ্গের গন্ধ এসে লাগছিলো নাকে, এসথা অভ্যস্ত ছিলো ওতে, ভালও বাসত। চিন্তা করার জন্যে যে জায়গাটা সে বেছে নিয়েছিলো সেটা হলো, দেওয়াল আর কালো একটা কড়াইয়ের মাঝখানটা। কড়াইতে তখন ফুটন্ত কলার জ্যাম (বেআইনি) ঠাণ্ডা হচ্ছিলো।

তখনও গরম ছিলো জ্যামটা, লালচে চটচটে ছিলো ওপরটা। ঘন গোলাপী বুড়বুড়িগুলো ধীরে ধীরে ফাটছিলো। ছোট ছোট কলার বুদবুদ জ্যামের নিচের দিকে ডুবে যাচ্ছিলো, ওগুলোকে সাহায্য করার কেউ ছিলো না।

অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্কম্যান যে কোন সময় আসতে পারে। কোচিন-কোট্রাইয়ামের বাস ধরে এখানে চলে আসতে পারে। আম্মু তাকে এক কাপ চা দিতে পারে। কিংবা একটু বরফ দেওয়া আনারসের শরবত সম্ভবত। গ্লাসে হলুদ রঙ।

লোহার লম্বা খুন্তিটা দিয়ে এসথা টাটকা জ্যাম নেড়ে দিলো।

বুড়বুড়িগুলো মিশে যেতে যেতে কিছুক্ষণ থেকে যাচ্ছিলো।

ভাঙা ডানার একটা কাক।

মুরগীর কাটা পা একটা নখ শুদ্ধ।

একটা প্যাঁচা (ওউসা নয়) নষ্ট করলো জ্যামটা।

একটা বাজে ব্যাপার।

এবং কারুর কিছু করার নেই।

জ্যাম নাড়তে নাড়তে এসথা ভাবলো, দু'টো ভাবনা, এবং যে দু'টো ভাবনা সে ভেবেছিলো সেগুলো এরকম :

ক. যে কারুরই যেকোন কিছু ঘটে যেতে পারে।

এবং

খ. সবচেয়ে ভালো তৈরি থাকা।

এই ভাবনাগুলো ভাবতে ভাবতে এসথা একা একা তার নিজের এই যুক্তির জন্যে খুশি হয়ে উঠলো।

গরম লালচে বেগুনী জ্যাম ঘুরপাক খাচ্ছিলো এসথা হয়ে উঠেছিলো নাড়ানোর যাদুকর– নষ্ট হওয়া চুল আর এবড়োথেবড়ো দাঁত এবং তখনই ম্যাকবেথের ডাইনীর–

আগুন, পোড়া, কলার বুদবুদ।

এসথাকে আম্মু অনুমতি দিয়েছিলো মামাচির 'রন্ধন প্রণালী' টুকে রাখতে। এই কলার জ্যামটা ছিলো তার নতুন রান্নার বইতে, কালো সাদা দাঁড়াওয়ালা।

আম্মু যে তার ওপর নির্ভর করতো সেটা সে সবসময় মনে রাখতো, এসথা তার জানা দু'ধরনের হাতের লেখাই ব্যবহার করেছিলো।

কলার জ্যাম (তার পুরনো ধাঁচের সুন্দর লেখা)

কলা চটকাও। পানি মেশাও ঢাকা দাও তারপর জ্বাল খুব বাড়িয়ে দাও।
ফোটাও যতক্ষণ না নরম হয়।
পাতলা কাপড়ে চিপে চিপে রস ছেঁকে নাও।
সমান মাপের চিনি মেপে নাও এবং পাশে রেখে দাও।
রস জ্বাল দিতে থাকো যতক্ষণ না লালচে বেগুনী রঙ হয় আর
কমে অর্ধেক হয়ে যায়।
জিলেটিন (পেকটিন) তৈরি করো এভাবে
অনুপাত ১ ঃ ৫
অর্থাৎ ৪ চা চামচ পেকটিন ঃ ২০ চা চামচ চিনি।

এসথার মনে হত পেকটিন হচ্ছে হাতুড়ির সঙ্গে থাকা তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, পেকটিন, হেকটিন আর আবিদনিগো। সে কল্পনা করতো তারা বৃষ্টি আর কুয়াশার মধ্যে একটা কাঠের জাহাজ বানাচ্ছে। নূহের ছেলেদের মতো। সে মনে মনে পরিষ্কার দেখতে পেত। সময় পিছনে ছুটছে। ভাবালুতার মধ্যে সে হাতুড়ির বাড়ির ভোঁতা শব্দ শুনতে পেতো, ঝড় ওঠার আগের আকাশ। আর কাছেই একটা জঙ্গল, তার মধ্যে হুড়োহুড়ি, ঝড় আসার আলো, জীবজন্তুরা জোড়ায় জোড়ায় লাইন ধরেছে।

ছেলেমেয়ে
ছেলেমেয়ে
ছেলেমেয়ে
ছেলেমেয়ে
যমজদের অনুমতি নেই।

বাকি রন্ধন প্রণালীটা লেখা ছিলো এসথার সবচেয়ে ভালো হাতের লেখায়। একটু বাঁকা, চোখা চোখা। পিছন দিকে বেঁকেছিলো বর্ণগুলো মনে হচ্ছিলো শব্দ তৈরি করতে গিয়ে ওগুলো শুয়ে পড়তে চাইছে আর বাক্য তৈরি করতে গিয়ে শুতে চাইছে শব্দগুলো।

ঘন হয়ে আসা রসে পেকটিন মিশাও। সামান্য কয়েক (৫) মিনিট জ্বাল দাও।
জ্বাল বাড়িয়ে দাও চারিদিকে যেন আগুন ওঠে।
চিনি মেশাও। জ্বাল দিতে থাক যতক্ষণ না চটচটে ভাব না আসে।
ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা কর।
আশা করি এ রান্নাটা করে মজা পাবে।

কিছু বানান ভুল ছাড়া শেষ লাইন– *আশা করি এ রান্নাটা করে মজা পাবে* এটাই ছিলো এসথার নিজের লেখা বাক্য আসল লেখার অতিরিক্ত।

আস্তে আস্তে কলার জ্যাম নাড়তে নাড়তে যখন ঘন হয়ে আসলো; ঠাণ্ডা হলো, তখন তিন নম্বর চিন্তাটা চোখা জুতো আর বেগি প্যান্টের মধ্যে থেকে উঠে আসলো।

চিন্তা নম্বর তিন ছিলো :

(গ) একটা নৌকা।

নদী পার হওয়ার জন্যে একটা নৌকা।

আক্কারা। সব কিছু বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটা নৌকা। দেশলাই, কাপড় চোপড়, থালা, বাসন-হাঁড়িকুড়ি যে জিনিসগুলো ওদের দরকার হয় কিন্তু যা নিয়ে সাঁতরানো যায় না।

শেষকালে এসথার হাতের লোম খাড়া হয়ে উঠলো। জ্যাম নাড়াটা হয়ে গেলো নৌকা বাওয়া। ঘোঁটা ঘোঁটা। হ্যাঁ, সামনে পিছনে। থক থকে চটচটে নদী পার হলো। ওনাম ডিঙি নৌকা থেকে একটা গানের সুর ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ফ্যাক্টরিতে। *'থাই-ই থাই-ই থাকা থাইই থাইই থোমে!'*

এনড়া ড়া কোরাংগাচা বাদি ইথরা থেনজাজ?'
(ওহে বাঁদর বাবা তোমার পাছা কেন এত লাল হে)
পানড়িল থুরান পোইয়া ... নেরাক্কামুথিরি নেরৎগি নজান।

(আমি মাদ্রাজে গিয়েছিলাম হাগতে, আর রক্ত বের না হওয়ার পর্যন্ত করেই গিয়েছিলাম) ভাটিয়ালী গানের এই রকম সব প্রশ্ন-উত্তর যখন চলছিলো তখন হঠাৎ ফ্যাক্টরির মধ্যে রাহেলের গলা পাওয়া গেলো।

'এসথা এসথা! এসথা!'

এসথা চুপ করে রইলো। শুধু ভাটিয়ালী গানের স্বরটা নিচুতে নেমে এলো ঘন জ্যামের কাছাকাছি।

দীওমি
থিথোসি
থারাকা
থিথোসি

কাপড়ের পর্দাটা সরে গেলো আর পিছনে সূর্য নিয়ে সানগ্লাস পরা এক এয়ারপোর্টের পরী উঁকি মারলো। ফ্যাক্টরিটা ছিলো রাগী রঙের। নুন মাখানো লেবুগুলো ছিলো লাল। কাঁচা আমগুলো ছিলো লাল। লেবেলের আলমারিটা ছিলো লাল। ধূলিময় সূর্যরশ্মিও ছিলো লাল (ওউসা যা ব্যবহার করত না)।

পর্দাটা আবার জায়গায় ফিরে এলো।

রাহেল শূন্য ফ্যাক্টরিতে দাঁড়িয়ে ছিলো লাভ ইন টোকিওতে বাঁধা চুল আর চশমা নিয়ে। ও শুনতে পাচ্ছিলো ভাটিয়ালী গান কিন্তু যেন গাইছিলো কোন নান।

স্বচ্ছ ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠছিলো সিরকার ফেনা আর আচারের গামলা থেকে।

সে এসথার দিকে ফিরলো, কালো কড়াই আর লাঠির ওপর দিয়ে উঁকি দিলো।

না তাকিয়েই এসথা বললো

'কি চাস?'

'কিছু না' রাহেল বললো।

'এখানে আসলি কেন?'

রাহেল উত্তর দিলো না। হিংসুটে নীরবতা রইলো কিছুক্ষণ।

'জ্যামের মধ্যে নৌকা বাইছিস কেন?' রাহেল প্রশ্ন করলো।

'ভারত স্বাধীন দেশ।' এসথা বললো।

কারুর কিছু বলার ছিলো না।

ভারত ছিলো স্বাধীন দেশ।

নুন বানানো যায়। জ্যাম বেয়ে যাওয়া যায় যদি কেউ চায়। অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্কম্যান চলে আসতে পারে, পর্দা ঠেলে, যদি সে চায়।

আম্মু তাকে আনারসের শরবত করে দিতে পারে। বরফ দিয়ে।

সিমেন্টের গামলার কিনারায় বসলো রাহেল (বকরম আর লেস দিয়ে কুঁচি দেওয়া জামার কিছুটা ডুবে গেলো আমের আচারের মধ্যে) রবারের অঙ্গুঠী পরার চেষ্টা করল। তিনটে নীল বোতল পর্দার তলা দিয়ে গড়িয়ে আসতে চাচ্ছিল। আর ওপরে বসে ওউসা– প্যাঁচাটা দেখছিল আচারের নীরবতার মধ্যে যমজ দু'টো কি করে।

রাহেলের আঙুলগুলো হলো হলুদ সবুজ নীল লাল হলুদ।

এসথার জ্যাম নড়ছিলো।

রাহেল যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালো দু'পুরের ঘুমের জন্যে

কোথায় যাচ্ছিস?

যেখানে খুশি।

রাহেল তার নতুন আঙুলগুলো খুলে ফেললো তার পুরনো আঙুলের রঙ ফিরে এলো। হলুদ না, সবুজ না, নীল না, লাল না, হলুদ না।

আমি অক্কারায় যাচ্ছি এসথা বললো কোনদিকে না তাকিয়েই। 'ইতিহাসের বাড়িতে।'

রাহেল দাঁড়ালো, একপাক ঘুরলো আর তখন তার হৃদপিণ্ডের মধ্যে একটা ঘুমন্ত লোমশ মথ তার অলস পাখাগুলো মেলে দিলো।

আস্তে গেলো।

আস্তে ঢুকলো।

'কেন?' রাহেল বললো।

'কারণ যে কারুরই যে কোন কিছু হতে পারে।' এসথা বললো

'সবচেয়ে ভালো তৈরি থাকা'

কারুর কিছু বলার নেই। কেউ আর কারি সাইপুর বাড়িতে যাবে না। ভিল্লে পাপেন সেই শেষ লোক যে তার ওপর চোখ রেখেছিলো। সে বলেছিলো ওটা ভূতুড়ে। যমজ দু'টিকে সে কারি সাইপুর ভূতের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা বলেছিলো। দু'বছর আগে হয়েছিলো ওটা। সে বলেছিলো। সে নদী পার হয়ে গিয়েছিলো, একটা জায়ফল গাছ খুঁজছিলো। জায়ফল আর তাজা রসুন দিয়ে তার বউ চেল্লার জন্যে ওষুধ বানানোর জন্যে, যক্ষ্মা হয়েছিলো তার। হঠাৎ সে চুরুটের পোড়া গন্ধ পেলো (তক্ষুণি সে গন্ধটা চিনতে পারল কারণ পাপাচি ঐ চুরুট খেত)। ভিল্লে পাপেন গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগুলো তারপর গন্ধ লক্ষ্য করে তার কাস্তেটা মারলো ছুঁড়ে। ভূতটা গেঁথে গেলো একটা রাবার গাছের গুঁড়িতে। ভিল্লে পাপেন বলে, এখনও ওটা ওভাবেই আছে। কাস্তে গাঁথা, রক্ত শূন্য, সাদা রক্ত, আর চুরুট চাচ্ছিল।

ভিল্লে পাপেন জায়ফল গাছটা খুঁজে পায়নি আর তাকে নতুন একটা কাস্তে কিনতে হয়েছিলো। কিন্তু সে সন্তুষ্ট ছিলো এই ভেবে যে তার উপস্থিত বুদ্ধি আর চকিত দৃষ্টি (যদিও তার চোখ ছিলো বন্ধক রাখা) আর বুদ্ধি লোপ না হওয়ার ফলে রক্ততৃষ্ণায় ঘুরে বেড়ানো ভয়ঙ্কর ভূতটাকে মারতে পেরেছিলো।

তখনও পর্যন্ত কেউ ওখানে গিয়ে চুরুট দিয়ে তাকে কাস্তে মুক্ত করেনি। ভিল্লে পাপেন (যে অনেক কিছু জানত) জানতো না যে কারি সাইপুর বাড়িটা ছিলো ইতিহাসের বাড়ি (যেটার দরজাগুলো ছিলো তালাবন্ধ আর জানালাগুলো ছিলো খোলা)। আর ভিতরে মানচিত্রে তীক্ষ্ণ নখ গেথে পূর্বপুরুষরা দেওয়ালের টিকটিকিগুলোর সঙ্গে কথা বলতো। পিছনের বারান্দায় ইতিহাস তার শর্ত নিয়ে দরকষাকষি করে তার পাওনা আদায় করতো। দেনা শোধ করতে না পারলে পরিণতি হত ভয়ঙ্কর। একদিন ইতিহাস বই থেকে উঠে আসলো, এসথা দেনার রশীদটা রেখে দিয়েছিলো, ভেলুথা তা শোধ করেছিলো। ভিল্লে পাপেনের ধারণা ছিলো না যে কারি সাইপু স্বপ্ন দখল করেছিলো আর বার বার পুরনো স্বপ্ন দেখাতো। স্বপ্নগুলো সে তুলে আনত পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া বাচ্চাদের মাথা থেকে যাদের হাতে থাকতো কেকের টুকরো। ওরকমই একটা স্বপ্ন যে বার বার দেখতে ভালবাসতো, সুন্দর একটা স্বপ্ন, দু'টো ডিমের যমজ।

হতভাগা বুড়ো ভিল্লে পাপেন যখন জানলো যে ইতিহাস তাকে তার সহকারী হিসাবে পছন্দ করেছে তখন ভয়ে তার চোখ দিয়ে জল ঝরছিলো আগে বুঝলে সে এইমেনেমের বাজারের মধ্যে দিয়ে বাচ্চা মোরগের মতো গলা উঁচিয়ে হাঁটতো না, আগ বাড়িয়ে বলতো না কেমন করে সে দাঁতে কাস্তে চেপে (জিভে টক লেগেছিলো লোহার স্বাদ) নদী পার হয়েছিলো। কেমন করে সে ওটা এক মুহূর্তের জন্যে নামিয়েছিলো যখন হাঁটু গেড়ে বসে চোখ থেকে (বন্ধক রাখা) নদীর বালি ধুয়েছিলো (নদীতে তখন বালির কণা ভেসে আসতো বিশেষ করে বর্ষাকলে) তখনি সে প্রথম চুরুটের গন্ধ পেয়েছিলো। কেমন করে সে কাস্তেটা তুলে নিয়েছিলো, ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো গন্ধটাকে কাস্তে দিয়ে গেঁথে ফেলেছিলো, সেই সঙ্গে ভূতটাকেও চিরদিনের জন্যে। একলহমায়।

এক সময় সে বুঝেছিলো, ইতিহাসের পরিকল্পনায় তার ভূমিকা। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো তখন ফিরতি পথ ধরার জন্যে। নিজের পায়ের চিহ্ন সে নিজেই মুছে দিয়েছিলো একটা ঝাড়ু দিয়ে পিছনে হামাগুড়ি মেরে।

ফ্যাক্টরির মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিলো আর আবার যমজ দু'টোর বন্ধন শক্ত করেছিলো। তবে এবারের নিস্তব্ধতাটা ছিলো অন্যরকম। প্রাচীন নদীর নিস্তব্ধতা। মাছ ধরা মানুষ আর মোম মসৃণ মৎস্যকন্যাদের মতো নিস্তব্ধতা।

'তবে কম্যুনিস্টরা ভূত বিশ্বাস করে না' এসথা বললো। যদিও তারা তখন ভূত সমস্যাটির খুঁটিনাটি নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলো। পার্বত্য ঝরনার মতো তাদের কথা ঝির ঝির করে নামছিলো। কখনও অন্যরা শুনতে পাচ্ছিল-কখনও নয়।

'আমরা কি কম্যুনিস্ট হয়ে যাব?' রাহেল প্রশ্ন করলো।

'হতেই হবে।'

এসথা—বাস্তববাদী।

দূর থেকে কেক চিবানো কণ্ঠস্বর আর নীল সৈন্যের দিকে ধেয়ে আসা পদশব্দ পেয়ে কমরেডরা গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে চুপ মেরে গেলো। আচার হওয়া, মুখ আঁটা, সরিয়ে রাখা গামলায় সুন্দর লাল আমের মতো গোপন। সভাপতি ছিলো একটা কুটরে প্যাঁচা।

লাল আলোচ্যটির ওপর আলোচনা হয়েছিলো। সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছিলো।

কমরেড রাহেলকে যেতে হলো দিবানিদ্রার জন্যে, এবং আম্মুর ঘুমানো পর্যন্ত ঘাপটি মেরে রইলো সে।

কমরেড এসথা পতাকাটা খুঁজে বের করলো (বেবি কোচাম্মা যেটা নাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন) এবং তার জন্যে নদীর পাড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। আর ওখানে তারা :

খ. তৈরি হওয়ার জন্যে—তৈরি হতে—তৈরি হতে লাগলো

একটি শিশুর পরীর জামা (অর্ধেক আচার হওয়া) আম্মুর অন্ধকার শোয়ার ঘরের মাঝখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

বাইরে বাতাস ছিলো সতর্ক উজ্জ্বল আর উষ্ণ। রাহেল আম্মুর পাশে শুয়েছিলো, পুরোপুরি জেগে এয়ারপোর্টে পরে যাওয়া নিকারের রঙ মেলাচ্ছিলো। সে দেখতে পেলো সুতোর কাজ করা ফুলের নীল ছাপ পড়েছে আম্মুর গালে। নীল সেলাই করা বিকেলের শব্দ শুনলো সে।

ফ্যানটা আস্তে আস্তে ঘুরছিলো। সূর্য চলে গিয়েছিল পর্দার ওপারে। হলুদ বোলতাটা ভয় ধরানো ভন ভন করছিলো জানালার চৌকাঠে।

এক বিশ্বাসঘাতক সরিসৃপের আওয়াজ।

উঠোনে লম্বা পা ফেলা মোরগদের আওয়াজ।

সূর্যের কাপড় শুকানোর আওয়াজ। কড় কড়ে হয়ে ওঠা সাদা সাদা বেড শীট। মাড় দেওয়া খড়খড়ে শাড়ী। অনুজ্জ্বল সাদা আর সোনালী। লাল পিঁপড়ে আর হলুদ পাথর।

একটা গরম গাইয়ের গরম লাগছিলো। দূর থেকে ডাকছিল– *আমহু।*

ধূর্ত ইংরেজ ভূতের গন্ধ, তাহার কাছে কাস্তে বেঁধা একটা চুরুট চাইছিলো বিনীতভাবে।

উম্ম...দুঃখিত। আপনি কি আমাকে উহুম্ একটা চুরুট দিতে পারেন?

নম্র শিক্ষকের মতো স্বর,

ওহ্ ডিয়ার।

আর এসথা তখন তার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। নদীর ধারে। তাহার গাছের নিচে। ওটা লাগিয়েছিলেন রেভারেণ্ড জন ইপে। মান্দালয় থেকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন চারাটা।

কিসের ওপর বসেছিলো এসথা?

যেখানে ওরা সবসময় বসে সেই তাহার গাছের নিচে। কিছুটা ধূসর আর পিছল। পরগাছা আর শ্যাওলায় ঢাকা, ফার্ণে ছাওয়া মাটির মতো কিছু, গাছের গুঁড়িও নয়, পাথরও নয়। চিন্তাটা আসার আগেই রাহেল উঠে দৌড়ালো।

রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে ঘুমন্ত কচু মারিয়াকে ছাড়িয়ে মোটা মোটা বলিরেখা পড়া মুখ আর গন্ডারের চামড়ার মতো মোটা এ্যাপ্রন পরা।

ফ্যাক্টরি পার হয়ে।

সবুজ গরমে খালি পায়ে লাফাতে লাফাতে, তার পিছু নিয়েছিলো একটা হলুদ বোলতা।

কমরেড এসথা ছিলো ওখানে। তাহার গাছের নিচে। লাল পতাকাটা পাশে পুঁতে রেখে। এক চলমান প্রজাতন্ত্র। একটা ফাপানো চুলওয়ালা মাথা এক যমজ বিপ্লব।

আর সে কিসের ওপর বসেছিলো?

ফার্ণের নিচে লুকানো আর শ্যাওলায় ঢাকা।

টোকা দিলে ওটা থেকে একটা ফাঁপা ঢ্যাপ ঢ্যাপ আওয়াজ হতো।

নিস্তব্ধতা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নামছিলো তার আকারটা হয়ে গিয়েছিলো ৪-এর মতো।

উজ্জ্বল ফড়িংগুলো ফর ফর করে উড়ছিলো সূর্যের আলোয়। আঙুল রঙের আঙুলগুলো ফার্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলো। পাথরটা সরিয়েছিলো, রাস্তা পরিষ্কার করেছিলো। ভেজা একটা বস্তু ছিলো ওখানে। ধরার মতো আকৃতি আর ওয়ান, টু এবং। একদিনেই সব বদলে যায়।

একটা নৌকা ছিলো, ছোট একটা কাঠের ভল্লম নৌকা।

এসথা বসেছিলো নৌকাটার ওপর আর রাহেল আবিষ্কার করেছিলো।

যে নৌকায় আম্মু নদী পার হতো। রাতে পুরুষটিকে সে ভালোবাসত আর দিনে তার বাচ্চাদের। প্রাচীন ছিলো নৌকাটা শিকড় গজিয়ে গিয়েছিলো। প্রায়। একটা ধূসর নৌকাগাছ, যাতে নৌকাফুল আর নৌকাফল। আর নিচে নৌকার মতো দাগ ধরা ঘাস। একটা অস্থির দাগ ধরা নৌকা জগৎ।

অন্ধকার শুকনো আর ঠাণ্ডা। এখন ছাদহীন এবং অন্ধ।

সাদা পিঁপড়েরা কাজে যাচ্ছিলো।

সাদা পক্ষীনীরা বাসায় ফিরছিলো।

সাদা গুবরে পোকারা আলোর আড়াল খুঁজছিলো।

সাদা ঝিঁঝিঁ পোকারা সাদা কাঠের বেহালা বাজাচ্ছিল।

দুঃখী সাদা বাজনা।

একটা সাদা বোলতা। মৃত।

একটা উজ্জ্বল সাদা সাপের চামড়া অন্ধকারে রাখা ছিলো, রোদে শুকানো।

কিন্তু সাদা ভল্লম নৌকাটা ছিলো কেন? খুব পুরানো ছিলো হয়তো। মৃতও কি? আক্কারা কি অনেক দূরে ছিলো?

দুই ডিমের যমজরা নদীর ওপার তাকালো।

মীনাচল নদী।

ধূসর সবুজ। মাছ ছিলো। আকাশ আর গাছ ছিলো। রাতে ছিলো ভাঙা হলুদ চাঁদটাও।

পাপাচি যখন ছোট ছিলেন তখন ভ্রুড় একটা তেঁতুল গাছ নদীতে পড়েছিলো। সেটা এখনও আছে। মসৃণ ছালহীন গাছ। সবুজ জলে ডুবে থাকতে থাকতে কালো হয়ে গেছে। আধা ডুবন্ত ডোবা কাঠ।

নদীটার তিনভাগের একভাগ তাদের বন্ধু। আসল গভীরতা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত। ওরা জানতো পিছল পাথুরে সিঁড়িগুলোর (তেরটা) পরে আছে কাদা। ওরা জানতো ডোবা জলজ গাছগুলো উল্টো দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকে যখন কোমারাকোম থেকে জোয়ারের জল উঠে আসে। ওরা জানতো ছোট মাছগুলোর কথা। চ্যাপ্টা বোকা পাল্লাথি, রূপালী পারাল, উরি, কুচি কিংবা কারিমীন।

এখানে চাকো ওদের সাঁতার শিখিয়েছিলো (মামার বিরাট ভুঁড়ির চারপাশে পানি ছিটিয়ে ওরা সাঁতরাতো)। এখানে ওরা আবিষ্কার করেছিলো পানির নিচে পাদ দিলে কেমন মজা লাগে।

এখানে তারা মাছ ধরা শিখেছিলো। প্যাঁচানো ঘিনঘিনে কেঁচো বড়শীতে গেঁথে মাছ ধরা। হলুদ বাঁশে চিকন কঞ্চি দিয়ে সুন্দর ছিপ বানিয়ে দিয়েছিলো ভেলুথা।

এখানে ওরা শিখেছিলো নীরবতা (জেলে শিশুদের মতো) আর শিখেছিলো ফড়িংদের সুন্দর ভাষা। এখানে ওরা অপেক্ষা করতে শিখেছিলো। দেখতে। চিন্তা করতে কিন্তু সশব্দে না জানাতে। ফাৎনাটা যখন ডুব মারতো তখন বিদ্যুতগতিতে হলুদ ছিপটা ঝটকা দিতে।

তাই নদীটার তিনভাগের একভাগ তারা ভালোই চিনতো। বাকি দু'ভাগ তেমন নয়।

পরের অংশে সত্যিই গভীরতা বেড়েছিলো। ওখানে স্রোত ছিলো (জোয়ারের জল যখন নেমে যেতো, তারপর ধীরে ধীরে চাপ বাড়তো ভাটি থেকে জল আসতো জোয়ার খেলতো)। শেষ অংশটা ছিলো আবার কম গভীর। বাদামী আর অস্বচ্ছ। আগাছায় ভরা আর টুথপেস্টের মতো প্যাঁচপেঁচে কাদায় পা ডুবে যেতো।

যমজরা সীল মাছের মতো সাঁতার কাটতো, চাকো নজর রাখতো। অনেকবার সে নদী পার হয়েছে। ফেরার সময় সে একটা পাথরের টুকরো বা পাতা নিয়ে আসত। প্রমাণ দেখানোর জন্য। কিন্তু এত বিখ্যাত নদীর মাঝখানে বাচ্চারা যেতে পারতো না, থাকতে পারতো না, শিখতে পারতো না। এসথা আর রাহেল মীনাচল নদীর তিনভাগের দ্বিতীয় অংশে এবং তিনভাগের তৃতীয় অংশের মধ্যে অনেক তফাত দেখেছিলো। সাঁতরে পেরিয়ে গেলো। অসুবিধা হলো না। জিনিসপত্র শুদ্ধ নৌকাটাকে ওরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো (তারা মানতে চেয়েছিলো (খ) *তৈরি হওয়ার জন্যে—তৈরি হওয়ার জন্যে তৈরি হওয়া*) প্রাচীন নৌকার চোখ নিয়ে তারা নদী পার হয়েছিলো। যেখানে পৌঁছে দাঁড়িয়েছিলো সেখান থেকে ইতিহাসের বাড়ি দেখতে পায়নি। গাছগাছালির মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে ছিলো ওটা। নষ্ট হওয়া রাবার বাগানের একেবারে মধ্যেখানে। ওখান থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ আসছিলো। এসথা আর রাহেল নৌকাটা তুলে আনলো। ওটাকে মনে হচ্ছিলো শোলমাছের মতো জলের নিচে থেকে মাথা জাগিয়েছে। সূর্যের আলো দরকার ছিলো। দরকার ছিলো ঝাড়া মোছা করা আর কিছু না।

দু'টো খুশি ভরা মন যেন ফুরফুরে করে উড়ছিলো আকাশীনীল আকাশে রঙীন ঘুড়ির মতো। কিন্তু তখন একটা ধীর সবুজ ফিসফিসানি, নদীটা (যাতে ছিলো মাছ, আকাশ আর গাছ) বুড়বুড়ি, তুললো।

আস্তে আস্তে প্রাচীন নৌকাটা ডুবলো আর ঠেকলো গিয়ে ষষ্ঠ ধাপে।

একজোড়া দুই-ভ্রূণের যমজের মনও ডুবলো, ষষ্ঠ সিঁড়ির ওপর স্থির হয়ে রইলো।

গভীর জলের মাছগুলো তাই দেখে ডানা দিয়ে মুখ ঢেকে হাসলো।

একটা সাদা নৌকা-মাকড়সা নদীটাকে নিয়ে নৌকার ওপর ভেসে উঠলো। একটু চেষ্টা করে আবার ডুবে গেলো। তার সাদা ডিমের নিচে থেকে শ' শ' ক্ষুদে মাকড়সা বেরিয়ে এলো (তারা এত হালকা ছিলো যে ডুবলো না কিন্তু এতো ছোট

ছিলো যে সাঁতরাতেও পারছিলো না) সবুজ শান্ত জলের ওপর তারা ভেসে রইলো যতক্ষণ না সমুদ্রে ভেসে গেলো। গেলো মাদাগাস্কারে মালায়ালী সাঁতারু মাকড়সার একটা নতুন প্রজাতি শুরু করতে।

এর মধ্যে এসব বলাবলি করতে করতে (যদিও ওরা দেখেনি) নদীতে নেমে নৌকাটা পরিষ্কার করতে শুরু করেছিলো। শ্যাওলা, কাদা, মাকড়সার জাল, পরগাছা সব ভেসে যাচ্ছিল। পরিষ্কার করে ওরা ওটাকে উল্টো করে মাথায় নিলো। যেন দু'জনে একটা হ্যাট পরেছিলো। এসথা লাল পতাকাটাও তুলে নিলো মাটি থেকে।

একটা ছোট্ট মিছিল চললো (একটা নিশান, একটা বোলতা একটা চার পাওয়ালা নৌকা) চেনা পথ ধরে, ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে। এঁকেবেঁকে চললো, কাঁটা ঝোপ, খানাখন্দক আর পিঁপড়ের ঢিবি এড়িয়ে। ওরা পথ করে নিলো লাল মাটির ঢিবির পাশ দিয়ে ঢিবিটা কাটা হচ্ছিলো, গর্ত আর খাড়া পাড়ের পুকুর তৈরি হয়েছিলো। জল ছিলো নোংরা ওপরে ভাসছিলো জ্বলজ্বলে ক্ষুদে পানা একটা জংলা ভরা মাঠের মতো ছিলো ওটা মশার বংশ বাড়ার মতো জায়গা, হৃষ্টপুষ্ট মাছও ছিলো কিন্তু দেখার উপায় ছিলো না।

পথটা গিয়েছিলো নদীর পাশ দিয়ে সমান্তরালভাবে, গাছে ঘেরা ঘেসো ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে গেলো, নারকেল, কাজু, আম, বিলিম্বি-এমন সব গাছ ছিলো। ফাঁকা জায়গাটার শেষে ছিলো একটা কুঁড়েঘর। নদীর দিকে পিঠ ফেরানো। মাটির দেয়াল, কমলা রঙের মাটি দিয়ে লেপা। খড়ের চাল নেমে এসেছিলো প্রায় মাটি পর্যন্ত, যেন মাটির গোপন কথা শুনছিলো। যে মাটির ওপর দাঁড়িয়েছিলো কুঁড়েঘরের দেওয়ালগুলো সেই মাটির রঙেরই ছিলো ওগুলো মনে হচ্ছিলো যেন মাটি ফুঁড়েই বেরিয়েছে পৃথিবীর চারকোণা পাঁজরের হাড়। সামনের উঠোনের পাশে ছিলো তিনটে কলাগাছ উঠোনটা বেড়া দেওয়া ছিলো তালপাতা দিয়ে।

পাওয়ালা নৌকাটা চললো কুটিরটার দিকে। দরজার পাশে ঝুলছিলো একটা নেভানো কুপি। দেয়ালে কালো দাগ লেগেছিলো। দরজা খোলাই ছিলো তবে অর্ধেকটা। ভিতরে ছিলো অন্ধকার। কালো একটা মুরগী বেরিয়ে এলো দরজা দিয়ে। আবার ঢুকলো। নৌকার জন্যে অনিশ্চিত বেড়ানো।

ভেলুথা বাড়ি ছিলো না। ভিল্লে পাপেনও না। কিন্তু কেউ একটা ছিলো। একটা লোকের আওয়াজ পাওয়া গেলো। বোঝা গেলো লোকটা একা।

একই কথা সে বার বার চীৎকার করে বলছিলো। ক্রমশ তার স্বর চড়ছিলো উন্মাদের মতো। যেন একটা পাকা পেয়ারা বলছিলো তাড়াতাড়ি পেড়ে নাও না হলে মাটিতে পড়ে যাব ছাত্রাখান হয়ে যাব।

পা পেরা-পেরা-পেরা পেরুক্কা
(হে-পেপ-পে-পে-পেয়ারা)
ইন্তে পেরামাবিল খুরালি

(আমার উঠোনে হেগো না)
চিটেন্তে পারামবিল থুরিক্কো
(পাশেই আমার ভাইয়ের উঠোনে হাগতে পার)
পা-পেরা-পেরা-পেরা-পেয়াঙ্কা
(হে পেপ-পে -পে-পেয়ারা)

কুট্টাপ্পেন চেঁচাচ্ছিলো। ভেলুথার বড় ভাই। বুকের নিচ থেকে পুরো শরীরটা ছিলো অবশ। দিনের পর দিন মাসের পর মাস, তার ভাই ঘুরে বেড়াতো বাবা কাজ করতো, কুট্টাপ্পেন থাকত চিৎ হয়ে শুয়ে? তখন কুট্টাপ্পেন দেখতো তার যৌবন বয়ে যাচ্ছে। সারাদিন শুয়ে থেকে সে গাছদের সংসার করা নীরবতার গান শুনতো, শুধু কালো মুরগীটা ছিলো তার সঙ্গী। তার মা ছিলো না, এখন সে যেখানে শুয়ে আছে সেখানে শুয়েই তার মা মরেছিলো। কাশতে কাশতে থুথু ফেলতে ফেলতে, যন্ত্রণায় কাৎরে কাৎরে, ভয়ঙ্কর মৃত্যু। কুট্টাপ্পেনের মনে আছে মরার আগেই তার পা দু'টো কেমন করে মরে গিয়েছিলো। গায়ের চামড়া কেমন ধূসর হয়ে উঠেছিলো। সে দেখেছিলো কেমন ভয়ঙ্করভাবে মৃত্যু নিচে থেকে ওপরে এগিয়ে আসছিলো তার মা'র দিকে। কুট্টাপ্পেনের ল্যাঙড়া পা পর্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। মাঝে মাঝে সে ছোট একটা লাঠি দিয়ে খোঁচাতো, লাঠিটা সে রাখতো সাপখোপ তাড়ানোর জন্যে। পায়ে তার কোনো সাড়া ছিলো না শুধু চোখে দেখেই বুঝতো যে ওগুলো তার শরীরের সঙ্গে লেগে আছে। আর ওগুলো তারই।

চেল্লা মরার পর তার জায়গা হয়েছিলো ঐ কোণায়। কুট্টাপ্পেনের মনে হতো তার ঘরের এই কোণাটা মৃত্যুর জন্যে রাখা হয়েছিলো তার মৃত্যুর ঘটনাটার জন্যেও। একটা কোনা রান্নার জন্যে। একটা কাপড় চোপড়ের জন্যে, একটা বিছানাপত্র রাখার জন্যে, একটা মরার জন্যে।

তার আশ্চর্য লাগত কত সময় লাগাচ্ছে সে, সে ভেবে পেত না, যে সব লোকের বাড়িতে চারটের বেশি কোণা আছে তারা ওগুলোকে কি কাজে লাগায়। তারাও কি মরার জন্যে একটা কোণা রেখে দেয়?

কারণ ছাড়াই তার মনে হতো তার পরিবারে তার মায়ের পর সেই মরবে, তবে সে অন্য কথাও জেনেছিলো খুব তাড়াতাড়ি।

কখনও কখনও (স্বভাবের জন্যে কিংবা মাকে মনে পড়ার জন্যে), কুট্টাপ্পেন মায়ের মতো করে কাশতো। তার শরীরের ওপর দিকটা বড়শিতে গাঁথা মাছের মতো লাফাতো। শরীরের নিচের দিকটা ছিলো শিলের মতো ভারি, মনে হত যেন অন্য কারুর। মৃত কারুর, যার আত্মা ফাঁদে আটকে পড়েছে– যেতে পারছে না কোথাও।

ভেলুথার মতোই কুট্টাপ্পেনও ছিলো ভাল নির্বিরোধী পারাভান। লেখাপড়া কিছুই জানত না। সে তার শক্ত বিছানায় শুয়ে থাকতো আর ওপর থেকে ঝুল, কুটো-কাটা খসে পড়তো, তার ঘামের সঙ্গে লেগে থাকতো। মাঝে মাঝে পিঁপড়ে বা

পোকামাকড়ও পড়তো। বাজে দিনগুলোতে কমলা রঙের দেয়ালগুলো যেন হাত ধরাধরি করে তার দিকে চেপে আসতো। কবিরাজের মতো ঝুঁকতো আস্তে আস্তে আলগোছে কিন্তু তার দম আটকে আসতো আর সে চীৎকার করে উঠতো। মাঝে মাঝে তারা দূরেও সরে যেতো তখন ঘরটাকে মনে হতো অনেক বড় সেটাও তাকে ভয় ধরাতো নিজেকে তখন সে খুঁজে পেতো না। সে কেঁদে উঠতো।

তার জন্যে যখন জিনিসপত্র আসতো তখন সে দামী রেস্তোরাঁর লোভী ওয়েটারের মতো (যারা সিগারেট ধরিয়ে দেয়, গ্লাস ভরে দেয়) হয়ে যেতো। কুট্টাপ্পেন মনে করতো পাগলরা হলো তার আসল শত্রু। সে জানতো তার ল্যাংড়া পা সারাতে কি দরকার।

যমজরা নৌকাটা নামিয়ে রাখলো। ভোঁতা খটখটে আওয়াজটা মিলে গেলো ভেতরের নিস্তব্ধতার সঙ্গে।

কুট্টাপ্পেন ভাবেনি কেউ আসবে।

এসথা আর রাহেল দরজাটা পুরো খুলে ফেললো, ভিতরে ঢুকলো। তারা ছোট হলেও দরজার নিচে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঝুঁকে যেতে হলো। কুপিটার কাছে অপেক্ষা করতে লাগলো বোলতাটা।

'আমরা।'

ঘরটা ছিলো অন্ধকার কিন্তু পরিচ্ছন্ন। মাছের ঝোল আর কাঠ পোড়া গন্ধ ছিলো। জ্বরের মতো গরম লাগছিলো তবে মাটির মেঝেটা ঠাণ্ডা লাগছিলো রাহেলের খালি পায়ে। ভেলুথা আর ভিল্লে পাপেনের বিছানা গোটানো ছিলো এক কোণায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে। নিচু একটা রান্নার তাকে ছিলো অনেক মাটির পাত্র, নারকেল মালার ওখড়া আর তিনটে ঘন নীল বর্ডার দেওয়া এনামেলের থালা। কোন বড় মানুষ কেবল ঘরের মাঝখানেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো। আর একটা ছোট দরজা ছিলো পিছনের উঠোনে যাওয়ার জন্যে। ওখানে আরও কলাগাছ ছিলো, তার পিছনেই ছিলো কুলকুল করে বয়ে যাওয়া নদী। পিছনের উঠোনে রাখা ছিলো কাঠমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি।

কোনও চাবি আলমারী কিংবা তালা ছিলো না।

পিছনের দরজা দিয়ে কালো মুরগীটা পালিয়ে গেলো আর খচ্‌মচ্‌ করে ঘুরতে লাগলো পিছনের উঠোনে। ওখানে ছিলো কাঠের একটা আধভাঙা তাক। মুরগীটা যেন তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্যে ওটার ওপর উঠে হাতুড়ি বাঁটালি, স্ক্রু পেরেকের মধ্যে ঠ্যাঙ তুলে তুলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

'আইয়ো মন! মল! কি ভাবছো তুমি? এটা হলো কুট্টাপ্পেনের ঝুপড়ি' একটা খসখসে গলা বলে উঠলো।

অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে যমজ দু'টোর সময় লাগলো। অন্ধকার কমে গেলে কুট্টাপ্পেনকে দেখা গেলো তার বিছানায়। আবছায়ায় যেন একটা প্রেত, যার চোখের

সাদা অংশটা ঘন হলুদ। তার পায়ের পাতা বেরিয়েছিলো কাপড়ের নিচে থেকে। বহু বছর আগে যে সে খালি পায়ে হাঁটতো তার হালকা কমলা রঙের চিহ্ন ছিলো পায়ে। গোড়ালিতে ছিলো দড়ির গিঁঠের ধূসর চিহ্ন, (সব পারাভানের পায়েই এমন দাগ ছিলো, নারকেল গাছে ওঠার জন্যে দড়ি বাঁধার জন্যে ওরকম হতো)।

তার পিছনের দেয়ালে ছিলো একটা ক্যালেন্ডার। যিশু খৃস্টের ছবিওয়ালা। ঠোঁট রাঙানো ছিলো লিপস্টিকে আর গায়ের কাপড়ে ছিলো মণি মুক্তো। ক্যালেন্ডারে নিচের দিকে যেখানে তারিখ থাকে সেখানটা ছিঁড়ে ঝুলছিলো। ছোটখাটো যিশু বারো ভাঁজের পেটিকোট পরা, বছরের বারোটা মাসের জন্যে। একটাও ছেঁড়া হয়নি।

এইমেনেমের বাড়ি থেকে আনা আরও কিছু জিনিস ছিলো ওখানে, হয় ওগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো কিংবা আবর্জনার স্তূপ থেকে কেউ কুড়িয়ে এনেছিলো। গরীবের বাড়িতে দামি জিনিস। একটা ঘড়ি, চলতো না। একটা ফুলের নক্সা করা বাতিল কাগজের ঝুড়ি। পাপাচির পুরনো ঘোড়ায় চড়ার জুতো (বাদমী সবুজ তলাওয়ালা) যাতে তখনও চর্মকারের চিহ্নটা ছিলো। বিস্কুটের টিনে ছিলো ইংল্যান্ডের দুর্গের ছবি আর ঘাগরা এবং আংটি পরা মেয়েদের ছবি।

একটা ছোট পোস্টার (বেবি কোচাম্মা ওটা দিয়ে দিয়েছিলেন কারণ এক কোণায় ছাতা ধরে গিয়েছিলো) যিশুর ছবির পাশে ঝুলছিলো। ক'টা চুলের একটা বাচ্চা, চিঠি লিখছে তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, ছবিটার নিচে লেখা :

'আমি লিখতে চাচ্ছি, তোমাকে আমার মনে পড়ছে।'

তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো সদ্য চুল কেটে এসেছে আর ভেলুথাদের পিছনের উঠোনে যে কাঠের লালচে ছিলকাগুলো পড়েছিলো সেগুলো যেন ছিলো ওর কটা চুল।

একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের টিউব ছোঁড়া কাপড়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলো একটা কাঁচের বোতলে, ওতে ছিলো হলেদেটে তরল। দরজা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছিলো ওতে হলদে তরল ক্রমশ বাড়ছিলো। ওটা দেখে রাহেলের মনে প্রশ্ন জাগলো। সে মাটির কুঁজো থেকে স্টিলের বাটিতে জল ঢেলে দিলো তাকে। কুট্টাপ্পেন মাথা উঁচু করে খেলো, খানিকটা জল গড়িয়ে পড়লো তার থুতনি দিয়ে।

যমজরা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসলো, যেমন এইমেনেমের বাজারে লোকজন বসে।

ওরা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসেছিলো। নৌকার চিন্তা ছাপিয়ে কুট্টাপ্পেন ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'চাকো সা-আর'—এর মল কি এসেছে? কুট্টাপ্পেন প্রশ্ন করলো।

'এসেছে তো' রাহেল বললো উদাসভাবে।

'কোথায় সে?'

'কে জানে? নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে। আমরা জানি না।'

'আমার কাছে তাকে আনতে পারো?'

'পারবো না' রাহেল বললো।

'কেন না?'

'ওকে ঘরের মধ্যে থাকতে হয়। খুব নরম। একটু ময়লা লাগলেই ও মরে যাবে।'

'তাই নাকি।'

'আমাদের সঙ্গে ওকে আসতে দিতো না...আর তাকে দেখার কিছু নেই,' রাহেল কুট্টাপ্পেনকে আশ্বস্ত করলো।' ওর চুল আছে, পা আছে, দাঁত আছে– যেমন যেমন থাকে, শুধু একটু লম্বা। আর ওইটুকুই সে ছাড় দিলো।

'এই-ই?' কুট্টাপ্পেন ব্যাপারটা ধরে ফেললো তাড়াতাড়ি।

'আর কিছু নেই তাকে দেখার মতো?'

'আচ্ছা কুট্টাপ্পা কোন ভল্লুম যদি ফুটো হয়ে যায় তাহলে কি সারানো খুব কঠিন?' এসথা প্রশ্ন করলো।

'তা না,' কুট্টাপ্পেন বললো, 'দেখতে হবে। কোথায় কার ভল্লুম ফুটো হয়েছে?'

'আমাদের–আমরা পেয়েছি দেখবে তুমি ওটা।'

ওরা বাইরে গিয়ে ওল্টানো নৌকাটা নিয়ে ফিরে এলো, অসাড় মানুষটাকে দেখানোর জন্যে ওর মাথার ওপর ধরলো ছাদের মতো। জল ঝরে পড়ল ওর ওপর।

'আগে আমাদের ফুটোগুলো খুঁজে বের করতে হবে।'

কুট্টাপ্পেন বললো। তারপর ওগুলোকে বন্ধ করতে হবে।

'তারপর শিরীষ কাগজ' এসথা বললো, 'তারপর রঙ করা।'

'তারপর বৈঠা,' রাহেল বললো

'তারপর বৈঠা,' এসথা একমত হলো।

'তারপর চালাবো,' রাহেল বললো।

'কোথায় যাবে?' কুট্টাপ্পেন প্রশ্ন করলো।

'এখানে ওখানে,' এসথা তাড়াতাড়ি বললো।

'দেখেশুনে যাবে' কুট্টাপ্পেন বললো, 'আমাদের এই নদীটা সব সময় এমন থাকে না।

'কি হয়?' রাহেল প্রশ্ন করলো।

'ওহ্...ছোট গীর্জার মতো আম্মুমন, ঠাণ্ডা পরিষ্কার।

...সকালে খায় ইডি আপ্পান, দুপুরে খায় কিনিজ আর মিন, নিজের মতো চলে। ডানে বাঁয়ে তাকায় না।

'আর সত্যি সে?'

'সত্যি জংলী একটা...আমি রাতে শুনেছি, জ্যোৎস্না রাতে তেজ বেড়ে যায়। তাড়াহুড়ো করে। ওর ব্যাপারে সবসময় সাবধান থাকবে।'

'আর আসলে সে কি খায়?'

আসলে খায়? ওহ্... স্টু...আর...' ইংরেজি শব্দ দিয়ে সে বোঝাতে চাইলো পাজি নদীটার স্বভাব।

'আনারসের টুকরো'...রাহেল বললো।

'হ্যাঁ ঠিক! আনারসের টুকরো আর স্টু। *আর* ও হুইস্কি খায়।'

'আর ব্র্যান্ডি।'

'আর ব্র্যান্ডি, সত্যি?'

'আর তাকায় ডানে আর বাঁয়ে।'

'সত্যি।'

'অন্যদের কাজে নাক গলায়...'

মাটির উঁচু নিচু মেঝের ওপর পড়ে থাকা নৌকাটা বাওয়ার জন্যে এসথা বাড়ির পিছন থেকে কয়েকটা কাঠের টুকরো নিয়ে আসলো। রাহেলকে সে দিলো একটা কাঠের হাতলওয়ালা আধখানা নারকেল মালা দিয়ে তৈরি ওখড়া।

যমজরা ভল্লুমের ওপর চড়ে বসলো, তারা দাঁড় চালাতে লাগলো। কল্পনার জলের মধ্যে।

মুখে বলতে লাগলো *হেইই, থেই থাকা, থেইই থেইই থোম* এবং মণিমুক্তো পরা যিশু দেখতে লাগলো।

এসথা জলের ওপর দিয়ে হেঁটেছিলো। কল্পনায়। তবে মাটিতে সাঁতারও কেটেছিলো হয়তো?

ম্যাচ করা নিকার আর চোখে চশমা পরে, লাভ ইন টোকিওতে ঝর্না আটকে। চোখা জুতো আর এলোমেলো চুলওয়ালা একটা মাথা। কি কল্পনা যে তার ছিলো!

কুট্টাপ্পেনের কিছু লাগবে কিনা দেখতে ভেলুথা আসলো। দূর থেকেই সে শুনতে পাচ্ছিল দাঁড়িদের গান। বাচ্চাদের গলায় ফুর্তি আর ছন্দ দু'ই ছিলো।

হে বাঁদর বাবা
*তোমার **পাছা** কেন লাল হে?*
*মাদ্রাজে গেলাম **হাগতে***
*হাগতে হাগতে **রক্ত** বের হল ছিঁড়ে ফোড়ে*

কিছুক্ষণের সুখ, অরেঞ্জড্রিঙ্ক লেমনড্রিঙ্কম্যান তার হলুদ হাসি থামিয়ে চলে গেলো। গভীর জলে ডোবার ভয় পেয়ে বসলো। কুকুরের মতো ঘুম। ঘুম থেকে উঠেই কাজে লেগে পড়া।

মার্কসবাদী লাল পতাকাটা দরজার পাশে ফুল গাছের মতো নড়তে দেখে মুচকি হাসলো ভেলুথা। ঘরে ঢোকার জন্যে তাঁকে ঝুঁকতে হলো। গরম দেশের এস্কিমো। বাচ্চাগুলোকে দেখেই তার ভিতরটা ধক্ করে উঠলো। এবং সে তখন কিছুই বুঝতে পারছিলো না। প্রত্যেকদিন ওদের সে দেখে। ওদের ভালবাসে কেন সে তা জানে

না। কিন্তু হঠাৎ সব অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন। ইতিহাস খুব বাজে একটা পিছল খেয়েছে। আগে এরকম দুশ্চিন্তা কখনও তার হয়নি।

তার (স্ত্রী লিঙ্গে) বাচ্চারা। একটা অপরাধী ফিসফিসানি সে শুনতে পেলো।

তার চোখ, তার মুখ, তার দাঁত।

তার নরম উজ্জ্বল চামড়া।

বেশ রেগে চিন্তাটাকে সে তাড়ালো। বেরিয়ে দাওয়ার ওপর বসলো। কুকুরের মতো।

হাহ! তার ছোট্ট অতিথিদের বললো, 'এসব মাছ ধরা লোকগুলোর পরিচয়?'

'এসথা পাপ্পিয়াচেন কুট্টাপ্পেন পিটার মন। মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস প্লিজেটোমিটয়্যু।' রাহেল তার ওখড়াটা তুলে ধরে খুশিতে নাচাতে লাগলো।

খুশিতে নাচাচ্ছিলো ওটা, তার আর এসথার।

'আর আমি তাদের নৌকা থেকে নামতে বলতে পারি?'

'আফ্রিকা থেকে?' রাহেল চীৎকার করে বললো।

'চেঁচানো বন্ধ কর,' এসথা বললো।

ভেলুথা নৌকাটার চারদিকে ঘুরলো। কোথায় ওটা পেয়েছে ওরা খুলে বললো।

'তাহলে এটা কারুর না।' রাহেল বললো একটু থতমত খেয়ে।

তার মনে হলো এটা বলা উচিত। 'আমাদের পুলিশকে জানানো উচিত।'

'হাঁদার মতো বকিস না' এসথা বললো।

ভেলুথা নৌকার কাঠে টোকা মারল তারপর নখ দিয়ে খুঁটে খানিকটা নরম কাঠ তুললো।

'ভাল কাঠ,' সে বললো।

'ডুবে যায়,' এসথা বললো, 'ফুটো আছে।'

'আমাদের এটা ঠিক করে দেবে ভেলুথা পাপ্পিয়াচাচেন পিটার মন?' রাহেল প্রশ্ন করলো।

'আমাদের দেখতে হবে' ভেলুথা বললো, 'নদীতে গিয়ে বোকার মতো খেলো আমি তা চাই না।'

'যাব না কথা দিচ্ছি। তুমি সঙ্গে থাকলে তবে যাব।'

'আগে দেখতে হবে ফুটোগুলো কোথায়...' ভেলুথা বললো।

'তারপর ওগুলো বন্ধ করতে হবে।' যমজ দু'টো একসঙ্গে বলে উঠলো নামতা পড়ার মতো।

'ক'দিন লাগবে?' এসথা জিজ্ঞাসা করলো।

'একদিন' ভেলুথা বললো।

'*একদিন!*' আমি মনে করেছিলাম এক মাস।

এসথা। খুশিতে নাচতে নাচতে ভেলুথার ওপর চড়াও হলো, দু'পা দিয়ে তার কোমর পেঁচিয়ে ধরে চুমু খেলো। শিরীষ কাগজকে সমান দু'ভাগে ভাগ করা হলো,

যমজ দুটো কাজে লেগে গেলো। কোনদিকে তাদের আর খেয়াল রইলো না। নৌকার গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সারা ঘরে। চুল, চোখের পাতায় গিয়ে জমা হলো। কুট্টাপ্পেনের ওপর মেঘের মতো ভাসতে লাগল, যিশুর ওপর অর্ঘ্যের মতো। ভেলুথা তাদের হাত থেকে শিরীষ কাগজ কেড়ে নিলো।

'এখানে না' জোরেই বললো সে, 'বাইরে'।

নৌকাটা উঠিয়ে নিয়ে বাইরে এলো পিছন পিছন যমজ দু'টো। চোখ ছিলো নৌকার দিকে মনও ছিলো। অনাহারি কুকুরের বাচ্চার মতো অবস্থা হয়েছিলো ওদের।

ভেলুথা নৌকাটাকে তাদের জন্যে ঠিকমতো সাজিয়ে দিলো। যে নৌকাটার ওপর এসথা বসেছিলো আর রাহেল আবিষ্কার করেছিলো। ভেলুথা দেখিয়ে দিলো কি করে কাঠের আঁশ দেখে শিরীষ ঘষতে হয়। ও তাদের ঘষতে দিয়ে চলে গেলো। সে যখন ঘরে গেলো কালো মুরগীটাও গেলো পিছন পিছন যেন বুঝতে পেরেছিলো নৌকাটা ঘরে নেই।

মাটির হাঁড়িতে রাখা জলে গামছা ভিজিয়ে নিঙড়ে (শক্তি দিয়ে যেন না চাওয়া চিন্তা) কুট্টাপ্পেনের হাতে দিলো তার মুখ আর গলার ময়লা পরিষ্কার করতে।

'ওরা কিছু বলেছে?' কুট্টাপ্পেন জিজ্ঞাসা করলো, 'মিছিলে তোকে দেখার ব্যাপারে।'

না ভেলুথা বললো 'এখনও বলেনি ওরা জানে'।

'সত্যি নাকি'?

ভেলুথা কাঁধ ঝাকালো গামছাটা সরিয়ে নিয়ে ধুলো ঝাড়লো তারপর । আছড়ালো আর ঘোরালো। মন ছিলো তার ক্ষিপ্ত, অসংযত।

চেষ্টা করলো তাকে ঘৃণা করতে।

'ওদেরই একজন' মনে মনে বললো সে, *'ওদের মতোই আর এক নারী।'*

কিন্তু পারলো না।

সে যখন হাসে তখন গভীর টোল পড়ে। তার চোখ সবসময় থাকে উদাস।

পাগলামী উঠে আসলো ইতিহাসের মধ্যে থেকে। এক লহমায়।

এক ঘণ্টা শিরীষ ঘষার পর রাহেলের মনে পড়লো তার দুপুরের ঘুমের কথা। উঠে দৌড় দিলো। সবুজ বিকালের গরমের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে লাগলো। পিছন পিছন আসছিলো তার ভাই আর একটা হলুদ বোলতা।

মনে মনে বলছিলো আম্মু যেন এখনও না জেগে ওঠে যেন বুঝতে না পারে সে বাইরে গেছে।

১১

ক্ষুদে জিনিসের দেবতা

সেই বিকেলে, আম্মু স্বপ্নের মধ্যে কোথায় চলে গিয়েছিলো। এক হাসিখুশি পুরুষকে দেখছিলো সে, একহাতে তাকে শক্ত করে ধরেছিলো, একটা লণ্ঠন আলো ছড়াচ্ছিলো। আর একটা হাত তার ছিলো না। মেঝেয় নাচতে থাকা ছায়াগুলোকে সে সরাতে পারছিলো না।

ছায়াগুলোকে কেবল সে একাই দেখছিলো।

চামড়ার নিচে তার মাংসপেশীর ভাঁজগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো চকোলেটের টুকরো ভাগ করার খাঁজগুলোর মতো।

সে তাকে নিবিড়ভাবে ধরেছিলো লণ্ঠনের আলোয়, তাকে এত উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল, যেন মোম দিয়ে পালিশ করা হয়েছিল তার পুরো শরীর।

একবারে সে কেবল একটা কাজই করতে পারছিলো।

যখন সে তাকে ধরেছিলো তখন চুমু খেতে পারছিলো না। যখন চুমু খাচ্ছিলো তখন তাকে দেখতে পারছিলো না। যখন সে তাকে দেখছিলো তখন আর অনুভব করতে পারছিলো না।

আম্মু আঙুল দিয়ে আলতো করে তাকে ছুঁয়েছিলো আর অনুভব করছিলো তার মসৃণ শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে। সে কেবল তাঁর মেদহীন পেটেই তার আঙুলগুলো বোলাচ্ছিল। উদাসভাবে চকোলেটের খাঁজগুলোর ওপর দিয়ে। সে অনুভব করছিলো শিরশিরানিতে লোমকূপ কাঁটা দিয়ে উঠে ছাল ছাড়ানো হাঁসের চামড়ার মতো গুটি গুটি নক্সা ফুটে উঠছে, ব্ল্যাকবোর্ডে চকের দাগের মতো পাতলা, ধান ক্ষেতে বাতাসের একটা ঝাপটার মতো, স্বচ্ছ নীল আকাশে জেট প্লেনের ধোঁয়ার মতো। খুব সহজেই তার পারার কথা কিন্তু পারছিলো না।

লোকটার পারার কথা কিন্তু সে করেনি, কারণ লণ্ঠনের পিছনে আলো আঁধারিতে ছায়ার মধ্যে ছিলো লোহার ভাঁজ করা চেয়ার সাজানো, একটা মঞ্চ ঘিরে। চেয়ারগুলোয় লোক ছিলো দামি সানগ্লাস চোখে তারা দেখছিলো। তারা সবাই থুতনিতে চেপে ধরেছিলো বেহালা, সবার মাথা একই দিকে বেঁকেছিলো। সবাই

পায়ের ওপর পা তুলে বসেছিলো। ডান পার ওপর বাঁ পা। আর তাদের সবার বাঁ পা কাঁপছিলো।

কারুর কারুর কাছে ছিলো খবরের কাগজ। কারুর কাছে ছিলো না। কেউ কেউ থুথুর বুড়বুড়ি তুলছিলো। কেউ কেউ না। তবে সবার চোখের চশমার দু'টো কাঁচেই লণ্ঠনের আলোর প্রতিফলন পড়েছিলো।

ফোল্ডিং চেয়ারের বৃত্তের বাইরে সমুদ্র সৈকতে পড়েছিলো অনেক ভাঙা নীল কাঁচের বোতল। নিঃশব্দ ঢেউগুলো আরও বোতল নিয়ে আসছিলো ভাঙার জন্যে। পুরনোগুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। কাঁচের ওপর কাঁচ রাখার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হচ্ছিলো। একটা পাথরের ওপর সাগরের মধ্যে নীলাভ আলো ছিলো। ওখানে ছিলো একটা মেহগনি আর বেতের রকিং চেয়ার। ভাঙা।

সাগর ছিলো কালো, সবুজ ফেনা উঠছিলো।

মাছ খাচ্ছিল ভাঙা কাঁচ।

রাতের শরীর জলে জিরিয়ে নিচ্ছিলো। খসে পড়া তারা এক পলকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলো।

মথরা আকাশে উড়ছিলো। চাঁদ ছিলো না। পুরুষটি সাঁতরাচ্ছিলো এক হাতে। সে তার দু'হাত দিয়ে।

পুরুষটির চামড়া ছিলো নোনা। তারটাও।

লোকটার পায়ের ছাপ পড়ছিলো না বালিতে, জলে কোন তরঙ্গও না, আয়নায় ছায়াও না।

মেয়েটি শুধু পারতো তাকে আঙুল দিয়ে ছুঁতে কিন্তু সে করেনি।

তারা শুধু এক সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলো।

সোজা হয়ে।

গায়ে-গা লাগিয়ে।

পাউডারের মতো রঙের এক ঝলক বাতাস মেয়েটির চুল উড়িয়ে নিয়ে লোকটির হাতহীন কাঁধে জড়িয়ে দিলো শালের মতো, তারা পড়ে থাকলো পাথরের মতো।

পিছনের হাড় বের হওয়া একটা রোগা লাল গরু কোত্থেকে এসে সোজা সাগরে নেমে গেলো, শিং না ভিজিয়ে সাঁতরাতে লাগলো, পিছনে তাকালো না।

আম্মু স্বপ্নের গভীরে তলিয়ে গিয়েছিলো, যেন উড়ে যাচ্ছিলো ডানা ঝাপটে নিচে আরও নিচে। এক সময় থামলো বিশ্রাম নিতে তাও স্বপ্নের চাঁদোয়ার নিচেই।

শুজনীর সুতোর কাজ করা নীল গোলাপের ওপর তার গাল চেপে ছিলো।

মনে হলো বাচ্চাদের মুখ স্বপ্নের ওপর দিয়ে তার ওপর ঝুঁকে আছে। দু'টো কালো চাঁদের মতো, ঢোকার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সে শুনতে পেলো, 'তোর মনে হয় ও মরে যাচ্ছে?' রাহেল ফিস ফিস করে বললো এসথাকে।

'বিকেলের দুঃস্বপ্ন' সবজান্তা এসথা উত্তর দিলো 'অনেক স্বপ্ন দেখছে।'

সে যখন তাকে স্পর্শ করছিলো তখন কথা বলতে পারছিলো না, যখন আদর করছিলো তখন ছাড়াতে পারছিলো না, যখন কথা বলছিলো তখন শুনতে পাচ্ছিল না, লড়াই করছিলো কিন্তু জিততে পারছিলো না।

একহাতওয়ালা পুরুষ কে সে? কে হতে পারে? হারানোর দেবতা? ক্ষুদে জিনিসের দেবতা? শরীর কাঁটা দেওয়া আর মুচকি হাসির দেবতা? পবিত্র গন্ধ আসছিলো– বাসের রডের গন্ধের মতো, ওগুলো ধরার পর বাস কন্ডাক্টারের হাতে কেমন গন্ধ হয়?

'জাগাবো?' এসথা বললো।

শেষ বিকেলের একটা আলোর রেখা ঘরে ঢুকে পড়েছিলো পর্দার ফাঁক দিয়ে। আলো পড়েছিলো আম্মুর ছোট্ট ট্র্যানজিস্টার রেডিওটার ওপর। ওটা নিয়ে আম্মু নদীতে যেতো। (ছোট্ট হওয়াতেই ওটাকে "*দ্য সাউণ্ড অব মিউজিক*" সিনেমা দেখার সময় নিয়ে গিয়েছিলো এক হাতে করে)।

সূর্যের আলোর রেখা এসে পড়েছিলো আম্মুর এলো চুলে। সে অপেক্ষা করছিলো স্বপ্নের চাঁদোয়ার নিচে, তার বাচ্চাদের ওর মধ্যে ঢোকার জন্যে নয়।

'ও বলেছে স্বপ্ন দেখা মানুষকে হঠাৎ জাগাতে নেই,' রাহেল বললো 'হার্ট এ্যাটাক হতে পারে।'

মনে মনে ওরা ঠিক করে নিলো হঠাৎ জাগানোর চেয়ে অন্যভাবে বিরক্ত করবে। তাই ওরা ড্রয়ার খুলে বন্ধ করলো, গলা খাঁকারি দিলো, জোরে ফিসফিসালো, গুনগুন করে গান গাইলো। জুতো সরালো, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করা আলমারীর দরজাটা খুললো।

আম্মু স্বপ্নের চাঁদোয়ার নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলো, টের পাচ্ছিলো আর ওদের জন্য তার ভালোবাসার যন্ত্রণা হচ্ছিলো।

এক হাতওয়ালা পুরুষটা লণ্ঠনটা নিভিয়ে হেঁটে চলে গেলো, ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে থাকা বেলভূমি মাড়িয়ে, ঢুকে গেলো ছায়ার মধ্যে যে ছায়া কেবল সেই দেখছিলো।

বেলভূমিতে কোন পায়ের ছাপ পড়েনি।

ভাঁজকরা চেয়ারগুলো ভাঁজ করাই ছিলো। কালো সাগরটা ছিলো মসৃণ। ঢেউগুলোকে যেন ইস্ত্রি করা হয়েছিলো। ফেনায়িত বোতলগুলোর মুখ আবার আঁটা হয়েছিলো।

রাতটা জানান না দিয়েই শেষ হয়ে গেলো।

আম্মু চোখ মেললো।

বিরাট একটা অভিযান শেষ করলো সে, এক হাতওয়ালা পুরুষটার আদল মাথা থেকে তার একরকম দেখতে দুই-ভ্রূণের যমজ পর্যন্ত।

'তুমি বিকেলের দুঃস্বপ্ন দেখছিলে,' তার মেয়ে জানালো তাকে।

'দুঃস্বপ্ন না' আম্মু বললো, স্বপ্নই।

'এসথা ভেবেছিলো তুমি মরে যাচ্ছ।'

'তোমাকে খুব খারাপ লাগছিলো,' এসথা বললো।

'আমি ভালোই ছিলাম,' আম্মু বললো, তবে বুঝলো কি হয়েছিলো।

'তুমি যদি স্বপ্নে সুখী থাক তাহলে কি তার হিসাব হবে?' এসথা প্রশ্ন করলো।

'কিসের হিসাব?'

'সুখ—তার হিসাব?'

সে বুঝতে পারছিলো ওকি বলতে চায়, তার ছেলেটা এক লহমায় পেকে গেছে।

কারণ আসল কথাটা হলো, হিসাবের হিসাব হওয়াটা।

সহজ হলো বাচ্চাদের ইচ্ছেমতো ভাবতে দেওয়া।

মাছ খাওয়ার স্বপ্ন দেখলে তার কি হিসাব হয়? এর মানে কি তুমি মাছ খেয়েছো? পদচিহ্নহীন এক সুখী পুরুষ—তার হিসাব কি?

আম্মু কাত হয়ে ছোট্ট ট্রানজিস্টার রেডিওটা নিলো, বোতাম চেপে খুলে দিলো, *"চেম্মিন"* সিনেমার গান বাজাছিলো।

একটা গরীব মেয়ের কাহিনী। যাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাগর তীরের জেলে পাড়ার এক জেলের সাথে আর সে ভালোবাসত অন্য একজনকে। জেলেটি যখন জানতে পারলো তার বউয়ের পুরনো প্রেমিকের কথা তখন সে ছোট্ট একটা নৌকা নিয়ে সাগরে ভেসে পড়লো, যদিও সে জানতো একটা ঝড় উঠে আসছে। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছিলো, জোরে বাতাস বইছিলো। সাগর জলে পূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। ঝড়ের বাজনা বাজছিলো, জেলেটা ডুবে যাচ্ছিল। ঝড়ের চোখের মধ্যেখানে পড়েছিলো সে, ঘূর্ণী তাকে টেনে নিয়ে গেলো সাগরের তলায়।

আর প্রেমিকরা ঠিক করলো আত্মহত্যা করবে। পরদিন সকালে সৈকতে পাওয়া গেলো জড়াজড়ি করে পড়ে থাকা তাদের লাশ। সবাই মারা গেলো, জেলে তার বউ, বউয়ের প্রেমিক আর একটা হাঙ্গর, কাহিনীতে যার কোন ভূমিকা ছিলো না তবে মরেছিলো। সাগর সবাইকেই নিয়েছিলো।

আলো এসে পড়ছিলো শুজনীর নীল সুতোর কাজের ওপর তার ঘুমে ভারি হয়ে থাকা গালে দাগ বসে গিয়েছিল নীল গোলাপের। আম্মু আর তার যমজরা (দু'টো বসেছিল দু'দিকে) ছোট্ট রেডিওটার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিল। গানটা ছিলো জেলেবস্তির মেয়েটার, যাকে বউ সাজিয়ে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে। যাকে সে ভালোবাসে না।

পওরু মুঙ্কভান মুথিনু পোই

(এক সময় এক জেলে গিয়েছিলো সাগরে)

পাখিমজারান কাট্টথু মুনজি পোই

(পশ্চিমের বাতাস উঠলো আর তার নৌকাটাকে গিলে ফেললো)

একটা এয়ারপোর্টফ্রক দাঁড়িয়েছিলো মেঝেয়, কুঁচিগুলো ফুলেছিলো। বাইরে মাঠে মাড় দেওয়া সারি সারি শাড়ী শুকাচ্ছিল। মরা-সাদা আর সোনালী। কাপড়ের মাড় শুকিয়ে জায়গায় জায়গায় ফুলে ছিলো, কিছুক্ষণ পর ওগুলোকে ঝেড়ে ঝুড়ে তোলা হবে, নিয়ে যাওয়া হবে ইস্ত্রি করার জন্যে।

আরিয়াথি পেন্নু পিঝাচি পোই
(তার বউ সাগরের তীরে খুঁজে বেড়ায়)

এট্টুমানুরে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে মারা হাতিটাকে (কচু থোমবাজ নয়) পোড়ানো হয়েছিলো। বড় রাস্তার পাশে একটা শ্মশান বানানো হয়েছিলো। পৌরসভার ইঞ্জিনিয়াররা হাতিটার দাঁতদু'টো কেটে নিয়েছিলো অবৈধভাবে, টুকরো টুকরো করে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলো। সমান ভাগ করেনি। আশিটা ঘি'র টিন ঢালা হয়েছিলো হাতি পোড়ানো আগুন তৈরির জন্যে। ঘন ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠেছিলো আকাশে নিরাপদ দূরত্বে লোকজন ভীড় জমিয়েছিলো, তাদের মনে হয়েছিলো,

ওখানে অনেক মাছি ছিলো।

অভানেই কাদালাম্মা কোন্ডু পোই
(সাগর মা উঠে এসে তাকে নিয়ে গিয়েছিল)

অস্পৃশ্যদের ঘুড়িগুলো আশপাশের গাছের ডালগুলোয় আটকে ছিলো, যেন ওগুলো হাতির মড়া পোড়ানোর তত্ত্বাবধানকারীদের ওপর নজর রাখছিলো। তাদের ধারণা ছিলো ভিতরের জিনিসপত্রগুলোও বড় বড় হবে, কারণ ছিলো, জন্তুটা তো কম বড় ছিলো না। একটা বিশাল পিত্তথলি কিংবা বিরাট একটা পিলে।

ওরা বিরক্ত হয়নি। আবার সন্তুষ্টও হয়নি।

আম্মু দেখলো তার দু'টো বাচ্চার গায়েই গুঁড়ো গুঁড়ো কী সব লেগে আছে। মনে হচ্ছিলো কেকের ওপর চিনির দানা ছড়ানো। রাহেলের কালো চুলে একটা লালচে সরু ছিলকা লেগে ছিলো। ভেলুথার পিছনের উঠোনের বস্তু। আম্মু ওটা খুঁটে তুললো।

'আমি তোদের আগেই বলেছি' সে বললো 'ওর বাড়িতে যাবি না একটা কিছু ঝামেলা হবে।'

কি ঝামেলা সে বলেনি। সে জানতও না।

যাই হোক সে তার নাম উচ্চারণ করেনি। সে জানতো, সেই নীল সেলাইয়ের ফোঁড় তোলা বিকেলে ছোট্ট ট্রানজিস্টারে বাজা গানের মধ্যে তাকে টেনে এনেছে। সে ভাবলো তার নাম না নিয়ে সে তার স্বপ্ন আর পৃথিবীর মধ্যেকার একটা চুক্তি

ভেঙেছে। সেই চুক্তির ধাত্রী হয়তো ছিলো এই কাঠের গুঁড়ো মাখা তার দু'টো যমজ বাচ্চা।

সে জানতো কে ছিলো সে– হারানোর দেবতা, ক্ষুদে জিনিসের দেবতা। সে *ঠিকমতোই* চিনেছিলো।

ছোট্ট রেডিওটা বন্ধ করে দিলো সে। বিকেলের বিশুদ্ধতা (আলোর শেষ রেখায় নক্সা তোলা), তার বাচ্চাদের জড়িয়ে ধরার উষ্ণতা। তার নিজের ঘ্রাণ। ওরা তার চুল দিয়ে নিজেদের ঢেকে রেখেছিলো। ওদের ধারণা হয়েছিলো ঘুমের মধ্যে সে ওদের রেখে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলো। ছোট ছোট হাতের নির্দেশে সে ফিরে এসেছে। হাতগুলো তখন খেলছিলো তার শরীরের মাঝখানে। পেটিকোট আর ব্লাউজের মাঝের ফাঁকা জায়গাটায়। ওরা মজা পাচ্ছিলো ওদের হাতের তালু আর মার পেটের ঐ জায়গাটার রঙ এক রকম দেখে। মিলিয়ে দেখছিলো। আম্মুর পেটের নিচের দিকে নরম লোমের ওপর দিয়ে আঙুল বুলিয়ে একটু ডানদিকে থেমে রাহেল বললো 'এসথা দেখ্।'

'এখানে আমরা লাথি মারতাম?' একটা রূপালী দাগের ওপর অঙুল ঠেকিয়ে? বললো এসথা।

'বাসের মধ্যে হয়েছিলাম আমরা আম্মু?'

'চা বাগানের পেঁচানো রাস্তায়?'

'তখন বাবা তোমার পেট ধরেছিলো?'

'তোমরা টিকিট কেটেছিলে?'

'আমরা কি তোমাকে ব্যথা দিয়েছিলাম?'

আর তারপর রাহেলের উদাস কণ্ঠ ঐ প্রশ্নটা করলো;

'তোমার মনে হয় বাবা আমাদের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে?' আম্মুর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষণিকের জন্যে থেমে যাওয়ায় ইঙ্গিত ছিলো প্রশ্নটার মধ্যে। এসথা রাহেলের মধ্যের আঙুলটার সঙ্গে নিজেরটা ঠেকালো। মধ্যমার সঙ্গে মধ্যমা, ওদের মায়ের সুন্দর পেটের মধ্যরেখায়। প্রশ্নের দিক বদলালো ওরা।

'এটা এসথার লাথি, এইটা আমার' রাহেল বললো..., 'আর এটা এসথার এইটা আমার।'

ওদের মধ্যে মায়ের পেটের সাতটা দাগের ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া হলো। তারপর রাহেল মুখ ঘষলো আম্মুর পেটে, ঠোঁটের মধ্যে খানিকটা নরম মাংস টেনে নিলো তারপর ছেড়ে দিয়ে থুথুর চকচকে ভেজা দাগটা দেখলো, তার দাঁতের হালকা লাল দাগ পড়েছিলো মা'র চামড়ায়।

চুমুটার পেলবতায় আম্মু শিহরিত হলো। সুন্দর স্বচ্ছ একটা চুমু। কামনা বা ইচ্ছের প্রাবল্যে ছিলো না– বাচ্চা দু'টোর মধ্যে সুপ্ত ছিলো যেন দু'টো কুকুর, বেড়ে ওঠার অপেক্ষায় ছিলো। ফিরতি চুমু পাওয়ার কোন প্রত্যাশা ছিলো না– ঐ চুমুর মধ্যে।

জটিল চুমুও ছিলো না ওটা, কোন প্রশ্নের উত্তরও না। স্বপ্নের হাসি খুশি এক হাতওয়ালা পুরুষটির চুমুর মতো।

আম্মু ক্লান্ত হয়ে পড়লো একচ্ছত্র সম্পত্তির মতো ওদের ঘাঁটাঘাঁটিতে। তার শরীরটা সে ফেরৎ চাইলো। এটা তার। মাদী কুকুর যেমন গা ঝাড়া দিয়ে বাচ্চাদের সরায় তেমনি সে ঝাড়া দিয়ে ওদের সরালো। বসে থেকেই সে চুলগুলো গুছিয়ে এলো খোঁপা বাঁধলো। তারপর বিছানা থেকে পা দু'টো নামালো, হেঁটে গেলো জানালার কাছে, পর্দাগুলো সরালো।

বিকেলের মরা রোদ ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরে, বিছানার ওপর বাচ্চা দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

যমজ দুটো শুনলো আম্মুর বাথরুমের দরজার তালা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

ক্লিক।

বাথরুমের দরজায় লাগানো লম্বা আয়নায় আম্মু নিজেকে দেখলো হিসাব করলো অনাগত ভবিষ্যতে তার রূপটা। জ্বরে আচার হয়ে যাওয়া। ধূসর। কোঁচকানো চোখ। সেলাইয়ে গোলাপের দাগ বসে যাওয়া গাল। ভারি মোজার মতো ঝুলে যাওয়া স্তন। দু'পায়ের মাঝখানে হাড়ের মত শক্ত হয়ে থাকা শুকনো জায়গাটা, পালকের মতো সাদা নরম লোম। উদ্বৃত্ত। দ্রুত ধসে যাওয়া চটকানো মতো।

খড়ি ওঠা চামড়ায় তুষারের মতো রঙ।

আম্মু কেঁপে উঠলো।

উষ্ণ বিকেলে শীতল অনুভূতি, জীবনটা যাপন করা হয়ে গেছে। তার পাত্র ভর্তি শুধু ধুলো। আকাশ, বাতাস, গাছ, সূর্য, বৃষ্টি, আলো, অন্ধকার সবকিছু বালুকায় পর্যবসিত। ঐ বালি তার নাক তার ফুসফুস তার মুখ ভরিয়ে ফেলেছে। নিচে নামিয়ে আনছে তাকে, বেলাভূমির বালিতে বাসা বানানোর সময় কাঁকড়ারা যেমন ঘুরে ঘুরে গর্ত করে তেমন এক ঘূর্ণীতে সে ঘুরছে।

আম্মু কাপড় চোপড় খুলে ফেললো। একটা লাল টুথ ব্রাশ নিয়ে একটা স্তনের নিচে রেখে দেখলো– থাকে কিনা। থাকলো না। নিজে ছুঁয়ে দেখলো চামড়া এখনও মসৃণ আর আঁটোসাঁটো। তার হাতের তলায় বৃন্ত দু'টো চারপাশের বৃত্তের মধ্যে থেকে কালো বাদামের মতো কঠিন হয়ে উঠলো, স্তনের চামড়া টান টান হয়ে গেলো। সরু একটা রেখা নেমে গেছে তার পেট হয়ে, বাঁকা হয়ে পেটের ঢালু বেয়ে হারিয়ে গেছে অন্ধকার ত্রিভুজের মধ্যে। যেন হারিয়ে যাওয়া পথচারীর জন্যে তীর চিহ্ন। এক অনভিজ্ঞ প্রেমিক।

সে তার চুল খুলে ছড়িয়ে দিলো কতোটা লম্বা হয়েছে দেখার জন্যে। ওগুলো ঢলে পড়লো ঢেউ আর ভাঁজ নিয়ে। অবাধ্য ঠাণ্ডা ছোঁয়া– ভিতর দিকে নরম বাইরে রুক্ষ কোমরের ভাঁজ শুরু হওয়ার জায়গাটা গিয়ে থামলো নিতম্বের ওপরে। বাথরুমটা গরম, ঘামের চিহ্ন ফুটে উঠলো চামড়ায় হীরের মতো। তারপর ওগুলো ভেঙে গেলো, গড়িয়ে পড়লো। তার শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাম গড়াতে লাগলো। একটু

চোখ কুঁচকে সে তার ভারি নিতম্বের দিকে তাকালো। বেশি বড় নয়। *পার সি* (অক্সফোর্ড থেকে আসা চাকো হয়তো বলতো) বড় দেখায়, কারণ তার অন্য জিনিসগুলো হালকা পাতলা। আর একটা চওড়া শরীরের অপেক্ষায় ছিলো ওটা।

তার মনে হলো ওরা নিশ্চয়ই তার টুথব্রাশ পরীক্ষাকে অনুমোদন দেবে। কমপক্ষে দু'জন। এইমেনেমের রাস্তায় নিজেকে উলঙ্গ আর নিতম্বের দু'দিকে দুটো রঙিন টুথব্রাশ ঝুলিয়ে হাঁটার কল্পনা করে সে জোরে হেসে উঠলো। তাড়াতাড়ি চুপ করে গেলো। সে দেখলো একটা পাগলামী কোন বোতল থেকে বেরিয়ে এসে সারা বাথরুমে ছড়িয়ে পড়ছে।

পাগলামীর কথা ভেবে আম্মু ভয় পেলো। মামাচি বলত, ওটা তাদের পরিবারে আছে। হঠাৎ জানান না দিয়ে আসে। পাথিল আম্মাই বলে এক বৃদ্ধা ছিলো। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পাগল হয়ে গিয়েছিলো, কাপড় চোপড় খুলে চলে যেতো নদীর পাড়ে, মাছদের জন্যে গান গাইতো। থামপাই চাচেন ছিলো আর একজন প্রত্যেক সকালে নিজের পায়খানা ঘাঁটতো। একটা উল বোনার কাঁটা দিয়ে। একটা সোনার দাঁত ছিলো তার, কয়েক বছর আগে গিলে ফেলেছিলো সে, তারপর থেকে ঐ বাতিক দেখা দিয়েছিলো। আর ডাক্তার মুথাচেনকে পাগলামীর জন্যে উঠিয়ে আনা হয়েছিলো তার বিয়ের আসর থেকে। ভবিষ্যতে এরকম যে হতে পারে, সে হলো, আম্মু–আম্মু ইপে। বিয়ে করেছিলো এক বাঙালিকে, পাগল হয়ে গিয়েছিলো। কম বয়সে মারা গিয়েছিলো। কোথাও একটা শস্তা হোটেলে। চাকো বলেছিলো এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা সিরীয় খৃস্টানদের মধ্যে হয় কারণ নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই এরা বিয়ে করে। মামাচি একমত হননি।

আম্মু ভারি চুল গোছালো। তার মুখের সামনে এনে জড়ো করলো। ওখান থেকে উঁকি মেরে দেখলো বয়স আর মৃত্যুর বিভক্ত অবস্থানকে। মধ্যযুগের জল্লাদের মতো ছিলো সেই অনুসন্ধানী দৃষ্টি, যেন কালো মুখোশের ভিতর থেকে সে চোখ লুকিয়ে দেখছিলো তার শিকারকে। এক হালকা পাতলা উলঙ্গ জল্লাদ, কালো স্তনবৃন্ত আর হাসলে গভীর টোল পড়া গাল। দুই ভ্রূণের যমজদের কাছ থেকে পাওয়া সাতটা রূপালী দাগ। তার জন্যে ওদের জন্ম ছিলো সেনা শিবিরে মোমের আলোয় কোন সেনাপতির পরাজয়ের খবর শোনার মতো।

পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার জন্যে আম্মু ভয় পেয়েছিলো– এমন নয় কারণ এ পথের স্বভাবই এমন, শেষ–হওয়া। কোন মাইলস্টোনে এগুনোর চিহ্ন থাকে না, কোন বৃক্ষ এর পাশে জন্মায় না। কোন ছায়া নেই কিছুর। কোন কুয়াশা একে ঢেকে দেয় না, কোন পাখি এর পথরেখা ধরে ওড়ে না, কোন বাঁক কোন মোড় নেই, কোন সাময়িক অস্পষ্টতাও নেই পথের শেষ সম্বন্ধে এমন স্বচ্ছই ছিলো তার ধারণা। এই উপলব্ধি আম্মুর মনে এক প্রচণ্ড যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছিলো। এমন মেয়ে সে ছিলো না-যে ভবিষ্যত নিয়ে কিছু বলতো। খুব বেশি গোপনই রাখতো সবকিছু। ছোট কোন ইচ্ছাও সে প্রকাশ করতো না, কেউ জানতো না। কেউ জানতো না,

প্রতিদিন তার ভিতরে কি জমা হচ্ছে। জানতো না– সে কোথায় থাকবে পরের মাসে, পরের বছরে। দশ বছর গেছে। কেউ জানে না তার রাস্তা কোনদিকে গেছে, মোড়ের পরে কি আছে? আর চিন্তা! সে জানতো ওটা খারাপ (কারণ স্বপ্নে মাছ খেতে দেখা মানে তুমি খেয়েছো)। এবং আম্মু যা জানতো (বা চিন্তার কথা সে জানতো) তা হলো, প্যারাডাইস পিকলসের সিমেন্টের গামলা থেকে গঁজিয়ে ওঠা ঝাঁঝালো সিরকার গন্ধ যা তার যৌবনকে দিয়েছে বলিরেখা আর ভবিষ্যতকে জারিয়ে দিয়েছে আচারের মতোই।

নিজের চুলের মুখোশে মুখ ঢেকে আম্মু বাথরুমের আয়নায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো কাঁদতে চেষ্টা করলো।

নিজের জন্যে।

ক্ষুদে জিনিসের দেবতার জন্যে।

তার স্বপ্নের পরে দেখা চিনির গুঁড়ো মাখা যমজদের জন্যে।

ঐ বিকেলে–বাথরুমে নিয়তি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে মেতেছিলো তাদের রহস্যময়ী মায়ের পথ নিয়ে। তখন ভেলুথার পিছনের উঠোনে তাদের জন্যে একটা প্রাচীন নৌকা ছিলো অপেক্ষায়। তখন এক হলুদ গীর্জায় একটা বাচ্চা বাদুড় জন্মানোর অপেক্ষায় ছিলো। মায়ের শোয়ার ঘরে এসথা রাহেলের পাছার ওপর মাথা ভর দিয়ে উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

শোয়ার ঘরটার জানালায় ছিলো নীল পর্দা, হলুদ বোলতারা জানালার চৌকাঠে ভন ভন করছিলো। শোয়ার ঘরটার দেয়ালগুলো কদিন বাদেই জেনেছিলো তাদের ভয়ঙ্কর গোপন কথা।

ঐ শোয়ার ঘরেই আম্মু প্রথমে তালা মেরেছিলো। তালা মেরেছিলো নিজেকে। সোফি মলের শেষকৃত্যের চারদিন পর দুঃখে ক্ষেপে ওঠা চাকো ঐ দরজায় এসে চেঁচামেচি করেছিলো।

'তোর সবগুলো হাড্ডি ভাঙার আগে তুই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা'।

আমার বাড়ি, *আমার* আনারস, *আমার* আচার।

ঐ ঘটনার পর অনেক বছর রাহেল স্বপ্নটা দেখতো : মোটা একটা লোক, মুণ্ডুহীন, হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক মেয়ে মানুষের মৃতদেহের পাশে। চুল ছিঁড়ে আনছে। হাড্ডিগুলো ভাঙছে। ছোটগুলোকে পর্যন্ত বাদ দিচ্ছে না। আঙুল কামড়ে হাড় সব মটমট করে ভাঙছে। থোঁত্ থ্যোঁত্, ভোঁতা হাড় ভাঙার শব্দ। পিয়ানিস্ট যেন পিয়ানোর চাবি ভাঙছে। কালোগুলোও। আর রাহেল (যদিও বহু বছর পর মড়া পোড়ানোর ইলেকট্রিক চুল্লিতে চাকোর মুঠো থেকে ছোটার জন্যে ছটফট করছিলো, ঘেমে-নেয়ে) দু'জনকেই ভালোবাসত। বাদক ও পিয়ানো দু'টোকেই।

হত্যাকারী আর মৃতদেহ।

আম্মু রাহেলের রিবনগুলো হেম করছিলো, দরজায় তখন টোকা পড়লো। রিবনগুলো সেলাই করার দরকার ছিলো না, তবু সে করেছিলো।

'কথা দে তোরা দু'জন দু'জনকে সবসময় ভালোবাসবি,' তার বাচ্চা দু'টোকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলো সে।

'কথা দিচ্ছি,' এসথা ও রাহেল বলেছিলো। ওরা এটা বোঝানোর মতো কথা খুঁজে পাচ্ছিলো না যে, ওদের দু'জন বলে কিছু নেই।

যমজ মাইলফলক আর তাদের মা। অজড় পাথর। তারা যা করতো তার বদলে কিছুই থাকতো না। তবে তা অনেক পরে।

অনেক পরে। একটা ভোঁতা আওয়াজ তোলা ঘণ্টা বেজেছিলো শ্যাওলা ধরা কুয়োর মধ্যে। কাঁপা কাঁপা লোমশ, মথের পায়ের মতো :

তখন শুধু ছিলো কাকতালীয় ঘটনা। যদিও অর্থ গুলিয়ে গিয়েছিলো আর সবকিছু ছত্রাখান হয়ে গিয়েছিলো। সম্পর্কহীন। আম্মুর সূঁচের ফোঁড়। রিবনের রঙ। ফুল তোলা শুজনীর ঢেউ। আস্তে ভেঙে পড়া একটা দরজা। বিচ্ছিন্ন জিনিসগুলোর কোন অর্থ ছিলো না। যদিও বুদ্ধি জীবনের গোপন নক্সা বলে দেয়– প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে আলো আর বস্তুর। সেলাই আর কাপড়ের সূঁচ আর সুতোর আর ঘরের, ভালবাসা আর ভয়ের, রাগ আর নীরবতার। তখন সব হারিয়ে গিয়েছিলো।

'তোর জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে যা।' ভাঙাচোরা জিনিসগুলোর ওপর পা রেখে চাকো বলেছিলো। ওদের ওপর দিয়ে তাকিয়েছিলো। হাতে ছিলো একটা দরজার হাতল। হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চুপ মেরে গেলো। বিস্মিত হলো নিজের শক্তিতেই। তার বিশালতা, শাসানোর ক্ষমতা। নিজের ভয়ঙ্কর দুঃখের যন্ত্রণা।

ভাঙা দরজার কাঠের রঙ ছিলো লাল।

আম্মু বাইরে ঠাণ্ডা ছিল, ভিতরে কাঁপছিল, অদরকারি সেলাই থেকে সে মুখ তুলছিল না। রঙিন রিবনের টিনটা তার কোলে খোলা পড়েছিলো। ঘরের মধ্যে তখন সে তার নিজস্বতা হারিয়েছিলো।

এই ঘরেই (যমজ বিশেষজ্ঞরা হায়দরাবাদ থেকে চিঠিতে জানিয়েছিলো) আম্মু এসথার ছোট্ট ট্রাঙ্কটা গুছিয়ে দিয়েছিলো। আর খাকি হোল্ডঅল। ১২টা হাতা ছাড়া গেঞ্জি, ১২টা হাফ সুতির গেঞ্জি। *এসথা দেখ এখানে কালি দিয়ে তোর নাম লেখা।* মোজা। তার চোঙা প্যান্ট। চোখা কালারওয়ালা শার্ট। তার বোগি আর চোখা জুতো (যেখানে থেকে রাগ উঠে আসতো)। তার এলভিসের রেকর্ড। তার ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট আর ভিদালিন সিরাপ। মাগনা জিরাফ (ভিদালিনের সঙ্গে যেটা পাওয়া গিয়েছিল), তার বুকস অব নলেজ ১ থেকে ৪ খণ্ড। *না মনি, ওখানে নদী নেই মাছ ধরার জন্যে।* তার সাদা চামড়ার, খাপওয়ালা বাইবেল যার চেনের হুকে রাজকীয় পতঙ্গ বিশারদের হাতের কাফলিঙ্ক লাগানো ছিলো। তার মগ-তার সাবান। তার আগাম পাওয়া জন্ম দিনের উপহার, যার ওপর লেখা ছিল *'আগে খুলো না।'* চল্লিশটা সবুজ ইনল্যাণ্ড লেটার ফরম। *দেখ্ এসথা সবগুলোতে ঠিকানা লিখে দিয়েছি, তোকে শুধু ভাঁজ করতে হবে। দেখ কেমন করে ভাঁজ করতে হয়।* আর এসথা ফোল্ডারের লেখা এবং ফুটকি দেওয়া লাইন দেখে দেখে ভাঁজ করে আম্মুর দিকে তাকিয়ে হেসেছিলো, আম্মুর বুক যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠেছিলো।

'কথা দে তুই লিখবি?' যদি খবর দেয়ার মতো কিছু নাও থাকে।

'তাও লিখবি।'

'ঠিক আছে, কথা দিলাম,' এসথা বলেছিলো। নিজের অবস্থাটা পুরোপুরি না বুঝেই বলেছিলো। হঠাৎ এত সম্পত্তির অধিকার পেয়ে ওর চোখা বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো। সব তার। তার নাম কালি দিয়ে লেখা। সব ট্রাঙ্কে ভরা হয়েছিলো (ওপরে তার নাম লেখা ছিলো) শোয়ার ঘরের মেঝেতে পড়েছিলো, ডালা খোলা।

অনেক বছর পর ঐ ঘরে রাহেল ফিরে এসেছিলো দেখেছিলো নীরব আশ্চর্য স্নান। আর ও কাপড় ধুচ্ছিল টুকরো করে কাটা নীল সাবান দিয়ে।

শীর্ণ মাংসপেশী আর মধুরঙা শরীর, চোখে সাগরের গোপনীয়তা। কানে জ্বলছিলো একটা রূপালী বৃষ্টির ফোঁটা।

এসাথাপ্পাইচাচেন কুট্টোপ্পেন পিটার মন।

১২

কচু থোমবান

মন্দিরের ওপর ঘুরছিলো চেনড়ার আওয়াজ, গড়িয়ে যাওয়া রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে পিছলে নামছিলো। জনমানবহীন ভেজা রাস্তা। জেগে থাকা বৃক্ষ। একটা নারকেল হাতে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাহেল মন্দিরের চাতালে পা রাখলো কাঠের দরজা পেরিয়ে। উঁচু সাদা দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিলো মন্দিরটা।

ভিতরের সব দেয়ালও ছিলো সাদা, টালিগুলো শ্যাওলা ধরা আর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। সবকিছু থেকে সদ্য হওয়া বৃষ্টির গন্ধ উঠছিলো। উঁচু পাথুরে বারান্দায় মাদুর পেতে ঘুমাচ্ছিল শীর্ণ পুরোহিত। একটা পিতলের পয়সা রাখার থালা ছিলো তার বালিশের পাশে। যেন তার স্বপ্নের ধারাবাহিক কমিক ছবি ছিলো ওগুলো। পুরো মন্দির চত্বরে চাঁদের আলো ছিলো, এখানে ওখানে জল-কাদার গর্তগুলোতে একটা করে চাঁদ ছিলো। কচু থোমবান তার পার্বণের ঘোরা শেষ করেছিলো। সে শুয়েছিলো একটা কাঠের গাদার ওপর, পাশেই ছিলো তার নিজের ধোঁয়া ওঠা মলের একটা স্তূপ। সে ঘুমাচ্ছিলো, তার কর্তব্য শেষ করে। তার পেট খালি, একটা দাঁত মাটিতে লেগেছিলো আর একটা ছিলো আকাশের তারার দিকে তাক করা। রাহেল নিঃশব্দে এগুলো। সে যা মনে করেছিলো দেখলো চামড়া তার চেয়ে বেশি ঝুলে পড়েছে। তখন সে আর কচু থোমবান ছিলো না। এখন সে *ভিল্লাইয়া* থোমবান। বড় দাঁতওয়ালা। সে নারকেলটা রাখলো তার পাশে। হাতিটার চোখের একটা চামড়ার ভাঁজ কেঁপে উঠলো, সেখান থেকে তরল গড়িয়ে পড়ছিলো। তারপর সে বন্ধ করলো, লম্বা শ্বাস নিলো, ঘুমিয়ে রইলো। একটা দাঁত উঠে রইলো তারার দিকে।

কথাকলির জন্যে জুন মাসটা মন্দা। তবে কিছু মন্দির আছে যেখানে কোন গোষ্ঠী না নেচে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। এইমেনেমের মন্দিরটা সেগুলোর মধ্যে পড়ে না কিন্তু এখন ভূগোলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রীতিনীতিও বদলে গেছে।

এইমেনেমে তারা বেশ দরদ দিয়ে নেচেছিলো 'আঁধারের হৃদয়' থেকে ফেরার পথে। হোটেলের সুইমিংপুলের পাশে ওরা এটা নাচতো। পর্যটনের সুবাদে এখন

তারা অনাহারে থাকার অবস্থা থেকে বেঁচেছে। তবে আঁধারের হৃদয় থেকে ফেরার পথে দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে এই মন্দিরে থেমেছিলো। কাহিনী বিকৃত করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলো। প্রার্থনা করেছিলো তাদের পরিবার বাঁচানোর জন্যে। জীবন বিনষ্ট না হওয়ার জন্যে।

এ উপলক্ষ্যে দর্শকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই হয়েছিলো হঠাৎ করে।

চওড়া ছাদওয়ালা করিডোর পেরিয়ে–মন্দিরের মধ্যেখানে কোলোন্নাদেদ কুথামবালাম অবুত্তিঙ-এ বাঁশিওয়ালা নীল দেবতা থাকতো। ঢুলিরা ঢোল বাজাতো নাচিয়েরা নাচতো। ধীরে ধীরে তাদের রঙ বদলে যেতো রাতের বেলায়। রাহেল আসন গেড়ে বসেছিলো একটা গোল থামে ঠেস দিয়ে। পিতলের প্রদীপের আলোয় একটা নারকেল তেলের টিন জ্বল জ্বল করছিলো। তেল বাতিকে জ্বালিয়ে রেখেছিলো। বাতি টিনটাকে।

এ সবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কাহিনী শুরু হয়েছিলো, কারণ অনেক অনেকদিন আগে যখন কথাকলি আবিষ্কার হয়েছিলো তখন এর গোপনীয়তা বলে কিছু ছিল না। মহান কাহিনীগুলো একবার শুনলে আবার শুনতে ইচ্ছে করে। এসব কাহিনী যে কোন জায়গা থেকে শুরু করা যায়। রোমাঞ্চ বা হঠাৎ শেষ করে শিহরণ জাগায় না। অকল্পনীয় বিষয় দিয়ে শিহরণ জাগায় না। এসবের বিষয়বস্তু এত কাছের যে নিজের বাড়িতে থাকার মতোই লাগে। কিংবা প্রিয় মানুষের শরীরের ঘ্রাণের মতো। কৌশলটা হলো এমন যে, সবাই জানে একদিন মরতে হবে, বাঁচতে চাইবে সবাই কিন্তু বাঁচা যাবে না। মহান কাহিনীগুলোতে বোঝাই যায় কে বাঁচে কে মরে, কে প্রেম পিয়াসী– কে নয়। আর আবার জানতে ইচ্ছে করে।

ওটাই তাদের রহস্য এবং জাদু।

কথাকলি মানুষের কাহিনীগুলো তার বাচ্চা কাচ্চা আর নিজের ছোটবেলার ঘটনা নিয়ে। সে তাদের সঙ্গে বড় হয়েছিলো। তারাই ছিলো সেই বাড়ি যেখানে সে বেড়ে উঠেছিলো। বৃক্ষছায়ায় সে খেলেছিলো। তারাই ছিলো তার জানালা, তার দেখার উপায়। তাই যখন সে গল্প বলতো তখন সে নিজেই নিজের শিশু হয়ে যেতো। সে ব্যাঙ্গ করত। শাস্তি দিতো। সে তাকে বুদবুদের মতো ফুলিয়ে তুলতো। তাঁর সঙ্গে লড়তো তারপর ছেড়ে দিতো। সে হাসতো কারণ তাকে ভালোবাসত। সে এক মিনিটে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারতো। সে এক ঘণ্টা এক জায়গায় থেমে থাকতে পারতো একটা ঝরা পাতার পরিণতি দেখার জন্যে। কিংবা ঘুমন্ত বাঁদরের লেজ নিয়ে খেলতে পারতো। অবলীলায় সে চলে যেতে পারতো যে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা ঝর্না ধারায় স্নানরতার প্রেমে মজে যেতে পারতো। লোক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে কথ্য মালায়ালী ভাষায় দুর্ণাম রটানোর ভঙ্গিতে এর কাহিনী বলা হতো। এতে থাকতো স্তন্যদানরতা নারীর কাহিনী থেকে নিয়ে কৃষ্ণের কাহিনী পর্যন্ত। দুঃখের মধ্যে থেকে সুখকে বের করে আনতো। আবার গৌরবের সাগরের মধ্যে থেকে তুলে আনতো লজ্জার গোপন মাছটি।

সে দেবতাদের গল্প শোনাতো কিন্তু তার সুতো পাকাতো দেবতাহীন মানব হৃদয়।

পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কথাকলি মানুষটি। কারণ তার শরীরটাই তার আত্মা। তার একমাত্র যন্ত্র। তিন বছর বয়স থেকে ওটা মৃসণ আর পালিশ করা চলছে, খোসা ছাড়ানো হচ্ছে। পুরোটাকে গল্প বলার জন্য তৈরি করা হয়েছে। জাদুটা তার নিজের মধ্যেই আছে, রঙকরা মুখোশ আর ফোলা ঘাগরাকে জড়িয়ে।

তবে এখন সে অকেজো হয়ে গেছে। আশাহীন। অচল মাল। ছেলেমেয়েরা তাকে এড়িয়ে চলে। ওরা যা চায় সে তা করতে পারে না। সে তাদের বড় হতে দেখেছে তারপর তারা কেউ হয়েছে কেরানি কেউ বাস কন্ডাক্টার। চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারি। ওদের নিজেদের ইউনিয়ন আছে।

কিন্তু সে পৃথিবী আর স্বর্গের মাঝখানে ঝুলে আছে। তাদের কাজের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। সে বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে পারে না, খুচরো গুনে টিকিট বেচতে পারে না। সে ঘড়ি ধরে কাজে যেতে পারে না। সে চায়ের ট্রে আর মেরি বিস্কুটের ওপর ঝুঁকে থাকতে পারে না।

নিরুপায় হয়েই সে পর্যটনের দিকে ঝুঁকেছে। বাজারে ঢুকেছে। যা তার আছে কেবল তাই সে বেচতে পারে। তার দেহ যে গল্প বলতে পারে তাই তার সম্পদ।

আঁধারের হৃদয়ের লোকজন তাকে নিয়ে মজা করে তাদের বিদেশী জিনিসপত্রের মধ্যে। সে তার রাগ চেপে রেখে ওদের জন্য নাচে। তার মজুরি নেয়। মাতাল হয়। দল বেঁধে ধোঁয়া টানে। কেরালার বিখ্যাত নেশা ধরানো ঘাস। সে হাসে। তারপর এইমেনেমের মন্দিরের পাশে থামে, সে আর তার সঙ্গের লোকজন, দেবতার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে নাচে।

রাহেল (ভাবনা নেই, পঙ্গ পালের বাধা নেই) থামে ঠেস দিয়ে দেখছিলো গঙ্গার তীরে কর্ণ প্রার্থনা করছে। আলোর বর্ম পরা কর্ণ। কর্ণ, সূর্যদেবের উন্মাদনার পুত্র। সূর্যদেব দিনের দেবতা। কর্ণ মহান। কর্ণ পরিত্যাক্ত শিশু। কর্ণ সেরা বীর। ঐ রাতে কর্ণ ময়লা হয়ে গিয়েছিলো। তার ছাপা ঘাগরায় ময়লা লেগে গিয়েছিলো। তার মুকুটটা ফুটো হয়ে গিয়েছিলো, মণিমাণিক্য থাকার জায়গাগুলোও ছিলো ফুটো। বেশি ব্যবহারে তার ভেলভেটের জামাটার ছাল উঠে গিয়েছিলো। জুতোর গোড়ালি ফেটে গিয়েছিলো। জোড়াগুলো খুলে পড়ছিলো।

তবে যদি একদল মেকআপম্যান থাকতো পর্দার পাশে, একজন এজেন্ট, একটা চুক্তি, লাভের অংশ– তাহলে সে কেমন হতো? এক ভণ্ড, ধনী, উমেদার। এক তুখোড় অভিনেতা। হয়ে উঠতে পারতো? কিংবা তার সম্পদের মধ্যে *নিরাপদে* থাকতে পারতো? তার আর তার গল্পের মতো টাকাও লকলকিয়ে বেড়ে উঠতো? সে কি এই মন্ত্রগুপ্তিটা জানতে পেরেছিলো?

হয়তো না।

লোকটি আজ রাতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। হতাশায় সে পরিপূর্ণ, গল্পটা রক্ষা করে যেন সার্কাসের সঙের মতো লাফ দিলো। যা কিছু লুকিয়ে রেখেছিলো সব

জমাট পাথরের মতো আছড়ে ফেললো পৃথিবীতে। তার রঙ আর আলো। একটা পাত্রের মধ্যে যেন সে নিজেকে ঢেলে দিলো। আরাম পেলো। কাঠামো। বর্ম। পরিপূর্ণ হলো। তার প্রেম। তার উন্মাদনা। তার আশা। তার অসীম আনন্দ। নিয়তির পরিহাস, তার নিজের লড়াইটা ছিল অভিনেতার লড়াইয়ের উল্টো। সে কষ্ট করত ব্যূহ্যের ভিতরে *ঢোকার* জন্যে নয়, এড়ানোর জন্যে। কিন্তু সে তাও পারেনি। তার পরাজয়ের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছিলো। সে *এখন* কর্ণবিশ্ব যার কাছে প্রণত। কর্ণ একা। শুভর রক্ষক। দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা এক রাজপুত্র। জন্মেছিলো অপঘাতে মরার জন্যে, ভাইয়ের হাতে-নিরস্ত্র-একা। রাজকীয় কিন্তু পুরোপুরি হতাশাগ্রস্ত। গঙ্গার তীরে প্রার্থনা করছিলো। মাথা থেকে মুকুট খসে পড়লো।

এবার কুন্তী আসলো। সেও পুরুষ মানুষই তবে নরম-সরম মেয়েলী গড়নের, স্তনওয়ালা পুরুষ, বহু বছর ধরে নারীর ভূমিকায় অভিনয় করছে। চনমনে তার চলাফেরা, নারীর মতোই। কুন্তীও টুটা ফাটা, বসন-ভুষনের জোড়া খোলা। সে কর্ণকে একটা কাহিনী শোনাতে এসেছিলো।

কর্ণ তার সুন্দর মাথা ঝুঁকিয়ে শুনছিলো।

লাল চোখ, কুন্তী নাচছিলো। সে তাকে এক দেবতার বর পাওয়া তরুণীর গল্প বললো। গোপন একটা মন্ত্র সে শিখেছিলো যা দিয়ে দেবতাদের একজনকে প্রেমিক হিসাবে পাওয়া যায়। কম বয়সের কৌতূহলে সে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলো সত্যি কিছু হয় কিনা? সেজন্যে সে শূন্য মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে মুখ করে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলো। কুন্তী বললো মন্ত্রের শব্দগুলো তার বোকা ঠোঁট দিয়ে অবলীলায় উচ্চারিত হয়ে গেলো, দিনের দেবতা সূর্য তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তরুণী বিমোহিত হলো তরুণ দেবতার উজ্জ্বল রূপে, নিজেকে নিবেদন করলো তার কাছে। ন'মাস পরে একটা ছেলে প্রসব করলো সে। শিশুটি জন্ম নিলো আলোক বিচ্ছুরিত করে, কানে ছিলো সোনার বালি আর বুকে ছিলো সোনার বর্ম, তাতে উৎকীর্ণ ছিল সূর্যের স্মারকচিহ্ন।

তরুণী মা তার প্রথম ছেলেকে খুব ভালোবাসত, কুন্তী বললো, কিন্তু সে ছিলো অবিবাহিতা ফলে সে তাকে রাখতে পারেনি। সে তাকে একটা বেতের ঝুড়িতে রেখে ভাসিয়ে দিয়েছিলো নদীতে, অধিরথ নামে এক রথনির্মাতা-ছুতোর তাকে উদ্ধার করেছিল ভাটিতে, নাম রেখেছিলো কর্ণ।

কর্ণ কুন্তীর দিকে তাকালো। *কে সে? কে আমার মা? বলো কোথায় সে? তার কাছে আমাকে নিয়ে চলো।*

কুন্তী তার মাথা নোয়ালো, বললো

এখানেই, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে।

কর্ণ রাগে দুঃখে অধীর হলো।

হতাশা আর অবিশ্বাসের নাচ নাচলো।

কোথায় ছিলে তুমি যখন আমার প্রয়োজন ছিলো? তুমি কি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে? তুমি কি আমাকে ঠিকমতো দেখেছিলে? তুমি কি খুঁজেছিলে আমি কোথায়?

উত্তরে কুন্তী তার উজ্জ্বল মুখ দু'হাতে ধরেছিলো, সবুজ মুখ, লাল চোখ, চুমু খেলো তার ভুরুতে। কর্ণ খুশিতে লাফিয়ে উঠলো। এক বীর যোদ্ধা স্নেহের কাঙাল হয়ে পড়লো। চুমুর মাহাত্ম্যে। সে তার সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করলো। পায়ের পাতায়, আঙুলের ডগায়, তার সুন্দরী মায়ের চুমু।

তুমি জানো না আমি তোমাকে কতো চেয়েছি?

রাহেল দেখলো তার ফুলে ওঠা শিরার চলাচল, মনে হলো উটপাখির গলা বেয়ে নামছে একটা ডিম।

চলমান চুমুর প্রতিক্রিয়া বেশিক্ষণ থাকলো না, কর্ণ বুঝতে পারলো তার মা নিজেকে তার সামনে উন্মোচিত করেছে তার প্রিয় আরও পাঁচ ছেলের জীবন বাঁচাতে– পাণ্ডবদের তখন একশ' খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছিলো– সেই পৌরাণিক মহাসমর। শুধু তাদের রক্ষা করার জন্যে কুন্তী কর্ণের কাছে মায়ের পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। কর্ণের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাচ্ছিলো সে।

স্নেহের সবগুলো নিয়মই কাজে লাগালো সে।

ওরা তোমার ভাই। তোমার নিজের রক্ত মাংস। কথা দাও ওদের বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধে যাবে না। কথা দাও।

মহাবীর কর্ণ কিন্তু কথা দিলো না, কারণ আগেই অন্য একজনকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। আগামীকাল সে যুদ্ধে যাবে এবং পাণ্ডবদের বিরুদ্ধেই লড়বে। ওদের মধ্যে তার সমকক্ষ একজনই আছে সে অর্জুন। সে আবার সবার সামনে তাকে অচ্ছুৎ সূত-পুত্র বলে ডেকেছিলো। এবং কৌরবদের একশ ভাইয়ের মধ্যে বড় দুর্যোধনই তাকে মানহানি থেকে বাঁচিয়েছিলো– একটা রাজ্যদান করে। তার বদলে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলো আমরণ তার পক্ষে থাকার।

কিন্তু কর্ণ তার মাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না তাই সে তার শপথ সংশোধন করলো। কূটকৌশল। সামান্য একটু ঠিকঠাক করে নেওয়া, শপথটা বদলানো।

কর্ণ কুন্তীকে বললো,

আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সবসময়ই তোমার পাঁচ পুত্র থাকবে। যুধিষ্ঠিরকে আমি শত্রু মনে করি না তার ক্ষতিও করবো না। ভীম আমার হাতে মরবে না। যমজ– নকুল সহদেবকে আমি ছোঁবও না। তবে অর্জুন– তার ব্যাপারে আমি শপথ করতে পারবো না। আমি তাকে বধ করব অথবা সে আমাকে। আমাদের একজন মরবে।

বাতাসে কিছুর উচ্চকিত ইশারা পাওয়া গেলো। আর রাহেল জানতো এসথা এসেছে। সে তার মাথা ঘোরাল না তবে ভিতরে ভিতরে একটা উষ্ণতা অনুভব করলো। 'সে আসছে,' সে ভাবলো ও এখানে, আমার সঙ্গে।

এসথা দূরে একটা থামে হেলান দিয়ে বসেছিলো। ওরা নাচটা দেখছিলো এভাবে, কুসুমবালামের নিঃশ্বাস তাদের আলাদা করেছিলো কিন্তু কাহিনীটা আবার মিলিয়েছিলো। আর এক মায়ের স্মৃতি।

বাতাস উষ্ণ হয়ে উঠেছিলো। আর্দ্রতা কমে গিয়েছিলো।

আঁধারের হৃদয়ে সেদিন সন্ধ্যাটা ছিলো খুব বাজে। এইমেনেমে যারা নাচছিলো তারা থামতে পারছিলো না। ঝড়ের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় নেয়া শিশুদের মতো হয়ে গিয়েছিলো ওরা। উঠতে চাচ্ছিল না, আবহাওয়ার দিকে কোন খেয়াল ছিলো না। বাতাস আর বজ্র। ইঁদুরগুলো ভেঙে পড়া দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল চোখে তাদের ছিলো ডলারের চিহ্ন। তাদের চারিদিকে পৃথিবী ধ্বসে পড়ছিলো।

তারা এক কাহিনী থেকে আর এক কাহিনীতে চলে যাচ্ছিল, দেওয়ালীর প্রদীপ জ্বালিয়ে। *কর্ণ শাবাদাম*—কর্ণের শপথ—থেকে *দুর্যোধন ভাধাম*—দুর্যোধনের মৃত্যু এবং তার ভাই দুঃশাসন।

ভীম যখন দুঃশাসনকে বধ করলো তখন ভোর চারটে বেজে গেছে। এই লোকটিই পাশা খেলায় জেতার পর সবার সামনে পাণ্ডবদের স্ত্রী দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিলো। দ্রৌপদী (বিস্ময়করভাবে রেগে গিয়েছিলো তাকে যারা জিতেছিলো তাদের ওপর কিন্তু যারা তাকে বাজী ধরেছিলো তাদের ওপর রাগেনি) শপথ করেছিলো ততক্ষণ সে চুল বাঁধবে না, যতক্ষণ না দুঃশাসনের রক্তে তা ভেজাতে পারবে। ভীম তাকে সসম্মানে সেই শপথ রক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিলো। মৃতদেহ ছড়ানো এক রণক্ষেত্রে ভীম দুঃশাসনকে কোণঠাসা করে ফেলেছিলো ঘণ্টাখানেক তারা একে অন্যের সঙ্গে যুঝেছিলো। গালিগালাজ করেছিলো। কে কি খারাপ কাজ করছে তার ফিরিস্তি দিয়েছিলো। পিতলের প্রদীপের বাতি যখন ম্লান হয়ে নিভে গিয়েছিলো তখন একটা বিরতী দেওয়া হয়েছিলো। ভীম তেল ঢেলেছিলো, দুঃশাসন প্রদীপের সলতে ঠিক করেছিলো। আবার শুরু হয়েছিলো যুদ্ধ। তাদের শ্বাস রুদ্ধকর যুদ্ধ কুথামবালামকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলো, সারা মন্দির জুড়ে চলছিলো নাচ। পুরো প্রাঙ্গন জুড়ে ওরা এ-ওকে তাড়া করছিলো কাগজের গদা নিয়ে। ফোলা ঘাগরা আর ছাল ওঠা ভেলভেটের জামা পরে ওরা ডিগবাজী খাচ্ছিল জল কাদার গর্ত আর হাতির বিষ্ঠার স্তূপের মধ্যে, বিশাল ঘুমন্ত হাতিটার চারদিকে ওরা ঘুরছিলো। দুঃশাসন মহা বিক্রমে আক্রমণ করার এক মিনিটের মধ্যে পড়ে গেলো, ভীম তাকে ক্ষানিকক্ষণ পেটালো দু'জনই কাদা মেখে একাকার হলো।

আকাশ রক্তিম হয়ে উঠেছিল। ... ধূসর হাতির মতো আকৃতির গর্ত দিয়ে আলো তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটালো। সে আবার ঘুমালো। ভোর হলো, যখন নিষ্ঠুর ভীম জিতলো। ঢোলের আওয়াজ বেড়ে গেলো কিন্তু বাতাস শান্ত আর স্তব্ধ হয়ে গেলো।

ভোরের আলোয় এসথাপ্পেন আর রাহেল দেখল ভীম দ্রৌপদীর কাছে তার শপথ রাখলো। সে দুঃশাসনকে মেঝেয় চেপে ধরলো। মৃত্যু পথযাত্রীর সমস্ত শরীরে সে আঘাত করতে লাগলো যতক্ষণ না নিঃসাড় হলো। যেন কামার লোহা পিটিয়ে পাত বানাচ্ছিলো। নিয়মমতো সব জায়গা সমান করছিলো। মারা যাওয়ার অনেক পরেও তাকে মারতে লাগলো। তারপর খালি হাতে সে তার দেহটা ছিঁড়ে ফেললো। সে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে এক আঁজলা রক্ত তুলে আনলো। তার ক্ষিপ্ত চোখ চৌকাঠের ওপর দিয়ে উঁকি মারছিল। ওতে ছিলো ক্রোধ আর হিংসা আর পরিতৃপ্তি। হালকা গোলাপী রঙের রক্তের বুদবুদ তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে রঙকরা মুখের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নামলো। গলা বুক ভরিয়ে দিলো। অনেকটা পান করার পর সে উঠে দাড়ালো রক্তাক্ত নাড়িভুঁড়ি তার গলায় বাঁদরের লেজের মতো ঝুলছিলো, সে গেলো দ্রৌপদীকে খুঁজতে তাজা রক্তে তার চুল ভেজানোর জন্যে। তখনও বধ করার পরেও তার মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ ছিলো।

সকালবেলা পাগলামী চলছিলো। গোলাপের গামলার নিচে। ওটা নাটক নয়। এসথাপ্পেন আর রাহেল চিনতে পারলো। ওরা আগেও দেখেছিলো তার কাজ। আর এক সকালে। আরএক মঞ্চে। আর এক ধরনের নিষ্ঠুরতা (জুতোর তলায় লেগেছিল কেন্নো) ঐ নিষ্ঠুরতার খেলার সস্তা মহড়া ছিলো যেন এটা।

ওরা বসে রইলো। ভেতরটা শক্ত আর খালি হয়ে গিয়েছিলো। দুই ভ্রূণের ফসিল জমে গিয়েছিল। শিঙার আওয়াজ উঠলো কিন্তু শিং দিয়ে ওগুলো তৈরি হয়নি। কুথামবালামের নিঃশ্বাসে আলাদা হয়েছিলো। আটকে পড়েছিলো একটা বাহিনীর মধ্যে যা তাদের ছিলো না। ওটাকে অন্যরকম কাঠামো দিয়ে গড়া হয়েছিলো, যেন নৈরাজ্যের মধ্যে এক ভয়ার্ত ঘোড়াকে বাঁধা হয়েছিলো। কচু খোমবান জেগে উঠলো এবং বেশ আয়েস করেই তার সকালের নারকেলটা ভাঙলো।

কথাকলির লোকেরা তাদের মুখোশ খুলে বাড়ি চলে গেলো বউ পেটাতে। এমনকি স্তনওয়ালা নরম-সরম কুন্তীও।

বাইরে তখন ছোট্ট শহরটা গাঁয়ের চেহারা নিয়ে জেগে উঠছিলো। একটা বুড়ো লোক ঘুম ভাঙা চোখে একটা স্টোভ জ্বালাচ্ছিলেন তাঁর লঙ্কা দেওয়া নারকেল তেল গরম করার জন্যে।

কমরেড পিল্লাই। এইমেনেমের ডিম ভাঙার ওস্তাদ আর পেশাদার ওমলেট বানানেওয়ালা। মেলে না, তিনিই এই দুই যমজকে কথাকলি চিনিয়েছিলেন। বেবি কোচাম্মার হিসাব ভুল ছিলো, তিনি মনে করেছিলেন তাদেরকে তিনি লেনিনের কাছে নিয়ে যাবেন। অথচ সকাল পর্যন্ত ওদের সঙ্গে বসে তিনি নাচ দেখেছিলেন, কথাকলির মুদ্রা আর কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ছ'বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে বসে ওরা গল্পটা ভালোই বুঝেছিলো। তিনিই ওদেরকে—রুদ্রভীম চিনিয়েছিলেন। ক্ষিপ্ত রক্ততৃষ্ণ ভীম হত্যা আর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলো। 'সে তার

ভিতরের পশুটাকে খুঁজছিলো,' কমরেড পিল্লাই ওদের বলেছিলেন। ভয়ার্ত বড় বড় চোখে চেয়ে শিশুরা চেয়েছিল যখন সাধারণ পোশাক পরা ভীম সবাইকে বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছিল। আসল কথাটা কমরেড পিল্লাই ব্যাখ্যা করেননি। ভিতরের *'মানুষটাকে'* সে খুঁজেছে কিনা। সম্ভবত তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন কারণ নির্দিষ্ট কোন জন্তু মানুষের ঘৃণাকে উস্কে দেয় না। কোন জন্তু তার ক্ষমতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না।

'ঠিক কোন জন্তুটা,' কমরেড পিল্লাই বলেননি।

গোলাপী গামলাটা উষ্ণ ধূসর আবরণে ম্লান হয়ে গেলো। তখন এসথা আর রাহেল মন্দিরের দরজায় পা রেখেছে। কমরেড কে এন এম পিল্লাই পা রাখলেন। তেল মেখে জবজবে হয়েছিলেন, তাঁর কপালে ছিলো চন্দনের ফোঁটা। বৃষ্টির ফোঁটা তাঁর তেলমাখা শরীর গড়িয়ে নামছিলো। তাঁর অঞ্জলিতে ছিলো টাটকা জুঁই ফুল।

'ওহ্' খ্যানখেনে গলায় তিনি বললেন, 'তোরা এখানে? এখনও তোদের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি টান আছে? হাঃ খুব ভালো।'

যমজরা ভদ্রতাও দেখায়নি, অবজ্ঞাও করেনি, কিছুই বলেনি। ওরা একসাথে বাড়ি ফিরেছিলো। সে আর সে। আমরা আর আমাদের।

১৩

হতাশ আর আশাবাদী

চাকো তার ঘর ছেড়ে দিয়ে পাপাচির পড়ার ঘরে ঘুমাতো সোফি মল আর মার্গারেট কোচাম্মাকে নিজের ঘরে শুতে দেওয়ার জন্যে। ঘরটা ছিলো ছোট, এক জানালাওয়ালা, ওখান দিয়ে দেখা যেতো নষ্ট হতে থাকা রাবার বাগানটা। রেভারেণ্ড ই, জন, ইপে ওটা কিনেছিলেন এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে। একটা দরজা ওটাকে মূল বাড়ীর সঙ্গে যুক্ত করেছিলো আর অন্যটা (আলাদা প্রবেশের পথ যেটা মামাচি বানিয়েছিলেন চাকোর 'পুরুষের চাহিদা মেটানোর' জন্যে সাবধানে) সোজা চলে গিয়েছিলো পাশের মিট্টামে।

সোফি মল শুয়েছিলো বড় বিছানার পাশে একটা ছোট ক্যাম্পখাটে যেটা তার জন্যেই বানানো হয়েছিলো। ধীরে ঘোরা সিলিং ফ্যানের গুন-গুন আওয়াজ তার মাথাটা জাম করে রেখেছিল। নীল-ধূসর-নীল চোখগুলো হঠাৎ খুলে গেলো।

জেগে ওঠা।

জীবন্ত।

সতর্ক।

ঘুমকে বাদ দেয়া হলো অল্প সময়ের জন্যে।

জো মারা যাওয়ার পর প্রথমবারের মতো, তবে সে-ই প্রথম জেগে চিন্তা করেনি।

সোফি মল ঘরটার চারিদিকে তাকালো। নড়া-চড়া না করে, শুধু তার চোখের মণিগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। শত্রু সীমানার মধ্যে বন্দী গুপ্তচরের পালানোর উদ্ভট ফন্দি আঁটলো।

একটা ফুলদানীতে ছিলো এলোমেলো সাজানো জবা ফুল। ততক্ষণে ওগুলো নেতিয়ে গেছে, দাঁড়িয়েছিলো চাকোর টেবিলের ওপর। দেয়ালগুলোয় দাগ ছিলো বইয়ের সারির। একটা কাঁচ লাগানো আলমারিতে ঠেসেঠুসে ভরা ছিলো নষ্ট বালসা প্লেন। মিনতি ভরা চোখে ছিলো ভাঙাডানার প্রজাপতিগুলো। এক চতুর রাজার কাঠের রাণীরা পাজী কাঠের গুণিনের মন্ত্রের হতাশায় মন মরা।

বন্দী।

একমাত্র একজন, ওর মা, মার্গারেট, পালিয়ে গেছে ইংল্যান্ডে।

ঘরটা ছিলো গোল শান্ত, রূপালী সিলিং ফ্যানটা ঘুরছিলো মাঝখানে। পশমী কাপড়ের একটা টিকটিকি, আধ-পোড়া একটা বিস্কুট, তাকে দেখলো কৌতূহলী চোখে। সে জো'র কথা ভাবলো। কিছু একটা তার ভিতরে কেঁপে উঠলো। সেও চোখ বন্ধ করলো।

শান্ত, রূপালী সিলিং ফ্যানটার ঘূর্ণী তার মাথার ভিতর ঘুরছিলো।

জো হাতের উপর ভর দিয়ে হাঁটতে পারতো। আর যখন সে ঘোরানো পথ বেয়ে নামতো পাহাড়ের নিচে, তখন শার্টের ভেতর বাতাস ঢুকাতে পারতো।

পাশের বিছানায়, মার্গারেট কোচাম্মা তখনও ঘুমিয়ে। সে শুয়েছিলো চিৎ হয়ে, তার বুকের খাঁচার ওপর জড়ো করা। তার আঙুলগুলো ছিলো ফোলা ফোলা, আর তার বিয়ের আংটিটাকে মনে হচ্ছিলো বেকায়দায় শক্ত হয়ে বসে গেছে। তার গালের মাংস ঝুলে পড়েছে মুখের অন্যপাশে, তার চোয়ালের হাড়গুলো উঁচু আর স্পষ্ট, এবং তার মুখে নিরানন্দ হাসিটা নিচের দিকে টানা যার মধ্যে ভেসে ছিলো দাঁতের একটু আভা। সে তার ঘন ভুরু সন্না দিয়ে তুলে হাল ফ্যাশানের করেছিলো, পেন্সিলের মতো চিকন বাঁকারেখা তাকে ঘুমের মধ্যেও দিয়েছিলো বিস্মিত হওয়ার অভিব্যক্তি। তার মুখের বিস্ময়ের ভাবটা বাড়ছিলো নকল ভুরুর পিছনে গজানো খোঁচা খোঁচা ভুরুর জন্যে। তার মুখটা ছিলো উজ্জ্বল। কপাল চক্‌চক্ করছিলো। আলোর নিচে ছিলো একটা বিবর্ণতা। একটা ঠেকিয়ে রাখা দুঃখ।

তার গাঢ় নীল আর সাদা রঙের ফুলের ছবিওয়ালা সুতী-পলিয়েস্টারের জামার পাতলা আঁশগুলো উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে নেতিয়ে লেগে ছিলো তার শরীরের সাথে, তার স্তনের সঙ্গে লেপ্টে উঁচু হয়েছিলো। তার লম্বা ও শক্ত পায়ের রেখা সোজা নেমে গিয়েছিলো, এটাও যেন অপরিচিত গরমের সঙ্গে এবং একটু বিশ্রাম চাচ্ছিল।

বিছানার পাশের টেবিলে ছিলো রূপালী ফ্রেমে বাঁধানো চাকো আর মার্গারেট কোচাম্মার একটা সাদা-কালো বিয়ের ছবি, ওটা তোলা হয়েছিলো চার্চের বাইরে অক্সফোর্ডে। তখন ওখানে অল্প তুষার ঝরছিলো। তাজা বরফকুচি পড়েছিলো রাস্তা আর ফুটপাতে। চাকো পরেছিলো নেহেরুর মতো জামা কাপড়। সাদা চুড়িদার আর একটা কালো সেরওয়ানী। তার কাঁধের ওপর বরফ পড়েছিলো। বোতামের গর্তে একটা গোলাপ ছিলো বোঁটটা ঠেকেছিলো রুমালে, সেটা তিনকোণা ভাঁজ করা, তার বুক পকেট থেকে উঁকি মারছিল। সে পালিশ করা কালো অক্সফোর্ডের জুতা পরতো। হাসছিলো এমন ভাবে যেন নিজের জন্যে এবং যে কাপড় পড়ে আছে সে জন্যে হাসছে। যেন কোন খেয়ালী পোশাক প্রদর্শনীর কেউ।

মার্গারেট কোচাম্মা পরেছিলো একটা লম্বা, ঢেউ তোলা ঘাগরা আর একটা সস্তা মুকুট। তার পরিপাটি কোঁকড়া চুলে মুখের নেকাবটা ছিলো মুখের ওপর থেকে

তোলা। সে চাকোর মতোই লম্বা। তাদেরকে খুশীই মনে হচ্ছিলো। রোগা আর তরুণ, ভ্রুকুটি চোখে স্যুট পরার জন্যে। তার ঘন, গাঢ় ভুরু গাঁথাছিলো একসঙ্গে এবং একটা চমৎকার কনট্রাস্ট যেকোনোভাবেই হোক তৈরী করেছিলো ঢেউ তোলা কনের সাদা পোশাকের সঙ্গে। একটা ভ্রুকুটি করা মেঘ ভুরুর সঙ্গে। তাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন বিশালবপু এক প্রবীনা যাঁর গোড়ালী মোটা এবং লম্বা ওভারকোটের সবগুলো বোতাম লাগানো। মার্গারেট কোচাম্মার মা। তাঁর সাথে দু'পাশে দু'টো ছোট নাতনী, পরনে ভাঁজ করা চৌকো ছক কাটা পশমী কাপড়ের ঘাগরা, কাজ করা পাড়ের একই রঙের পশমী মোজা। মুখে হাত চেপে তারা দু'জনই হাসছিলো খিলখিল করে। মার্গারেট কোচাম্মার মা দেখছিলেন দূর থেকে, ছবির বাইরে থেকে, যেন তাঁর সেখানে থাকার ইচ্ছে ছিলোনা।

মার্গারেট কোচাম্মার বাবা বিয়েতে আসতে রাজি হননি। তিনি ভারতীয়দের পছন্দ করতেন না, তিনি তাদেরকে ধূর্ত আর অসৎ মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি যে তাঁর মেয়ে একটা ভারতীয়কে বিয়ে করছে।

ছবির ডান দিকের কোনায়, একটা লোক পথের মোড়ের এক পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলো আর বড়-বড় চোখে একমুহূর্তের জন্য দম্পতিকে দেখছিলো।

মার্গারেট কোচাম্মা অক্সফোর্ডের এক ক্যাফেতে ওয়েট্রেসের কাজ করতো। সে চাকোকে প্রথম দেখে ওখানেই। তার পরিবার থাকতো লন্ডনে। তার বাবা একটা বেকারী চালাতেন। আর মা ছিলেন এক কোটিপতির (মহিলাদের টুপি তৈরী করে যে) সেক্রেটারি। মার্গারেট কোচাম্মা তারা বাবা-মা'র বাড়ি থেকে চলে এসেছিলো এক বছর আগে, তারুণ্যের স্বাধীনতার অধিকার আদায় ছাড়া আর বড় কোনো কারণ ছিলো না। সে চাচ্ছিলো কাজ করে টাকা জমিয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের একটা কোর্স করতে, তারপর কোন একটা স্কুলে চাকরী নিতে। অক্সফোর্ডে সে এক বান্ধবীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকতো একটা ছোট ফ্ল্যাটে। তার বান্ধবীও ওয়েট্রেস ছিলো অন্য এক ক্যাফেতে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে, মার্গারেট কোচাম্মা নিজেই আবিষ্কার করলো ঠিক সে রকম মেয়েই যে রয়ে গেছে যেমনটি তার বাবা-মা চেয়েছেন। বাস্তব দুনিয়ার মুখোমুখি, ঘাবড়ে যাওয়া, পুরনো নিয়ম-নীতিকে মনে রেখে সে লেগে থাকলো, এবং সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ ছিলনা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো। এমনকি অক্সফোর্ডে বাড়ির তুলনায় গ্রামোফোনটা একটু জোরে বাজানোতেও বিদ্রোহ ছিলো, সে জীবনটা চালাতে লাগলো আগের মতোই সীমাবদ্ধ দাঁতে দাঁত চেপে নিজের মতো, ওটাকেই সে স্বাধীনতা পেয়েছে– বলে ভেবেছিলো।

এক সকালে চাকো ক্যাফেতে হেঁটে আসার আগ পর্যন্ত।

ওটা ছিলো অক্সফোর্ডে তার শেষ বর্ষের গরমকাল। সে একাই ছিলো। তার দলামোচড়া শার্টটার বোতাম লাগানো ছিলো ভুল ঘরে। তার জুতার ফিতেগুলোও

বাঁধা ছিল না। তবে চুল, নিপুণভাবে আঁচড়ানো আর সামনের দিকে নামানো, দাঁড়িয়েছিলো একটা পালকের পিছন দিকে তীব্র আলোর মধ্যে। ওকে দেখতে লাগছিলো অগোছালো, স্বর্গ সুখে সুখী সজারুর মতো। সে ছিলো লম্বা, আর বাতিল কাপড়ের তলায় (বেমানান টাই, জীর্ন কোট), মার্গারেট কোচাম্মা দেখলো সে বলিষ্ঠ। তার উপস্থিতিটা ছিলো আনন্দ দেওয়ার মতো এবং একটা কৌশল যাতে সে তার চোখগুলোকে সরু করলে মনে হয় যেন সে পড়তে চেষ্টা করছিলো দূরের কোন সঙ্কেত আর ভুলে গিয়েছিলো চশমা আনতে। তার কান দু'টো মাথার দু'পাশে লাগানো যেন চায়ের কেতলির হাতল। তার খেলোয়াড়সুলভ শরীরের বাঁধনে বেমানান কিছু একটা ছিলো আর তার অপরিছন্ন উপস্থিতিতে। একটা মাত্র ইঙ্গিত একটা মোটা লোক ওৎ পেতে ছিলো, তার ভিতরে, তা হলো তার চক্‌চকে সুখী গালগুলো।

তার অনিশ্চিত অথবা মাফ করে দেবার মতো জবুথবু অবস্থা এর কোনোটাই ছিলো না যেটা সাধারণভাবে কোন অগোছালো, উদাস মানুষের থাকে। তাকে মনে হচ্ছিলো উৎফুল্ল, যেন তার সাথে ছিলো কোনো কাল্পনিক বন্ধু যার সঙ্গ সে উপভোগ করছে। সে বসলো টেবিলের ওপর একটা কনুইতে ভর দিয়ে জানালার পশের একটা চেয়ারে আর মুখ হাতের তালুতে ঢেকে রাখলো, হাসছিলো খালি ক্যাফের চারপাশে তাকিয়ে যেন তিনি চিন্তা করছিলো আসবাবপত্রগুলোর সাথে কথা বলবে কিনা? সে কফির অর্ডার দিলো সেই একই বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি ছড়িয়ে, কিন্তু আসলেই খেয়াল করেনি লম্বা, ঘন ভুরুওয়ালা ওয়েট্রেসকে যে তার অর্ডারটা নিলো।

সে হেঁটে আসলো যখন সে তার খুব বেশী দুধওয়ালা কফিতে দিলো দু'চামচ উঁচু করা চিনি।

তারপর সে টোস্ট করা পাউরুটি আর ভাজা ডিম চাইলো। আরো কফি, ষ্ট্রবেরী আর জ্যাম।

যখন সে ফিরে আসলো তার অর্ডারের জিনিস নিয়ে, সে বললো, যেন সে একটা পুরনো গল্প চালু রাখছে, 'তুমি সেই লোকটির কথা কি শুনেছো যার যমজ ছেলে ছিলো?'

'না,' সে বললো তার সকালের নাস্তা সাজাতে গিয়ে। কোন কারনে (হয়তো স্বাভাবিক বিচক্ষণতা ছিলো ওটা, এবং বিদেশীদের সঙ্গে কম কথায় কাজ সারার অভ্যাস) হয়তো সে তেমন আগ্রহ দেখায়নি, যা সে আশা করেছিলো তার কাছ থেকে যমজ ছেলেওয়ালা লোকটার ব্যাপারে। চাকো ওতে বিরক্ত হলো না।

'একটা লোকের যমজ ছেলে ছিলো,' চাকো বললো মার্গারেট কোচাম্মাকে। 'পিট আর ষ্টুয়ার্ট। পিট ছিলো আশাবাদী এবং স্টুয়ার্ট হতাশ।'

চাকো ষ্ট্রবেরীগুলো জ্যামের ভিতর থেকে তুললো আর তার প্লেটের এক পাশে রাখলো। বাকি জ্যামটাকে সে ছড়ালো পুরু করে মাখন দেওয়া টোস্টের ওপর।

'তাদের তের বছরের জন্মদিনে তাদের বাবা দিলো ষ্টুয়ার্ট– হতাশাকে– একটা দামী ঘড়ি, কাঠ-মিস্ত্রীর যন্ত্র-পাতির একটা সেট আর একটা সাইকেল।'

চাকো মার্গারেট কোচাম্মার দিকে তাকালো দেখলো সে শুনছে কিনা।

'আর পিট– আশাবাদীর– ঘর সে ভরে দিলো ঘোড়ার বিষ্ঠা দিয়ে।'

চাকো টোস্টের ওপর ভাজা ডিমটা তুললো, ভাঙলো বিচক্ষণ, এদিক-ওদিক নড়া-চড়া করা কুসুমটা সামলালো আর চা চামচের তলা দিয়ে ছড়ালো স্ট্রবেরী জ্যামের ওপর।

'স্টুয়ার্ট তার উপহারগুলো খুলে মুখ গোমড়া করে বসে থাকলো সারাটা সকাল। সে চায়নি কাঠ-মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতির সেট, সে ঘড়িটাও পছন্দ হলো না আর সাইকেলটার টায়ার ছিলো অপছন্দের।'

মার্গারেট কোচাম্মা চাকোর কথা শোনা থামিয়ে দিলো কারণ সে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলো তার প্লেটের ওপর খোলামেলা হওয়া অদ্ভুত আচার অনুষ্ঠানের। জ্যাম মাখানো টোস্ট আর ভাজা ডিমটাকে কাটা হয়েছিল নিখুঁত, ছোট চারকোণা টুকরো করে। জ্যাম থেকে আলাদা করা স্ট্রবেরীগুলোকে একের পর এক টানা হচ্ছিলো, এবং কাটা হচ্ছিলো ছোট করে।

'যখন বাবা গেলেন পিটের কাছে– আশাবাদীটার কক্ষে, তিনি পিটকে দেখতে পেলেননা, কিন্তু তিনি শুনতে পেলেন উন্মাদের মতো শাবল চালানো এবং ঘন ঘন শ্বাস নেয়ার শব্দ। ঘোড়ার বিষ্ঠা উড়ছিলো সারা ঘর জুড়ে।'

চাকো তার কৌতুকের শেষাংশ ভেবে আগাম নিঃশব্দ হাসিতে কাঁপতে শুরু করেছিলো। হাসতে হাসতে হাতে, সে একটা করে টুকরো স্ট্রবেরী প্রত্যেকটা উজ্জ্বল হলুদ– লাল চারকোণা টুকরো টোস্টের উপর রাখলো– পুরো জিনিসটাকে দেখতে লাগছিলো একটা ভীষণবর্ণের জলখাবারের মতো যা কেবল কোন বাতিকওয়ালা বুড়ীই খাওয়াতে পারে তাসের পার্টিতে।

"ঈশ্বর, তুমি কি করছো?" বাবা চেঁচালেন পিটকে ডেকে।

নুন ও গোলমরিচ ছড়ানো হয়েছিলো চারকোণা টুকরো টোস্টের ওপর। চাকো একটু থামলো শেষ পংক্তিটা বলার আগে, হাসতে হাসতে মার্গারেট কোচাম্মার দিকে তাকালো আর সে তার প্লেটের দিকে তাকিয়ে হাসছিলো।

একটা কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো বিষ্ঠার ভিতর থেকে। "হ্যাঁ, বাবা," পিট বললো, "যদি চারপাশে এতো ঘোড়ার গু থাকে, তাহলে কোন জায়গায় একটা ঘোড়ার বাচ্চা থাকবেই।"

চাকো, শূন্য ক্যাফেতে দু'হাতে কাঁটা-চামচ আর ছুরি ধরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো, হাসলো হেঁড়েগলায়, হেঁচকিতোলা, ছোঁয়াচে, মোটা লোকের হাসি। থামে না– যতক্ষণ না গাল বেয়ে অশ্রু পড়ে। মার্গারেট কোচাম্মা, যে তার কৌতুকের বেশির ভাগটাই শোনেনি, সেও হাসলো। তারপর সে চাকোর হাসি দেখে হাসতে শুরু করলো। তাদের দু'জনের হাসি একে অন্যেরটাকে পুরণ করলো এবং চড়লো হিষ্টিরিয়ার মতো। যখন ক্যাফের মালিক আসলো, সে দেখলো এক খদ্দের (যাকে খুব একটা পছন্দ হচ্ছিল না), এবং এক ওয়েট্রেস (যাকে কিছুটা পছন্দ করা যায়), একটা হো হো হাসির কুণ্ডলীতে আটকে গেছে, নিরুপায় হয়ে।

ইতোমধ্যে আরেকজন খদ্দের (নিয়মিত একজন), অগোচরে এসেছেন, তিনি খাবারের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

মালিকটা মার্গারেট কোচাম্মাকে তার বিরক্তিটা বোঝাতে কিছুক্ষণ আগেই পরিষ্কার করা গ্লাসগুলো আবার পরিষ্কার করতে লাগলো ঠোকাঠুকি লাগিয়ে সশব্দে, এবং কাউন্টারের ওপর কাপ-পিরিচে ঠন-ঠন শব্দ তুলে। মার্গারেট কোচাম্মা নিজেকে পরিপার্টি করছিলো আরেকটা নতুন অর্ডার নেয়ার আগে। কিন্তু তার চোখে ছিলো জল আর দমবন্ধ করতে হয়েছিলো নতুন একটা পেটে খিল-ধরা হাসি থামাতে, যেটা অসন্তুষ্ট করলো ক্ষুধার্ত মানুষটাকে যার অর্ডার সে নিচ্ছিল, তাকালো তার মেন্যু থেকে চোখ তুলে, তার পাতলা ঠোঁটগুলো চুমরাচ্ছিল নিঃশব্দ বিরক্তিতে।

সে চুরি করে এক ঝলক দেখলো চাকোকে, সে তার দিকে তাকালো আর হাসলো। ওটা ছিলো পাগল করা বন্ধুত্বের হাসি।

চাকো তার খাওয়া শেষ করলো, দাম দিলো, আর চলে গেলো।

ক্যাফের মালিক মার্গারেট কোচাম্মার কাছে আবার আসলো এবং ক্যাফের নিয়মকানুনের ওপর একটা বক্তৃতা দিলো। সে ক্ষমা চাইলো তার কাছে। সে আসলেই লজ্জা পেয়েছিলো ওরকম হাসির জন্যে।

সেই সন্ধ্যায়, কাজের পরে, সে ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছিলো আর অস্বস্তিতে পড়লো নিজেকে নিয়ে। এমনিতে তার ছেলেমানুষী স্বভাব নেই, এবং বুঝতে পারলোনা ছোঁয়াচে রোগের মতো এমন একটা বেমক্কা হাসি কি করে আসলো। অন্ত -রঙ্গ ব্যাপারগুলো। সে ভাবছিলো কি তাকে এতো হাসিয়েছে? সে জানতো ওটা কৌতুকের জন্যে নয়।

সে ভাবলো চাকোর হাসিটা নিয়ে, আর ঐ হাসিটা তার চোখে লেগে থাকলো অনেকক্ষণ ধরে।

চাকো মাঝে মাঝেই ক্যাফেতে আসতে শুরু করলো।

সে সবসময়ই আসতো তার বন্ধুত্বের হাসি আর কল্পনার বন্ধুকে সঙ্গে করে। যখন মার্গারেট কোচাম্মা তাকে সার্ভ না করতো তখনও তার চোখ তাকেই খুঁজে বের করতো, এবং তারা গোপনে হাসি বিনিময় করতো যা তাদের সেই একসঙ্গে হাসার স্মৃতিটাকে জাগিয়ে রাখতো।

মার্গারেট কোচাম্মাও অগোছালো সজারুর দেখা পাওয়ার জন্যে অপেক্ষায় থাকতো। দুঃশ্চিন্তা ছাড়াই। তবে একটা পছন্দ বেড়ে উঠছিলো। পছন্দ। সে জানতে পারলো সে রোডস্ বৃত্তি পাওয়া ছাত্র। সে ক্লাসিকগুলো পড়ে। এবং ব্যালিওলের দলে নৌকা বাইচে অংশ নিতো।

যতদিন না মার্গারেট তাকে বিয়ে করে, সে ভাবতেও পারেনি যে সে কারো বউ হতে রাজী হবে।

কয়েক মাস পরে যখন ওরা একসঙ্গে বেড়াতে শুরু করেছিলো, সে শুরু করলো চুরি করে ওকে তার ঘরে নিতে, এক অসহায়, নির্বাসিত রাজকুমারের জীবন। তার

অক্সফোর্ড কলেজের বেয়ারা ও ধোপানীর প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তার ঘরটা নোংরা থাকতো সবসময়। বই, খালি মদের বোতল, ময়লা জাঙ্গিয়া আর সিগারেটের টুকরা ছড়িয়ে থাকতো মেঝের ওপর। আলমারীগুলো খোলা ছিলো বিপজ্জনক, কারণ কাপড়, বই আর জুতাগুলো হুড়মুড় করে পড়তে পারতো নিচে এবং তার কিছু বই এতো ভারি যা আসলেই ভালো ব্যথা দেওয়ার মতো ছিলো। মার্গারেট কোচাম্মা তার ছোট, নিয়মমানা জীবনটাকে এই অদ্ভুত পাগলাগারদে ছেড়ে দিতো, শান্ত বদ্ধ একটা ঠাণ্ডা সমুদ্রে এক উষ্ণ দেহকে প্রবেশের অনুমতি দিতো।

সে আবিষ্কার করলো যে অগোছালো সজারুর মতো চেহারার নিচে ছিলো, এক নিপীড়িত মার্কসবাদী, যে যুদ্ধ করছিলো অসম্ভবের সঙ্গে, অনিরাময়যোগ্য রোমান্টিক– যে ভুলে যেতো মোমবাতি লাগে রোমান্টিকতার জন্যে, যে মদের গ্লাস ভাংতো এবং সে আংটিটাও হারিয়েছিলো। যে তার সাথে সঙ্গম করতো এমন এক কামনা নিয়ে যা তাকে বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাস করতো। সে সবসময় নিজেকে মনে করতো কারুর মন কাড়ার অনুপযুক্ত, মোটা কোমর, মোটা গোড়ালীওয়ালা একটা মেয়ে হিসাবে ভাবতো। দেখতে খারাপ না। আবার চোখে পড়ার মতোও না। কিন্তু যখন সে চাকোর সাথে ছিলো, তার পুরনো সীমাবদ্ধতাগুলো কেটে যেতো। বিস্তৃত হতো দিগন্ত।

সে আগে কখনো এমন কোন লোকের সাক্ষাৎ পায়নি, যে পৃথিবীর কথা বলবে– পৃথিবীটা কি, পৃথিবীটা কি করে হলো, অথবা পৃথিবীর পরিণতি নিয়ে সে কি ভাবতো– সেভাবে না, যেভাবে পরিচিতেরা আলোচনা করতো, তার পরিচিতরা শুধু আলোচনা করতো তাদের চাকরী নিয়ে, তাদের বন্ধু-বান্ধব অথবা সাগরতীরে তাদের সপ্তাহ্‌র ছুটি কাটানো নিয়ে।

চাকো মার্গারেট কোচাম্মাকে অনুভব করাতো যেন তার আত্মা মুক্তি পেয়েছে সংকীর্ন ও ছোট গন্ডী থেকে তার বিশাল, সীমাহীনতায়। সে তাকে ভাবতো যেন পৃথিবীটা তাদের– যেন এটা পড়ে আছে তাদের সামনে একটা পেট কাটা ব্যাঙের মতো– ব্যবচ্ছেদ টেবিলের ওপর, পরিচিত হওয়ার জন্যে যে মিনতি করছে।

বিয়ের আগে, যে বছর সে তাকে জানলো, মার্গারেট কোচাম্মা সে সময় নিজের মধ্যে আবিষ্কার করলো একটা যাদু, একদিন তার মনে হলো যেন একটা হাসিখুশী দৈত্য বের হয়েছে তার প্রদীপ থেকে। সে হয়তো ছিলো খুব তরুণ এই উপলব্ধি থেকে সে ভেবেছিলো তার ভালোবাসা চাকোর জন্যে হলেও আসলে তা ছিলো তার নিজের জন্যেই। একই সময়ে তৈরী হলো ভীরু আত্মবিশ্বাস ।

চাকোর জন্যে, মার্গারেট কোচাম্মা ছিলো প্রথম মেয়ে বন্ধু এমন আগে কখনোও পায়নি। প্রথম মেয়ে নয়– যার সাথে সে শুয়েছে, তবে তার প্রথম সঙ্গী। চাকোর যেটা সবচেয়ে ভালোলাগতো মার্গারেট কোচাম্মার, সেটা হলো, তার নিজস্ব পূর্ণতা হয়তো ওটা গড়পড়তা ইংরেজ রমণীর জন্যে তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলো না, কিন্তু চাকোর জন্যে তা ছিলো জরুরী।

সে ভালোবাসতো এ সত্যিটা মার্গারেট কোচাম্মা সবসময় তার সাথে লেগে থাকতো না। তাদের সম্পর্কের শেষের দিকে মার্গারেট কোচাম্মা হয়ে পড়েছিলো দিশেহারা, মনে হতো তার জন্যে চাকোর কোন অনুভূতিই নেই। শেষ দিন পর্যন্ত সে জানতো না যে চাকো তাকে বিয়ে করবে কি করবে না। চাকো উপভোগ করতো তার বিছানার ওপর মার্গারেটের কাপড়চোপড় খুলে বসা, তার লম্বা সাদা পিঠ চাকোর দিকে ঘোরানো এবং বার বার ঘড়ির দিকে তাকানো আর একটু পরপর বলা– 'ওহ! আমাকে যেতে হবে।' চাকো ভালোবাসতো প্রতিদিন সকালে মার্গারেট কাঁপা কাঁপা হাতে যেভাবে সাইকেল চালিয়ে কাজে যেতো, তা দেখতে। সে মার্গারেট ও তার মধ্যে মতের পার্থক্য হওয়াকে উপভোগই করতো, ভিতরে ভিতরে উল্লসিত হতো তার হঠাৎ চেঁচানোতে, যা ঘটতো তার অধঃপতনের জন্যে বিরক্ত করার ফলে।

চাকো কৃতজ্ঞ ছিলো মার্গারেট কোচাম্মার প্রতি, তাকে খবরদারি না করার জন্যে। তার এলোমেলো ঘরটা গোছাতে না চাওয়ার জন্যে। তার ক্লান্ত করা 'মা' না হওয়ার জন্য। চাকো অদ্ভুতভাবে মার্গারেট কোচাম্মার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো না নির্ভর করার জন্যে। সে তাকে সম্মান করতো তাকে সম্মান না করার জন্যে।

চাকোর পরিবার সম্বন্ধে মার্গারেট জানতো খুবই কম। সে খুব কমই বলতো তাদের কথা।

আসল সত্যিটা ছিলো তার অক্সফোর্ডের দিনগুলোই, চাকো তাদের খবর পেতো খুব কম। তখন তার জীবন এত ঘটনাবহুল ছিলো যে, এইমেনেমকে মনে হতো অনেক দূরে। নদীটাকে মনে হতো খুব ছোট। মাছ মনে হতো খুবই কম।

চাকো তার বাবা মায়ের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক রাখার সঠিক কারণ খুঁজে পেতো না। রোড্স এর বৃত্তিটা ছিলো খুব ভালো। তার টাকা লাগতো না। সে গভীর প্রেমে ডুবে ছিলো মার্গারেট কোচাম্মার সঙ্গে আর তার হৃদয়ে অন্য কারুর জন্যে কোন জায়গা ছিলনা।

মামাচি অবশ্য তাকে লিখতো নিয়মিত, তার ও তার স্বামীর নোংরা হৈ-চৈ ঝগড়ার কথা আর আম্মুর ভবিষ্যতের ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে। চাকো অবশ্য খুব কম চিঠিই পুরোপুরি পড়ে শেষ করতো। কখনো কখনো সে কষ্ট করে খুলতোও না অনেক চিঠি। সে চিঠির উত্তরও দিতো না।

এমনকি একবার যে সে এইমেনেমে ফিরে গিয়েছিলো (যেবার সে পাপাচিকে থামিয়েছিলো মামাচিকে পিতলের ফুলদানী দিয়ে পেটানো থেকে এবং যেবার একটা রকিং চেয়ারকে টুকরা করা হয়েছিলো চাঁদের আলোয়) তখনো সে বুঝতে পারেনি তার বাবা কতটা যন্ত্রণা পেয়েছিলো, অথবা চাকোর জন্যে তার মায়ের দ্বিগুন বাড়া ভক্তি, কিংবা তার তরুণী বোনের হঠাৎ সৌন্দর্যের ব্যাপারও সে পাত্তা দিতো না। সে আসলো আর গেলো একটা ঘোরের মধ্যে, সেখানেও প্রবল টান অনুভব করতো কবে লম্বা পিঠওয়ালা সাদা মেয়েটার কাছে ফিরে যাবে, যে তার জন্য অপেক্ষা করেছিলো।

সেবারের শীতে, ব্যালিওল থেকে ফিরে আসার পর (খুব খারাপ করেছিলো পরীক্ষায়) মার্গারেট কোচাম্মা আর চাকো বিয়ে করলো। মার্গারেট কোচাম্মা যেমন তার পরিবারের অনুমতি নিলো না, চাকোও জানালো না তার মা-বাবাকে।

ওরা ঠিক করলো, চাকো মার্গারেট কোচাম্মার ফ্ল্যাটে উঠবে (মার্গারেট কোচাম্মার ক্যাফের সহকর্মী মেয়েটাকে ভাগিয়ে) যতোদিন না চাকো কোনো কাজ পায়।

বিয়ের সময়টা ছিলো সবচেয়ে খারাপ।

একসঙ্গে থাকার চাপের সঙ্গে যোগ হলো নিদারুণ দারিদ্র্য। বৃত্তির টাকা ছিলো না আর ফ্ল্যাটের পুরো ভাড়া বাকি ছিলো।

চাকোর নৌকা বাইচের দাঁড় বাওয়া শেষ হয়ে গেলো হঠাৎ- সময়ের আগেই, মধ্য বয়সের ছাপ পড়লো। চাকো পরিণত হলো মোটা মানুষে, তবে তার হাসির সঙ্গে মানানসই ছিল শরীরটা।

বিয়ের এক বছরেই মার্গারেট কোচাম্মার চাকোর সৌন্দর্য্যের ছাত্রের মতো কুড়েমিপ্রীতির আকর্ষণ গেলো কমে। ওটা আর তাকে খুশি করলোনা কারণ মার্গারেট কোচাম্মা যখন কাজে যেতো, ফিরে এসে দেখতো ফ্ল্যাটটা নোংরা হয়ে আছে ঠিক যেভাবে সে ফেলে রেখে গেছে সেরকমই। চাকোর পক্ষে বিছানা গোছানো, কাপড় ধোয়া, কিংবা প্লেটগুলো পরিষ্কার করা অসম্ভব ছিলো। চাকো সিগারেটের নতুন সোফা পোড়ানোর জন্যে ক্ষমা চাইলো না। নিজের শার্টের বোতাম পর্যন্ত লাগাতে পারতোনা, চাকরীর ইন্টারভিউয়ের সময় সে নিজের টাই আর জুতোর ফিতেও বাঁধতে পারতোনা। এক বছরের মধ্যে মার্গারেট প্রস্তুতি নিলো ব্যবচ্ছেদ টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ব্যাঙটাকে বদলে নিতে। ছোট একটা বাস্তববাদী 'ছাড়' এর সঙ্গে। যেমন তার স্বামীর জন্যে একটা চাকরী আর একটা পরিচ্ছন্ন বাড়ি।

ঘটনাক্রমে চাকো একটা কম বেতনের চাকরী পেলো, ভারতীয় চা বোর্ডের 'বৈদেশিক বিক্রয় শাখায়।' সে আশা করছিলো যে এটা তাকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে, চাকো আর মার্গারেট লন্ডনে চলে গেলো। তাদের ছোট আর ঘুপচি ঘরগুলোয়। মার্গারেট কোচাম্মার বাবা-মা তাদের সঙ্গে দেখা করলেন না।

মার্গারেট আবিষ্কার করলো যে সে গর্ভবতী, ঠিক তখনই যখন সে জো এর সঙ্গে পরিচিত হলো। জো, মার্গারেটের ভাইয়ের স্কুলের পুরনো বন্ধু। যখন জো তাকে দেখলো তখন মার্গারেট কোচাম্মা ছিলো তার সৌন্দর্য্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল অবস্থায়। অন্তঃসত্তা হওয়ায় ফলে তার গালে ফুটেছিলো একটা রঙীন আভা এবং একটা উজ্জ্বলতা এসেছিলো তার ঘন কালো চুলে। তার দাম্পত্য সমস্যাগুলো থাকলেও তার ছিলো এক গোপন উল্লাসের ভাব, সেই ভালো লাগাটা যা অন্তঃসত্তা মহিলাদের থাকে।

জো ছিলো জীববিজ্ঞানী। সে তার জীববিদ্যার অভিধানের তৃতীয় সংস্করনটাকে হালনাগাদ করতে ব্যস্ত ছিলো একটা ছোট প্রকাশনা সংস্থায়। জো'র সবকিছুই ছিলো যা চাকোর ছিলো না।

স্থিরতা। আর্থিক সক্ষমতা। পাতলা।

মার্গারেট কোচাম্মা তার দিকে ঝুঁকলো যেমন অন্ধকার ঘরে থাকা সবকিছুই যেতে চায় আলোর দীর্ঘ রেখার দিকে।

যখন চাকো তার কাজটা খোয়ালো আর আর একটা চাকরী পাচ্ছিলনা, তার বিয়ের কথা জানিয়ে এবং কিছু টাকা চেয়ে সে মামাচিকে লিখলো। মামাচি একেবারে ভেঙে পড়লেন, গোপনে তাঁর গহনাগুলো বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করে পাঠিয়ে দিলেন ইংল্যাণ্ডে চাকোর কাছে। টাকাটা তার প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই ছিলো না। ওটা কোনও কাজেই আসলো না।

এরইমধ্যে সোফি মল জন্মালো, মার্গারেট কোচাম্মা বুঝলো চাকোকে ছাড়তে হবে তার নিজের আর মেয়ের জন্যে। সে চাকোর কাছে ডিভোর্স চাইলো।

চাকো ইন্ডিয়ায় ফিরে গেলো, সেখানে সে একটা চাকরী পেলো খুব সহজেই। কয়েক বছর সে শিক্ষকতা করলো মাদ্রাজের খৃষ্টান কলেজে, আর পাপাচির মৃত্যুর পর, সে ফিরে গেলো এইমেনেমে তার ভারত বোতলের ছিপি লাগানোর মেশিন নিয়ে, তার ব্যালিওল দলের বৈঠা আর ব্যর্থ হৃদয় নিয়ে।

মামাচি খুশিমনে তাকে স্বাগত জানালেন তাঁর জীবনে। তিনি তাকে খাওয়াতেন, তার জামা কাপড় সেলাই করে দিতেন, তার ঘরে প্রতিদিন তাজা ফুল রাখতেন। চাকোর প্রয়োজন ছিলো মায়ের স্নেহের। আসলে, সে ওটা দাবী করছিলো, যদিও এজন্যে সে তাকে বকতো এবং গোপন কৌশলে তাকে শাস্তি দিতো। চাকো চাষ করা শুরু করলো তার মেদ কমাতে আর শরীরের ধ্বংসকে ঠেকাতে। সে পরতো সাদা ধুতির ওপর সস্তা, ছাপা টেরিলিনের বুশ শার্ট এবং সবচেয়ে বিশ্রী প্লাষ্টিকের স্যান্ডেল। মামাচির কাছে যদি অতিথি আসতো, আত্মীয়, অথবা হয়তো পুরনো কোন বন্ধু– যারা বেড়াতে আসতো দিল্লী থেকে, চাকো ভূতের মতো হাজির হতো মামাচির ছিমছাম খাওয়ার টেবিলে। আর্কিড আর চিনেমাটির জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো ছিলো খাবার ঘরটা আর চাকো ঢুকতো ঝড়ো কাকের মতো পুরনো পাঁচড়া বা কনুইতে 'চুলকানির' দাগ নিয়ে।

তার বিশেষ লক্ষ্য ছিলো বেবি কোচাম্মার অতিথি– ক্যাথলিক যাজক কিংবা সাক্ষাৎপ্রার্থী অন্য ধর্মের যাজকদের দিকে– যারা প্রায়ই আসতো খাওয়ার জন্যে। তাদের উপস্থিতিতে চাকো তার চটিগুলো খুলতো আর পায়ে বাতাস লাগাতো, ফলে বের হয়ে থাকতো তার পায়ের পুঁজ ভরা ডায়াবেটিক ফোঁড়া।

'প্রভু, দয়া করো এই কুষ্ঠ রোগীকে,' সে বলতো, বেবি কোচাম্মা প্রাণপনে চেষ্টা করতেন ঐ দৃশ্য থেকে মেহমানদের মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরানোর জন্যে, তাদের দাড়িতে লেগে থাকা বিস্কুটের গুঁড়োঝাড়া আর কলার খোসার টুকরাগুলো তুলে ফেলার চেষ্টা করতেন।

কিন্তু এ গোপন শাস্তিগুলো, যে সব দিয়ে চাকো মামাচিকে কষ্ট দিতো, তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আর অপমানকর যন্ত্রণার ছিলো– যখন সে মার্গারেট

কোচাম্মার কথা বলতো। সে প্রায়ই তার কেচ্ছা বলতো এক অদ্ভুত অহংকারের সাথে। যেন সে তাকে শ্রদ্ধা করতো তাকে ডিভোর্স দেয়ার জন্যে।

'সে আমাকে ছেড়েছে আরেকটা ভালো লোকের জন্যে,' সে বলতো মামাচিকে, আর মামাচি সেখান থেকে ঘরে চলে যেতেন, যেন চাকো নিজেকে কলংকিত না করে করেছে তাকে।

মার্গারেট কোচাম্মা চাকোকে নিয়মিত লিখতো, সোফি মলের খবর জানাতে। সে চাকোকে নিশ্চিন্ত করতো যে জো খুব ভালো ও স্নেহপ্রবণ বাবা এবং সোফি মল তাকে সমানভাবে কষ্ট আর আনন্দ দেয়।

মার্গারেট কোচাম্মা জো'র সাথে সুখীই ছিলো। চাকোর সঙ্গে থাকা অনিশ্চয়তার বছরগুলোর চেয়ে হয়তো ভাল। চাকোর কথা সে ভাবতো গভীর স্নেহের সঙ্গে, কিন্তু কোনরকম অনুশোচনা ছাড়াই। তার মাথায় আসতো না কেমন করে সে তাকে এতো কষ্ট দিয়েছিলো, কারণ তখনও সে নিজেকে এক সাধারণ মেয়ে হিসাবেই ভাবতো, আর চাকোকে এক অসাধারণ মানুষ বলেই মনে করতো।

এবং যেহেতু চাকোর তখন, বা তার পরে, দুর্দশার বা হৃদয়ের আঘাতের কোন স্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যায়নি, তাই মার্গারেট কোচাম্মা ধরে নিয়েছিলো যে চাকো মনে করেছিলো, তাদের সম্পর্কটা ছিলো একটা ভুল, বেশি ছিলো তার নিজের জন্যে। যখন সে চাকোকে জো'র কথা বললো এবং চাকো চলে গেলো যন্ত্রণা নিয়ে, কিন্তু নীরবে তার অদৃশ্য সঙ্গী আর তার বন্ধুটানা হাসি নিয়ে।

তারা দু'জনেই চিঠি লিখতো প্রায়ই আর দীর্ঘ সময়ে তাদের সম্পর্কটা গভীর হয়েছিলো। মার্গারেট কোচাম্মার জন্যে এটা হয়েছিলো নির্ঝঞ্ঝাট বন্ধুত্ব। চাকোর জন্যে ছিলো একটা পথ, একমাত্র পথ, তার সন্তানের মায়ের সঙ্গে এবং একমাত্র মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার পথ– যাকে সে ভালোবেসেছে।

যখন সোফি মল স্কুলে যাওয়ার মতো বড়ো হলো, মার্গারেট কোচাম্মা তখন ভর্তি হলো এক শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের কোর্সে আর একটা চাকরীও পেলো ক্লাফামের এক স্কুলের নিচু ক্লাসের শিক্ষিকার। যখন জো এর দুর্ঘটনার কথা শুনতে পেলো তখন সে ছিলো টিচার্স রুমে। খবরটা পৌঁছিয়েছিলো এক তরুণ পুলিশ, যার মুখে ছিলো একটা গোমড়া ভাব আর হেলমেটটা ছিলো তার হাতে। তাকে মজার মনে হচ্ছিলো যেন এক অভিনেতা একটা গুরুগম্ভীর চরিত্রের জন্যে হঠাৎ অভিনয় করছে। মার্গারেট কোচাম্মা পরে মনে করতে পেরেছিলো যে পুলিশটাকে দেখে তার প্রথমে হাসি পেয়েছিলো।

সোফি মলের জন্যে, তার জন্যে না হলেও, মার্গারেট কোচাম্মা চেষ্টা করলো মনের জোর ঠিক রেখে স্থিরভাবে দুঃসময়ের মুখোমুখি হতে। সে ছুটি নিলো না স্কুল থেকে। খেয়াল রাখলো যেন সোফি মলের স্কুলের দৈনন্দিন কাজ ঠিক মতো চলে– 'তোমার বাড়ির কাজ শেষ কর, তোমার ডিম না খেলে আমরা স্কুলে যাবো না'– এসব বলা চালিয়ে গেলো।

সে গোপন রাখলো তার মনের দুর্দশা আর যন্ত্রণাকে। কঠোর, মাস্টারনীর মাপের ব্রহ্মাণ্ডে এক গর্ত (যে মাঝে মাঝে থাপ্পড় মারতো)।

কিন্তু যখন চাকো তাকে লিখলো, এইমেনেমে আমন্ত্রণ জানালো, তখন কিছু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার বুকের ওপর বসে পড়লো। চাকো আর তার মধ্যে যা ঘটেছে তা সত্ত্বেও। তখন পৃথিবীতে ভালো এমন কেউ ছিলোনা মার্গারেটের জন্যে যার সঙ্গে সে বড়দিনটা কাটাতে পারতো। মার্গারেট ওটাকে মনে করলো সবচেয়ে ভালো এবং আকৃষ্টও হলো। সে নিজেকে বোঝালো যে ভারতে এমন একটা লোক সোফি মলের জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার হবে।

কিন্তু ঘটনাক্রমে, যদিও সে জানতো তার দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর এতো তাড়াতাড়ি প্রথম স্বামীর কাছে দৌড়ে যাওয়াটা খারাপ দেখাবে– তার বন্ধুরা এবং স্কুলের সহকর্মীরা এটাকে ভালোভাবে নেবেনা– তারপরও মার্গারেট কোচাম্মা তার ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙলো আর প্লেনের দু'টো টিকেট কিনলো। লন্ডন-বোম্বে-কোচিন।

সে ঐ সিদ্ধান্তটা নেওয়ার জন্যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অনুশোচনা করেছিলো।

সে যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়েছিলো সোফি মলকে, আসলে নিয়েছিলো সোফির কবরের ছবিটা যাতে সোফির দেহ পড়েছিলো এইমেনেমের বাড়ির বসার ঘরের সোফায়। কিছু দূর থেকে দৃশ্যটা দেখলেও ঠিকই বোঝা যাচ্ছিলো যে সে মৃত। অসুস্থ বা ঘুমন্ত নয়। বোঝা যাচ্ছিল তার শোয়ার ধরণ দেখে। তার হাত-পায়ের। মৃত্যুর দখলদারীর সঙ্গে যোগসূত্রে। ভয়ঙ্কর স্থিরতার জন্যে।

সবুজ আগাছা এবং নদীর নোংরা আটকেছিলো তার সুন্দর লালচে বাদামী চুলে। তার গর্তের ভিতর ঢুকে থাকা চোখের পাতাগুলো ছিলো মাছে ঠোকরানো (ও হ্যাঁ মাছগুলো ওরকম করে, গভীর জলে সাঁতার কাটা মাছ। কারণ ওরা সবকিছুর স্বাদ নিতে চায়)। তার বেগুনী রঙের আংরাখা বললো ছুটি! একটা হেলানো, সুখী আকারের অক্ষরে। চামড়া কুঁচকে গিয়েছিলো তার, যেমন হয় ধোপার বুড়ো আঙুল– অনেক্ষণ জলে ডুবে থাকার ফলে।

একটা স্পঞ্জের মতো জলকন্যা, যে ভুলে গিয়েছিলো সাঁতার কাটতে।

একটা রূপোর তৈরী অঙ্গুঠী আটকে ছিলো সৌভাগ্যের প্রতীকের মতো তার ছোট্ট মুঠোয়।

'ঘটিতে জল খাওয়া।'

কফিন টানা গাড়িতে চড়া।

মার্গারেট কোচাম্মা কখনও নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি সোফি মলকে এইমেনেমে আনার জন্যে। সে আর চাকো সপ্তাহ্র ছুটি কাটাতে আর তাদের ফিরতি টিকেট কনফার্ম করতে যখন কোচিনে গিয়েছিলো তখন তাকে রেখে যাওয়ার জন্যেও ছিলো অনুশোচনা।

তখন সময় ছিলো সকাল প্রায় ন'টা যখন মামাচি আর বেবি কোচাম্মা খবর পেলেন একটা সাদা বাচ্চার ভেসে ওঠা মরদেহ পাওয়া গেছে নদীর ভাটির দিকে যেখানে মীনাচল নদী চওড়া হয়ে ব্যাকওয়াটারের দিকে যাচ্ছে। এসথা আর রাহেলকে তখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সেদিনও সকালের প্রথমদিকে বাচ্চারা– তিনজনই গ্লাস ভরা সকালের দুধ খেতে আসেনি। বেবি কোচাম্মা আর মামাচি ভেবেছিলেন হয়তো ওরা সাঁতার কাটতে নদীতে গেছে ওটা নিয়েও দুঃশ্চিন্তা ছিলো, তার আগের দিন এবং রাতেও প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিলো। তাঁরা জানতেন যে নদী বিপজ্জনক হতে পারে। বেবি কোচাম্মা তাদের খোঁজার জন্য কচু মারিয়াকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সে তাদেরকে খুজে না পেয়ে ফিরে আসলো। হৈ চৈ শুরু হয়েছিলো ভিল্লে পাপেনের আসার পর। কেউ মনে করতে পারছিলোনা শেষ কখন বাচ্চাদের দেখা গেছে। কারো মনের মধ্যেই বাচ্চাদের নিয়ে তেমন চিন্তা ছিলো না। তারা হয়তো রাতেই হারিয়ে গিয়েছিলো।

আম্মু তখনও শোবার ঘরে তালাবন্ধ ছিলো। চাবি ছিলো বেবি কোচাম্মার কাছে। তিনি দরজার ভিতর দিয়ে আম্মুকে জিজ্ঞেস করলো যে, বাচ্চারা কোথায় আছে সে জানে কিনা। তিনি চেষ্টা করছিলেন ভয়টাকে গলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে, এমনভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করলেন যেন এমনিতেই খোঁজ করছেন। কিছু একটা ধাক্কা খেলো দরজার সঙ্গে। রাগে এবং অবিশ্বাসে আম্মু পাগল পারা হয়ে গিয়েছিলো তার সঙ্গে যা করা হয়েছিলো তার জন্যে– পাগলদের পরিবারে এক মধ্যযুগীয় বাড়িতে তাকে বন্ধ করে রাখার জন্য সে খুঁজছিলো প্রতিশোধের উপায়। এটা হলো আরও কিছুক্ষণ পর, যখন পৃথিবীটা ধ্বসে পড়লো তাদের চারিদিকে, সোফি মলের মৃতদেহটা এইমেনেমের বাড়িতে আনার পর, বেবি কোচাম্মা তাকে বের হতে দিলেন, রোষ থেকে আম্মু পরিণত হলো সান্তনা দানকারীতে। ভয় এবং ভাবনা তাকে জোর করে চিন্তা করালো, আর সেটা হলো শুধু তখনই যখন সে মনে করতে পারলো কি সে বলেছিলো তার যমজ বাচ্চাদের ওরা যখন এসেছিলো তার শোবার ঘরের দরজায় আর প্রশ্ন করেছিলো কেন তাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বেয়াড়া শব্দগুলো সে তখন বোঝাতে চায়নি।

'তোদের জন্যে!' আম্মু চেঁচিয়েছিলো। 'যদি তোরা না হতিস তবে আমার এখানে থাকতে হতোনা! এসবের কোন কিছুই ঘটতোনা! আমি এখানে থাকতামনা! আমি মুক্ত থাকতে পারতাম! যেদিন তোরা জন্ম নিয়েছিলি আমার উচিত ছিলো তোদের এতিমখানায় ফেলে আসা! আমার ঘাড়ের উপর তোরা হলি পাথর!'

সে তাদেরকে দেখতে পায়নি গুটিসুঁটি মেরে দরজার পাশে ছিলো ওরা। একটা অবাক হওয়া চুলের নষ্ট ভাঁজ আর লাভ ইন টোকিওতে বাঁধা চুলের ঝর্না। অবাক হওয়া যমজ দূত দু'জন কিসের কেবল ঈশ্বরই জানেন! মহামান্য দূত ই, পেলভিস আর এস, ইনসেক্ট।

'এখান থেকে চলে যা!' আম্মু বললো, 'তোরা চলে যেতে পারিস না এবং আমাকে একা থাকতে দিতে পারিস না?'

তাই তারা করেছিলো।

কিন্তু যখন বেবি কোচাম্মা বাচ্চাদের নিয়ে প্রশ্ন করে জবাবে কেবল এই উত্তরটা পেলেন যে, কিছু একটা আম্মুর শোবার ঘরের দরজার সাথে ধাক্কা খাচ্ছে, তিনি চলে গেলেন। একটা ধীরে আসা ভয় তাঁর মধ্যে তৈরী হলো যখন তিনি করতে শুরু করলেন যা অনিবার্য, যুক্তিসংগত আর সম্পূর্ণ ভুল যোগসূত্র ছিলো সেই রাতের ঘটনাগুলোর সঙ্গে হারানো বাচ্চাদের।

বৃষ্টিটা শুরু হয়েছিলো আগের দিন বিকেলের আগে। হঠাৎ করে গরম দিনটা গাঢ় হলো আর আকাশটা শুরু করলো গজরাতে। কচু মারিয়া, খারাপ মেজাজ নিয়ে কোন কারণ ছাড়াই, রান্নাঘরে তার নিচু টুলের উপর দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুরভাবে আঁশ ছাড়াচ্ছিলো একটা বড় মাছের, গন্ধওয়ালা মাঁছের আঁশ ছিটকে ওঠায় মনে হচ্ছিলো শিলাবৃষ্টি আর ঝড় হচ্ছে। তার কানের সোনার দুল দুলছিলো প্রচণ্ডভাবে। রূপালী মাছের আঁশ উড়ছিলো রান্নাঘরের চারিদিকে, পড়ছিলো কেটলির ওপর, দেয়ালে, সব্জী ছেলার চাকুর ওপর, ফ্রিজের হাতলের ওপর। সে অবহেলা করলো ভিল্লে পাপেনকে যখন সে রান্না ঘরের দরজায় আসলো, সম্পূর্ণ ভেজা, কাঁপছিলো। তার আসল চোখটা ছিলো রক্তলাল আর তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো সে মদ গিলেছে। সে নিজের উপস্থিতি টের পাওয়াতে সেখানে অপেক্ষা করলো দশ মিনিট। যখন কচু মারিয়া মাছটা শেষ করে পেঁয়াজগুলো ধরলো, ভিল্লে পাপেন তার গলা খাঁকারি দিলো আর মামাচিকে ডাকতে বললো। কুচ মারিয়া চেষ্টা করলো তাকে তাড়িয়ে দিতে, কিন্তু সে গেলোনা। প্রত্যেক বার যখনই সে মুখ খুলছিলো কথা বলার জন্যে, তার নিঃশ্বাস থেকে ভেসে আসা তাড়ির গন্ধ কচু মারিয়াকে হাতুড়ির মতো বাড়ি মারছিলো। কচু মারিয়া আগে কখনও ভিল্লে পাপেনকে এরকম দেখেনি, আর সে একটু ভয়ই পেয়েছিলো। তার খুব ভালো ধারণা ছিলো এটা কি জন্যে, তাই সে ঠিক করলো যে মামাচিকে ডাকাই ঠিক হবে। সে রান্নাঘরের দরজাটা লাগালো, ভিল্লে পাপেনকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে বললো, সে টলছিলো মাতালের মতো অঝোর বৃষ্টির মধ্যে। যদিও সেটা ছিলো ডিসেম্বর মাস, কিন্তু এমন বৃষ্টি হচ্ছিলো যেন জুন মাস। 'সাইক্লোনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ' বলে পরের দিন খবরের কাগজে আবহাওয়া বার্তা বেরিয়েছিলো। কিন্তু খবরের কাগজ পড়ার মতো মনের অবস্থা তখন কারোরই ছিলোনা।

হয়তো বৃষ্টিটাই ভিল্লে পাপেনকে নিয়ে এসেছিলো রান্নাঘরের দরজায়। কুসংস্কারে বিশ্বাসী এমন লোকের কাছে, অসময়ের ঐ অবিরাম বৃষ্টি মনে হতে পারে ঈশ্বরের অভিশাপের মতো। মাতাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকটার কাছে এটা হতে পারতো পৃথিবীর জন্যে বিনাশের শুরু। যা, একদিক থেকে ওরকমই ছিলো।

মামাচি রান্নাঘরে আসলেন বিবর্ণ গোলাপী ড্রেসিং গাউন পরে যার কোণা ছিলো আকাঁ বাঁকা, ভিল্লে পাপেন রান্নাঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে মামাচিকে দিতে চাইলো তার বন্ধক রাখা পাথরের চোখটা। সে চোখটাকে হাতের তালুতে ধরে রাখলো খোলা অবস্থায়। সে বললো ওটা পাবার যোগ্য সে নয় এবং চাচ্ছিলো যাতে তিনি সেটা ফেরৎ নেন। তার বাঁ দিকের চোখের পাতাটা ঝুলে পড়েছিলো খালি গর্তটার মধ্যে একটা নিশ্চল, দানবীয় পিটপিটানি ছিলো।

যেন সবকিছু– যা সে বলছিলো তা যেন ছিলো হুল্লোড়ে নাটকের গল্প।

'কি হয়েছে?' মামাচি জিজ্ঞেস করলেন, হাত টান টান করে, ভাবতে লাগলেন, হয়তো সকালে দেয়া এককিলো লাল চাল কোন কারণে ভিল্লে পাপেন ফেরৎ দিতে এসেছে।

'এটা ওর চোখ,' কচু মারিয়া জোরে বললো মামাচিকে, পিঁয়াজের ঝাঁজে তার নিজের চোখ সজল। ততক্ষণে মামাচি ছুঁয়েছেন কাঁচের চোখটাকে। তিনি ভয়ে পিছনে সরে আসলেন ওটার পিচ্ছিল কঠিন শীতলতার জন্যে। ওটার পাতলা মার্বেল পাথরের চেহারা দেখে।

'তুই কি মাতাল?' মামাচি বললেন রেগে গিয়ে বৃষ্টির মতো শব্দে। 'তুই কোন সাহসে এই অবস্থায় এখানে এসেছিস?'

মামাচি হাতড়ে হাতড়ে গেলেন বেসিনের দিকে, আর সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে ধুলেন ভেজা পারাভানের চোখের রস। মামাচি ধোয়া শেষ করে হাত শুঁকলেন। কচু মারিয়া ভিল্লে পাপেনকে রান্নাঘরের একটা পুরনো কাপড় দিলো গা মুছতে, কিন্তু কিছুই বললো না, সে তখন দাঁড়িয়েছিলো সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে, প্রায়ই তার উঁচুজাতের রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে গেলে সে চেঁচামেচি করতো, সেদিন নিজেকে শুকাচ্ছিলো, হেলানো ছাদের কোণায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে।

যখন সে শান্ত হলো, ভিল্লে পাপেন তার নিজের চোখের গর্তে ফেরত দিলো চোখটাকে আর কথা বলতে লাগলো। সে আসল কথায় যাওয়ার আগে বলতে লাগলো কিভাবে মামাচির পরিবার তার পরিবারের জন্য কতকিছু করেছে। পুরুষের পর পুরুষ ধরে। কিভাবে, কম্যুনিষ্টরা চিন্তা করার অনেক আগে থেকেই, রেভারেণ্ড ই জন ইপে ভিল্লের বাবা কেলানকে, জমির মালিকানা দিয়েছিলেন যেটার ওপর এখন তাদের কুঁড়েঘরটা দাঁড়িয়ে আছে। কিভাবে মামাচি তার কৃত্রিম চোখের জন্যে পয়সা দিয়েছিলেন। কিভাবে তিনি ভেলুথার পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাকে চাকরীও দিয়েছিলেন ...।

মামাচি, যদিও অসন্তুষ্ট ছিলেন তার মাতলামোর জন্যে, তবে তাঁর আর তাঁর পরিবারের খৃষ্টান দানশীলতার কথার বয়ান শুনতে তাঁর খারাপ লাগছিলো না। কোন কিছুই তাঁকে প্রস্তুত করেনি, যা তিনি একটু পরে শুনবেন তার জন্যে।

ভিল্লে পাপেন কাঁদতে শুরু করলো। তার অর্ধেক কান্না। পানিতে ভরে উঠলো তার আসল চোখ আর পানি গড়িয়ে তার কালো গাল চক্‌চক্ করে উঠলো। তার অন্য চোখটা দিয়ে সে তাকালো সোজা সামনের দিকে পাথরের মতো। এক বুড়ো পারাভান, যে অতীতে দেখেছিলো সম্মান দেখানোর জন্যে পিছন দিকে হাঁটার দিনগুলোকে, যা ছিলো আলাদা করা আনুগত্য ও ভালোবাসার ভিতরে।

তারপর ভয়টা তাকে চেপে ধরলো এবং শব্দগুলোকে ঝাঁকিয়ে বের করলো তার ভিতর থেকে। সে মামাচিকে বললো যা সে দেখেছে। গল্পটা ছিলো ছোট নৌকার। যেটা রাতের পর রাত নদী পার হয়ে যেতো, এবং তার মধ্যে থাকতো তার...। এক পুরুষ আর এক নারীর গল্প, চাঁদের আলোতে ওরা দাঁড়িয়ে থাকতো একসঙ্গে। গায়ে গা লাগিয়ে।

ওরা যেতো কারি সাইপুর বাড়িতে, ভিল্লে পাপেন বললো। সাদা লোকটার ভূত তাদের মধ্যে ঢুকেছিলো। এটা ছিলো ভিল্লে পাপেনের ওপর কারি সাইপুর প্রতিশোধ তার কৃতকর্মের জন্য। নৌকাটা (যেটার উপর এস্‌থা বসেছিলো এবং রাহেল যেটা পেয়েছিলো) বাঁধা ছিলো গাছের গুঁড়ির সাথে খাড়া পথের পাশ দিয়ে যেটা গিয়েছে জলার পাশ দিয়ে, ফেলে রাখা রাবার বাগানে। সে ওটা দেখতো সেখানে। প্রত্যেক রাতে। পানির ওপর দুলতো। শূন্য। প্রেমিক-প্রেমিকাদের ফিরে আসার অপেক্ষায়। ঘন্টার পর ঘন্টা ওটা অপেক্ষা করতো। কখনো যুগলরা আবির্ভূত হতো ভোর বেলায় লম্বা ঘাসের মধ্যে থেকে। ভিল্লে পাপেন তাদেরকে নিজের চোখে দেখেছে। অন্যরাও তাদের দেখেছে। সারা গ্রাম জানে। মামাচির জানাটা কেবল একটু দেরি। মামাচিকে তাই ভিল্লে পাপেন নিজেই বলতে এসেছে : এক পরাভান এবং এক বিশ্বস্ত লোক হিসাবে যার দেহের খানিকটা বন্ধক দেওয়া, সে এটাকে কর্তব্য মনে করে।

প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল। ভিল্লে ও মামাচির মধ্যে থেকে ছিটকে উদয় হলো। ভিল্লের ছেলে ও মামাচির মেয়ে। তারা অচিন্ত্যনীয়কে চিন্ত্যনীয় করেছিলো আর অসম্ভবকে সত্যিই ঘটিয়েছিলো।

ভিল্লে পাপেন কথা বলতে থাকলো। কাঁদতে কাঁদতে। বমি করার মতো মুখ বিকৃত করে। তার মুখ নাড়িয়ে। মামাচি শুনতে পাচ্ছিলেননা কী সে বলছিলো। বৃষ্টির শব্দটা বেড়ে জোরে হলো আর তার মাথায় বিস্ফোরিত হলো। সে নিজের চেঁচানিও শুনতে পেলোনা।

হঠাৎ করে খাঁজকাটা ড্রেসিং গাউন পরা আর পাতলা ছাইরঙা চুলে একটা ইঁদুরের লেজের মতো বেনী করা অন্ধ বৃদ্ধ মহিলাটি সামনে এগিয়ে আসলেন এবং ভিল্লে পাপেনকে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা মারলেন। সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো

পিছন দিকে, রান্নাঘরের সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে থাকলো হাত পা ছড়িয়ে কাদার মধ্যে। আঘাতটা যে আসবে তা কেউ-ই আঁচ করতে পারেনি। কুসংস্কারের নিয়মে কোন অচ্ছুৎকে স্পর্শ করা যেতে পারেনা, তা মনে ছিলো না। অন্তঃত এরকম পরিস্থিতিতে। দৈহিক ভাবে একটা ঘেরা টোপে আটকে থাকার ফল।

বেবি কোচাম্মা, হেঁটে যাচ্ছিলেন রান্নাঘরের পাশ দিয়ে শুনতে পেলেন হৈ-চৈটা। তিনি দেখতে পেলেন মামাচিকে বৃষ্টির মধ্যে থু থু ফেলতে, থু! থু! থু! আর ভিল্লে পাপেন শুয়ে আছে কাদায় ভেজা, কাঁদছে, ছ্যাবলার মতো। ভিল্লে পাপেন তার ছেলেকে মেরে ফেলার প্রস্তাব করছে। ছিড়ে ফেলতে চেয়েছে তার ছেলের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

মামাচি চেঁচাচ্ছিলেন, 'মাতাল কুত্তা! মাতাল পারাভান মিথ্যুক!'

ভিল্লে পাপেনের গল্পটাকে কানে তালা লাগার মতো গলায় কচু মারিয়া বেবি কোচাম্মাকে বলছিলো। বেবি কোচাম্মা তক্ষুণি উপলব্ধি করলেন পরিস্থিতিটা, কিন্তু তক্ষুণি তাঁর চিন্তাগুলোকে মসৃণ করে তুললেন তেল লেপে। তিনি খুশি হলেন। তিনি এটাকে দেখলেন আম্মুর পাপের জন্যে ঈশ্বরের শাস্তি হিসেবে এবং একই সময়ে প্রতিশোধ নিলেন (বেবি কোচাম্মা) ভেলুথা আর মিছিলের কুচকাওয়াজকারী লোকটার করা অপমানের– যে তাঁকে *মোড়ালালী মারিয়াকুট্টি* বা ছোট জমিদারনী বলে খোঁচা মেরেছিলো এবং তাঁকে দিয়ে জোর করে কম্যুনিষ্ট পতাকা নাড়িয়েছিলো। তিনি তক্ষুণি কল্পনার পাল উড়ালেন। একটা পাপের সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে লাঙ্গলের মতো যাওয়া একটা জাহাজের– যা ভালোর!

বেবি কোচাম্মা নিজের ভারি হাতগুলো দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন মামাচিকে।

'এটা সত্যিই হবে'– বেবি কোচাম্মা বললেন খুব শান্ত স্বরে। 'আম্মু এটা করার মতোই। এবং ভেলুথাও তাই। ভিল্লে পাপেন এরকম একটা কিছু নিয়ে মিথ্যা বলবেনা।'

তিনি কচু মারিয়াকে মামাচির জন্যে একগ্লাস পানি আনতে আর বসার জন্যে একটা চেয়ার দিতে বললেন। তিনি ভিল্লে পাপেনকে দিয়ে গল্পটা আবার বলালেন, তাকে একটু পরপর থামাচ্ছিলেন সবটা জানার জন্যে– কার নৌকা? কতো দিন পরপর? কতোদিন ধরে ওটা চলছে?

যখন ভিল্লে পাপেন শেষ করলো, বেবি কোচাম্মা ফিরলেন মামাচির দিকে। 'তার যাওয়া উচিৎ,' তিনি বললেন। 'আজ রাতে। এটা আরও এগুনোর আগেই। আমরা পুরো ধ্বংস হওয়ার আগেই।'

তারপর তিনি শিউরে উঠলেন, তাঁর স্কুলের বালিকার মতো শিউরানো। তা হলো যখন তিনি বললেন: *'আম্মু কিভাবে সেই দুর্গন্ধটা সহ্য করে? তুমি কি কখনো লক্ষ্য করোনি? ওদের গায়ে একটা কেমন গন্ধ আছে, এসব পারাভানদের।'*

এই ঘ্রাণ সংক্রান্ত লক্ষ্য করানোতে, সেই আসল ভয়টা চলে এলো।

মামাচির রাগ, বুড়ো একচোখা পারাভানের ওপর– যে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টির মধ্যে, মাতাল, লালা ঝরছিলো এবং কাঁদায় মাখা। তাঁর মেয়ের জন্যে তার কৃতকর্মের জন্যে একটা ঠাণ্ডা অপমানবোধ *ঠেলে* উঠলো। তিনি তাঁর মেয়েকে কল্পনা করলেন উলঙ্গ, কাদার মধ্যে সঙ্গমরত এমন একটা লোকের সঙ্গে যে নোংরা কুলি ছাড়া কিছু না। তিনি চিন্তা করলেন সেটা সুস্পষ্ট ও ছবির মতো: একটা পারাভানের রুক্ষ কালো হাত তাঁর কন্যার স্তনের ওপর। একের মুখে অন্যের মুখ? তার কালো নিতম্ব ঢেউ তুলছে তাঁর মেয়ের ফাঁক করা দু'পায়ের মধ্যে। তাদের নিশ্বাস নেয়ার শব্দ। তার আলাদা পারাভানের দুর্গন্ধ। *জানোয়ারের মতো*, মামাচি ভাবতে ভাবতে প্রায় বমি করে দিচ্ছিলেন। যেন সঙ্গমের জন্য কাতর কুত্তীর সঙ্গে একটা *কুত্তা*। *জন্তুর মতো* তার সহ্যশক্তি 'পুরুষের চাহিদা'– যখন নিজের ছেলের জন্য তা বিবেচ্য, কন্যার ব্যাপারটা পরিণত হলো সৃষ্টিছাড়া ক্রোধের জ্বলুনীতে। তিনি দুষিত করেছিলেন জন্ম নেয়া প্রজন্মগুলোকে (ছোট আশীবাদ প্রাপ্তিটা, ব্যক্তিগতভাবে আশীর্বাদ পেয়েছিলো এন্টিওকের যাজকের কাছ থেকে, একজন মহান পতঙ্গবিশারদ, অক্সফোর্ডের রোড্স বৃত্তিপ্রাপ্ত এক বিদ্বান) এবং পরিবারটাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিয়েছিলো *চিরদিনের জন্যে।* আগামী প্রজন্মগুলোকে। বিয়েতে ও অন্ত্যষ্টিক্রিয়ায়। খৃষ্টধর্মের দীক্ষাদান ও জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। ওরা একে অন্যকে কনুই দিয়ে মৃদু খোঁচা মারবে আর ফিসফিস করবে। সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।

মামাচি খেই হারালেন।

তাঁরা তাই করেছিলেন যা তঁদের করার ছিলো, দুই বুড়ির। মামাচির ছিলো ক্রোধ। বেবি কোচাম্মার পরিকল্পনা। কচু মারিয়া ছিলো তাঁদের কমন লেফট্যানেন্ট। ভেলুথাকে ডেকে পাঠানোর আগে তাঁরা আম্মুকে (কৌশলে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে) বন্ধ করে রাখলেন। তাঁরা জানতেন যে চাকো ফিরে আসার আগেই আম্মুকে এইমেনেমের বাইরে পাঠিয়ে দিতে হবে। তাঁরা না বিশ্বাস-না ধারণা করতে পারছিলেন এ ব্যাপারে চাকোর আচরণ কি রকম হবে।

ওটা পুরোপুরি তাঁদের দোষ ছিলোনা, যদিও, পুরো ব্যাপারটাকে অযথা দেরি করিয়ে যেন একটা বেয়াড়া লাট্টু। যেটা তার কাছে আসা সবকিছুকেই ছিটকে ফেলে দিলো। যখন চাকো ও মার্গারেট কোচাম্মা কোচিন থেকে ফিরে এলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

জেলেটা ততক্ষণে সোফি মলকে পেয়ে গেছে, মরা।

জেলেটা এরকম।

তার নৌকায় ভোর বেলায়, নদীর মুখের যে জায়গাটাকে সে জানতো সারা জীবন ধরে। আগের রাতের বৃষ্টিতে নদীটা তখনও ছিলো চঞ্চল ও ফুঁসে ওঠা। কিছু একটা ওঠানামা করছিলো তার পাশে জলের মধ্যে এবং বস্তুটার রঙ সে দেখতে পাচ্ছিলো। বেগুনী। লালচে বাদামী। সাগর বেলার বালির মতো। ওটা স্রোতের সঙ্গে, খুব দ্রুত

সাগরের দিকে যাচ্ছিল। সে তার বাঁশের লগিটা বাড়িয়ে ওটাকে থামালো আর নিজের দিকে টেনে আনলো। ওটা ছিলো একটা চামড়া কোঁচকানো জলকন্যা। একটা জল-শিশু। একটা বিশুদ্ধ জল-শিশু। লালচে বাদামী চুলওয়ালা। মহান পতঙ্গবিশারদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটা নাক এবং সৌভাগ্যের প্রতীকের মতো হাতের মুঠোয় ধরা একটা রূপোর অঙ্গুঠী। সে দেহটাকে টেনে তুললো তার নৌকায়। সে দেহটার নিচে নিজের সূতীর পাতলা গামছাটা বিছিয়ে দিলো। দেহটা শুয়ে থাকলো তার নৌকার তলায় ছোট ছোট রূপালী মাছের গাদার সঙ্গে। সে বাড়ির দিকে নৌকা বাইতে লাগলো– থাই থাই থাক্কা, থাই থাই থমে ছন্দে– ভাবতে ভাবতে যে এটা কিরকম ভুল? একটা জেলের জন্যে চিন্তারই কারণ সে তার নদীটাকে খুব ভালোভাবে জানে। আসলে কেউই জানতোনা মীনাচল নদীটাকে। কেউ জানতোনা যে হঠাৎ সে কি ছিনিয়ে নেবে বা দিয়ে যাবে। কিংবা কখন। তার জন্যেই প্রার্থনা করতো জেলেরা।

কোট্টাইয়াম পুলিশ স্টেশনে বেবি কোচাম্মাকে আনা হলো– অফিসারের ঘরে। তিনি ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথুকে পরিস্থিতিটা বললেন। যে জন্যে কারখানার এক শ্রমিককে হঠাৎ বরখাস্ত করা হয়েছে। সে এক পারাভান। কিছু দিন আগে সে চেষ্টা করেছিলো, করেছিলো ... তার বোনের মেয়েকে ধর্ষণ করার জন্যে চড়াও হয়েছিলো, তিনি বললেন। সে দু'টো বাচ্চা নিয়ে তালাকপ্রাপ্ত।

বেবি কোচাম্মা ভেলুথা ও আম্মুর সম্পর্কটার ভুল ব্যাখ্যা করলেন, আম্মুর জন্যে নয়, দুর্ণামটাকে পুরো করতে এবং ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথুর চোখে পরিবারের সুনাম পুনরুদ্ধারের জন্যে। তার এমন মনে হলোনা যে, আম্মু তার নিজের লজ্জা ডেকে আনবে– এবং বেবি কোচাম্মাকে আবার পুলিশের কাছে যেতে হবে কাহিনীটা ঠিক করতে। যেভাবে বেবি কোচাম্মা কাহিনীটা বলছিলেন, সেভাবে তিনি তা বিশ্বাস করতেও শুরু করেছিলেন।

কেন প্রথমেই ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো হয়নি? পুলিশ ইন্সপেক্টর তা জানতে চাইলো।

'আমরা একটা বনেদি পরিবার,' বেবি কোচাম্মা বললেন। 'এগুলো এমন কোন বিষয় ছিল না যা নিয়ে আমরা কথা বলতে চাইবো ...'

ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথু, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পুতুলের মতো গোঁফের আড়ালে, যার তখন কর্মব্যস্ততা ছিলো না, ব্যাপারটা বুঝলো ঠিকমতোই। তার ছিল একটা উঁচুবর্ণের বউ, দু'টো উঁচুবর্ণের মেয়ে– এবং পুরো উঁচুবর্ণের বংশ যারা তাদের উঁচুবর্ণের গর্ভের ভিতরে অপেক্ষা করছে ...

'যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে সে এখন কোথায়?'

'বাড়িতে, সে জানেনা যে আমি এখানে এসেছি। জানলে সে আমাকে আসতে দিতোনা। স্বাভাবিকভাবেই– সে উন্মাদ তার বাচ্চাদের জন্যে, হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ।'

পরে, যখন আসল কাহিনীটা ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথুর কাছে পৌঁছালো, আসল ঘটনা মানে পারাভান যা নিয়েছে বর্ণবাদী রাজত্ব থেকে তা সে ছিনিয়ে নেয়নি বরং তাকে দেয়া হয়েছে, ব্যাপারটা তাকে গভীরভাবে চিন্তিত করে তুললো। সোফি মলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর, যখন আম্মু যমজদের নিয়ে তার কাছে বলতে গেলো যে একটা ভুল করা হয়েছে তখন ইন্সপেক্টর তার স্তন দু'টোতে টোকা মারলো তার কাঠের রুল দিয়ে, ওটা অবশ্য পুলিশের লোকের স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা ছিলোনা। ইন্সপেক্টর ঠিকই জানতো যে সে কি করছে। ওটা ছিলো পূর্ব-পরিকল্পিত, যা হিসাব করে রাখা হয়েছিল আম্মুকে অপমান ও শংকিত করতে। ভুল পথে যাওয়া পৃথিবীতে নিয়মশৃংখলা আনার একটা চেষ্টা।

তারপরেও, যখন ধুলোগুলো স্থির হলো এবং স্বাক্ষ্য-প্রমাণাদি সম্পন্ন হলো, ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথু পুলকিত হয়েছিলো পুরো ব্যাপারটার পরিনতি দেখে।

কিন্তু তখন, সে শুনছিলো সতর্কতা ও ভদ্রতার সঙ্গে যখন বেবি কোচাম্মা তাঁর কাহিনীটা তৈরী করছিলেন।

'গত রাতে যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিলো– সন্ধ্যা প্রায় সাতটার দিকে– তখন সে আমাদের বাসায় আমাদের শাসাতে এসেছিলো। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিলো তখন। আলোগুলো নিভে গিয়েছিলো আর আমরা প্রদীপগুলো জ্বালাচ্ছিলাম তখন সে আসলো,' বেবি কোচাম্মা বলতে থাকলেন। 'সে জানতো বাড়ীর পুরুষ মানুষ, আমার ভাইপো, চাকো ইপে, তখন ছিলো বাড়ির বাইরে– কোচিনে। শুধুমাত্র আমরা তিনজন মহিলা একা বাড়ীতে।' তিনি ইন্সপেক্টরকে ভয়টা অনুভব করাতে লাগলেন তখন কোন যৌন-উন্মাদনা পারাভানের পক্ষে করা সম্ভব যখন সে তিন মহিলাকে একা পায়।

'আমরা তাকে বললাম সে যদি নিঃশব্দে এইমেনেম ছেড়ে চলে না যায় তবে আমরা পুলিশ ডাকবো।' সে বলতে শুরু করলো আমার বোনের মেয়ের *সম্মতি আছে*। তুমি কি কল্পনা করতে পারো? সে আমাদের জিজ্ঞেস করলো কোন প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা তাকে অভিযুক্ত করছি। সে বললো শ্রম আইন অনুযায়ী আমাদের কোন অধিকার নেই তাকে বরখাস্ত করার। এসব বলার সময় সে ছিলো খুব শান্ত। "সেই দিন চলে গেছে," সে আমাদের বললো, "যখন আমাদের তোমরা কুকুরের মতো লাথি মেরে বেড়াতে পারতে চারিদিকে ..." কাহিনীটা বলতে বলতে ততক্ষণে বেবি কোচাম্মার কণ্ঠস্বর পুরোদস্তুর আশ্বস্ত করার মতো হয়েছিলো। আহত। অবিশ্বাসী।

তারপর তার কল্পনার সুতোগুলোকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলেন। তিনি বর্ণনা করলেন না কিভাবে মামাচি খেই হারিয়েছিলেন। কিভাবে তিনি ভেলুথার কাছে গিয়েছিলেন এবং তার মুখে থুথু মেরেছিলেন। সব কথা বেবি কোচাম্মা ইন্সপেক্টরকে বলেছিলেন। সেই নাম, যে নামে তিনি তাকে ডেকেছিলেন।

বরং তিনি ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথুকে বললেন ভেলুথার বলা কথাগুলো আর কেন তাঁকে পুলিশের কাছে আসতে হয়েছে সে ব্যাপারটাও। ভেলুথার কি রকম

অনুশোচনার অভাব তাকে সবচেয়ে বেশি আহত করেছিলো। কারণ তাকে তার কাজের জন্যে গর্বিত মনে হচ্ছিলো। তিনি নিজে না বুঝেই জোড়াতালি দিয়ে বানালেন লোকটার ব্যবহার যে তাকে মিছিলে অপমান করেছিলো এবং সেটা চাপিয়ে দিলেন ভেলুথার ঘাড়ে। বেবি কোচাম্মা বললেন, ভেলুথার মুখের অবজ্ঞা আর রাগ ছিলো। নিলর্জ্জ, তার কণ্ঠের ঔদ্ধত্য তাঁকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো। যার ফলে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে ভেলুথাকে বরখাস্ত করতে হবে এবং বাচ্চাদের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটার সঙ্গে ভেলুথার আচরণের যোগসূত্র আছে।

তিনি জানতেন পারাভানটাকে ছোটবেলা থেকেই, বেবি কোচাম্মা বললেন। সে শিক্ষিত হয়েছিলো তাঁর পরিবারের সাহায্যেই, নিচুজাতের স্কুলে যেটা তাঁর বাবা পুন্যান কুঞ্জু চালু করেছিলেন (জনাব টমাস ম্যাথু নিশ্চয়ই জানবেন তিনি কে ছিলেন? হ্যাঁ, অবশ্যই) ... সে কাঠমিস্ত্রীর প্রশিক্ষণ পেয়েছিলো তাদের পরিবারের সাহায্যেই, যে বাড়িতে সে থাকে সে বাড়িটাও বেবি কোচাম্মার পরিবারের দেয়া। সে সবকিছুর জন্যে বেবি কোচাম্মার পরিবারের কাছে ঋণী।

'আপনারা,' ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথু বললো, 'প্রথমে আপনারা এসব লোককে খারাপ করেন, ওদেরকে মাথায় তুলে নাচেন, জয় করা প্রাইজের মতো, তারপর যখন ওরা খারাপ ব্যবহার করে তখন আমাদের কাছে দৌড়ে আসেন সাহায্যের জন্যে।'

বেবি কোচাম্মা তাঁর চোখগুলো শাসন পাওয়া বাচ্চার মতো নামালেন। তারপর আবার কাহিনীটা বলতে লাগলেন। ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথুকে তিনি বললেন কিভাবে গত কয়েক সপ্তাহ্ ধরে তিনি লক্ষ্য করছিলেন ভবিষ্যতের কিছু লক্ষণ, কিছুটা ঔদ্ধত্য, কিছুটা বদমেজাজ। তিনি উল্লেখ করলেন, ভেলুথাকে তিনি দেখেছেন কোচিনে যাওয়ার পথে মিছিলে এবং সেই গুজবটার কথাও বললেন– যাতে সে ছিলো বা আছে– এক নক্সাল। তিনি খেয়াল করলেন না যে এই খবরটা দেয়াতে ইন্সপেক্টর এর ভুরুগুলো কিরকম কুঁচকে উঠলো দুঃশ্চিন্তায়।

তিনি তাঁর ভাইপোকে ভেলুথার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, বললেন বেবি কোচাম্মা, তবে কখনো কল্পনাও করতে পারেননি অবস্থা এরকম হবে। একটা সুন্দর শিশু মারা গেছে। দু'টো বাচ্চা নিখোঁজ।

বেবি কোচাম্মা মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন।

ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথু তাঁকে এক কাপ পুলিশের চা দিলেন। তিনি একটু সুস্থ হলেন, ইন্সপেক্টর তাঁকে সাহায্য করলো তাঁর বলা সবকিছু গুছিয়ে লিখতে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন তৈরীর জন্যে। কোট্টাইয়ামের পুলিশ পুরোপুরি সহযোগিতা করবে বলে ইন্সপেক্টর কথা দিলো বেবি কোচাম্মাকে। 'বদমাশটাকে আজকের দিন শেষ হওয়ার আগেই ধরা হবে, সে বললো।' এক পারাভান একজোড়া যমজ নিয়ে উধাও, ইতিহাস তাড়িত– সে জানতো তার জন্যে খুব বেশি জায়গা নেই– লুকিয়ে থাকার।

ইন্সপেক্টর টমাস্ ম্যাথু ছিলো দূরদর্শী লোক। সে একটু আগেই সাবধান হয়ে গেলো। সে একটা জিপ পাঠিয়ে কমরেড কে. এন. এম. পিল্লাইকে ডেকে আনলো

থানায়। কারণ তার জানা দরকার ছিলো যে পারাভানটার রাজনৈতিক মেরুদণ্ড আছে কিনা অথবা সে নিজেই এসব করেছে কিনা! যদিও ইন্সপেক্টর নিজে কংগ্রেস সমর্থক, কিন্তু মার্কসবাদী সরকারের সাথে সে কোনও বিরোধে জড়াতে চাইলো না। যখন কমরেড পিল্লাই আসলেন, তাঁকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং বসানো হলো, কিছুক্ষণ আগে বেবি কোচাম্মার খালি করে যাওয়া চেয়ারে। ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথু তাঁকে দেখালো, বেবি কোচাম্মার দায়ের করা সাধারণ অভিযোগ। তারা দু'জন কথা বলছিলো। সংক্ষেপে, গোপনে, ঠিকমতো। মনে হচ্ছিল তারা সংখ্যার লেনদেন করছে শব্দের নয়। কোনো ব্যাখ্যার মনে হয় প্রয়োজন ছিলো না। কমরেড পিল্লাই এবং ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথু বন্ধু ছিলো না, এবং তারা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করতোনা। কিন্তু তারা দু'জন দু'জনকে ভালোভাবেই বুঝতো। তারা দুজনই ছিলো ঠিকানা ছাড়া শৈশব না থাকা লোক। নির্বিকার মানুষ। সন্দেহহীন। সত্যি বলতে কি তাদের নিজেদের মতোই, ভয়ঙ্কর প্রাপ্তবয়স্ক। তারা তাকালো পৃথিবীর দিকে এবং কখনো আশ্চর্য হয়নি এই ভেবে যে এটা কি করে কাজ করছে, কারণ তারা জানতো। তারাই সেটাকে দিয়ে কাজ করাতো। তারাই ছিলো কারিগর যারা ঠিক-ঠাক করতো এই যন্ত্রটার বিভিন্ন অংশ।

কমরেড পিল্লাই ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথুকে বললেন, তিনি ভেলুথাকে চেনেন, কিন্তু চেপে গেলেন যে, সে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য, অথবা এটাও, ভেলুথা যে আগের রাতে তাঁর দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলো, যার ফলে ধরা যায় যে কমরেড পিল্লাই হলেন শেষ লোক যে ভেলুথাকে গায়েব হওয়ার আগে দেখেছিলেন। এও বললেননা যে, যেন তিনি জানতেন তা সত্যি না, কমরেড পিল্লাই বেবি কোচাম্মার সই করা প্রাথমিক অভিযোগে উল্লেখিত ধর্ষণের অভিযোগটা খন্ডন করলেন। তিনি শান্তভাবে ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথুকে আশ্বস্ত করলেন যে তিনি যতটা জানেন ভেলুথার পিছনে কোন সমর্থন বা নিরাপত্তা ছিলোনা কম্যুনিষ্ট পার্টির। সে ছিলো নিজের মতো।

কমরেড পিল্লাই চলে যাওয়ার পর, ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথু তাদের কথাবার্তা মনে মনে তলিয়ে দেখলো, যুক্তি খুঁজলো মনে মনে, ফাঁক-ফোঁকর বের করার জন্যে। যখন সন্তুষ্ট হলো, তখন সে তার লোকদের নির্দেশ দিলো।

ইতোমধ্যে, বেবি কোচাম্মা এইমেনেমে ফিরলেন। প্লেমাউথটা রাখা ছিলো গাড়ির রাস্তায়। মার্গারেট কোচাম্মা ও চাকো কোচিন থেকে ফিরেছিলো।

সোফি মলকে শোয়ানো ছিলো কাপড়ের সোফার ওপর।

মার্গারেট কোচাম্মা যখন তার ছোট মেয়ের মৃতদেহ দেখলো, একটা শূন্য হলঘরে ধাক্কাটা তার মধ্যে ফুলে ফেঁপে হয়ে গেলো করতালিতে। ওটা পরিপূর্ণ হয়ে উপচে পড়লো একটা বমির ঢেউ হয়ে আর তাকে বাকহীন ও শূন্যদৃষ্টি করে দিলো। সে শোক করছিলো দু'টি মৃত্যুর, একটার নয়। সোফির হারানোতে জো আবার মারা গেলো। এবং এবার শেষ করার মতো কোন বাড়ির কাজ ছিলোনা কিংবা ছিলো না

খাওয়ার জন্যে ডিম। মার্গারেট এইমেনেমে এসেছিলো তার জখমি জগৎটাকে সারাতে, তার বদলে হারালো পুরোটাই। সে কাঁচের মতো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো।

তার ঐসব দিনের স্মৃতি যা পরে এসেছিলো মিহি গুঁড়োওয়ালা, লম্বা, অস্পষ্ট ঘন্টা, গাঢ় লোমশ-জিভওয়ালা সৌন্দর্য (ডঃ ভার্গিস ভার্গিসের চিকিৎসা শাস্ত্রের মতো), ছিন্ন করা, ধারালো, ইস্পাতের মতো চাবুকের আঘাতে হিষ্টিরিয়া সারানো, পরিষ্কার আর ধারালো কিছু একটা নতুন রেজার ব্লেডের ধারের মতো।

সে চিন্তিত ছিলো চাকোর ব্যাপারে– ভাবালু ও ভদ্র কণ্ঠের চাকো। যখন সে তার পাশে ছিলো– আবার রাগী, একটা দমকা বাতাসের মতো এইমেনেমের বাড়ির মধ্যে। পুরোপুরি অন্যরকম হাসিখুশি সজারুর চেয়ে এলোমেলো যাকে মার্গারেট প্রথম দেখেছিলো অক্সফোর্ডের ক্যাফেতে সেরকমই।

হলুদ গির্জার শেষকৃত্যের কথা তার আসলেই মনে ছিলো। দুঃখ সংগীত পরিবেশন। একটা বাদুড়ের যে বিরক্ত করছিলো কাউকে। সে মনে করতে পারলো দরজাগুলো ভাঙার শব্দ এবং মহিলাদের ভয়ার্ত কথাগুলো। আর রাতের ঝোপের পোকাগুলো সিঁড়ির মত কড়মড় শব্দ করে কিভাবে ভয়টাকে বাড়িয়ে দিতো এবং অন্ধকারটা ঝুলে থাকতো এইমেনেমের বাড়ির ওপর।

সে কখনো ভুললোনা বাকি দুই বাচ্চার ওপর তার প্রচণ্ড রোষ– যারা কোনরকমে বেঁচে গিয়েছিল। তার মন বাঁধা ছিলো একটা শামুকের মতো বিশ্বাসে, এসথা কোন না কোনভাবে দায়ী ছিলো সোফির মৃত্যুর জন্যে। ভাবতে অবাক লাগে, মার্গারেট কোচাম্মা জানতোনা যে ওটা ছিলো এসথা– নাড়া দেয়া যমজের একটা। চুলের ভাঁজওয়ালা যে জ্যামের ভিতর বৈঠা বাইলো আর চিন্তা করলো দু'টো চিন্তা– এসথা যে ভেবেছিলো নিয়মগুলো এবং সোফি মল আর রাহেলকে নিয়ে গিয়েছিলো নদীর ওপর দিয়ে দুপুরে, একটা ছোট নৌকায় করে। এসথা যে উচ্ছেদ করেছিলো একটা কাস্তের গন্ধ, একটা মার্কসবাদী পতাকা নাড়িয়ে। এসথা, যে ইতিহাসের বাড়ির পিছনের বারান্দায় তাদের বাড়ি বানিয়েছিলো নিজের বাড়ি থেকে অনেক দূরে, একটা ঘাসের মাদুর আর তাদের বেশীর ভাগ খেলনা দিয়ে সাজিয়েছিলো– একটা গুলতি, কাটার মতো একটা হাঁস, একটা অস্ট্রেলীয় বিমানের প্রতীক কোয়ান্টাস কোয়ালা পুতুল যেটা দেখতে ভালুকের মতো আর যার চোখগুলো ছিলো আলগা। এবং সবশেষে, সেই ভয়ংকর রাতে এসথা ঠিক করেছিলো পালাবে। যদিও তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো এবং অন্ধকার ছিলো, সময় এসেছিলো তাদের পালানোর, কারণ আম্মু তাদেরকে আর চাচ্ছিলো না।

এসব কিছুই না জানা সত্ত্বেও, সোফির ব্যাপারে যা ঘটেছে তার জন্যে মার্গারেট কোচাম্মা এসথাকে কেন দোষ দিলো? হয়তো মায়ের সহজাত প্রবৃত্তির জন্যেই।

তিন থেকে চার বার, ওষুধের জন্যে আসা ঘুমের গাঢ় ঢেউগুলোর ভিতর দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে, সে সত্যি-সত্যি খুঁজে বের করে আনলো এসথাকে আর চড় মারতে লাগলো যতক্ষণ না কেউ তাকে থামালো আর তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলো।

ক্ষমা চেয়ে পরে সে আম্মুর কাছে চিঠি লিখেছিলো। যখন চিঠিটা এসে পৌছেছিলো, এসথা চলে গিয়েছিলো আর আম্মুকেও তার পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে চলে যেতে হয়েছিলো। এসথার পক্ষে, মার্গারেট কোচাম্মার ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করার জন্যে শুধু রাহেল থেকে গেলো এইমেনেমে। *'আমি ভাবতে পারছিনা কি আমার ওপর ভর করেছিলো,'* সে লিখেছিলো। *'ওটাকে আমি শুধু ঘুমের ওষুধের প্রভাব বলে মনে করতে পারি। আমার এরকম ব্যবহার করার কোন অধিকার ছিলো না– যে ব্যবহার আমি করেছি, আমি তোমাকে জানাতে চাই যে, আমি আমার ব্যবহারের জন্য লজ্জিত, এবং ভীষণ-ভীষণভাবে দুঃখিত।*

আশ্চর্য বিষয় হলো, মার্গারেট কোচাম্মা যার কথা একেবারেই ভাবেনি, সে হলো ভেলুথা। ভেলুথার ব্যাপারে আদৌ তার কোন স্মৃতি ছিলোনা। সে দেখতে কিরকম সেটাও সে জানতো না।

হয়তো এটা হয়েছিলো এ কারণে যে সে কখনোই তার সাথে পরিচিত হয়নি। কখনো শোনেনি তার কি হয়েছিলো?

হারিয়ে যাওয়া ঈশ্বর।

ক্ষুদে জিনিসের ঈশ্বর।

সে বালির ওপর কোনো পায়ের ছাপ রেখে যায়নি, কোনো ঢেউ ছিলো না জলে, কোন প্রতিবিম্ব ছিলো না আয়নায়।

আসল কথা, উঁচুবর্ণের পুলিশ দঙ্গলের সঙ্গে ভরা নদীটা পার হওয়ার সময় মার্গারেট কোচাম্মা তাদের সঙ্গে ছিলো না। তারা ছিলো কড়া মাড় দেয়া ঢোলা খাকী হাফ-প্যান্ট পরে।

কারুর পকেটের ভিতর হাতকড়ার ভোঁতা ধাতব শব্দ।

এটা আশা করা অন্যায়, যা ঘটেছিলো তা না জেনে কেউ তা স্মরণ করবে কিভাবে।

যেভাবেই হোক, দুঃখ, তখনও তা আরো দু'সপ্তাহ দূরে ছিলো ঐ নীল সেলাইয়ের দুপুর থেকে। মার্গারেট কোচাম্মা যখন বিমান-ভ্রমণের ক্লান্তি নিয়ে চুপচাপ ছিলো। চাকো, কমরেড কে, এন, এম, পিল্লাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে যাচ্ছিলো, এবং চলে গেলো শোবার ঘরের জানালার পাশ দিয়ে এক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বিশাল তিমির মতো উঁকি মারার ইচ্ছে নিয়ে। দেখতে, তার স্ত্রী (প্রাক্তন স্ত্রী, চাকো!) এবং মেয়ে জেগে আছে কিনা এবং কিছু চাচ্ছে কিনা? শেষ মুহূর্তে তার সাহস তাকে থামালো এবং সে চলে গেলো হেলেদুলে, ভিতরে উঁকি না মেরেই। সোফি মল (জেগে ওঠা, জীবন্ত) দেখলো তাকে যেতে।

সে বিছানার ওপর উঠে বসলো আর বাইরে রাবার গাছগুলোর দিকে তাকালো। সূর্যটা সরে গিয়েছিলো আকাশের ওপর দিয়ে এবং একটা ঘন কালো ছায়া ফেলেছিলো বাগানটা জুড়ে, এমনিতেই কালো হয়ে যাওয়া গাছের পাতাগুলোকে আরো কালো করে তুলেছিলো। ছায়ার পিছনের আলোটা ছিলো মসৃণ ও শান্ত। সেখানে একটা সমান্তরাল সাঁ-সাঁ শব্দ ছিলো প্রত্যেকটা গাছের বহুবিচিত্র বর্ণের বাকলের ওপর দিয়ে যাদের ভিতর থেকে দুধের মত সাদা কষ চুঁইয়ে পড়ছিলো সাদা রক্তের মতো একটা ক্ষত থেকে, এবং গাছের সাথে বাধা অর্ধেক নারকেলের খোলের মধ্যে ফোঁটায়-ফোঁটায় জমা হচ্ছিলো।

সোফি মল বিছানা থেকে নামলো এবং তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো তার ঘুমন্ত মায়ের ব্যাগ হাতড়ে। সে পেয়ে গেলো যা সে খুঁজছিলো– মেঝের ওপর রাখা প্লেনের ষ্টিকার ও ট্যাগ লাগানো বিরাট তালাবন্ধ সুটকেসের চাবিগুলো। সে সুটকেসটা খুললো আর ভিতরের জিনিষপত্রের মধ্যে খুঁজতে লাগলো সাবধানে কুকুরের মতো মাটি খুঁড়ে একটা ফুলের কেয়ারী। সোফির অন্তর্বাসের স্তূপ, ইস্ত্রী করা ঘাগরা ও কাঁচুলি, শ্যাম্পু, ক্রীম, চকোলেট, সেলোটেপ, ছাতা, সাবান (এবং বোতলভর্তি লন্ডনের সুগন্ধিগুলো), কুইনাইন, এ্যাসপিরিনি, নানান রকমের এন্টিবায়োটিক সুটকেসের মধ্যেকার সবকিছু ওলট-পালট করে ফেললো। 'সবকিছু নাও,' মার্গারেট কোচাম্মার সহকর্মীরা তাকে উপদেশ দিয়েছিলো চিন্তিত গলায়। 'তুমি কিছুই জানোনা।' সহকর্মীকে তাদের বলার ধরণ ছিলো এমন যেন সে যাচ্ছিলো অন্ধকারের গভীরে বেড়াতে:

ক. যে কারুর যে কোন কিছু ঘটতে পারে।

তাই

খ. প্রস্তুত থাকাই ভালো।

সোফি মল ঘটনাচক্রে পেয়ে গেলো যা সে খুঁজছিলো।

তার ফুফাতো ভাই-বোনদের জন্যে আনা উপহারগুলো। তিনকোণা দুর্গের মতো টবলারওয়ান চকোলেট (নরম ও গরমে বাঁকা)। আঙুলের দিকে আলাদা রঙওয়ালা মোজা। আর দু'টো বল পয়েন্ট কলম– যার ভিতরে জলের মধ্যে ভাসছিলো লন্ডনের রাস্তার একটা ছবি। বাকিংহাম প্রাসাদ আর বিগবেন ঘড়ি। দোকান-পাট, মানুষজন। একটা লাল দোতলা বাস যেটা বাতাসের বুদবুদের ঠেলায় ওপর থেকে নিচে নিঃশব্দে ঘুরছিলো। সেখানে অপয়া কিছু একটা ছিলো শব্দের শূন্যতার মধ্যে ব্যস্ত বলপেনের পথের উপর।

সোফি মল তার গো গো ব্যাগে উপহারগুলো রাখলো, আর এগিয়ে গেলো পৃথিবীর দিকে। একটা শক্ত দরকষাকষি করতে। বন্ধুত্বের সন্ধি করতে আর ভাব জমাতে।

বন্ধুত্বটা যেটা, দুর্ভাগ্যবশত, ঝুলে থাকবে। অসম্পূর্ণ। মাটি না ছুঁয়ে দীর্ঘ লাঠির মতো বাতাসে। এমন একটা বন্ধুত্ব যেটা কখনো কোন গল্পের মধ্যে ঘুর ঘুর করবেনা, এজন্যে যে, খুব তাড়াতাড়ি যেভাবে ঘটে তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি, সোফি মল পরিণত হলো একটা স্মৃতিতে, যখন সোফি মলের হারানোটা হয়ে গেলো শক্ত সবল ও জীবন্ত। মৌসুমী ফলের মতো– যা প্রত্যেক মৌসুমে ফলে।

১৪

কাজ হলো সংগ্রাম

কমরেড কে, এন, এম, পিল্লাইয়ের বাড়িতে যেতে চাকো নোয়ানো রাবার গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে শর্টকাট্ রাস্তাটা ধরলো, যাতে তাকে কম হাঁটতে হয়। শুকনো পাতার মাদুরের উপর দিয়ে পা ফেলে যাওয়া আঁটোসাঁটো এয়ারপোর্টের স্যুট পরা চাকোকে দেখতে লাগছিলো বিচ্ছিরি রকমের হাস্যকর, টাইটা আবার ছিলো তার কাঁধের ওপর ওল্টানো।

কমরেড পিল্লাই বাড়িতে ছিলেন না। পিল্লাইয়ের স্ত্রী কল্যাণী ছিলেন, তাঁর কপালে তাজা চন্দনের ফোঁটা, চাকোকে বসতে দিলেন তাদের ছোট সামনের ঘরে ইস্পাতের একটা ফোল্ডিং চেয়ারে এবং নিজে উধাও হয়ে গেলেন উজ্জ্বল গোলাপী, নাইলনের লেসের পর্দাঘেরা দরজার ওপারে, পাশের একটা অন্ধকার ঘরে, সেখানে একটা বড় পিতলের প্রদীপে একটা ছোট শিখা জ্বলছিলো। দরজার ভিতর দিয়ে নাক জ্বলানো ধূপের গন্ধ আসছিলো, যার ওপরে একটা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিলো, 'কাজ হলো সংগ্রাম, সংগ্রাম হলো কাজ।'

ঘরটার তুলনায় চাকো অনেক বড়। নীল রঙের দেয়ালগুলো তাকে ঘিরে রেখেছিলো। সে এদিক-ওদিক তাকালেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ এবং কিছুটা অস্বস্তিতে ভোগা। সবুজ ছোট জানালার গরাদের উপর গামছা একটা শুকাচ্ছিলো। খাওয়ার টেবিলটা একটা উজ্জ্বল ফুলের নক্সা আঁকা প্লাষ্টিকের টেবিল ঢাকনি দিয়ে ঢাকা। ছোট ছোট মাছিগুলো ভোঁ ভোঁ করে উড়ে বেড়াচ্ছিল, এক ছড়া ছোট কলার চারপাশে যেগুলো রাখা ছিলো একটা নীল রংয়ের কানাওয়ালা এনামেলের থালায়। ঘরের এক কোনায় ছিলো সবুজ খোসা না ছাড়ানো গাদা করা নারকেল। একটা বাচ্চার একজোড়া রাবারের চটি ছিলো এক কোনে, জানালার শিকের মধ্যে দিয়ে আসা সূর্যের আলো ওগুলোর ওপর পড়ে একটা উজ্জ্বল চৌকোনো ছায়া তৈরি করেছিলো। একটা কাঁচের কপাট লাগানো আলমারী দাঁড়িয়ে ছিলো টেবিলের পাশে। ভিতরের জিনিসগুলোকে আড়াল করার জন্যে আলমারীটার ভিতরের দিকে ছিলো ছাপা পর্দা ঝোলানো।

কমরেড পিল্লাই-এর মা, এক ছোট্ট বুড়ি একটা বাদামী কাঁচুলী আর সাদা ধুতি পরে, বসে ছিলেন কাঠের খাটিয়ার কিনারে। ওটা লাগানো ছিলো দেয়ালের সাথে, তার পাগুলো ঝুলছিলো মেঝে থেকে উঁচুতে। গায়ে ছিলো একটা পাতলা সাদা তোয়ালে, ওটা আড়াআড়ি ছিলো তাঁর বুকের ওপর আর খানিকটা ছিলো কাঁধের ওপর শাড়ীর মতো ঝুলিয়ে দেয়া। উল্টোকরা গাধার টুপির মতো একটা মশার দঙ্গল, ভ্যান ভ্যান করছিলো তাঁর মাথার উপর। তিনি বসে ছিলেন গালে হাত রেখে, তাঁর মুখের পাশের সব বলিরেখাগুলোকে এক জায়গায় জমা করে। তাঁর শরীরের প্রত্যেক ইঞ্চিতে, এমনকি তার কব্জি এবং গোড়ালীও ছিলো বলিরেখায় ভরা। শুধু গলার চামড়াই আঁটোসাঁটো ও মসৃণ, একটা বিশাল গলগন্ডের উপর বিছিয়ে ছিলো। তাঁর যৌবনের ঝর্না। তাকিয়ে ছিলেন বোবা দৃষ্টিতে উল্টো দিকের দেয়ালে। আস্তে আস্তে দুলছিলেন আর ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ করছিলেন। নিয়মিত। ছন্দময় ছোট ছোট ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ, যেন দূরপাল্লার বাস যাত্রায় বিরক্ত যাত্রী।

কমরেড পিল্লাই-এর এস এস এল সি, বি এ, আর এম এ, সার্টিফিকেটগুলো ফ্রেমে বাঁধিয়ে তাঁর পিছনের দেয়ালে ঝোলানো ছিলো।

আর একটা দেয়ালে ছিলো একটা বাঁধানো ছবি যেটিতে কমরেড পিল্লাই মাল্য ভূষিত করছেন কমরেড ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদকে। সে ছবিতে আরো আছে ষ্ট্যান্ডের উপর একটা মাইক্রোফোন, পিছনে জ্বলজ্বল করছে খোদাই করা একটা ফলক যাতে লেখা অজন্তা।

ঘুরে চলা টেবিল ফ্যানটা, বিছানার পাশ থেকে তার যান্ত্রিক বাতাস মেপে ভাগ করে দিচ্ছিলো লক্ষ্যণীয় ও গনতান্ত্রিক ঘূর্ণনে– প্রথম উড়াচ্ছিল বৃদ্ধ জনাবা পিল্লাই এর অবশিষ্ট চুলগুলো, তারপর চাকোর। মশাগুলো ক্লান্তিহীন এলোমেলো তবে দল পাকাচ্ছিলো।

জানালা দিয়ে চাকো দেখতে পাচ্ছিলো, পাশ দিয়ে দ্রুত বেগে চলা বাসগুলোর ছাদ, মালপত্র রাখার জায়গায় মালপত্র রাখা। একটা জীপ পাশ দিয়ে গেলো, যাতে লাগানো মাইকে চড়া স্বরে বাজছিলো মার্কসবাদী দলের একটা সঙ্গীত, যার মূলকথা হচ্ছে বেকারত্ব।

কোরাসটা ইংরেজীতে, বাকিটা মালায়লমে।

চাকরী খালি নাই। চাকরী খালি নাই।
যেখানেই কোন অভাগা লোক যায়,
নাই নাই নাই নাই চাকরী খালি নাই।

'না'– টা উচ্চারণ হচ্ছিলো দরজা খোলার শব্দের মতো করে।

কল্যাণী ফিরে আসলেন চাকোর জন্যে স্টেনলেস স্টিলের গ্লাসে ছাঁকা কফি স্টেনলেস স্টিলের থালায় কলার টুকরো নিয়ে (কলার ফালিগুলো উজ্জ্বল হলুদ, মাঝে কালো কালো বীচি)।

তিনি গেছেন ওলাসসায়, এখন যে কোন সময় ফিরবেন, পিল্লাই এর স্ত্রী কল্যাণী বললেন। তিনি তাঁর স্বামীকে সম্বোধন করলেন *আড়েহাম* বলে যেটা ছিলো সে'র সম্মানজনক প্রতিশব্দ (আপনি) কিন্তু পিল্লাই তাকে বলতেন, '*এড়ি*' যা ছিলো তুই এর কাছাকাছি, 'এই যে তুমি!'

পিল্লাই এর বউ সোনালী বাদামী রঙের শরীরওয়ালা আর বড় বড় চোখের এক ভরন্ত সুন্দরী। তাঁর লম্বা কোঁকাড়ানো চুল ভেজা এবং পিঠের ওপর ছড়ানো, একেবারে গোড়ায় গিঁঠ বাঁধা। বেনীটা তাঁর আঁটো গায় লাল রঙের কাঁচুলির পিছনটা ভিজিয়ে দিচ্ছে এবং কাঁচুলিটাকে আরো আঁটো ও আরো গাঢ় লাল করে তুলছে। বাহু শেষ হয়েছে যেখানে তাঁর নরম হাতের মাংস ফুলে উঠছে এবং নামছে, গর্ত হওয়া কনুইয়ের ওপর চর্বির ফোলা। তাঁর সাদা ধুতি এবং কাভানী ছিলো পাট পাট ইস্ত্রী করা। তাঁর গা থেকে চন্দন আর বাটা সবুজ ছোলার গন্ধ বেরুচ্ছিলো, ওটা তিনি ব্যবহার করতেন সাবানের বদলে। কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম, চাকো তাঁকে দেখলো, যৌন কামনার ক্ষীণ নড়াচড়া ছাড়া। চাকোর একটা স্ত্রী ছিলো (প্রাক্তন স্ত্রী, চাকো!) বাড়িতে। হাত আর পিঠে তিলের মত দাগওয়ালা। নীল পোশাক পরতো যার নিচে দিয়ে পা বের হয়ে থাকতো।

ছোট্ট লেনিন বেরিয়ে এলো এসময় দরজায়, লাল মাড় দেয়া কাপড়ের হাফ প্যান্ট পরে। সে বকের মত একটা রোগা পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়েছিলো আর লাল পর্দাটাকে পেঁচিয়ে লাঠির মতো করছিলো, চাকোর দিকে মায়ের মতো বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। সে এখন ছ' বছরের, যথেষ্ট বড় নিজের নাকের ভিতর জিনিসপত্র ঢোকানোর চেয়ে।

'মন, যাও লাথাকে ডাকো,' মিসেস পিল্লাই, তাকে বললেন।

লেনিন ঠায় দাঁড়িয়েছিলো আর তখনো তাকিয়েছিলো চাকোর দিকে, তীক্ষ্ণ শব্দ করলো অক্লেশে ওভাবে শুধু বাচ্চারাই পারে।

'লাথা, লাথা, তোমাকে খোঁজা হচ্ছে!'

আমাদের ভাইয়ের মেয়ে কোট্টাইয়াম থেকে এসেছে। পিল্লাই-এর বড় ভাইয়ের মেয়ে, মিসেস পিল্লাই ব্যাখ্যা করলেন। 'ও গত সপ্তাহে ত্রিবান্দ্রামে ছোটদের উৎসবে আবৃত্তি করে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। লেসের পর্দার আড়াল থেকে দেখা দিলো মুখরা ধরনের একটা ছোট্ট মেয়ে যার বয়স হবে বারো কি তেরো। সে পরে ছিলো একটা লম্বা, ছাপা ঘাগরা; ওটা তার গোড়ালী পর্যন্ত নেমে গিয়েছিলো আর একটা ছোট সাদা কাঁচুলি কোমর পর্যন্ত যার মধ্যে ছিলো উঁচু হওয়া একটা জায়গা, ভবিষ্যতের স্তনগুলোর জন্যে। তার তেল দেওয়া চুল দু' ভাগে সিঁথিকাটা। তার সবকিছুই আঁটো, চক্‌চকে বেনীগুলো গোলকরে বাঁধা ফিতা দিয়ে যাতে ওগুলো ঝুলে থাকে মুখের দু'পাশে। যেন বড় ঝুলে থাকা কানের মতো ওগুলোকে তখনও রঙ করা হয়নি।

'তুমি জানো ইনি কে ?' মিসেস পিল্লাই লাথাকে জিজ্ঞেস করলেন।

লাথা মাথা নাড়লো।

'চাকো সার, আমাদের কারখানার মালিক।'

লাথা তার দিকে তাকালো এমন ভাব করে যেমনটা কোন তের বছর বয়সীর জন্যে অস্বাভাবিক।

'উনি লেখাপড়া করেছেন লন্ডনের অক্সফোর্ডে, মিসেস পিল্লাই বললেন, 'তুমি কি আবৃত্তি করবে ওনার জন্যে ?'

লাথা রাজী হলো কোনো ইস্তততঃ না করে। সে তার পাগুলোকে একটু ফাঁক করলো।

'সম্মানিত সভাপতি,' সে আনত হলো চাকোর দিকে, 'আমার প্রিয় বিচারকগণ এবং ...' সে চারিদিকে তাকালো কাল্পনিক দর্শকদের দিকে যারা ভিড় করে আছে ছোট, গরম হল ঘরে, 'আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা।' সে একটু থামলো নাটকীয়ভাবে।

'আজকে আমি আপনাদের আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি স্যার ওয়াল্টার স্কট এর একটি কবিতা যার শিরোনাম "লোচিনভার"।' সে তার হাতগুলোকে একসঙ্গে করলো পিছনে। একটা পাতলা আচ্ছাদন পড়লো তার চোখের ওপর। তার দৃষ্টি– সে কিছু দেখছেনা এমনভাবে চাকোর মাথার উপর স্থির হয়ে ছিলো। কথা বলার সময় সে অল্পঅল্প দুলছিলো। প্রথমে চাকো ভেবেছিলো যে ওটা মালায়লাম ভাষায় অনুবাদ করা 'লোচিনভার' হবে। এর মালায়লামে অনুবাদ করা শব্দগুলো একটা আরেকটার ভিতরে ঢুকে গেছে। শেষ অক্ষরটা এক শব্দের পরের অন্য শব্দের প্রথম অক্ষরের সাথে জোড়া লেগে যাচ্ছে। এটুকু আবৃত্তি করা হচ্ছে খুব জোরে।

'O, young Lochin varhas scum out of the vest,
Through wall the vide Border his teed was the bes;
Tand savissgood broadsod heweapon sadnun,
Nhe rod all unarmed, and he rod all lalone.'

বিছানার ওপর বৃদ্ধ মহিলার ঘোঁত ঘোঁত শব্দ কবিতাটিকে সঙ্গত করেছিলো, যেটা চাকো ছাড়া আর কেউ খেয়াল করেছিলো বলে মনে হয়না।

'Nhe swam Eske river where ford there was none;
Buttair he alighted at Netherby Gate,
The bridehad cunsended, the gallantcame late.'

কমরেড পিল্লাই কবিতার মাঝখানে এসে পড়লেন, ঘামে চক্‌চক্ করছিলো তাঁর শরীর, তাঁর ধুতিটা গোটানো ছিলো হাঁটুর ওপর পর্যন্ত। গাঢ় ঘামের দাগ ছড়িয়ে ছিলো তাঁর টেরিলিনের বগলের নিচে। তাঁর বয়স তখন ছিলো তিরিশের কোঠার শেষের দিকে, তখন তিনি ছিলেন পেশাহীন, পাংশুবর্ণ ছোট মানুষ। ততদিনে তাঁর

পাগুলো হয়ে গেছে সরু ও লম্বা, তাঁর ভূড়ি হয়েছে তাঁর ছোটখাট মায়ের গলগন্ডের মতো। ওগুলো তাঁর হালকা পাতলা শরীর আর সতর্ক চেহারার সঙ্গে ছিলো একেবারেই বেমানান। যেন তাদের পরিবারের জিনের মধ্যে কোন কিছু তাদেরকে অবধারিতভাবে নাড়া দিয়েছে, যা এলোমেলোভাবে তাদের দেহের নানান জায়গায় বেরিয়েছে।

তাঁর নিখুঁত পাতলা গোঁফ তার উপরের ঠোঁটটাকে ভাগ করেছে একটু ফাঁক রেখে সমানভাবে অর্ধেক করে, আর সেটা শেষ হয়েছে তার ঠোঁটের রেখার ঠিক শেষ কোণায়। তাঁর চুলের ঘনত্ব কমতে শুরু করেছিলো তিনি তা লুকানোর কোন চেষ্টা করেননি। তাঁর চুলে তেল দেয়া এবং আর ব্যাক ব্রাশ করা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি যৌবনের পিছনে ধেয়ে চলেননি। বাড়ির একমাত্র পুরুষ হিসাবে তাঁর কর্তৃত্ব খুব সহজ। তিনি হাসলেন এবং চাকোকে ঝুঁকে অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী কিংবা মায়ের উপস্থিতির ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখালেন না।

পদ্যটা আবৃত্তি করে যাবার অনুমতির জন্যে লাথার চোখগুলো তাঁর দিকে ফিরলো। অনুমতি দেয়া হলো। কমরেড পিল্লাই তাঁর শার্টটা খুলে দলা করে বগল মুছলেন। যখন তাঁর শেষ হলো কল্যাণী সেটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে এমনভাবে ধরে রাখলেন যেন একটা উপহার পেয়েছেন। একটা ফুলের তোড়া। কমরেড পিল্লাই, তাঁর হাতাছাড়া জামার উপর বসলেন একটা ভাঁজ করা চেয়ারে এবং তাঁর বাঁ পাটা টেনে আনলেন তাঁর ডান উরুর ওপর। তাঁর ভাইয়ের মেয়ের বাকি আবৃত্তির সময়টুকু তিনি তাকিয়ে থাকলেন মেঝের দিকে ধ্যানমগ্নভাবে, তাঁর থুতনিটা হাতের তালুতে ধরা। ডান পাটা দিয়ে তাল দিচ্ছেন পদ্যের ও ধ্বনির ওঠা-নামার সঙ্গে। অন্য হাতে তিনি মালিস করছিলেন বাঁ পায়ের মসৃণ গোড়ালী ও আঙুলের মাঝখানের ওপরের জায়গাটা।

যখন লাথা শেষ করলো, চাকো তালি দিলো আন্তরিকতার সঙ্গেই। লাথা তাঁর তালি দেয়াকে গ্রাহ্য করলো না এমনকি এক চিলতে হাসির ভাবও ফুটলো না। যেন স্থানীয় একটা প্রতিযোগিতায় সে একজন পূর্ব জার্মান সাঁতারু। তার চোখগুলো কঠিন অচঞ্চল অলিম্পিকের সোনা জেতার জন্যে। এর চেয়ে যে কোন কম সাফল্য সে তার প্রাপ্য বলে মনে করে না। সে তার চাচার দিকে তাকিয়ে রইলো ঘর ছাড়ার অনুমতির জন্যে।

কমরেড পিল্লাই তাকে ইশারায় কাছে ডাকলেন এবং কানে কানে বললেন 'যাও আর পোতাচেন ও মাথুকুট্টি বলো, যদি ওরা আমার সাথে দেখা করতে চায় তবে এখনই আসতে হবে।'

'না, কমরেড, আসলেই... আমি আর কিছু খাবোনা,' চাকো বললো, সে ভাবছিলো যে কমরেড পিল্লাই হয়তো লাথাকে পাঠাচ্ছে আরও কিছু খাবার আনতে।

কমরেড পিল্লাই ভুল বোঝার জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে ওটাকে জিইয়ে রাখলেন।

'না না না। হাহ্! এটা কি?...এই যে কল্যাণী, এক প্লেট ঐ আভালোস এর ওনড়াস আনো।'

উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদ হিসাবে, এটা কমরেড পিল্লাই-এর জন্যে প্রয়োজন ছিলো। তাঁর পছন্দের আসনে নিজেকে প্রভাবশালী লোক হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা ছিলো তাঁর। তিনি চাকোর সাক্ষাৎটাকে ব্যবহার করে তাক লাগাতে চাইলেন সনির্বন্ধ আবেদনকারী ও দলীয় কর্মীদের। পোথাচেন ও মাথুকুট্টি, যাদেরকে তিনি ডেকেছিলেন, তারা ছিলো গ্রামবাসী, যারা তাঁর কাছে অনুরোধ করে গেলো তাঁর পরিচিতির যোগাযোগ ব্যবহার করে কোট্টাইয়ামের হাসপাতালে তাদের মেয়েদের নার্সের চাকরীর ব্যবস্থা করার জন্যে। কমরেড পিল্লাই ছিলেন– চাইতেন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীরা বাড়ির বাইরে অপেক্ষায় থাকুক। যত বেশী লোককে তাঁর বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করতে দেখা যাবে তত তাঁকে ব্যাস্ত মনে হবে, এবং তাঁর সম্বন্ধে মানুষের তত ভালো ধারণা হবে। এবং যদি অপেক্ষা করা লোকরা দেখে কারখানার মালিক নিজেই তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছে, তাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পৌঁছে যাবে সব জায়গায়।

'তাহলে! কমরেড!' কমরেড পিল্লাই বললেন লাথার চলে যাওয়া ও আভালোস ওনড়াস আসার পর। 'কি খবর ? তোমার মেয়ে এখানকার পরিবেশের সাথে মিলতে পারছে?' তিনি চাকোর সাথে ইংরেজীতে কথা বলার জন্য জোর করে চেষ্টা করলেন।

'খুব ভালো। ও ঘুমিয়ে আছে এখন।'

'ওহো! আমার মনে হয় প্লেনের জার্নির ক্লান্তিতে?' কমরেড পিল্লাই বললেন, নিজের ব্যাপারে সন্তুষ্টি নিয়ে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের দু'একটা ব্যাপার জানা থাকার কথা অন্যভাবে জানান দিলেন তিনি।

'ওলাসসাতে কি হচ্ছে ? দলীয় সভা ?' চাকো জিজ্ঞেস করলো।

'ওহো! সেরকম কিছুনা, আমার বোন সুধার একটা হাড্ডি ভাঙার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে ক'দিন আগে,' কমরেড পিল্লাই বললেন, যেন হাড্ডি ভাঙাটা একটা সাক্ষাৎপ্রার্থী সম্মানিত ব্যক্তি। 'তাই আমি তাকে ওলাসসা মুসে নিয়ে গিয়েছিলাম কিছু ওষুধ পাইয়ে দেওয়ার জন্যে। ওষুধটা একরকম তেল এবং সেটাই লাগে। তার স্বামী থাকে পাটনাতে, শ্বশুর বাড়িতে সে একা।'

লেনিন দরজার পাশের জায়গাটা ছেড়ে দিলো, এবং বাপের দুই হাঁটুর মধ্যে হেলান দিয়ে নাক খুটতে লাগলো।

'এই যে, বাবু তুমি একটা কবিতা শোনাবেনা ?' চাকো বললো তাকে, 'তোমার বাবা কি তোমাকে একটাও শেখায়নি ?'

লেনিন চাকোর দিকে তাকালো, বোঝা গেলোনা চাকো যা বলেছে তা সে বুঝতে পেরেছে– না শুনতে পেরেছে!

'ও সব জানে,' কমরেড পিল্লাই বললেন। 'ও হলো একটা প্রতিভা, শুধুমাত্র বাইরের লোকজনের সামনে চুপচাপ।'

কমরেড পিল্লাই লেনিনকে নাড়ালেন তাঁর হাঁটু দিয়ে।

'লেনিন. বাবু, কমরেড চাচাকে একটা শোনাওতো বাবা তোমাকে যেটা শিখিয়েছি। *বন্ধুরা রোমানরা দেশবাসী ...*'

লেনিন অনবরত নাক খুঁটে যাচ্ছে।

'বাবু, শোনাওনা তোমার কমরেড চাচাকে–'

কমরেড পিল্লাই সেক্সপীয়র থেকে শুরু করার চেষ্টা করলেন, '*বন্ধুরা, রোমানরা, দেশবাসী, আমাকে ধার দাও তোমার– ?*'

লেনিনের পলকহীন দৃষ্টি চাকোর উপর। কমরেড পিল্লাই আবার চেষ্টা করলেন,

'*... আমাকে ধার দাও তোমার– ?*'

লেনিন কটা কলার টুকরা তুলে নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সে চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ী আর রাস্তার মাঝের লম্বা জায়গাটায় এবং ওপরে নীচে ছুটাছুটি শুরু করলো এবং চেঁচিয়ে যা বলতে লাগলো তা সে নিজেই বুঝতে পারছিলোনা। কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর তার দৌড় পরিণত হলো দম আটকে হাঁটু সমান উঁচু লাফে।

'তোমরা শোনো;'

লেনিন চেঁচিয়ে উঠলো উঠোন থেকে। পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়া বাসের চেয়ে জোরে।

> *'আমি এসেছি কবর দিতে সিজারকে, তাকে প্রশংসা করতে নয়।*
> *যে সব খারাপ কাজ লোকেরা করে তা তাদের পিছনে থেকে যায়।*
> *ভালোকে প্রায়ই সমাহিত করা হয় তাদের অস্থির সঙ্গে।'*

সে চেঁচালো পরিষ্কার গলায়, একবারও ভুল না করে। প্রশংসাযোগ্য, তবে ও ছিলো মাত্র ছ' বছরের আর বুঝতও না যে শব্দগুলো সে বলেছে তার একটিও। ভিতরে বসে থাকা কমরেড পিল্লাই তার ছোট ধুলো মাখা দুষ্টু ছেলেকে উঠোনে দেখে (যে ভবিষ্যতে হবে ঠিকাদার, নিজের একটা বাচ্চা থাকবে আর একটা বাজাজ স্কুটারের সওয়ারী) গর্বের হাসি হাসলেন।

'ও ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছে। এ বছর ডাবল প্রমোশন পাবে।'

ছোট্ট গরম ঘরটার মধ্যে প্রচুর উচ্চাকাঙ্খা ভরে গাদা হয়ে আছে।

কমরেড পিল্লাই তাঁর পর্দা ঢাকা আলমারীর ভিতর যেসব জিনিস রেখেছিলেন তা অবশ্যই ভাঙা বালসা প্লেন ছিলোনা।

অন্য দিকে চাকো এ বাড়িতে ঢোকার মুহূর্ত থেকেই, অথবা যখন কমরেড পিল্লাই বাড়িতে ফিরে এলেন তখন থেকেই কেমন একটা অস্বস্তিতে ভুগছিলো। যেন কোন তারকা কেড়ে নেওয়া জেনারেল, যে তার হাসি কমিয়ে রেখেছিলো। শুধু তার

মেজাজটা ধরে রেখেছিলো। এমন অবস্থায় প্রথম সাক্ষাতে যে কেউ তাকে ভাবতে পারতো সল্পভাষী। বেশ নম্র।

রাস্তার লড়াকুর অভ্রান্ত সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে কমরেড পিল্লাই জানতেন তাঁর দারিদ্র্য পীড়িত অবস্থা (তার ছোট্ট, গরম বাড়ি, তাঁর ঘোঁত-ঘোঁত করা মা, তাঁর অবশ্যম্ভাবী নৈকট্য কষ্ট করা মানুষেরা) তাঁকে দিয়েছে চাকোর চেয়ে বেশী একটা শক্তি সেই বৈপ্লবিক সময়ে যা আক্সফোর্ডের যে কোন ধরনের শিক্ষা তা দিতে পারতো না।

তিনি তাঁর দারিদ্র্যকে চাকোর মাথার ওপর ধরে থাকলেন একটা বন্দুকের মতো।

চাকো একটা কোঁচকানো কাগজের টুকরা বের করলো যার উপর সে একটা খসড়া ছবি আঁকার চেষ্টা করছিলো একটা নতুন লেবেলের জন্যে এবং লেবেলটা সে কমরেড কে, এন, এম পিল্লাইয়ের কাছ থেকে ছাপাতে চাচ্ছিল। ওটা প্যারাডাইস পিকলস এ্যাণ্ড প্রিজার্ভস-এর ও একটা নতুন পন্যের জন্যে যা আগামী বসন্তে বাজারে ছাড়া হবে। সিনথেটিক রান্না করার ভিনিগার। আঁকা-আঁকি ছিলো চাকোর ভালো গুণগুলোর একটা, কমরেড পিল্লাই তা থেকেই পেয়েছিলেন সাধারণ ধারণাটা।

পিল্লাই ছিলেন কথাকলি নৃত্যশিল্পীর ছকটার সঙ্গে পরিচিত, তাঁর ঘাগরার নিচের স্লোগানটা ছিলো *স্বাদের রাজ্যের রাজা* (তাঁর ধারণা) এবং ছাপার অক্ষরের আকারটা তিনিই পছন্দ করেছিলেন।

'নক্সাটা হবে একই। শুধু বদল হবে লেখার বিষয়টা, আমার মনে হয়,' কমরেড পিল্লাই বললেন।

'আর কিনারার রঙটা,' চাকো বললো, সরষের রঙ লালের বদলে।'

কমরেড পিল্লাই তাঁর চশমাটাকে চুলের ওপরে উঠিয়ে দিলেন বিষয়বস্তুটা পড়ার জন্যে। লেন্সগুলো তক্ষুণি ঝাপসা হয়ে গেলো চুলের তেলে।

'সিনথেটিক রান্না করার ভিনিগার,' তিনি বললেন, 'এর পুরোটাই বড় হাতের অক্ষরে, আমার মনে হচ্ছে।'

'গাঢ় নীল,' চাকো বললো।

'অ্যাসেটিক এ্যাসিড থেকে তৈরি?'

'গাঢ় নীল,' চাকো বললো, 'যেমন আমরা করেছিলাম লবন জলে কাঁচা মরিচের জন্যে।'

নেট কনটেন্টস, ব্যাচ নম্বর, মানুফ্যাকচারিং ডেট, এক্সপায়ারি ডেট, রিটেইল প্রাইস, রুপী...

চাকো মাথা নাড়লো।

'আমরা এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই বোতলে রক্ষিত ভিনেগার, প্রকৃতি ও গুনগত ভাবে যে রকম হওয়া উচিত ঠিক সেই রকম। উপাদান: জল এবং অ্যাসেটিক এসিড।'

'এটা হবে লাল রঙের, আমার মনে হয়।'

কমরেড পিল্লাই ব্যবহার করেছিলেন 'মনে হয়' কথাটা প্রশ্ন ও বক্তব্যের মধ্যে আড়ালে আনার জন্যে। তিনি অপছন্দ করতেন প্রশ্ন করতে যদি সেটা ব্যক্তিগত না হয়। প্রশ্নগুলো অজ্ঞতার অপমানজনক পরিচয় তুলে ধরে।

ভিনিগারের লেবেলের ব্যাপারে আলোচনা এরিমধ্যে তারা শেষ করেছিলো, চাকো ও কমরেড পিল্লাই দু'জনেই অর্জন করেছে মাথার ওপরে একটা করে মশার চোঙা তাদের।

তারা ডেলিভারির জন্যে একটা তারিখ ঠিক করলো।

'তো গতকালের মিছিলটা ছিলো একটা সাফল্য ?' চাকো বললো, শেষ সময়ে এসে তার সাক্ষাৎ করতে আসার আসল কারণ বলতে আরম্ভ করলো।

'দাবীগুলো যদি পূরন না হয়, যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ– কমরেড, আমরা বলতে পারিনা এটা সফল না ব্যর্থ।' একটা পুঁথি পড়ার সুর উঠলো কমরেড পিল্লাইয়ের কণ্ঠস্বরে।

'ততক্ষণ পর্যন্ত, পরিশ্রম করে যেতে হবে।'

'তবে সাড়াটা ভালোই ছিলো,' চাকো আগ বাড়িয়ে বললো, একই ঢঙে বলতে চাইলো।

'সেটা অবশ্য ওখানে ছিলো,' কমরেড পিল্লাই বললেন। 'কমরেডরা স্মারকলিপি পেশ করেছে দলীয় সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকের কাছে। এখন আমাদের দেখার পালা। আমাদের শুধু নজর রাখতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে।'

'গতকাল আমরা রাস্তায় মিছিলটার পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম,' চাকো বললো।

'কোচিনের পথে, আমার মনে হয়,' কমরেড পিল্লাই বললেন। 'কিন্তু দলীয় সূত্র অনুযায়ী ত্রিবান্দ্রামে সাড়া ছিলো আরো অনেক ভালো।'

'কোচিনেও ছিলো হাজার হাজার কমরেড,' চাকো বললো। 'সত্যি কথা বলতে কি আমার বোনের মেয়ে ভেলুথাকে দেখেছে তাদের মধ্যে।'

'ওহো! তাই নাকি,' কমরেড পিল্লাই হতবাক হয়ে গেলেন। ভেলুথা ছিলো একটা বিষয়– যেটা নিয়ে চাকোর সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা তাঁর ছিলো। কোনদিন। ঘটনাচক্রে। কিন্তু এতো সরাসরি নয়। তাঁর মন গুন গুন করছিলো টেবিল পাখার মতো। তিনি ভাবছিলেন তাকে যে প্রস্তাবটা দেয়া হয়েছে সেটা শুরু করার সুযোগ তিনি নেবেন কিনা, কিংবা সেটাকে অন্য কোনদিনের জন্যে ছেড়ে দেবেন কিনা। তখনই তিনি সুযোগটা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

'হ্যাঁ, ও একজন ভালো কর্মী,' চাকো বললো চিন্তা করে। 'খুব বুদ্ধিমান।'

'ঐ [illegible], কমরেড,' কমরেড পিল্লাই বললেন, 'পার্টি কর্মী।'

কমরেড পিল্লাই-এর মা ঘোঁত-ঘোঁত করতে করতে দুলতে লাগলেন। ঘোঁত-ঘোঁত করার ছন্দের মধ্যে কিছু একটা আশ্বস্ত করার মতো ছিলো। যেন ঘড়ির টিক টিক করার মতো। যে শব্দটা কেউ হয়তো খেয়াল করবেনা, কিন্তু ছন্দপতন হলেই বুঝতে পারবে।

'আহ!, তাই নাকি। তাহলে ওর কার্ড আছে ?'

'হ্যাঁ,' কমরেড পিল্লাই নম্রভাবে বললেন। 'ওহ হ্যাঁ।'

চাকোর চুলের ভিতর দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়লো। সে অনুভব করলো যেন এক দল পিঁপড়ে তার মাথার তালুর ওপর দিয়ে বিলবিল করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সে দু' হাত দিয়ে তার মাথার তালু চুলকালো অনেকক্ষণ ধরে। তার মাথার পুরো তালু ওপর নিচে করছিলো আঙুল দিয়ে।

'*ওরু কারায়াম পারাইয়্যাটি?*' কমরেড পিল্লাই মালায়লামে বদল হলেন এবং গোপন ও ষড়যন্ত্রীর মতো কণ্ঠে বললেন। 'আমি বলছি বন্ধুর মতো, কেটো, অফ দ্য রেকর্ড।'

কথাটা চালিয়ে যাওয়ার আগে, কমরেড পিল্লাই ভালোভাবে চাকোকে দেখলেন। তাঁর সাড়াটা মাপতে চেষ্টা করছিলো চাকো, দেখছিলো ধুসর আঠালো ঘামটা এবং খুসকিটা যেটা ঢুকেছিলো তার নখের ভিতরে।

'ঐ পারাভানটা তোমাকে সমস্যায় ফেলবে,' তিনি বললেন। 'আমিই বলছি লিখে নিতে পারো... ওকে একটা চাকরী যোগাড় করে দাও। অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও।'

কথাবার্তা যেভাবে বাঁক নিলো চাকো তাতে আশ্চর্য হলো। সে শুধু জানতে চাচ্ছিলো কি ঘটছে, ব্যাপার কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে।' সে আশঙ্কা করেছিলো মুখোমুখি ঝগড়া লাগার, বদলে তাকে প্রস্তাব দেওয়া হলো– ধূর্ত, উল্টো উপদেশ, ষড়যন্ত্রের সহযোগিতা।

'ওকে পাঠিয়ে দেবো? কিন্তু কেন?' 'আমার কোনো অসুবিধা নেই সে কার্ডওয়ালা হলেও, আমি শুধু জানতে চাইছিলাম, ওটুকুই ... আমি ভেবেছি হয়তোবা আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেছেন,' চাকো বললো। 'কিন্তু আমি ঠিক জানি ও শুধু পরীক্ষা করছে, ওর ডানাগুলো নেড়ে দেখছে, ও বুদ্ধিমান লোক, কমরেড, আমি ওকে বিশ্বাস করি।'

'ও ভাবে না,' কমরেড পিল্লাই বললেন, 'ও মানুষ হিসাবে খুব ভালো হতে পারে। কিন্তু অন্য শ্রমিকরা তাকে নিয়ে খুশি নয়। এরমধ্যেই তারা আমার কাছে এসেছিলো অভিযোগ নিয়ে...তোমাকে বলছি, কমরেড, এলাকার কথা ভেবে, এই জাত-পাতের ব্যাপারগুলো খুব গভীর শিকড়ওয়ালা।

কল্যাণী তাঁর স্বামীর জন্য একটা স্টিলের কাপ ভরা গরম ধোঁয়া ওঠা কফি রাখলেন টেবিলের ওপর ।

'ওকে দেখো, উদাহরণ হিসাবে, এ বাড়ির গিন্নী। এমনকি সেও কখনো পারাভানদের অনুমতি দেবেনা তার বাড়ির ভিতরে ঢুকতে। কখনো না। এমনকি আমিও তাকে বোঝাতে পারিনা। আমার নিজের বউকে। অবশ্য বাড়ির ভিতরে সে-ই মালিক।' তিনি ঘুরলেন তাঁর স্ত্রীর দিকে একটা আদরের, দুষ্টু হাসি নিয়ে। 'কি তাইনা, কল্যাণী?'

কল্যাণী নিচের দিকে তাকালেন আর হাসলেন, লাজুকভাবে, তাঁর গোঁড়ামীর কথা স্বীকার করে নিলেন।

'দেখলে?' কমরেড পিল্লাই বললেন, কণ্ঠে বিজয়ীর উষ্ণতা। 'ও ইংরেজী খুব ভালো বোঝে। শুধু বলেনা।'

চাকো হাসলো, চাপা হাসি।

'আপনি বলছেন যে আমার শ্রমিকরা আপনার কাছে এসেছে অভিযোগ নিয়ে ...?

'ওহ্ হ্যাঁ, ঠিক,' কমরেড পিল্লাই বললেন।

'বিশেষ কোন ব্যাপারে?'

'তেমন বিশেষ কিছু না,' কমরেড কে, এন, এম পিল্লাই বললেন। 'কিন্তু দেখো, কমরেড, যে কোন সুবিধা তুমি তাকে দাওনা কেন, স্বাভাবিক ভাবেই অন্যেরা সেটার বিরোধিতা করছে। তারা এটাকে দেখছে পক্ষপাতিত্ব হিসাবে। সবকিছু বাদ দিলেও, যে কাজই সে করুকনা কেন, কাঠমিস্ত্রীর, ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর অথবা যে কাজই হোক না কেন, তাদের জন্য সে পারাভান। এটা একটা শর্ত যেটা ওরা জন্ম থেকেই পেয়েছে। এটা আমি তাদের নিজেই বলেছি যে ভুল। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, কমরেড, পরিবর্তন এক জিনিষ আর গ্রহন করা অন্য জিনিষ। তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে। সে জন্যেই ভালো যদি তুমি তাকে পাঠিয়ে দাও ...।'

'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড,' চাকো বললো, 'সেটা অসম্ভব।' ওর তুলনা নেই। ওই আসলে কারখানাটা চালায় ... আমরা সমস্যাটা সমাধান করতে পারবো না সব পারাভানদের তাড়িয়ে দিয়ে। আসলে কান্ডজ্ঞানহীন এই ব্যাপারগুলো থেকে আমাদের শিখতে হবে।'

কমরেড পিল্লাই 'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড' হিসাবে তাঁকে ডাকাটা অপছন্দ করলেন। এটা তার কাছে শোনালো অনেকটা অপমানের মতো, যেটা ভালো ইংরেজীতে প্রকাশ করা হয়েছিল। আর সেটাই বিষয়টাকে পরিণত করেছিলো দ্বিগুণ অপমানে, অপমানটা নিজের, এবং সত্যিটা এই যে চাকো ভেবেছিলো তিনি অপমানটা বুঝতে পারবেন না। ওটা তাঁর মেজাজটাকে একেবারে বিগড়ে দিলো।

'তা হতে পারে,' তিনি বললেন তিক্তভাবে। 'কিন্তু রোম শহর একদিনে তৈরী হয়নি। এটা মনে রেখো কমরেড, যে এটা তোমার অক্সফোর্ড কলেজ নয়। তোমার জন্যে যেটা কান্ডজ্ঞানহীন কিছু, জনগনের জন্য সেটা অন্য কিছু।'

লেনিন, তার বাপের শীর্ণতা আর তার মায়ের চোখ নিয়ে, দরজায় উদয় হলো, হাঁফাতে হাঁফাতে। সে চেঁচিয়ে শেষ করেছে মার্ক অ্যান্টনীর পুরো বক্তৃতাটা এবং লোচিনভার এর প্রায় সবটাই, তখন সে বুঝতে পারলো যে তার শ্রোতাদের সব মনযোগ সে হারিয়ে ফেলেছে। সে আবার হেলান দিলো কমরেড পিল্লাই এর ফাঁক করা হাঁটুর মাঝখানে।

সে তার হাতগুলো দিয়ে তালি বাজাতে থাকলো তার বাপের মাথার ওপর, মশার দঙ্গলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্যে। সে হাতের তালুতে থ্যাঁতলানো মশার মৃতদেহগুলো গুনলো। তাদের মধ্যে কয়েকটা ছিলো মোটা তাজা– রক্ত চুষে। সে সেগুলো তার বাপকে দেখালো, পিল্লাই তাকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন পরিষ্কার করার জন্যে।

আর একবার তাদের নীরবতা বৃদ্ধ মিসেস পিল্লাই এর ঘোঁত ঘোঁত শব্দ ভরে দিলো। লাথা আসলো পোথাচেন ও মাথুকুট্টিকে নিয়ে। লোকগুলোকে বাইরে অপেক্ষায় রাখা হলো। দরজাটা একটু খোলা থাকলো। তখন কমরেড পিল্লাই আবার কথা বললেন। তিনি মালায়লামে এবং জোরে জোরে বললেন যাতে বাইরের স্রোতারাও শুনতে পায়।

'আসলে শ্রমিকদের দুর্দশা দূর করার জন্যে থাকা উচিত ইউনিয়ন। এবং এই ক্ষেত্রে মালিক নিজেই যখন কমরেড, তখন সেটা তাদের জন্যে একটা লজ্জার বিষয় তার ইউনিয়ন এবং দলের সংগ্রামে যোগ না দেওয়া।'

'আমি সেটা ভেবেছি,' চাকো বললো, 'আমি তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত করতে যাচ্ছি ইউনিয়নে। নিজেদের প্রতিনিধি তারা নিজেরাই ঠিক করবে।'

'কিন্তু কমরেড, তুমি তাদের বিপ্লবকে তাদের জন্যে সাজিয়ে দিতে পারোনা। তুমি শুধু তাদেরকে উজ্জীবিত করতে পারো। তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারো। তাদের নিজেদের সংগ্রাম নিজেদের শুরু করতে হবে। তাদের ভয়কে তাদেরই জয় করতে হবে।'

'কার ভয়?' চাকো হাসলো। 'আমার?'

'না, তোমার নয়, প্রিয় কমরেড। শত শত বছরের নিপীড়ন'

তারপর কমরেড পিল্লাই, একটা তর্জন গর্জন করে কর্তৃত্ব জাহির করার মতো কণ্ঠে, চেয়ারম্যান মাও এর উদ্ধৃতি দিলেন মালায়লামে। তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিটা ছিলো অবাক করা, একেবারে তাঁর ভাইয়ের মেয়ের মতো।

'বিপ্লব তো রাতের ভুরিভোজ নয়। বিপ্লব হলো বিদ্রোহ, একটা সন্ত্রাসের কাজ যেটাতে এক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে।'

এবং তাই সিনথেটিক রান্নার ভিনিগারের লেবেলের চুক্তিটা পকেটে ভরে, তিনি কৌশলে নির্বাসিত করলেন চাকোকে। বিজয়ী যোদ্ধা থেকে একেবারে শত্রু বানিয়ে ছাড়লেন।

পরাজিতরা বসে থাকলো পাশাপাশি ইস্পাতের ফোল্ডিং চেয়ারে, ঐ বিকেলে যেদিন সোফি মল এসেছিলো। চুমুক দিচ্ছিলো কফিতে এবং কচকচ করে খাচ্ছিলো কলার টুকরো।

ছোট পাতলা লোকটা এবং বড় মোটা লোকটা। যেন অনাগত এক যুদ্ধের দুই সৈনিক ছিল পক্ষ-বিপক্ষের।

ওটা এমন একটা যুদ্ধে পরিনত হলো যেটা, দুর্ভাগ্যজনক কমরেড পিল্লাইয়ের জন্যে, শেষ হবে প্রায় শুরুর আগেই। জয় উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছিলো তাঁকে, কাগজে মোড়ানো এবং ফিতে দিয়ে বাঁধা, একটা রূপোর থালায়। তবে তখন, যখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, এবং প্যারাডাইস পিকলস ব্যবসার মন্দার জন্যে মুখ থুবড়ে পড়লো মেঝেতে। একটা গুন গুন শব্দ কিংবা বিদ্রোহের মিথ্যে গুজবের মতো-

কমরেড পিল্লাই বুঝে নিলেন, যে তাঁর যেটা আসল প্রয়োজন ছিলো সেটা হলো যুদ্ধে এগিয়ে থাকা, জয়ের ফলাফলের চেয়ে ওটাই জরুরী। যুদ্ধ হতে পারতো যে ঘোড়াতে তিনি চড়েছিলেন তা থেকেই কিন্তু তাঁর মাথায় ছিলো লোক সভার নির্বাচন, ওটায় তিনি কখনওই জিততে পারেননি তবে শুরুটা করেছিলেন ভালোই।

তিনি ডিমটা ভেঙেছিলেন কিন্তু ওমলেটটাকে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

কেউ কখনো জানতে পারেনি কমরেড পিল্লাই এর অভিনীত চরিত্রের নিখুঁত প্রকৃতি ঘটনাপ্রবাহ, যেগুলো তারপর ঘটেছিলো। এমনকি চাকো– সে জানতো যে গরমাগরম, উঁচু গলার বক্তৃতাগুলো অস্পৃশ্যদের অধিকারের ব্যাপারটা ('জাত হলো শ্রেণী, কমরেডরা') আসলে কি। কমরেড পিল্লাই মার্কসবাদী দল দিয়ে প্যারাডাইস পিকলস ধ্বংস করলেন, চাকো কিছুটা জানতো তবে তাঁর ভগ্নীর পুরো কাহিনীটা কখনো জানতে পারেনি। সে সেটা জানতে চায়ওনি। তখন থেকে, সোফি মলের মৃত্যুতে অসার হয়ে গিয়ে, সে সবকিছুকে দেখতো দুঃখভরা দৃষ্টিতে। যেন দুর্বিপাকে পড়া বাচ্চার মতো, যে হঠাৎ করে বেড়ে উঠেছে আর তার খেলনাগুলো ফেলে রেখেছে। চাকো তার খেলনাগুলো পরিত্যাগ করলো। আচার জমিদারের স্বপ্নগুলো এবং জনগণের যুদ্ধ যোগ হলো ভাঙা প্লেনগুলোর তাকে তার কাঁচের পাল্লা লাগানো আলমারীতে। প্যারাডাইস পিকলস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, কিছু ধানের জমি বিক্রি করে দেয়া হলো (তাদের বন্ধকী টাকাসহ) ব্যাংকের ঋণগুলো শোধ করতে। আরও কিছু বেচা হলো পরিবারের খাওয়া পরার জন্যে। চাকোর কানাডায় চলে যাওয়ার সময়ে, পরিবারের একমাত্র আয় আসতো বারবার বাগান থেকে। ওটা ছিলো এইমেনেমের বাড়ির লাগোয়া আর উঠোনের কিছু নারকেলের গাছ থেকে। বেবি কোচাম্মা ও কচু মারিয়া মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত ওভাবেই চলেছিলো। সবাই মারা যাওয়া, চলে যাওয়া ও ফিরে আসা পর্যন্ত।

কমরেড পিল্লাই-এর ব্যাপারে ন্যায্য কথা বললে বলতে হয়, তিনি পরিকল্পনা করেননি, যে সব ঘটনা পরে ঘটেছিলো। তিনি কেবলমাত্র তাঁর প্রস্তুত আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ইতিহাসের অপেক্ষমাণ দস্তানার মধ্যে।

সবটা দোষ তাঁর ছিলোনা। কারণ তিনি বাস করতেন এমন সমাজে যেখানে কোন লোকের মৃত্যু হতে পারে বেশি লাভজনক, তাঁর জীবন কোনদিন সেটা হতে পারেনি।

ভেলুথার শেষ সাক্ষাৎ কমরেড পিল্লাইর সঙ্গে হয়েছিলো মামাচি ও বেবি কোচাম্মার সঙ্গে তার ঝগড়ার পর যেটা তাদের মধ্যে বিনিময় হয়েছিলো সেটা থাকলো গোপনেই। শেষ বিশ্বাসঘাতকতাটা তাকে পাঠিয়েছিলো নদীর ওপর দিয়ে, স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে, অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্যে, খুব ভালো সময়ে ইতিহাসের সঙ্গে তার অজানা সাক্ষাতের জন্যে।

ভেলুথা কোট্টাইয়াম থেকে শেষ বাসটা ধরলো যেখানে সে ফল টিনে ভরার যন্ত্রটাকে সারাতে দিয়েছিলো। বাস স্ট্যাণ্ডে সে কারখানার অন্য এক শ্রমিকের দেখা পেলো। সে তাকে বললো একটা বোকা বোকা হাসি দিয়ে যে, মামাচি তাকে দেখতে চেয়েছে। ভেলুথার কোনো ধারণা ছিলোনা কি ঘটেছে সে ব্যাপারে, এবং ঘুণাক্ষরেও জানতো না তার বাপ মাতাল হয়ে এইমেনেমের বাড়িতে গিয়েছিলো। সে এটাও জানতোনা যে ভিক্কে পাপেন বসেছিলো কয়েক ঘন্টা ধরে তাদের কুঁড়ে ঘরে, তখনও মাতাল, তার কাঁচের চোখ এবং কুড়ুলের ধারালো কিনারটা চক্‌চক্ করছিলো প্রদীপের আলোয়, অপেক্ষা করছিলো ভেলুথার ফিরে আসার। এটাও জানতো না যে হতভাগা পক্ষাঘাতগ্রস্ত কুট্টাপ্পেন অসাড় হলেও কি ঘটাবে তার জন্যে প্রস্তুত ছিলো, তার বাপের সঙ্গে সে কথা বলছিলো দু'ঘন্টা ধরে, তাকে শান্ত করতে থাকার সবটা সময় ধরে কানটাকে খাড়া রেখেছিলো একটা খচখচ শব্দের জন্যে, যাতে সে সন্দেহ না করা ভাইকে চেঁচিয়ে সাবধান করতে পারে।

ভেলুথা বাড়ি গেলোনা। সে সরাসরি এইমেনেমের বাড়িতে গেলো। যদিও, একদিকে সে অবাক হয়েছিলো, অন্যদিকে সে জানতো– অনেকদিন ধরেই বুঝতে পারছিলো, প্রাচীন সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে– একদিন ইতিহাসের কুচক্রী মুরগীরা আসবে বাড়িতে ঘুমাতে। মামাচির চেঁচানোর পুরোটা সময় ধরে সে থাকলো সংযত এবং বিস্ময়করভাবে গম্ভীর। ওটা ছিলো প্রচণ্ড উস্কানির ফলে জন্ম নেওয়া একটা থমথমে ভাব। ওটা অবরুদ্ধ ছিলো একটা সরলতার জন্যে যেটা ছিলো রোষের চেয়ে বেশি।

যখন ভেলুথা আসলো, মামাচি তাঁর ধৈর্য্য হারালেন এবং বমি করলেন। তাঁর বেপরোয়া বিষটা, তার মুর্খতায় ভরা, অসহনীয় অপমান গুলোকে উগলে দিলেন। ঝরকা কাটা দরজার একটা তক্তার ওপর যতক্ষণনা বেবি কোচাম্মা কায়দা করে তাঁকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং তাঁর রোষকে ঠিক দিকে নির্দেশ করলেন, ভেলুথার দিকে, যে দাঁড়িয়েছিলো স্থির হয়ে আধো অন্ধকারে। মামাচি তার গালাগালি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার চোখগুলো শূন্য, তার চেহারাটা কোঁচকানো ও কুৎসিত তার ক্রোধ তাঁকে ঠেলে দিলো ভেলুথার দিকে। তিনি চেঁচাচ্ছিলেন ঠিক তার (ভেলুথার) মুখের ওপর এবং সে (ভেলুথা) অনুভব করতে পারছিলো তার থুথুর ছিটকে ওঠা কণাগুলো এবং গন্ধ পাচ্ছিলো বাসি চায়ের। বেবি কোচাম্মা ছিলেন মামাচির কাছে। তিনি কিছু বলেননি, কিন্তু তাঁর হাতগুলো ব্যবহার করছিলেন। মামাচিকে উস্কে দিচ্ছিলেন।

একটা উত্তেজিত পিঠের ওপর হালকা চাপড়। একটা আবার সমর্থন করা হাত কাঁধের উপর। মামাচি পুরোপুরি অজ্ঞ ছিলেন বিষয়টাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার বিষয়ে।

শুধু কোথায় তার মতো এক বৃদ্ধা– যিনি পরতেন নিপাট ভাঁজে ইস্ত্রি করা শাড়ী আর তাঁর বেহালায় সন্ধ্যায় বাজাতে শিখেছিলেন 'পক্ষীর সংগীত'। নোংরা যে গালাগালির ভাষা মামাচি ব্যবহার করেছিলেন সেদিন, ওটা ছিলো এক রহস্য সবার কাছেই (বেবি কোচাম্মা, কচু মারিয়া, আম্মু তার ঘরে আটক), যারা তা শুনেছিলো।

'বের হয়ে যা!' তিনি চেঁচালেন, উত্তেজনায়। 'যদি আমি তোকে আমার ত্রিসীমানায় দেখি কালকে আমি তোর বিচি ছেঁচে দেবো রাস্তার কুকুরের মতো, আমি তোকে খুন করাবো!'

'আমরা দেখবো,' ভেলুথা বললো আস্তে।

সেটাই ছিলো সব, যা সে বলেছিলো। এবং ওটাকেই বেবি কোচাম্মা ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথুর অফিসে বাড়িয়ে আর ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছিলেন খুনের আর অপহরনের হুমকি বলে।

মামাচি ভেলুথার মুখের ওপর থুথু ছিটালেন। ঘন থুথু। ওটা ছড়িয়ে পড়লো তার চামড়ার ওপর। তার মুখ ও চোখের ওপর।

সে শুধু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলো। হতবাক হয়ে। তরপর সে ঘুরলো, চলে গেলো।

যখন সে বাড়িটা থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেলো, তার মনে হলো, তার অনুভূতিগুলোকে শান দেয়া ও তীক্ষ্ণ করা হয়েছে যেন তার চারপাশের সবকিছুকে সমান করে দেওয়া হয়েছে একটা নিখুঁত ছবিতে। একটা যন্ত্র যেটা সে আঁকছিলো একটা অনুশীলন বই থেকে সেটা তাকে বলছিলো কি করতে হবে। তার মন, যেটা আকুলভাবে মিনতি করছিলো কোন একটা নোঙরের জন্য। খোলাসা হচ্ছিল সব। সবকিছু সে বুঝতে পারছিলো।

গেট, সে ভাবলো যখন সে গেট দিয়ে বাইরে গেলো। *গেট*। রাস্তা। পাথর। আকাশ। বৃষ্টি।

গেট।

রাস্তা।

পাথর।

বৃষ্টি।

তার চামড়ার ওপর পড়া বৃষ্টিটা ছিলো উষ্ণ। সুরকির পথটা তার পায়ের নিচে নড়লো। সে জানতো কোথায় সে যাচ্ছিল। সে লক্ষ্য করলো সবকিছু। প্রত্যেকটা পাতা। প্রত্যেকটা গাছ। তারাহীন আকাশের সব মেঘ, তার সব পা ফেলা।

কু-কু- কুকাম থিভান্দি
কুকি পাদুম থিভান্দি

রাপাকাল ওদুম থিভান্দি।
থালান্যু নিলকাম থিভান্দি।

সেটি ছিলো প্রথম পাঠ যেটা সে স্কুলে শিখেছিলো। ট্রেন নিয়ে একটি পদ্য।

সে গুণতে শুরু করলো। কোনকিছু। যে কোন কিছু। *এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দ, পনের, ষোল, সতের, আঠার, উনিশ, কুড়ি, একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আঠাশ , উনত্রিশ ...*

যে যন্ত্রটা আঁকছিলো তা অস্পষ্ট হতে শুরু করলো। পরিষ্কার রেখাগুলো লেখাগুলো লেপ্টে গেলো। নিয়মগুলোর আর কোনো মানে থাকছিলোনা। রাস্তাটা উঠলো তাকে সাক্ষাৎ করতে এবং অন্ধকারটা ঘন হলো। আঠালো। ওটার ভিতর দিয়ে ঠেলে যাওয়া একটা পরিশ্রমে পরিণত হলো। যেন জলের নিচে সাঁতার কাঁটার মতো।

ওটা ঘটছে, একটা কণ্ঠ তাকে জানালো। ওটা শুরু হয়েছে।

তার মন, হঠাৎ করে অসম্ভব রকমের বুড়ো হয়ে গেলো, তার শরীর থেকে ভেসে বেরিয়ে গেলো তার থেকে উঁচুতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো বাতাসে, যেখান থেকে ওটা বিড়বিড় করে পাঠাচ্ছিলো অপ্রয়োজনীয় সর্তকবাণী।

ওটা নিচে তাকালো আর দেখলো একটা তরুণ লোকের শরীর হেঁটে যাচ্ছে অন্ধকারে অঝোর ধারায় ঝরা বৃষ্টির মধ্যে। অন্য সব কিছুর চেয়ে ওর শরীরটা চাচ্ছিলো ঘুমাতে। ঘুমাতে ও জেগে উঠতে অন্য এক জগতে। আম্মুর শরীরের গন্ধ ছিলো বাতাসে সে শ্বাস নিচ্ছিলো। আম্মুর শরীর তার ওপর, সে হয়তো তাকে আর কখনো দেখবেনা। সে কোথায় ছিলো? তারা তার সঙ্গে কি করেছে? তারা কি তাকে মেরেছে?

সে হাঁটতে লাগলো। তার মুখটা হ্যাঁ করা হলো বৃষ্টির দিকে উঁচু, না তাকে বাঁচানো হলো ওটা থেকে। সে না এটাকে স্বাগত জানালো, না এটাকে বাধা দিলো।

যদিও বৃষ্টিটা তার মুখের ওপর থেকে ধুয়ে ফেললো মামাচির থুথু, ওটা বন্ধ হলো না, মনে হচ্ছিল কেউ তার মাথাটা চুরি করেছে এবং তার দেহে বমি করেছে। দলাদলা বমি, তার ভিতরে গড়িয়ে পড়ছিলো। তার মনের ওপর। তার ফুসফুসের ওপর। ধীরে পড়া গাঢ় ফোঁটা তার পেটের খাঁজে। তার সবগুলো অঙ্গ বমিতে প্লাবিত। বৃষ্টির তেমন কিছু করার ছিলোনা।

সে জানতো তার কি করতে হবে। অনুশীলন বই যা তাকে নির্দেশ করছিলো। তাকে কমরেড পিল্লাই এর কাছে যেতে হবে। সে আর জানতো না যে কেন। তার পাগুলো তাকে নিয়ে গেলো লাকি প্রেসে, ওটা বন্ধ ছিলো। আর তারপর ছোট উঠোনটা পার হয়ে কমরেড পিল্লাই-এর বাড়ি।

শুধু তার হাতটা তুলে দরজায় টোকা দেওয়াই তাকে ক্লান্ত করলো।

কমরেড পিল্লাই শেষ করেছিলেন তাঁর আভিয়াল এবং একটা পাকা কলা চটকে আঠালো মন্ডটাকে তৈরি করছিলেন তাঁর বন্ধ করা মুঠোর ভিতর থেকে ফেলছিলেন দইয়ের প্লেটে, তখন ভেলুথা ধাক্কা দিলো। তিনি তাঁর বউকে পাঠালেন দরজাটা খুলতে। তিনি ফিরে আসলেন, তাঁকে দেখতে লাগলেন গোমড়ামুখে, এবং কমরেড পিল্লাই ভাবলেন, হঠাৎ করে যৌন কামনা, উঠেছে। তিনি তার স্তন গুলোকে স্পর্শ করতে চাচ্ছিলেন তখনি। কিন্তু তাঁর হাতে ছিলো দই এবং কেউ একজন দরজায় ছিলো। কল্যাণী বসলেন বিছানার ওপর এবং উদাসভাবে চাপড় মারতে লাগলেন লেনিনকে, সে ঘুমিয়ে ছিলো তার ছোট্ট দাদীর পাশে, নিজের বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে।

'কে এসেছে?'

'ঐ পাপেন পারাভানের ছেলে, ও বলছে জরুরী ব্যাপার।'

কমরেড পিল্লাই তাঁর দইটা শেষ করলেন ধীরেসুস্থে। তিনি হাত ধুলেন থালার মধ্যেই। কল্যাণী আনলেন জল একটা ছোট স্টেনলেস স্টিলের পাত্রে করে এবং তাঁর জন্যে সেটা ঢাললেন। উচ্ছিষ্ট তাঁর থালায় (একটা শুকনা লাল মরিচ, শক্ত চোখা ও চিবিয়ে ফেলেদেয়া সজনে ডাঁটা) উঠলো ও ভেসে থাকলো। তিনি তাকে এনে দিলেন একটা হাত মেছোর গামছা। তিনি হাত মুছলেন, ঢেকুর তুললেন তৃপ্তিতে, এবং দরজায় গেলেন।

'কি? রাতের বেলা এই সময়ে?'

যখন সে উত্তর দিলো। ভেলুথা শুনতে পেলো তার নিজের কণ্ঠই তার কাছে ফিরে আসলো, যেন সেটা কোন দেওয়ালে বাড়ি খাচ্ছে। সে চেষ্টা করলো ব্যাখ্যা করতে যা ঘটেছিলো, কিন্তু সে নিজেকে শুনতে পাচ্ছিল কেমন বেখাপ্পা। যে লোকটির সঙ্গে সে কথা বলছিলো সে ছিলো ছোট আর অনেক দূরে, যেন কাঁচের দেয়ালের পিছনে।

'এটা একটা ছোট গ্রাম,' কমরেড পিল্লাই বলছিলেন। 'লোকজন কথা বলে। আমি শুনি, তারা যা বলে। এমন না যে আমি জানিনা কি সব চলেছে।'

আর একবার ভেলুথা শুনতে পেলো নিজেকে বলতে এমন কিছু যার– কোন অন্যরকম অর্থ হলো না লোকটার কাছে যাকে সে বলছিলো। তার নিজের কণ্ঠস্বর তার চারিদিকে পেঁচিয়ে থাকলো সাপের মতো।

'হয়তোবা,' কমরেড পিল্লাই বললেন। 'কিন্তু কমরেড তোমার জানা উচিত যে দলের সংবিধানে নেই যে, দলীয় কর্মীদের ব্যক্তিগত জীবনের যথেচ্ছাচারকে সমর্থন করবে।'

ভেলুথা দেখলো কমরেড পিল্লাই এর শরীরটা মিলিয়ে গেলো দরজা থেকে, তাঁর শরীর থেকে আলাদা করা ও বাঁশের মতো কষ্ঠ থেকে গেলো। ওখানে স্লোগান লেখা ছিলো। পতাকাগুলো দ্রুত নড়ছিলো খালি দরজার সামনে।

দলের স্বার্থের মধ্যে নেই এই ধরনের বিষয়গুলো দেখা।

দলীয় স্বার্থের চেয়ে প্রত্যেকের ব্যাক্তি স্বার্থ অবশ্যই ক্ষুদ্র।

দলীয় নিয়ম অমান্য করা মানে দলীয় ঐক্য অমান্য করা।

কণ্ঠটা বলতেই থাকলো। বাক্যগুলো বেসুরো হয়ে নির্দেশ হয়ে গেলো। শব্দে।

বিপ্লবের উন্নতি।

শ্রেণী শত্রুকে খতম করা।

বিদেশী কোম্পানীর দালাল পুজিঁবাদী।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালো- বাজ পড়লো।

এবং আবার সেটা সেখানে। আরেকটা ধর্ম ওটার নিজের বিরুদ্ধেই। আরেকটা অট্টালিকা যেটা তৈরি করা হয়েছে মানুষের মন দিয়ে, অনেক কিছু গ্রাস করা হয়েছে মানুষের প্রকৃতিতে।

কমরেড পিল্লাই দরজাটা বন্ধ করলেন এবং তাঁর বউয়ের আর রাতের খাবারের কাছে ফিরলেন। তিনি ঠিক করলেন আরেকটা কলা খাবেন।

'ও কি চাচ্ছিলো?' তার বউ জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে একটা কলা দিতে দিতে।

'ওরা জেনে গেছে, কেউ একজন ওদেরকে বলে দিয়েছে। ওরা তাকে বরখাস্ত করেছে।'

'ওটাই কি সব? ও ভাগ্যবান যে তাকে ওরা ফাঁসিতে ঝোলায়নি।'

'আমি লক্ষ্য করেছি কিছু একটা অবাক ...' কমরেড পিল্লাই বললেন যখন তিনি কলা ছিলছিলেন। 'ভেলুথার নখে ছিলো লাল রঙের নেলপলিশ...'

বাইরে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে, শীতের মধ্যে, ভেজা আলোয় রাস্তার নিঃসঙ্গ লাইট থেকে, ভেলুথা হঠাৎ করে ঘুমে অবসন্ন হয়ে পড়লো। তার চোখের পাপড়িগুলোকে জোর করতে হচ্ছিলো খোলা রাখার জন্যে।

আগামীকাল, সে নিজেকে বললো। *আগামীকাল যখন বৃষ্টিটা থামবে।*

তার পাগুলো তাকে নিয়ে গেলো নদীতে। যেন ওগুলো হয়ে গিয়েছিলো চামড়ার দড়ি আর সে ছিলো কুকুর।

ইতিহাস হাঁটাচ্ছিলো কুকুরটাকে।

১৫

পার হয়ে যায়

তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। নদীতে জোয়ার এসেছে, জলস্রোত দ্রুত ধাবমান আর কালো, ঘূর্ণী তুলে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে, নিজের সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেঘাচ্ছন্ন রাতের আকাশ, একটা আস্ত তালের পাতা, একটা খড়ের বেড়ার খানিকটা, আরও নানান উপহার, বাতাস যা তাকে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টিটা কমলো, গুঁড়ি গুঁড়ি আর তারপর থেমে গেলো। দমকা বাতাস গাছ থেকে নাড়া দিয়ে জল ঝরালো এবং কিছুক্ষণ ধরে শুধুমাত্র গাছের নীচেই বৃষ্টি হতে লাগলো, যেখানে একসময় ঘরবাড়ি ছিলো।

একটা দুর্বল, অনুজ্জ্বল চাঁদ মেঘের ছায়ায় ঢেকে গেলো আর অনাবৃত করলো এক তরুণকে যে বসেছিলো তেরোটা পাথরের সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরেরটায়, যা নেমে গিয়েছে নদীর জলে। সে ছিলো খুব স্থির, খুব আর্দ্র। খুব তরুণ। কিছুক্ষণের মধ্যে সে উঠে দাঁড়ালো। পরনে সাদা ধুতিটা খুলে ফেললো, ধুতিটাকে নিঙড়ে পানিটা ফেলে দিলো আর সেটাকে মাথার চারপাশে প্যাঁচালো পাগড়ির মতো। একদম নগ্ন, সে হেঁটে নামলো তেরোটা পাথরের সিঁড়ি তারপর আরো নিচে। যতক্ষণ না নদীটা বুক সমান হয়। তারপর সে সাঁতার কাটতে শুরু করলো সহজ, শক্তিশালী ধাক্কায়, এগিয়ে যেতে লাগলো যেখানে স্রোতটা ছিলো দ্রুত আর সাবলীল, যেখানে আসল গভীরতা শুরু হয়েছে। চন্দ্রালোকে নদীর জল তার সাঁতরানো হাত থেকে ঝরে পড়লো যেন রূপার হাতার মতো। নদী পার হতে তার লাগলো মাত্র মিনিট কয়েক। যখন সে অন্য পাড়ে পৌছালো সে উঠে আসলো জ্বলজ্বলে অবস্থায় এবং নিজেকে তীরে ওঠালো, তার চারিদিক ঘিরে থাকা রাতের মতো কালোয়, যে কালো জল সে পার হয়ে এসেছে তার মতো।

সে ওই পথে পা রাখলো যেটা জলার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের বাড়ির দিকে গেছে।

সে নদীর জলে তরঙ্গবৃত্ত ফেলে গেলো না।

পায়ের কোন ছাপ ফেলে গেলো না তীরে।

সে ধুতিটা তার মাথার ওপর ছড়িয়ে ধরলো শুকানোর জন্যে। বাতাস ওটাকে উড়াতে লাগলো পালের মতো। সে হঠাৎ সুখী হলো। ব্যাপারগুলো আরো খারাপ হবে, সে নিজে ভাবলো। তারপর আবার ভালো। সে তখন দ্রুত হাঁটছিলো, অন্ধকারের আরও গভীরের দিকে। নেকড়ের মতো একা।

হারানোর ঈশ্বর।

ক্ষুদে জিনিসের ঈশ্বর।

উলঙ্গ, কিন্তু নখ নেলপলিশে রাঙানো।

১৬

কয়েক ঘন্টা পর

নদীর পাড়ে তিনটে বাচ্চা। একজোড়া যমজ ও আর একটা, ওদের সুখী বেগুনী রঙের সুতী কাপড়ের আংরাখা বললো, ছুটির দিন! একটা হেলানো, সুখী অক্ষরের মাপের। ভেজা পাতাগুলো গাছে চক্‌চক্ করছিলো কাঁপছিলো মসৃণ পাতের মতো। ঘন থোকার হলুদ বাঁশগুলো নদীর ওপর ঝুঁকে পড়েছিলো যেন ওরা শোক করছিলো যা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্যে, যা তারা অগ্রীম জানতো। নদীটা নিজে ছিলো অন্ধকার ও নীরব। একটা উপস্থিতির চেয়ে বরং একটা অনুপস্থিতি। বেঈমানী করা না চিহ্নিত সংকেত যেটা দিয়ে বোঝা যাবে আসলে কত উঁচু ও নির্মম ছিলো ওটা।

এসথা আর রাহেল টেনে হিঁচড়ে বের করলো নৌকাটাকে ঝোপের ভিতর থেকে যেখানে ওরা ওটাকে লুকিয়ে রাখতো। বৈঠাগুলো, ভেলুথা বানিয়েছিলো– সেগুলো লুকোনো ছিলো একটা ফাঁপা গাছের গুঁড়ির কোটরে। তারা ওটা নদীতে ভাসালো এবং শক্ত করে ধরে রাখলো যাতে সোফি মল সেটাতে চড়ে বসতে পারে। অন্ধকারটাকে মনে হচ্ছিলো তারা বিশ্বাস করছে এবং চক্-চক্ করা পাথর গুলোর ওপর দিয়ে ওরা ওঠানামা করতে লাগলো ছোট ছাগলের বাচ্চার মতো।

সোফি মল আরও অস্থির ছিলো। সে অল্প ভয়ও পেয়েছিলো তার চারপাশে অন্ধকারে কিছু ওঁৎ পেতে আছে ভেবে। একটা কাপড়ের থলেতে ফ্রিজ থেকে চুরি করা খাবার ছিলো যেটা তার বুকের ওপর কাপড়ের পট্টি দিয়ে বাঁধা। রুটি, কেক, বিস্কুট। যমজরা তাদের মায়ের কথাগুলোর জন্যে মুখ চেপেছিলো।

'যদি তোরা না থাকতিস তবে আমি মুক্ত হতে পারতাম। আমার উচিত ছিলো তোদের এতিমখানায় ফেলে আসা, যেদিন তোরা জন্ম নিয়েছিলি। তোরা আমার ঘাড়ের চারপাশে পাথরের মতো চেপে বসে আছিস।'– কথাগুলোর কোনো মানে ছিলোনা, ড্রিঙ্কওয়ালা লোকটাকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে যা সে করেছিলো এসথার সঙ্গে। তাদের বাড়ি থেকে দূরে নতুন বাড়ি ততক্ষণে হয়ে গিয়েছিলো সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি ভর্তি। দু' সপ্তাহে যখন এসথা বেগুনী জ্যাম নৌকা বেয়ে নিয়ে এসেছিলো

এবং দু'টো কল্পনাকে মাথায় রেখেছিলো, তারা কাঠবেড়ালীর মতো জমা করেছিলো দরকারি জিনিসপত্র: কয়েকটা ম্যাচ, আলু, বার বার ভাজার জন্য একটা সসপ্যান, একটা রাবারের ফোলানো হাঁস, কতগুলো মোজা– যেগুলোর আঙুল আর গোড়ালি রঙীন, লন্ডনের বাসের ছবিওয়ালা বলপয়েন্ট পেন আর অস্ট্রেলীয় এয়ার লাইন্সের প্রতীক কোয়ালা পুতুল কোয়ান্টাস কোয়ালা বোতামের মত চোখওয়ালা।

'যদি আম্মু আমাদের খুঁজে পায় আর বাড়ি ফিরে যেতে বলে তাহলে কি হবে?'

'তখন দেখা যাবে। কিন্তু যদি ও কাকুতি মিনতি করে শুধু তাহলেই।'

এসথা, করুণাময়।

সোফি মল দুই যমজকে বোঝাতে পেরেছিলো যে তারও তাদের সঙ্গে যাওয়াটা দরকারি। বাচ্চাদের অনুপস্থিতি, সব বাচ্চাদের অনুপস্থিতি বড়দের অনুশোচনা বাড়াবে। আসলেই এটা তাদেরকে অনুশোচনাগ্রস্ত করবে, হ্যামেলিনের বড়দের মতো, বংশীবাদক যেমন তাদের সবগুলো বাচ্চা নিয়ে গিয়েছিলো। সবজায়গায় খুঁজে যখন তারা নিশ্চিত হবে যে তাদের তিনজনই মারা গেছে, তখন তারা বাড়িতে ফিরবে বিজয়ীর বেশে। মূল্যবান এবং ভালোবাসার পাত্র হিসাবে, এবং সবাই তাদেরকে সবসময়ের চাইবে বেশী করে ভালবাসতে। সোফি মলের অকাট্য যুক্তি ছিলো, যদি তাকে ফেলে রেখে আসা হয় তবে তাকে অত্যাচার করে ও জোর করে বাধ্য করানো হবে তাদের গোপন লুকানোর জায়গার কথা বলে দিতে।

এসথা অপেক্ষা করলো যতক্ষণ রাহেল না উঠলো, তারপর সে নিজের জায়গা নিলো, দুই পা ফাঁক করে বসলো ছোট নৌকাটায় যেন এটা একটা খেলার ঢেঁকিকল। সে তার পা দিয়ে নৌকাটাকে ঠেলে দিলো তীর থেকে। ওরা সামনের দিকে গড়িয়ে গভীর পানিতে গেলো এবং দাঁড় বাইতে শুরু করলো কোণাকুণি উজানের দিকে, স্রোতের উল্টো দিকে, যেভাবে ভেলুথা তাদের শিখিয়েছিলো ('যদি তুমি চাও ঐখানে পৌছাতে, তোমার তাহলে ঐখানটাকেই নিশানা করতে হবে')।

অন্ধকারে ওরা দেখতে পেলোনা যে ওরা ছিলো ভুল পথে একটা শান্ত মহাসড়কের ওপর যেটা ছিলো গাড়ি ঘোড়ার শব্দ না থাকায় নীরব। ঐ ডালগুলো, কাঠের গুঁড়িগুলো, গাছের অংশগুলো, তাদের দিকে কিছুটা দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসছিলো।

তারা ছিলো আসলে গভীরতার পাশে, অন্য পাড় থেকে মাত্র কয়েকগজ দূরে, তখন ওরা ধাক্কা খেলো একটা ভেসে থাকা কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে আর ছোট নৌকাটা উল্টে গেলো। আগেও প্রায়ই নদীর ওপর দিয়ে অভিযানে তাদের এরকম হয়েছে এবং তাদের নৌকাটার পিছনে-পিছনে সাঁতার কেটে যেতে হয়েছে, ওটাকে ভেলার মতো আঁকড়ে ধরে, কুকুরের মতো সাঁতরে তীরে যেতে হয়েছে। এবার, তারা তাদের নৌকাটাকে দেখতে পেলোনা অন্ধকারে। ওটা স্রোতের তোড়ে ভেসে গিয়েছিলো। ওরা তীরের দিকে রওয়ানা দিলো, অবাক হলো এই ভেবে যে অল্প দুরত্ব অতিক্রম করতেও কতো কষ্ট করতে হয়!

এসথা চেষ্টা করলো একটা নিচু গাছের ডাল ধরতে যেটা পানির উপর ঝুঁকে ছিলো। ও নদীর নিচের দিকে উঁকি মারলো অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যদি কোনরকমে নৌকাটাকে দেখা যায়।

'আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিনা। ওটা চলে গেছে।'

রাহেল, কাদায় ঢাকা, চার হাত-পায়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে কষ্ট করে তীর উঠলো আর একটা হাত বাড়িয়ে দিলো এসথার দিকে, যাতে সে পানি থেকে নিজেকে ঠেলে তীরে তুলতে পারে। কয়েক মিনিট লাগলো তাদের নিঃশ্বাস নিতে এবং নৌকা হারানোর ব্যাপারটা মনে গাঁথতে। নৌকাটার হারিয়ে যাওয়ার জন্যে শোক করতে।

'আর আমাদের সব খাবারগুলো নষ্ট হয়ে গেছে,' রাহেল বললো। সোফি মলকে নিয়ে চিন্তা এবং একটা নিরবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। একটা ধেয়ে আসা, পাক খাওয়া, মাছের সাঁতারের মত নীরবতা।

'সোফি মল?' সে ফিসফিস করলো ধেয়ে চলা নদীর দিকে। 'আমরা এখানে! এখানে! ইলিম্বা গাছের কাছে!'

কোনো শব্দ নেই।

রাহেলের মনের ওপর পাপাচির পোকাটা ঝপাৎ করে খুললো তার বিষণ্ন লোমশ ডানাগুলো।

বাইরে।

ভিতরে।

এবং ওটা তার পাগুলো উঁচু করলো।

ওপরে।

নিচে।

ওরা তীর ধরে দৌড়াতে লাগলো তাকে ডাকতে ডাকতে। কিন্তু সে চলে গেছে। ভেসে ভেসে শব্দহীন মহাসড়কে। ধুসর সবুজ। ভিতরের মাছগুলোকে নিয়ে। ভিতরের আকাশ আর গাছ-পালা নিয়ে। আর রাতের ভাঙা হলুদ চাঁদাটাকেও নিয়ে।

সেখানে কোন ঝড়ের সংগীত ছিলোনা। মীনাচলের কালো গভীরতা থেকে কোন ঘুর্ণিস্রোত পেঁচিয়ে উঠে আসেনি। কোনো হাঙর দেখা-শোনা করেনি দুর্ঘটনাটাকে।

শুধু একটা শান্ত হাত বদলের অনুষ্ঠান। একটা নৌকা থেকে তার মালপত্র পড়ে যাওয়া। একটা নদীর সেটা টেনে নেওয়া। একটা ছোট জীবন। যেটা সংক্ষিপ্ত সুর্যকিরণ। একটা রূপার অঙ্গুঠী মুঠোয় আঁকড়ে ধরা সৌভাগ্যের জন্যে।

সময় তখন ভোর চারটে, তখনও অন্ধকার, যখন যমজরা, পরিশ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত আর কাদায় মাখামাখি হয়ে তাদের পথ ধরে আসলো বিলের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের বাড়িতে। হ্যানসেল ও গ্রেটেল– একটা ভূতুড়ে রূপকথা, যাতে তাদের স্বপ্নগুলো অবরুদ্ধ এবং আবার দেখা যাওয়ার মতো। ওরা শুয়ে থাকলো পেছনের বারান্দায় ঘাসের মাদুরের ওপর একটা ফোলানো হাঁস আর একটা অস্ট্রেলীয় বিমানের প্রতীক

কোয়ান্টাস কোয়ালা পুতুল নিয়ে। একজোড়া ভেজা বামন, ভয়ে অসাড়, অপেক্ষা করছিলো পৃথিবীর শেষের জন্য।

'তোর কি মনে হয় এতক্ষণে সোফি মল মরে গেছে?'

এসথা উত্তর দিলোনা।

'এখন কি হবে?'

'আমরা জেলে যাবো।'

ও খুব ভালো করেই তা জানতো। ছোট মানুষ। সে একটা চাকাওয়ালা গাড়িতে বাস করতো। দাম দাম।

তারা দেখেনি যে অন্য একজনও ছায়ার মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। নেকড়ের মতো নিঃসঙ্গ। একটা বাদামী পাতা তার কালো পিঠের ওপর। ওটা বর্ষাকালকে বাধ্য করতো সময় মতো আসতে।

১৭

কোচিন পোতাশ্রয়ের টার্মিনাস

এইমেনেমের নোংরা বাড়ির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে, অন্ধকারে এসথা (বুড়ো নয়, তরুণও নয়) তার বিছানায় বসেছিলো। ও বসেছিলো একদম সোজা হয়ে। কাঁধগুলো ঘাড়ের সমকোনে রেখে। হাতগুলো তার কোলের উপর। যেন সে ডাক্তারের চেম্বারে কোন রোগীর সারিতে বসে আছে এবং একজনের পরেই তাকে ডাকা হবে কিংবা গ্রেফতার হওয়ার জন্যে অপেক্ষা।

ইস্ত্রি করা শেষ। ইস্ত্রিটা বসানো ছিলো ইস্ত্রি করার বোর্ডের উপর একটা নিখুঁত লোমশ তন্তুতে বোনা জায়গার উপর। সে রাহেলের কাপড়গুলোও ইস্ত্রি করে দিলো।

বৃষ্টি হচ্ছিল টিপটিপ করে। রাতের বৃষ্টি। ঐ নিঃসঙ্গ ঢুলি তার বাজনাটা মকশ করছিলো তার বাদকদলের বাকিরা বিছানায় যাওয়ার পরে।

পাশের উঠানে আলাদা করা 'পুরুষদের চাহিদা'র প্রবেশপথে, ক্রোম দিয়ে তৈরী লেজের ডানাগুলো, বজ্রপাতের ফলে পুরনো প্লেমাউথটা জ্বল জ্বল করছিলো মাঝে মাঝে। অনেক বছর ধরে চাকোর কানাডায় চলে যাওয়ার পর, বেবি কোচাম্মা গাড়িটাকে নিয়মিত ধোয়াতেন। প্রত্যেক সপ্তায় দু'বার। অল্প পারিশ্রমিকে কচু মারিয়ার ভগ্নিপতি, যে মিউনিসিপ্যালটির হলুদ ময়লার ট্রাকটা চালাতো কোট্টাইয়ামে, সে এইমেনেমে আসতো ট্রাক চালিয়ে (যার আগমন বার্তা ঘোষিত হতো কোট্টাইয়ামের আবর্জনার দুর্গন্ধে, এবং গন্ধটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকতো তার চলে যাওয়ার পরও) সে তার শালীর বেতন থেকে তাকে বঞ্চিত করতে আসতো এবং প্লেমাউথটাকে চালাতো যাতে তার ব্যাটারীটার চার্জ ঠিক থাকে। যখন বেবি কোচাম্মা টেলিভিশন নিয়ে মাতলেন, তিনি বাগান ও গাড়ি দু'টোরই দেখাশোনা একদম বাদ দিলেন। টুট্টি ফ্রুটি।

প্রত্যেক বর্ষাকালে, পুরনো গাড়িটা মাটিতে আরও শক্তভাবে গেড়ে বসতো। যেন একটা তিনকোনা, বাতরোগওয়ালা মুরগী জাঁকিয়ে বসেছে তার ডিমের ওপর। যেন উঠবার কোন ইচ্ছাই নেই। ঘাস গজিয়েছে এর বাতাসহীন চাকার চারপাশে।

প্যারাডাইস পিকলস এ্যাণ্ড প্রিজার্ভস-এর সাইনবোর্ডটা পচে গেছে আর ভিতরের দিকে পড়ে আছে যেন একটা ধসে যাওয়া রাজার মুকুট।

একটা লতিয়ে ওঠা লতা চুরি করে ড্রাইভারের ফাটা আয়নাটার বহুবর্ণের বাকি অংশে নিজেকে একবার দেখলো।

একটা চড়ুই মরে পড়ে আছে পিছনের সিটের ওপর। সে তার ঢোকার পথ খুঁজে পেয়েছিলো সামনের কাঁচের একটা গর্তে এবং বাসা বানানোর জন্যে সিটের স্পঞ্জ–এর লোভে পড়ে তার। সে তার বের হওয়ার রাস্তা কখনো খুঁজে পায়নি। কেউ লক্ষ্য করেনি গাড়ির জানালা দিয়ে তার ভয়ার্ত মিনতি। সে মরলো পিছনের সিটের ওপর, তার পা দুটো শুন্যে তুলে। যেন একটা মজা।

কচু মারিয়া কিন্তু ঘুমে অচেতন ছিলো বসার ঘরের মেঝেতে। একটা প্যাঁচানো কলেরা জীবাণুর মতো অস্থিরভাবে জ্বলা টেলিভিশনের আলোয় যেটা তখনও চলছিলো। আমেরিকার পুলিশের লোকরা একটা হাতকড়া পরানো তের থেকে উনিশের মধ্যের বয়সের একটা ছেলেকে পুলিশের গাড়িতে তুলছে। ফুটপাতে রক্ত ছড়িয়ে আছে ছোপছোপ। পুলিশের গাড়ির আলোগুলো জ্বলছে আর সাইরেনের শব্দ যেন একটা অমঙ্গলের আভাস দিচ্ছে আর্তনাদ করে। একটা অকেজো বোধশক্তিহীন মহিলা, ছেলেটারই মা হয়তোবা, ভয়ে ভয়ে দেখছে ছায়ার মধ্যে থেকে। ছেলেটা টলতে টলতে যাচ্ছে। তারা রঙীন মোজাইকের মতো প্রলেপ তার মুখের ওপরের দিকে ব্যবহার করেছে যাতে সে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে না পারে। তার মুখের ওপর কেকের মাপের রক্ত লাগানো এবং হাফ হাতা গেঞ্জির সামনের দিকে লালা লেগে আছে। তার শিশুর মতো গোলাপী ঠোঁটগুলো দাঁত খিঁচানোর ফলে ওপরে উঠে গেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা মানুষের মতো নেকড়ে। সে গাড়ির কাঁচের ভিতর থেকে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে চেঁচাচ্ছে।

'আমার বয়স পনের বছর এবং আমি চেয়েছিলাম ভালো মানুষ হতে এখনকার চেয়ে। কিন্তু আমি পারিনি। তুমি কি আমার করুণ কাহিনী শুনতে চাও?'

সে থুথু ছুঁড়ে মারলো ক্যামেরার দিকে এবং থুথুর ক্ষেপণাস্ত্র লেন্সের ওপর ছড়িয়ে পড়ে গড়াতে লাগলো।

বেবি কোচাম্মা তাঁর ঘরে তাঁর বিছানার ওপর বসেছিলেন, লিষ্টারিনের মূল্য ছাড়ের একটা কুপন পুরণ করছিলেন যারা ঘোষণা দিয়েছে তাদের নতুন বাজারে ছাড়া ৫০০ মিলিলিটার বোতলের জন্যে দুই রুপী ছাড় আর তাদের লটারীর ভাগ্যবান বিজয়ীদের জন্যে দু' হাজার রুপী মূল্যের উপহার চেক।

ছোট ছোট পোকার বড় বড় ছায়া নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছিলো দেয়ালে এবং ছাদে। পোকা তাড়ানোর জন্যে বেবি কোচাম্মা আলোগুলো নিভিয়ে দিলেন এবং একটা বড় মোমবাতি জ্বালালেন একটা জলভরা গামলায়। জলটুকু ততক্ষণে ভরে গিয়েছিলো

দগ্ধ পোকার মৃতদেহে। মোমবাতির আলোটা তাপ দিয়েছে তার লাল রঙ করা গাল ও রঙ করা মুখে। তাঁর চোখের পাতার ওপরের মাস্‌কারা লেপ্টে গেছে। জ্বল-জ্বল করছে তার গহনাগুলো।

তিনি কুপনটাকে মোমবাতির দিকে হেলালেন।

কুপনে প্রশ্ন আছে-- '*কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্লিচ আপনি ব্যবহার করেন?*'

লিস্টারিন, বেবি কোচাম্মা লিখলেন এক হাতে যেটা বয়সের ফলে মাকড়সার মতো হয়ে গেছে।

'আপনার পছন্দের কারণগুলো উল্লেখ করুন।

তিনি একটুও ইতস্তত করলেন না। 'তীব্র স্বাদ, সতেজ শ্বাস।' তিনি টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের চটপটে, আকস্মিক ভাষাগুলো শিখেছিলেন।

তিনি তার নামট লিখলেন এবং নিজের বয়সটাকে লিখলেন মিথ্যা করে।

পেশার নিচে তিনি লিখলেন, 'বাগানের নক্সাবিদ (ডিপ্লোমা) রচেস্টার, আমেরিকা।'

তিনি কূপনটাকে একটা খামে ভরলেন যার উপর লেখা, '*রিলায়েবল মেডিকোস, কোট্টাইয়াম*।' এটা সকালে যাবে কচু মারিয়ার সাথে, যখন সে শহরে যাবে তার সবচেয়ে ভালো বেকারীর ক্রিম বনরুটি আনতে।

বেবি কোচাম্মা তাঁর বেগুনী রঙের ডায়েরি লেখার খাতাটা বের করলেন যার সাথে একটা নিজস্ব কলম ও ছিলো। তিনি ১৯ শে জুনের পাতাটা বের করে তাতে নতুন করে লিখলেন। তার এই অভ্যাসটা নিত্যনৈমিত্তিক। তিনি লিখলেন '*আমি তোমাকে ভালোবাসি' 'আমি তোমাকে ভালোবাসি*।'

খাতাটার প্রত্যেক পাতায় একই রকম লেখা। খাতা দিয়ে তাঁর একটা বাক্স ভর্তি সবগুলো খাতার ভিতরে একইরকম লেখা। কোন-কোনটাতে তার চেয়ে কিছু বেশি লেখা ছিলো। কোনটাতে ছিলো দিনের হিসাব, যা যা করতে হবে তার তালিকা, পছন্দের সোপ-অপেরা থেকে পছন্দের কথোপকথনের টুকে রাখা উদ্ধৃতি, কিন্তু এই লেখাগুলোও শুরু হতো ঐ একই শব্দ দিয়ে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

ফাদার মুলিগ্যান মারা গেছেন চার বছর আগে ভাইরাসজনিত যকৃতের প্রদাহে, হৃষিকেশের উত্তরে একটা আশ্রমে। তাঁর হিন্দু ধর্ম পুস্তক নিয়ে গভীর মনোযোগের গবেষণা ও বিবেচনা থেকে উৎপত্তি হয়েছিলো ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতি উৎসাহ, কিন্তু পদকচক্রে বিশ্বাসের পরিবর্তন। পনের বছর আগে, ফাদার মুলিগ্যান বৈষ্ণব হন। প্রভূ বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত। আশ্রমে যোগ দেওয়ার পরও তিনি বেবি কোচাম্মার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। তিনি প্রত্যেক দেওয়ালীতে তাঁকে লিখতেন এবং প্রত্যেক নব-বর্ষে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠাতেন। মাত্র কয়েক বছর আগে ফাদার মুলিগ্যান নিজের একটা ছবি পাঠালেন বেবি কোচাম্মাকে, মধ্যবিত্ত পাঞ্জাবী বিধবাদের এক সমাবেশে একটা আত্মিক উন্নতির শিবিরে বক্তৃতার ছবি। মহিলাদের সবাই পরে আছে সাদা

শাড়ী, তাদের মাথায় শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঘোমটা টানা। ফাদার মুলিগ্যান ছিলেন জাফরানী রঙের কাপড় জড়ানো। যেন একটা ডিমের কুসুম বক্তৃতা দিচ্ছে সিদ্ধ ডিমের এক সমুদ্রের উদ্দেশ্যে। তাঁর দাড়ি ও চুল সাদা এবং লম্বা, কিন্তু আঁচড়ানো ও সুন্দর করে ছাঁটা। এক জাফরানী রঙের সন্ত, যার কপালে ব্রতের ছাই। বেবি কোচাম্মা সেটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এটাই একমাত্র জিনিস যা ফাদার মুলিগ্যান পাঠিয়েছিলেন অথচ বেবি কোচাম্মা রাখেননি। তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এই সত্যটা জেনে যে, তিনি আসলেই হঠাৎ করে তার ব্রত ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু বেবি কোচাম্মার জন্যে নয়। অন্য ব্রতের জন্য। এটা ছিলো খোলা হাতে কাউকে স্বাগতম জানিয়ে, কেবল অন্য কারো আলিঙ্গনে যাওয়ার জন্যে পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো।

ফাদার মুলিগ্যানের মৃত্যু বেবি কোচাম্মার খাতায় লেখার বিষয়ে পরিবর্তন আনেনি, শুধুমাত্র এজন্যে যে, বেবি কোচাম্মার জন্যে ফাদার মুলিগ্যানের উপস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। যদি হয়, তবে এটা হতে পারে যে, তার মৃত্যুর পর সে তাঁকে এমন ভাবে পেলো যেভাবে হয়তো তার বেঁচে থাকতে সে পায়নি। অন্তত বেবি কোচাম্মার স্মৃতি ফাদার মুলিগ্যানের জন্যে ছিলো তার একান্ত নিজের। সম্পূর্ণভাবে বেবি কোচাম্মার। হিংস্রভাবে, ভয়ানকভাবে তার। বিশ্বাসের সঙ্গে ভাগ করার জন্যে নয় প্রতিযোগীতারত সহ-সন্ন্যাসিনীদের সাথে তো নয়ই এবং সহ-সাধুদের সাথে অথবা তারা নিজেদের যা বলে তাদের সঙ্গে। সহ-স্বামীদের সঙ্গে।

ফাদার মুলিগ্যানের জীবনে বেবি কোচাম্মাকে প্রত্যাখ্যান (যদিও প্রত্যাখ্যানটা ছিলো ভদ্র ও করুনাময়) নিরপেক্ষ হয়েছিলো মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। ফাদারের জন্যে বেবি কোচাম্মার স্মৃতিতে, তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। শুধু তাকে। যেভাবে একজন পুরুষ একজন মহিলাকে আলিঙ্গন করে। যখন তিনি মারা গেলেন, বেবি কোচাম্মা ফাদার মুলিগ্যানকে অনাবৃত করলেন তাঁর হাস্যকর জাফরানী আলখাল্লা থেকে। আবার তাঁকে ঢাকলেন তাঁর খুব পছন্দের কোকা-কোলা আলাখাল্লায়। (তার অনুভূতিগুলো পরমানন্দিত হতো, পরিবর্তনের মধ্যে, ঐ লম্বা, ভিতর দিকে বাঁকানো, খৃষ্টের মতো শরীর দেখে।) তিনি ছিনিয়ে নিলেন তাঁর ভিক্ষার পাত্রটি, তাঁর বহু যন্ত্রণা ভোগের ফলে বোধশক্তিহীন পায়ের তলাটার যত্ন করলেন এবং ফেরত দিলেন তাঁর আরামের চটি জোড়া। তিনি তাঁকে আবার বদলে ফেললেন উঁচু পা ফেলা উটটাতে যেটা দুপুরের ভোজ খেতে আসতো বৃহস্পতিবারগুলোতে।

আর প্রত্যেক রাতে, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, খাতার পর খাতায়, খাতার পর খাতায়, তিনি লিখতেন : '*আমি তোমাকে ভালোবাসি,*' '*আমি তোমাকে ভালোবাসি।*'

তিনি কলমটাকে তাঁর ঝোলানোর জায়গায় রেখে দিয়ে খাতাটা বন্ধ করলেন। তিনি তার চশমা খুললেন, লুকানো জায়গা থেকে দাঁতের পাটি বের করলেন জিভ দিয়ে, থুথুর আঁশ থেকে সেটাকে আলাদা করলেন যা ওটাকে তাঁর মাড়ির সাথে

আটকে রেখেছিলো তারের বাদ্যযন্ত্রের ঝুঁলে পড়া তারের মতো, এবং সেটাকে এক গ্লাস লিস্টারিনের মধ্যে ফেলে দিলেন।

ওগুলো গ্লাসের তলায় তলিয়ে গেলো এবং ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্ ওপরে পাঠালো, প্রার্থনার মতো। তার রাতের ঘুমের আগে পান করা অল্প পানীয়, একটা হাসি আঁকড়ানো সোডা। টাংড়ি দাঁত সকালে।

বেবি কোচাম্মা তার বালিশে আবার মাথা রাখলেন এবং অপেক্ষা করতে থাকলেন রাহেল এসথার ঘর থেকে বেরিয়ে আসলো শোনার জন্যে। তারা তাঁকে অস্বস্তিতে ভোগাচ্ছিলো, তাদের দু'জনই। অল্প কয়েকদিন আগে এক সকালে তিনি তার জানালা খুলেছেন (সতেজ বাতাসে একটা শ্বাস নেওয়ার জন্য) এবং ওদেরকে কোন জায়গা থেকে ফিরে আসার সময় হাতে-নাতে ধরে ফেললেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো যে, ওরা বাইরে কোথাও রাত কাটিয়েছে। একসাথে। ওরা কোথায় থাকতে পারে? কি এবং কতটুকু ওরা মনে করতে পারে? তারা কখন যাবে? ওরা এতক্ষণ কি করছিলো অন্ধকারের মধ্যে বসে? তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন বালিশে হেলান দিয়ে হয়তো ভাবতে ভাবতে, বৃষ্টি আর টেলিভিশনের আওয়াজে, তিনি হয়তো এসথাব দরজা খোলার আওয়াজ পাননি।

রাহেল বিছানায় গিয়েছিলো অনেক আগেই।

রাহেল যায়নি।

রাহেল শুয়েছিলো এসথার বিছানায়, শুয়ে থাকায় তাকে দেখতে পাতলা লাগছিলো। বয়সে ছোট। আকারে ছোট। তার মুখ জানালার দিকে বিছানার পাশে ফেরানো। কোণাকুণি পড়া বৃষ্টি জানালার গ্রীলের গরাদ গুলোতে বাড়ি খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে এবং নিখুঁতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে ওর মুখের ওপর আর মসৃণ খোলা হাতে। অন্ধকারে তার নরম, হাতাছাড়া গেঞ্জি হলুদ, জ্বলজ্বল করছে। তার নিচের অর্ধেক, নীল রঙের জিন্স, গলে গেছে অন্ধকারে।

বাতাসটা একটু ঠাণ্ডা। একটু ভেজা। একটু শান্ত।

কিন্তু কীই বা বলার ছিল?

যেখানে সে বসেছিলো, বিছানার শেষ প্রান্তে, এসথা তার মাথা না ঘুরিয়েই, তাকে দেখতে পাচ্ছিলো। নিস্তেজ দেহরেখা। তার চোয়ালের খাড়া রেখা। তার কাঁধের হাড় যেগুলো ডানার মতো ছড়ানো তার গলার গোড়া থেকে কাঁধের শেষ পর্যন্ত। যেন চামড়া দিয়ে আটকে রাখা একটা পাখি।

রাহেল তার মাথা ঘোরালো এবং এসথার দিকে তাকালো। সে একদম সোজা হয়ে বসে আছে। ডাক্তার দেখানোর জন্যে অপেক্ষা করছে। সে ইস্ত্রি করা শেষ করে ফেলেছে।

রাহেল দেখতে খুব সুন্দর এসথার মনে হলো। তার চুল। তার গাল। তার ছোট, চটপটে হাত।

তার বোন।

একটা ঘ্যানঘ্যান করা শব্দ শুরু হলো তার মাথায়। পাশ দিয়ে যাওয়া ট্রেনের শব্দ। আলো-ছায়া, আলো-ছায়া জানালার পাশের আসনধারীর উপর পড়ে।

এসথা আরও সোজা হয়ে বসলো। এখনও সে রাহেলকে দেখতে পাচ্ছে। ওদের মায়ের চামড়ার ভিতর বড় হওয়া।

তার অশ্রুসজল চক্‌চক্ করা চোখের অন্ধকারে। তার ছোট খাড়া নাক। তার মুখ, মোটা ঠোঁটে ঘেরা। এর সাথে একটা কাটা দাগের দৃশ্যের মিল আছে। যেন একটা কিছু থেকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছে। যেন অনেক আগে কেউ একজন আংটিসহ তার মুখের ওপর আঘাত করেছিলো। একটা সুন্দর, আহত হওয়া মুখ।

তাদের সুন্দরী মায়ের মুখ, এসথা ভাবলো। আম্মুর মুখ।

যেটা এসথার হাত চুমু খেয়েছিলো ট্রেনের গরাদওয়ালা জানালা দিয়ে। ফার্স্ট ক্লাসে মদ্রাজ মেলে, মাদ্রাজে যাওয়ার পথে।

'বিদায়, এসথা। ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন, আম্মুর মুখটা বলেছিলো। আম্মুর কাঁদতে-চেষ্টা-না করা মুখটা।

শেষবার সে যখন তাকে দেখেছিলো।

সে দাঁড়িয়েছিলো কোচিন বন্দরে সঙ্কেত লেখা পাথরটার মঞ্চের ওপর, তার দৃষ্টি ছিলো ট্রেনের জানালার দিকে ঘোরানো। আম্মুর চামড়া ধূসর, বিবর্ণ, যেন তার চকচকে উজ্জ্বলতা ডাকাতি হয়ে গেছে নিয়ন গ্যাসে ঝলমলে স্টেশনের আলোতে। দিনের আলো থামছিলো ট্রেনের জন্যে দু' পাশেই। লম্বা কর্কের ছিপির মতো যা অন্ধকারকে বোতলে পুরে রেখেছিলো। মাদ্রাজমুখী ট্রেনে। উড়ন্ত রানী।

রাহেল আম্মুর হাত ধরা। যেন একটা মশা আটকানো চামড়ার সুতোয়। একটা বাস্তুহারা গুবরে পোকা, বাটা স্যান্ডেল পরা। একটা এয়ারপোর্টের পরী একটা রেলষ্টেশনে। তার পা দিয়ে জোরেজোরে লাথি মারছিলো মঞ্চের ওপর, অস্থির মেঘগুলো ছিলো নিশ্চল ষ্টেশনের নোংরার ওপর। যতক্ষন না আম্মু তাকে নাড়লো আর থামতে বললো, সে থামলো। তাদের চারপাশে নানান ধরনের লোকের ভিড়।

দ্রুত বেগে ছুটছিলো, তাড়াহুড়া করছিলো, কিনছিলো বেচছিলো, মালপত্র চাকায় গড়াচ্ছিলো, কুলিকে পয়সা দিচ্ছিলো, বাচ্চাদের হাগু করাচ্ছিলো, মানুষজন থুথু ফেলছিলো, আসছিলো যাচ্ছিলো, ভিক্ষা করছিলো, দর-দাম করছিলো। অগ্রীম সিট পরীক্ষা করছিলো।

প্রতিধ্বনিত ষ্টেশনের শব্দগুলো।

ফেরীওয়ালারা কফি, চা বিক্রি করছিলো।

রোগা বাচ্চারা। অপুষ্টিতে চুল লালচে হওয়া বাচ্চার, বিক্রি করছিলো পর্ণো পত্রিকা এবং খাবার যেগুলো তাদের নিজেদের খাওয়ার সামর্থ্য নেই।

গলানো চকোলেট, সিগারেট খাওয়ার পর খাওয়ানো মিষ্টি।

অরেঞ্জড্রিঙ্ক।

লেমনড্রিঙ্ক।

কোকা-কোলা ফানটা আইসক্রীম রোজমিল্ক।

গোলাপী রঙের পুতুল। ঘরঘর শব্দ করা খেলনা। চুল বাঁধার জন্যে লাভ ইন টোকিও ব্যান্ড।

ফাঁপা প্লাষ্টিকের তৈরি লম্বা লেজওয়ালা টিয়া পাখি যেগুলোর ভিতরে ছোট ছোট মিষ্টির গুলি ভর্তি আর প্যাঁচ ঘুরিয়ে মাথা খোলা যায়।

হলুদ ফ্রেমের লাল সানগ্লাস।

খেলনা ঘড়ি যার উপর সময় আঁকা। একটা দু' চাকার ঠেলাগাড়ি যা বাজে দাঁতের ব্রাশে ভর্তি।

কোচিন বন্দরের সঙ্কেত লেখা পাথর খন্ডটি।

ষ্টেশনের আলোয় ধূসর। কাঁপা লোকজন। গৃহহীন। ক্ষুধার্ত। গত বছরের দুর্ভিক্ষের ছাপ এখনো তাদের গায়ে লেপ্টে আছে। তাদের বিপ্লব সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়েছে। পেয়েছেন কমরেড ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদের (সোভিয়েট ভাঁড়, পালানো কুত্তা)। পিকিং এর সাবেক চোখের মনি।

বাতাস ভরেছিলো মাছিতে।

একটা অন্ধ লোক যার চোখের পাপড়ি নেই এবং চোখগুলো যেন বিবর্ণ হয়ে যাওয়া জিন্স, তার চামড়ায় গর্ত গর্ত বসন্তের দাগ, কথা বলছে একটা কুষ্ঠ রোগীর সঙ্গে যার একটাও আঙুল নেই, তার পাশে ডাঁই হয়ে পড়ে থাকা আবর্জনা, ফেলে দেয়া সিগারেটের টুকরো থেকে মাদক নিচ্ছে ডানহাতে।

'তোমার খবর কি? এখানে কখন আসলে তুমি?'

যেন এ ব্যাপারে তাদের পছন্দের কিছু ছিলো। যেন তারা ঐ জায়গাকেই পছন্দ করে বাছাই করেছে বাস করার জন্য, সারিসারি সাজানো, দামী থাকার জায়গাটা, যেগুলোকে একটা চক্‌চকে পুস্তিকার মধ্যে ফর্দ করে ছাপা হয়েছে।

একটা লোক বসে আছে ওজন করার একটা লাল যন্ত্রের ওপর তার কৃত্রিম পা'কে ফিতের বাঁধন থেকে খুললো (হাঁটুর নিচে) যার ওপর আঁকা আছে একটা কালো জুতো আর সুন্দর সাদা মোজা। ফাঁকা ও গোল পায়ের ডিমটা গোলাপী, আসলেই ওগুলো যেমন হয়। (যখন কেউ একটা মানুষের প্রতিবিম্ব নতুন করে তৈরি করে, সে কেন ঈশ্বরের ভুলগুলো আবার করবে?) এর ভিতরে সে তার টিকেট গুলো জমিয়ে রাখতো। তার গামছা। তার স্টেনলেস স্টিলের গ্লাসটা। তার গন্ধগুলো। তার গোপনীয়তাগুলো। তার ভালোবাসা। তার পাগলামো। তার আশা। তার অসীম আনন্দ। তার আসল পা-টা খোলা।

সে তার গ্লাসের জন্যে একটু চা কিনলো।

এক বুড়ি বমি করছে। একটা দলা দলা জলাশয়। এবং তার জীবন-যাপনে আবার সে মেতে উঠলো।

ষ্টেশন-পৃথিবী : সমাজের সার্কাস। যেখানে, টাকার ধেয়ে আসার সঙ্গে, হতাশা বাড়ি ফিরে আসতো ঘুমাতে আর আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যেতো কাজে ইস্তফা দেয়ার জন্যে।

কিন্তু এইবার, আম্মু আর তার দুই ভ্রূণের যমজদের জন্যে, সেখানে কোনো প্লেমাউথ এর জানালা নেই যার ভিতর দিয়ে এটা দেখা যাবে। তাদের রক্ষা করার জন্যে কোন নিরাপত্তার জাল টাঙানো ছিলো না যখন তারা সাকার্সের বাতাসের ওপর লাফ দিচ্ছিলো।

'*তোদের জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে* চলে যা,' চাকো বলেছিলো। ভাঙা দরজার ওপর দাঁড়িয়ে। একটা হাতল হাতে নিয়ে। আর আম্মু, যদিও তার হাত কাঁপছিলো, উপরে তাকালো না তার অদরকারি কাপড়ের মুড়ি সেলাই করা থেকে। তার কোলের উপর এক টিন ফিতে খোলা পড়ে আছে।

কিন্তু রাহেল তাকিয়েছিলো। তাকিয়েছিলো ওপরে। এবং দেখেছিলো যে চাকো অদৃশ্য হয়ে গেলো কিন্তু একটা দানবকে রেখে গিয়েছিলো তার জায়গায়।

একটা মোটা ঠোঁটওয়ালা লোককে আংটি আর, সাদা পোশাকে-ঠান্ডা, সিজার সিগারেট কিনলো প্লাটফর্মের ফেরিওয়ালার কাছ থেকে। তিন প্যাকেট। ট্রেনের করিডোরে দাঁড়িয়ে ফোঁকার জন্য।

কজের মানুষের জন্যে
পরিতৃপ্তি।

লোকটা এসথার সহযাত্রী এক পারিবারিক বন্ধু যিনি কোন কাজে মাদ্রাজে যাচ্ছিলেন। শ্রী কুরিয়েন মাথেন।

যেহেতু এসথার সঙ্গে একজন বয়স্ক লোক থাকছেই, মামাচি বললেন আরেকটা টিকিট কিনে টাকা নষ্ট করার কোন দরকার নেই। বাবা কিনছিলো মাদ্রাজ থেকে কলকাতার টিকেট। আম্মু কিনছিলো *সময়*। তাকেও মালপত্র গোছ-গাছ করে চলে যেতে হচ্ছিলো। একটা নতুন জীবন শুরু করতে, যাতে সে তার ছেলে মেয়েকে সঙ্গে রাখাতে পারে। ততক্ষণ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে, যমজদের একজন এইমেনেমে থাকতে পারবে। দু'জন নয়। একসঙ্গে ওরা দু'জন হলে সমস্যা। ওদের চোখে শয়তান। ওদেরকে আলাদা করে রাখতে হবে।

হয়েতো ওদের ধারণাই ঠিক ছিলো। আম্মুর ফিসফিসানি বললো, যখন সে তার বাক্স আর হোল্ডঅল গুছাচ্ছিলো। *হয়তো সত্যিই একটা ছেলের একটা বাবা দরকার হয়।*

মোটা ঠোঁটওয়ালা লোকটা ছিলো এসথার কামরার পরের কামরায়। তিনি বললেন ট্রেন ছাড়ার পর তিনি চেষ্টা করবেন কারো সঙ্গে সিট বদল করতে।

তখনকার মতো তিনি ছোট পরিবারটাকে তাদের মতো থাকতে দিয়েছিলেন।

সে জানতো যে একটা নরকের দেবদূত তাদের ওপর বাতাসে ভাসছিলো। তারা যেখানে যাচ্ছে সেও সেখানে যাচ্ছে। তারা যেখানে থামছিলো সেও সেখানে থামছিলো, একটা বাঁকা মোমবাতি থেকে মোম গড়িয়ে পড়ছিলো।

সবাই জানতো।

ওটা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। সোফি মলের মৃত্যু সংবাদটা, একটা পারাভানের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান যাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো অপহরণ ও খুনের জন্যে। এবং এর পরের কম্যুনিষ্ট পার্টি প্যারাডাইস পিকলস এ্যাণ্ড প্রিজার্ভস দখল করে, যার নেতৃত্বে ছিলেন এইমেনেমের নিজস্ব ধর্মযোদ্ধা ন্যায় বিচারের বিপ্লবী, এবং শোষিতের মুখপাত্র– কমরেড কে, এন, এম, পিল্লাই। তিনি দাবী করেছিলেন যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পারাভানকে একটা মিথ্যা পুলিশী মামলায় জড়িত করেছে কারণ সে কম্যুনিষ্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলো। এবং তারা তাকে ছাঁটাই করতে চেয়েছিলো 'আইনসম্মত ইউনিয়ন কর্মকান্ডে' জড়িত থাকার অভিযোগে।

এসবই লেখা ছিলো কাগজে। দাপ্তরিক ব্যাখ্যা।

অবশ্য আংটি পরা মোটা ঠোঁটওয়ালা লোকটার কোন ধারণা ছিলোনা অন্য ব্যাখ্যাটার বিষয়ে।

যাতে একদল উঁচুবর্ণের পুলিশ মীনাচল নদী পার হলো। বৃষ্টির জন্যে যেটা ছিলো শান্ত আর ফেঁপে ওঠা এবং তারা পথ ধরলো বড় গাছের নিচে গজিয়ে ওঠা ভেজা ছোট ছোট গাছগুলোর ভিতর দিয়ে, আঁধারের হৃদয় আঁকড়ে।

১৮

ইতিহাসের বাড়ি

নীলাচল নদী পার হলো উঁচুবর্ণের পুলিশের একটা দঙ্গল। বর্ষার পানিতে নদীটা উঠেছিলো ফুলেফেঁপে আর জল বয়ে যাচ্ছিলো শান্তভাবেই। ভেজা মাটি মাড়িয়ে ওরা যাচ্ছিলো। একজনের ফুলে ওঠা পকেটে ছিলো হাতকড়া, সেটা বাজছিলো টুংটাং করে।

উঁচু ঘাসের ওপর কড়া মাড় দেওয়া তাদের খাকি হাফপ্যান্টের সারি দেখে মনে হচ্ছিলো ফোলানো স্কার্ট, যার ভিতরে তাদের পা গুলো চলছিলো খুব সহজেই।

ওরা ছিলো ছ'জন। রাষ্ট্রের ভৃত্য।

Politeness– ভদ্রতা
Obedience– বিশ্বস্ততা
Loyality– আনুগত্য
Intelegence– বুদ্ধিমত্তা
Courtesy– সৌজন্য
Efficency– দক্ষতা

কোট্টাইয়ামের পুলিশ। মজার এক দঙ্গল। হাস্যকর শিরস্ত্রাণ মাথায়। যেন নব যুগের রাজকুমার সব। কার্ডবোড আর তুলো দিয়ে তৈরি হয়েছিলো ওগুলো। কারো কারো মাথা থেকে তেল চুঁইয়ে পড়ছিলো। জীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো ওদের মুকুটগুলো।

হৃদয়ের অন্ধকার।

ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য।

উঁচু ঘাসের মধ্যে ওরা চিকন পাগুলো বার বার ওপরে ওঠাচ্ছিল। চোরকাঁটা জড়িয়ে যাচ্ছিল ওদের পায়ের লোমে। ওদের মোজায় লেগেছিলো খড়কুটো আর ঘাসফুল। লোহার নালওয়ালা জুতোর নিচে লেগেছিলো বাদামী কেন্নো। বর্ণবাদী জুতো। খস্‌খসে ঘাস তাদের পায়ের চামড়ায় আঁচড় কাটছিলো। পা দেবে যাচ্ছিলো জলাভূমির কাদায়। কষ্টে সৃষ্টে হেঁটে তারা পেরিয়ে গেলো– গাছের ডালে বসা লম্বা ঠোঁটের বকগুলোকে। আকাশের নিচে ওরা কাপড় শুকানোর মতো করে ভেজা ডানা

মেলে রেখেছিলো। কানি বক, দাঁড় বক, সারস। বুনো হাঁসগুলো ছিলো নাচের অপেক্ষায়। বেগুনী হিরণগুলোর চোখ ছিলো ক্ষমাহীন। তাদের ওয়াক ওয়াক ওয়াক ডাকে কানে তালা ধরে যাবার যোগাড়। ডিমে তা দেওয়া মা পাখিরাও ছিলো। সকালের নরম রোদ তেতে উঠছিলো, বোঝাই যাচ্ছিলো খারাপ কিছু হবে।

জলাভূমি পার হলেও জলের গন্ধ গেলো না। লতায় ঢাকাপড়া প্রাচীন বৃক্ষগুলো পার হলো ওরা। বিশাল পাতাওয়ালা মানিপ্ল্যান্ট। বুনো পিপুল। খোলসওয়ালা বেগুনী কাঠবাদাম। পেরিয়ে গেলো খাড়া ঘাসের ডগায় বসা গাঢ় নীল গুবরে পোকাদের।

বৃষ্টিতেও নষ্ট না হওয়া বিশাল সব মাকড়সাদের জাল পেরিয়ে গেলো, গাছ থেকে গাছে চুপি চুপি ওরা বুনেছিলো। ঘন পাতার ঝোপের ওপর ঝুলছিলো একটা কলার মোচা। স্কুলপালানো ছেলের হাতে দামী পাথর যেন, অথবা মখমল জঙ্গলের রত্ন। লাল ফড়িঙগুলো বাতাসে লীলাখেলা করছিলো। একটার ওপর আরএকটা। মিলে যাচ্ছিল। একটা পুলিশ কিছুক্ষণ দেখলো ফড়িঙের যৌনতা এবং চিন্তা করছিলো 'কী থেকে কী হয়!' হঠাৎ তার পুলিশী চিন্তা ফিরে এলো।

চললো এগিয়ে।

বৃষ্টি ভেজা পিঁপড়ের ঢিবি পেরিয়ে গেলো। যেন স্বর্গের দুয়ার পাহারা দিচ্ছিলো ঘুমন্ত সৈন্যরা। পেরিয়ে গেল উড়ন্ত প্রজাপতিদের যেন খুশির খবর দিচ্ছিলো ওরা।

বিশাল ফার্ণ ।

একটা গিরগিটি।

একটা উচ্ছল ফুল।

ভয়ার্ত ধূসর বুনো মুরগীটা দৌড়ে গিয়ে লুকালো। জায়ফল গাছটা পেলো যেটা ভিল্লে পাপেন-খুঁজে পায়নি। ছোট্ট একটা খাল। নলখাগড়ায় ভরা। সবুজ একটা সাপ যেন। একটা গাছের গুঁড়ি পড়েছিলো ওটার ওপর। উঁচুবর্ণের পুলিশরা সাবধানে পার হলো। তেলতেলে বাঁশের লাঠিগুলো নাচাচ্ছিলো। ওদের হাতে। লোমশ দেবদূতদের মারাত্মক দণ্ড। তখন বাতাসের দোলায় দুলতে থাকা গাছগুলো সূর্যের আলোকে ভেঙেচুরে ফেলেছিলো। অন্ধকারের হৃদপিণ্ডের মধ্যে সন্তর্পণে ঢুকে পড়েছিলো হৃদয়ের অন্ধকার। ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের আওয়াজ থেমে গিয়েছিলো।

ধূসর কাঠবিড়ালী গাছের গুঁড়ির কোটর থেকে বেরিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলো। পুরনো ক্ষত ছিলো গাছের ছালে। চিরদিনের। শুকনো। অপরিবর্তনীয়।

অনেকটা জায়গা জুড়ে এইসব এবং তারপরেই ঘাসে মোড়া খোলা মাঠ। একটা বাড়ি।

ইতিহাসের বাড়ি।

যার দরজাগুলো ছিলো বন্ধ আর জানালাগুলো ছিলো খোলা।

ঠাণ্ডা পাথুরে মেঝে ছিলো ঢালু। দেয়ালে ছিলো জাহাজের মত ছায়া। ওখানে কঠিন নখ গেঁথে বসেছিলো মোম-মসৃণ পূর্বপুরুষেরা, হলুদ মানচিত্রের কাগুজে শব্দ যেন ছিলো তাদের ফিসফিসানি।

ওখানে পুরনো তেলরঙের ছবিগুলোর পিছনে বাস করতো ভয়ার্ত ফুলো ফুলো টিকটিকিগুলো।

ওখানে স্বপ্নগুলোও গিয়েছিলো বেদখল হয়ে আর পুরনো স্বপ্ন নতুন করে দেখা হচ্ছিলো। ওখানে এক ইংরেজ ভূত বেঁধা ছিল একটা গাছের সঙ্গে, দুই ভ্রূণের যমজ এক মার্কসবাদী পতাকাওয়ালা ভ্রাম্যমাণ প্রজাতন্ত্র, ওদের মধ্যে যেটি তার পাশের ভূখণ্ডে গেড়েছিলো পতাকাটা– তার ছিলো ফাঁপানো চুল। পুলিশের দলটি দ্রুত পেরিয়ে গেলো জায়গাটা। তারা শুনতে পেলো না তার অনুরোধ। সে নরম স্বরে বলছিলো, *আমাকে মাফ করো তোমরা উম্... তোমরা হয়ত বুঝছ না উম... আমার মনে হয় না তোমাদের কাছে চুরুট আছে– না? না আমি তা মনে করি না।*

ইতিহাসের বাড়ি।

যেখানে বছরের পর বছর ধরে ভীতি (আরও আসবে) সমাধিস্থ রয়েছে একটা অগভীর কবরে। হোটেলের রাঁধুনিদের কথাবার্তার নিচে লুকিয়ে আছে। বুড়ো বামপন্থীদের চীৎকার। নাচিয়েদের ধীরে ধীরে মৃত্যু। ধনী পর্যটকরা এসেছিলো খেলনা ইতিহাস নিয়ে খেলতে।

খুব সুন্দর বাড়ি ছিলো ওটা।

সাদা দেয়াল ছিলো এক সময় লাল ছাদ। কিন্তু এখন প্রকৃতি রঙ করেছে। প্রকৃতির পাত্রে তুলিগুলো ডুবে আছে। শ্যাওলা সবুজ মাটির মতো বাদামী। ঘন কালো। যতটা না পুরনো তার চেয়ে বেশি প্রাচীন মনে হয়। যেন সমুদ্রের তলা থেকে তোলা গুপ্তধন। তিমিতে ঠোকরানো এবং ক্ষতবিক্ষত। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। বুদবুদের নিঃশ্বাস ছাড়ছে ভাঙা জানালা দিয়ে।

একটা চওড়া বারান্দা চারিদিক ঘিরে আছে। ঘরগুলো নির্জন এবং ছায়াময়। টালির ছাদ নেমে এসেছে এমনভাবে– মনে হয় যেন কোন উল্টে যাওয়া নৌকার পাশের দিকটা। পচন ধরা বীমগুলো এক সময় ছিলো মাঝখানেই, সাদা থামগুলোর ওপর দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা ছিলো, এখন সেখানে গর্তগুলো শুধু আছে। ইতিহাসের গর্ত। ইতিহাস মাপের গর্ত ব্রহ্মাণ্ডে, যার মধ্যে দিয়ে সন্ধ্যার ঘন মেঘের ভিতরে নিঃশব্দ বাদুড়েরা বের হয়ে যায় কারখানার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুনোর মতো। রাতে তা ঘন হয়ে আসে।

সকালের প্রত্যাবর্তন পৃথিবীর খবর নিয়ে আসে। একটা ধূসর কুয়াশা হঠাৎ দিগন্ত থেকে এসে বাড়িটার কোণায় জমা হয় তারপর ইতিহাসের গর্ত দিয়ে ঢুকতে থাকে সিনেমার ফিল্ম পিছন দিকে চলার মতো।

সারাদিন তারা ঘুমায়, বাদুড়। ছাদ জুড়ে থাকে লোমশ চাদরের মতো। মেঝে নোংরা করে। পুলিশরা থেমেছিলো। ওগুলোকে তাড়িয়েছিলো। দরকার ছিলো না ওসবের কিন্তু এধরনের অভিজাত খেলা তারা পছন্দ করতো।

তারা কৌশলী অবস্থান নিয়েছিলো। ভাঙা নিচু পাথুরে পাঁচিলের ওপর চড়ে বসেছিলো।

জোর হিসি,

গরম পাথরের ওপর ফেনা জমে গেলো, পুলিশের মুত।

হলদেটে বুদবুদের মধ্যে ডুবল পিঁপড়েরা।

বড় নিঃশ্বাস।

তারপর হাঁটু আর কনুইতে ভর দিয়ে ওরা বাড়িটার দিকে এগুলো। সিনেমার পুলিশদের মতো। ঘাসের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে। হাতে ছিলো লাঠি। মনে হচ্ছিলো মেশিনগান। ওদের রুগ্ন কিন্তু যোগ্য কাঁধে ছিল উঁচুবর্ণের ভবিষ্যত রক্ষার দায়িত্ব।

পিছনের বারান্দায় তারা খুঁজে পেলো তাদের অনুসন্ধানের জিনিসটি। লাভ ইন টোকিওর মধ্যে আটকানো একটা ঝরনা। আর এক কোণায় (নেকড়ের মতো একা) এক কাঠমিস্ত্রি ছিলো, যার নখগুলো ছিলো রক্তের মত লাল রঙে রাঙানো। ঘুমাচ্ছিলো। উঁচুবর্ণের চালাকির কিছুই টের পেলো না হতভাগা।

আশ্চর্য হলো।

মজা নষ্ট হচ্ছে না, ও হ্যাঁ, ওদের মাথায় ঘুরছিল সংবাদ শিরোনাম।

পুলিশী অভিযানে উগ্রপন্থী ধৃত।

নির্লিপ্ততার জন্যে তাদের মজাটা জমলো না ভেলুথাকে জাগালো বুটের গুঁতো মেরে। এসথাপ্পেন আর রাহেল চমকে জাগলো চীৎকার শুনে, তাদের হাঁটু কাঁপতে লাগলো।

চীৎকার থেমে গেলো। পেটে ভর দিয়ে পড়ে রইলো ওরা মরা মাছের মত। মেঝেতে ঘষটালো, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে দোল খাচ্ছিলো। তবে বুঝতে পারছিলো যে লোকটা মার খাচ্ছিলো, সে ভেলুথা। কোত্থেকে এসেছিলো সে? কি করেছিলো, কেন পুলিশরা তাকে এখানে এনেছিলো?

মাংসের ওপর কাঠের বাড়ির ভোঁতা আওয়াজ পেলো ওরা। হাড়ের ওপর বুটের লাথির। দাঁতে বাড়ি। পেটে লাথি মারার পর কোঁৎ করে আওয়াজ হলো। মুখ দিয়ে রক্ত উগলে দেওয়ার শব্দ হলো যখন ভাঙা পাঁজরের হাড় ফুসফুস ছিঁড়ে ফেলেছিলো।

নীল হয়ে যাওয়া ঠোঁট আর থালার মত বড় চোখ করে ওরা সম্মোহিতের মত দেখছিলো কিছু একটা ঘটছে কিন্তু বুঝতে পারছিলো না। পুলিশদের কোন খেয়াল ছিলো না কী তারা করছিলো। এত রাগ কোত্থেকে এসেছিলো কে জানে। ঠাণ্ডা মাথায় নিষ্ঠুর কাজ করেছিলো ওরা।

ওরা একটা বোতল খুলেছিলো। অথবা একটা কল বন্ধ করেছিলো। ওমলেট বানানোর জন্যে একটা ডিম ভেঙেছিলো। যমজ দু'টো ছিলো বেশি বাচ্চা, জানতো

না এরা ইতিহাসের ক্রীড়নক মাত্র। তাদেরকে প্রশ্নের ভিতর থেকে পাঠানো হয়েছে আইন ভঙ্গকারীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের জন্যে। সমস্ত ব্যাপারটাই ছিলো আবেগহীন এবং নৈর্ব্যক্তিক। অবমাননার অনুভূতি, অজানিত ভীতি জন্মের নিগৃহ-সভ্যতার প্রাকৃতিক ভীতি। নারীকে পুরুষের ভয়, ক্ষমতার ক্ষমতাহীনতার ভয়।

যাকে প্রতিরোধ করা যায় না কিংবা এড়ানো যায় না তাকে ধ্বংস করার একটা অবদমিত ইচ্ছে থাকে মানুষের।

মানুষের প্রয়োজন।

এসথাপ্পেন আর রাহেল ঐদিন সকালে যা দেখেছিলো আসলে তার চরিত্রটা বুঝতে পারেনি, মানুষের স্বভাবের উত্তমর্ণতা রক্ষায় এক বাস্তব মহড়া (যুদ্ধ বা গণহত্যা ছিলো না ওটা)। কাঠামো। সংহতি। একচেটিয়া।

এই ছিলো মানুষের ইতিহাস, পেশী শক্তি দিয়ে দেবতার ইচ্ছা পূরণ করে যাওয়া, তার অবোধ দর্শকদের সামনে তার অনুপ্রেরণার রসদ জোগানো।

সকালে যা ঘটেছিলো তা আকস্মিক ছিলো না, দুর্ঘটনাও ছিলো না। বিচ্ছিন্ন বা ব্যক্তিগত দুর্ভোগের ঘটনাও একে বলা যায় না। সমসাময়িক জীবিতদের ললাট লিখনই ছিলো ঘটনাটা।

ইতিহাসের চলমান ঘটনা।

ভেলুথাকে যদি তারা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পিটিয়ে থাকে তাহলে সেটাও ছিলো নিয়তিনির্দিষ্ট। ওদের এবং তার মধ্যে একটা অদৃশ্য যোগাযোগ তো ছিলোই, অন্তত প্রাকৃতিক ভাবেই সে ছিলো সহযোগী সত্তা যার ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিলো বহু আগেই। ওরা কোন লোককে গ্রেপ্তার করেনি। তারা ভীতির সঞ্চার করেছিলো। লোকটা কতটা অত্যাচার সহ্য করতে পারবে তা মাপার মতো কোন যন্ত্র ছিলো না ওদের। তাদের হিসাব ছিলো না চিরদিনের মতো মানুষটির কী ক্ষতি তারা করেছিলো।

ঐ সকালে অন্ধকারের হৃদপিণ্ডে বর্ণবাদী পুলিশ দঙ্গলটি সুলভে যা করেছিলো তা কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনকারী সেনাবাহিনীও পারে না। দক্ষতা ছিলো, নৈরাজ্য নয়। দায়িত্বশীলতার সঙ্গে, ক্ষিপ্ত হয়ে নয়। ওরা তার চুল ওপড়ায়নি, জ্যান্ত পুড়িয়েও মারেনি। তার পুরুষাঙ্গ কেটে মুখে ঢুকিয়ে দেয়নি। ওরা তাকে বলাৎকারও করেনি কিংবা মাথাও কেটে ফেলেনি।

তারা কোন মহামারীর বিরুদ্ধেও লড়েনি। তারা শুধু একটা জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিপদ প্রতিরোধ করেছিলো।

ইতিহাসের বাড়ির পিছনের বারান্দায় তাদের ভালবাসার মানুষটি ভেঙে পিষে চ্যাপ্টা হয়ে পড়েছিলো। শ্রীমতি ইয়াপেন আর শ্রীমতি রাজাগোপালন, যমজ দূতী-ঈশ্বরই জানেন কিসের, তবে তাঁরা দুটো নতুন শিক্ষা পেয়েছিলেন।

প্রথম শিক্ষা :

কালো মানুষের রক্ত খুব কমই দেখা যায় (দুম দম)

আর

দ্বিতীয় শিক্ষা :

এর গন্ধ যদিও মৃদু বাতাসে বাসি গোলাপের মতো তবু হালকা মিষ্টি (দম দম)

'মাদিও?' এক ইতিহাসের দূত ডাকলো।

'মাদি আইরিক্লুম' / জবাব দিলো আর একজন।

হয়েছে?

হয়েছে।

তারা ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেলো। কুটিরশিল্পীরা তাদের কাজকর্ম পরীক্ষা করলো। নান্দনিক দূরত্ব বজায় রাখতে চাইলো।

তাদের সৃষ্টিকে পরিত্যাগ করলেন দেবতা এবং ইতিহাস, মার্কসও করলেন, পুরুষও করলো নারীও করলো এবং (যখন সময় আসলো) শিশুরাও করলো, ত্রিভঙ্গ হয়ে সে পড়ে রইলো মেঝের ওপর। অর্ধচেতন কিন্তু নড়াচড়া করতে পারছিলো না। মাথা ফেটে গিয়েছিলো তিন জায়গায়। নাক আর দু'টো চোয়ালের হাড়ই ভেঙে গিয়েছিলো মুখ উঠেছিলো ফুলে, চেনার উপায় ছিলো না। ঘুষির চোটে তার ওপরের ঠোঁট ফেটে ছ'টা দাঁত পড়ে গিয়েছিলো। তার সুন্দর হাসি হয়ে উঠেছিলো ভয়ংকর। নাক দিয়ে তাজা রক্ত বেরুচ্ছিলো ঝলকে ঝলকে। তলপেটেও রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো, ভিতরেই রক্ত জমছিলো। মেরুদণ্ড ভেঙেছিলো দু'জায়গায়। প্রচণ্ড আঘাতে ডান হাতটা তার একেবারে অবশ হয়ে গিয়েছিলো। মূত্রথলি আর গুহ্যদ্বার ফেটে গিয়েছিলো। তার দু'টো হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে গিয়েছিলো। তারপরেও তারা হাতকড়া বের করেছিলো।

ঠাণ্ডা।

রক্তহিম করা গন্ধ ছিলো। ইস্পাতের তৈরি বাসের রডের মতো এবং এক বাস কন্ডাক্টার...যেন ওটা ধরেছিলো। ওরা লক্ষ্য করলো তার নখগুলো রঙ করা। একজন হাত ধরে আঙুলগুলো উঁচু করে দেখলো, দুলিয়ে দুলিয়ে অন্যদের দেখালো। ওরা হাসলো। একি? ব্যঙ্গ করলো একজন **'এসি-ডিসি?'**

আর একজন লাঠি দিয়ে তার যৌনাঙ্গে খোঁচা দিলো। বললো, 'দেখা তোর বুজরুকি। দেখা দেখি কত লম্বা হয় ওটা?' তারপর বুটওয়ালা পা তুলে মারল এক লাথি। তখনও সোলের খাঁজে একটা কেন্নো লুকিয়ে ছিলো। ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো। তার হাত দুটো পিছনে নিয়ে ওরা হাতকড়া পরিয়ে দিলো।

ক্লিক।

এবং

ক্লিক।

নিচে একটা ভাগ্যের পাতা। শরৎ রাতের পাতা। বোঝা গেলো মৌসুমী বায়ু সময়মতই আসবে। হাঁসের মত কুঁজো হয়ে রইলো সে হাতকড়া পরানোর পর।

'এ সে নয়,' রাহেল ফিসফিসিয়ে বললো এসথাকে। আমি জানি এ তার যমজ ভাই। কোচিন থেকে আসা উরুমবান।

ওই গল্পের প্রতি আগ্রহ দেখালো না। কিছুই বললো না এসথা।

একজন তাদের সঙ্গে কথা বললো। একটি দয়ালু উঁচুবর্ণের পুলিশ। তার মতোই সে দয়ালু।

'মন মল তোমরা ঠিক আছো? ওকি তোমাদের মেরেছে?' একসঙ্গে না হলেও যমজরা ফিসফিসিয়ে বললো হ্যাঁ– না।

'ভয় পেও না, এখন আমাদের সঙ্গে তোমরা নিরাপদ।' তখন পুলিশরা চারিদিকে তাকালো আর দেখলো ঘাসে ঢাকা জমি।

জলের পাত্র, হাঁড়ি-কুড়ি। বাতাসে ফোলানো হাঁস। কোয়ান্টাস কোয়ালার বোতামের চোখ। ড্যাব-ডেবিয়ে রইল। লন্ডনের রাস্তার ছবিওয়ালা বলপেন ছিলো ওদের কাছে। মোজাগুলোর সামনেটা ছিল অন্য রঙের। হলুদ রিমের প্লাস্টিকের সানগ্লাস। একটা হাতঘড়ি যাতে সময় আঁকা। এগুলো কার?

এগুলো আসলো কোত্থেকে?

কে এনেছে?

কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ছিলো। এসথা আর রাহেল তার দিকে অবাক চোখে তাকালো।

পুলিশরা একজন আর এক জনের দিকে তাকালো। তারা জানতো কি তাদের করতে হবে। কোয়ান্টাস কোয়ালাটা তারা নিলো তাদের বাচ্চাদের জন্য।

এবং কলম আর মোজাগুলোও। পুলিশের বাচ্চারা বিচিত্র রঙের মোজা পরা।

বাতাস ভরা হাঁসটা ফাটালো সিগারেট দিয়ে। ব্যাং। নষ্ট রবারগুলো মাটি চাপা দিলো।

অকাজের হাঁস। খুব বেশি চেনা যায়।

একজন পরলো চশমাটা। অন্যরা একটু হাসলো। ঘড়িটার কথা তারা সবাই ভুলে গেলো। ওটাই রয়ে গেল ইতিহাসের বাড়িতে। পিছনের বারান্দায়। ভুল সময়ের চিহ্ন নিয়ে। দু'টো বাজতে দশ মিনিট।

ওরা চলে গেলো।

ছয় যুবরাজ, পকেট ভরা খেলনা।

একজোড়া এক ভ্রূণের যমজ।

এবং হারানোর দেবতা।

সে হাঁটতে পারছিলো না। হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো তাকে।

কেউ দেখেনি তাদের।

বাদুড়গুলো অবশ্যই, অন্ধ ছিলো।

১৯

আম্মুকে বাঁচানো

পুলিশ স্টেশনে ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথু দু'টো কোকা-কোলা আনতে পাঠালো। সঙ্গে নল। চাকরের মতো একটা পুলিশ কনস্টেবল সেগুলো প্লাস্টিক ট্রেতে সাজিয়ে আনলো। আর ইন্সপেক্টরের টেবিলের ওপাশে বসা দু'টো কাদামাখা বাচ্চাকে দিলো। টেবিলে জমে থাকা ফাইল আর কাগজপত্রের ওপর দিয়ে ওদের মাথা অল্প একটু জেগেছিলো।

দু'সপ্তাহ্ পরে আবার এসথাকে বোতলের ভয় পেয়ে বসলো। ঠাণ্ডা। ফোঁস্ করে ওঠা। মাঝে মাঝে কোকা-কোলাও গণ্ডগোল বাধিয়ে দেয়।

ফোঁস করে ওঠা গ্যাস ওর নাকে চলে গিয়েছিলো। সে বিষম খেলো। রাহেল বুড়বুড়ি ছাড়ছিলো। রাহেল ওর নল দিয়ে ফুঁ দিচ্ছিল, বুড়বুড়ি উঠতে উঠতে বোতল ছাপিয়ে তার জামায় পড়লো। মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো। দেয়ালে ঝোলানো একটা বোর্ডের লেখাগুলো এসথা জোরে জোরে পড়তে লাগলো।

সসেনোটিলোপ সে বললো (পোলাইটনেসকে উল্টো করে) সসেনোটিলোপ, এসনেডিবো (ওবিডিয়েন্স উল্টো করে) 'ইটলাইওল (লয়ালিটি উল্টো করে), এসনেজিল্লেটনি (ইন্টেলিজেন্সের উল্টো)' রাহেল বললো।

'ইসেট্রুওস (করটেসির উল্টো)'

'ইসনেইসিফেস (এফিসিয়েন্সির উল্টো)'

নিজের সাফল্যের পর ইন্সপেক্টর ম্যাথু চুপ করেছিলো। সে বুঝতে পারছিলো বাচ্চা দু'টোর মধ্যে যোগসূত্র তৈরি হচ্ছে। অভিযুক্তদের সে লক্ষ্য করছিলো। এরকম সে আগেও দেখেছে...মানুষের মনের বন্ধ কপাট। মানসিক আঘাত সারিয়ে তোলার এটাই উপায়। সে এজন্যে সময় নিলো এবং চালাকি করে প্রশ্ন করলো। হঠাৎ করে। তোমার জন্মদিন কবে মন? আর তোমার সবচেয়ে প্রিয় রঙ কোনটা মল?

আস্তে আস্তে ভাঙা হাড় জোড়া লাগার মতো সবকিছু ঠিকঠাক হতে লাগলো। তার লোকজন তাকে বলেছিলো হাঁড়ি কুড়ির ব্যাপারটা। ঘাসের মাদুরের কথা। ভুলতে না পারা খেলনার কথা। ওরা এখন ধাতস্থ। ইন্সপেক্টর টমাস মজা পেলো

না। সে বেবি কোচাম্মার জন্যে জীপ পাঠালো। যখন তিনি আসলেন বাচ্চারা ও ঘরে ছিলো না, ইচ্ছে করেই এই ব্যবস্থাটা করেছিলো সে। তাঁকে নমস্কার-টমস্কার করলো না।

'বসুন' সে বললো।

বেবি কোচাম্মা বুঝতে পারছিলেন খুব খারাপ কিছু হয়েছে।

'ওদেরকে আপনি খুঁজে পেয়েছেন? সবকিছু ঠিক আছে?'

'কিছুই ঠিক নেই'। ইন্সপেক্টর চাঁচাছোলা উত্তর দিলো।

তার চাহনি দেখে আর গলার স্বর শুনে বেবি কোচাম্মা বুঝতে পারলেন অন্যরকম এক লোকের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। যে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আগে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন সে আর তেমন নেই। তিনি নিচু হয়ে বসলেন চেয়ারে। ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথু তার স্বর নরম করলো না।

বেবি কোচাম্মার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে কোট্টাইয়াম পুলিশ কাজ করেছিলো। পারাভানটিকে ধরা হয়েছিলো। কিন্তু খারাপ ব্যাপার হলো, মারামারিতে সে এমন জখম হয়েছিলো যে, রাতটা বাঁচে কিনা সন্দেহ হচ্ছিলো ইন্সপেক্টরের। কিন্তু এখন বাচ্চা দু'টো বলছে ওরা নিজেদের সিদ্ধান্তে গিয়েছিলো। তাদের নৌকা ডুবে গিয়েছিলো আর ইংরেজ বাচ্চাটা হঠাৎ ডুবে গিয়েছিলো। ওটা দুর্ঘটনা। কিন্তু পুলিশের জন্যে তখন সমস্যাটা হলো, পুলিশ হেফাজতে আপাতদৃষ্টিতে নিরপরাধ একটি লোকের মৃত্যু। যদিও সে পারাভান-অচ্ছুৎ। সত্যি তার স্বভাব খারাপ ছিলো। খারাপ ব্যবহার করেছিলো। কিন্তু সময়টা খারাপ, আইনের দৃষ্টিতে সে নিরপরাধ। কোন মামলাও ছিলো না।

'ধর্ষণের চেষ্টা?' বেবি কোচাম্মা মরা গলায় বললেন।

'ধর্ষিতার অভিযোগ কোথায়? কেউ দিয়েছে? স্বীকারোক্তি করেছে? আপনার সঙ্গে আছে?' ইন্সপেক্টরের গলা চড়াছিলো। প্রায় শত্রুর মতো হয়ে উঠলো।

বেবি কোচাম্মা এমনভাবে তাকালেন যেন ডুবে যাচ্ছেন। তাঁর চোখের নিচের চামড়া ঝুলে পড়লো। ভয় পেয়ে গেলেন, মুখের লালা নোনতা হয়ে গেলো। ইন্সপেক্টর এক গ্লাস জল তাঁর দিকে ঠেলে দিলো।

'সোজা কথা ধর্ষিতাকে অবশ্যই অভিযোগ করতে হবে। অথবা পুলিশ সাক্ষীর উপস্থিতিতে বাচ্চাদের পারাভানকে শনাক্ত করতে হবে তাদের অপহরণকারী হিসাবে। নতুবা'...বেবি কোচাম্মাকে তার দিকে তাকানোর সুযোগ দেয়ার জন্যে সে একটু হাসলো। 'নতুবা আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ দায়েরের জন্যে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।'

বেবি কোচাম্মার ঘন নীল ব্লাউজ ঘামে ভিজে উঠলো। ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথু তাঁকে জবরদস্তি করলো না। রাজনৈতিক অবস্থা তখন এমন ছিলো, যে তার নিজেরই বিপদে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো। সে জানতো কমরেড কে এন এম পিল্লাই সুযোগটা ছাড়বেন না। বোকার মতো ফাঁসে যাওয়ার জন্যে সে নিজেকে

লাথি মারলো। ছাপা ছোট হাত তোয়ালে দিয়ে সে শার্টের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বুকের ঘাম মুছলো। হাতের ঘাম মুছলো। তার অফিসটা ছিলো শান্ত। শুধু পুলিশী কাজকর্মের শব্দ ছিল, বুট ঠোকার শব্দ, জিজ্ঞাসাবাদের আসামীর গোঙানির শব্দ, মনে হচ্ছিল দূর থেকে আসছে কিংবা অন্য কোথাও থেকে।

'বাচ্চাদের যা শিখিয়ে দেওয়া হবে তাই বলবে,' বেবি কোচাম্মা বললেন, 'মিনিট পাঁচেক যদি একা আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

'আপনার ইচ্ছে,' ইন্সপেক্টর উঠে অফিসের বাইরে চলে গেলো। ওদের ভিতরে আনার আগে আমাকে মিনিট পাঁচেক সময় দিন।'

ইন্সপেক্টর ম্যাথু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেলো।

বেবি কোচাম্মা তাঁর ঘামে ভেজা মুখ মুছলেন। ঘাড় ডললেন, ছাদের দিকে মাথা উঁচু করে শিরদাঁড়া বেয়ে নামা ঘাম মুছলেন। গলার চর্বির ভাঁজে জমা ঘাম মুছলেন পালাউয়ের আঁচল দিয়ে। ক্রুশে চুমু খেলেন।

'হাইল্ মেসি, ফুল অব গ্রেস...'

প্রার্থনার শব্দগুলো তাঁকে নিঃসঙ্গ করে ফেললো।

দরজা খুলে গেলো, দরজা ঠেলে ভিতরে এলো এসথা ও রাহেল। কাদামাখা, কোকা-কোলায় ভেজা।

বেবি কোচাম্মাকে দেখে ওরা হঠাৎ থতমত খেয়ে ভদ্র বনে গেলো। অসাধারণ ভারি পাখাওয়ালা মথটা ওদের মনের ওপর পাখা ছড়িয়ে দিলো।

উনি আসলেন কেন? আম্মু কোথায়? এখনও কি সে তালাবন্ধ আছে?

বেবি কোচাম্মা ওদের দিকে সরাসরি তাকালেন। বেশ কিছুক্ষণ কিছু বললেন না। কথা বলে উঠলেন বিশ্রী কর্কশ স্বরে।

'কার নৌকা ওটা? কোত্থেকে পেয়েছিলি?'

'আমাদের। আমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, ভেলুথা ঠিক ঠাক করে দিয়েছিল, রাহেল ফিসফিস করে বললো।'

'কদ্দিন আগে পেয়েছিলি।'

'সোফি মল যেদিন আসে সেদিন পেয়েছিলাম।'

'আর তোরা বাড়ি থেকে জিনিস চুরি করে নদী পার হচ্ছিলি?'

'আমরা কেবল খেলছিলাম।'

'খেলছিলাম! এটাকে তাই বলে নাকি?'

আবার কথা বলার আগে বেবি কোচাম্মা কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'তোদের ফুটফুটে মামাতো বোনটার লাশ এখন বসার ঘরে পড়ে আছে। মাছেরা ওর চোখ খুবলে খেয়ে ফেলেছে। ওর মা'র কান্না থামানো যাচ্ছে না। ওটাকে তোরা বলছিস খেলা?'

একটা দমকা বাতাস জানালার ফুল ছাপা পর্দাটাকে সরিয়ে দিলো। রাহেল বাইরে দেখলো একটা জীপ দাঁড়িয়ে। লোকজন হাঁটছে, একটা লোক মোটর

সাইকেল স্টার্ট দিতে চেষ্টা করছে। প্রত্যেকবার কিক স্টার্টার লিভারে চাপ দেওয়ার সময় সে লাফিয়ে উঠছিলো, তার হেলমেটটা একদিকে কাত হয়ে নেমে এসেছিলো।

ইন্সপেক্টরের ঘরের মধ্যে পাপাচির মথ উড়তে শুরু করেছিলো।

'এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার, একজনের জীবন নিয়ে নিলো।' বেবি কোচাম্মা বললেন, 'এমন খারাপ কাজ করে? এমনকি গডও এজন্য ক্ষমা করবেন না। তোরা জানিস, জানিস না?'

দু'টো মাথা দু'বার নাড়লো।

'তারপর'– তিনি মুখ গোমড়া করে বললেন 'তোরাই করলি।' তিনি ওদের চোখের দিকে তাকালেন 'তোরা খুনি।' একটু থামলেন কথাটা ওদের মধ্যে ঢোকানোর জন্যে।

'তোরা জানিস আমিও জানি ওটা দুর্ঘটনা নয়। আমি জানি তোরা কতোটা হিংসুটে। আর কোর্টে জজ আমাকে প্রশ্ন করলে আমি বলবো না? আমি মিথ্যে বলবো না। বলবো?' তিনি পাশের চেয়ারটায় চাপড় মারতে লাগলেন। চারটে গাল আর দু'টো পাছা ওতে জড়োসড়ো হয়ে ঢুকলো।

'আমি ওদের বলবো আইন ভেঙে তোরা কেমন করে নদীতে গিয়েছিলি। কেমন করে তোরা ঐ মেয়েটাকে জোর করে তোদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলি, তোরা জানতিস ও সাঁতার জানে না। কেমন করে মাঝ নদীতে ওকে তোরা ঠেলে ফেলে দিয়েছিস, ওটা দুর্ঘটনা নয়, ঠিক না?

চারটে পিরিচ তাঁর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তাঁর এ গল্প শুনে ওরা বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো।

তারপর কি হয়েছিলো?

'এখন তোদের জেলে যেতে হবে।' বেবি কোচাম্মা স্বাভাবিক গলায় বললেন। তোদের জন্যে তোদের মাকেও জেলে যেতে হবে, ভালো লাগবে?

ভয়তরাসে চোখগুলো আর একটা ঝরনা তাঁর দিকে তাকালো। 'তোরা তিনজন থাকবি আলাদা তিনটে জেলখানায়। জানিস ইন্ডিয়ার জেলখানা কেমন?'

দু'টো মাথা দু'বার নড়লো।

বেবি কোচাম্মা তাঁর মামলা সাজাচ্ছিলেন। সাজিয়ে ফেললেন। তিনি (কল্পনায়) জেলখানার ছবি আঁকলেন। তেলাপোকায় ঠোকরানো খাবার। বাথরুমে ডাঁই হয়ে থাকা নরম বাদামী পায়খানা। ছারপোকার কামড়। তিনি বললেন অনেকদিন আম্মুকে জেলে থাকতে হবে। যদি মরে না যায়, জেল থেকে যখন সে বেরোবে তখন বুড়ি হয়ে যাবে, চুলে থাকবে উকুন। তাঁর নিজের মতো করে– যেমন সব সময় বলেন তেমন ঠাণ্ডা গলায় তিনি বলে গেলেন, ওদের ভবিষ্যৎতকে দেখিয়ে দিলেন। আশার প্রত্যেকটা রশ্মিকে তিনি স্ট্যাম্পট্‌ড্ আউট করে দিলেন, ওদের জীবন নষ্ট করে দিলেন। তারপর পরী-নানীর মতো তিনি তাদের একটা সমাধান দিলেন। বললেন, ওরা যা করেছে তার জন্যে ঈশ্বর যদিও কখনো ক্ষমা করবেন না

তবু পৃথিবীর জন্যে, যাতে আরও ক্ষতি না হয় তার একটা উপায় আছে। ওদের মাকে দুর্ভোগ আর কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে ওরা কিছু করতে পারে। তাই ওদেরকে বাস্তববাদী হওয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে।

'ভাগ্য ভালো' বেবি কোচাম্মা বললেন, 'তোদের ভাগ্য ভালো পুলিশ একটা ভুল করে ফেলেছে। একটা সৌভাগ্যের ভুল।' একটু থেমে তিনি বললেন 'ওটা কি, তোরা জানিস তাই না?'

পুলিশের টেবিলে একটা কাঁচের পেপার ওয়েটে কয়েকটা মানুষ আটকে ছিলো। এসথা তাদের দেখতে পাচ্ছিলো। একটা লোক ওয়ালৎজ নাচাচ্ছিল এবং একটা মেয়ে লোকও। মেয়েটির পরনে ছিলো সাদা পেশাক, নিচে পা দু'টো।

'জানিস না?'

পেপারওয়েটে ওয়ালৎজ-এর বাজনাও ছিলো। মামাচি বেহালা বাজাতেন।

রা-রা-রা-রা-রাম

পারুম-পারুম

'কথা হলো' বেবি কোচাম্মার গলা চড়লো 'যা হওয়ার হয়ে গেছে। ইন্সপেক্টর বলেছে ও মরেই যাবে কিছুতেই বাঁচবে না। তাই পুলিশ কি মনে করছে সেটা ব্যাপার না। আসল ব্যাপার হচ্ছে তোরা জেলে যেতে চাস কিনা কিংবা আম্মুকে তোদের জন্যে জেলে যেতে হবে কিনা? তোদেরই এখন ঠিক করতে হবে।'

'যদি তোরা তোদের মা'কে বাঁচাতে চাস তাহলে ওটা তোদের করতে হবে। কাজটা হলো বড় গোঁফওয়ালা আঙ্কেলের সঙ্গে যেতে হবে। উনি প্রশ্ন করবেন। একটাই প্রশ্ন, তোদের যা করতে হবে তা হলো শুধু "হ্যাঁ" বলা। তারপর আমরা সবাই বাড়ি চলে যাবো। খুব সোজা। বেশি কষ্ট হবেনা।'

বেবি কোচাম্মা এসথার চোখের দৃষ্টিটা লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল পেপার ওয়েটটা তুলে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। তাঁর বুক ধুকধুক করছিলো।

'তাহলে,' তিনি পান খাওয়া চকচকে দাঁত বের করে হাসলেন তাঁর গলায় কিছুটা খস্‌খসে ভাব এসে গিয়েছিলো। 'ইন্সপেক্টর আঙ্কেলকে তাহলে কি বলবো? আমরা কি ঠিক করলাম? তোরা আম্মুকে বাঁচাতে চাস? না তাকে জেলে পাঠাতে চাস?' যেন তিনি তাদের দু'টো খেলার একটা বেছে নিতে বলছেন মাছ ধরা বা শুয়োর নাওয়ানো? শুয়োর নাওয়ানো বা মাছ ধরা!

যমজ দু'টো তাঁর দিকে তাকালো। একসঙ্গে না (তবে প্রায়) দু'টো ভয়ার্ত কণ্ঠ ফিসফিস করে বললো 'আম্মুকে বাঁচাতে।'

পরের বছরগুলোতে এ দৃশ্যটা বার বার তাদের মাথায় ঘুরে ঘুরে আসতো। শৈশবে। কৈশোরে। বড় হয়ে। যা তাদের উচিত ছিলো না তাই তারা করেছিল? ওদের কি পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিলো? ফাঁদে আটকে ফেলা হয়েছিলো?

এক অর্থে– হ্যাঁ। কিন্তু বিষয়টা অত সরল ছিলো না। ওরা জানতো ওদেরকে বেছে নিতে বলা হয়েছিলো। কতো তাড়াতাড়ি যে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছিলো! এক সেকেন্ডের বেশি চিন্তা করার সময় দেওয়া হয়নি। ওরা মুখ ঘুরিয়ে বলেছিলো (একসঙ্গে না, তবে প্রায়), 'আম্মুকে বাঁচাও আমাদের বাঁচাও, আমাদের মাকে বাঁচাও।'

বেবি কোচাম্মা সহজ হলেন। সন্তুষ্টি কাজ করলো জোলাবের মতো। তিনি বাথরুমে যেতে চাইলেন। তাড়াতাড়ি। দরজা খুলে ইন্সপেক্টরকে ডাকলেন।

'ছোট্ট লক্ষ্মী বাচ্চারা' সে আসার পর তিনি তাকে বললেন, 'ওরা আপনার সঙ্গে যাবে।'

'দু'জনের দরকার নেই একজনকে দিয়েই কাজ চলবে।' ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথু বললো। 'যে কোন একজন। মন। মল। কে যাবে আমার সঙ্গে?'

'এসথা' বেবি কোচাম্মা ঠিক করে দিলেন। বুঝেশুনেই বললেন কারণ দু'টোর মধ্যে ওটাই বুঝদার। বেশি চালাক। দূরদৃষ্টি বেশি। বেশি দায়িত্বশীল।

'তুই যা– গুডবাই।'

ছোট্ট মানুষ। থাকতো সে ক্যারাভানে। দাম দাম।

এস্থা চলে গেলো।

রাষ্ট্রদূত ই, পেলভিস। বড়বড় চোখে, এলোমেলো চুল। এক বেঁটে রাষ্ট্রদূতকে আগলে নিয়ে চললো এক লম্বা পুলিশের লোক। এক মারাত্মক অভিযানে। কোট্টাইয়াম পুলিশ স্টেশনের গভীর গর্তের মধ্যে। পাথুরে মেঝেতে তাদের পা ফেলার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

রাহেল রয়ে গেলো ইন্সপেক্টরের অফিস রুমে আর ভুট্‌ভাট্‌ শব্দ শুনতে লাগলো। অফিসের লাগোয়া টয়লেটে ইন্সপেক্টরের পটে বেবি কোচাম্মা স্বস্তির কাজ সারছিলেন। ফ্ল্যাশটা অকেজো ছিলো, বেরিয়ে আসতে আসতে তিনি বললেন। 'খুব বাজে ব্যাপার।' ইন্সপেক্টর তাঁর পায়খানার রঙ আর চেহারা দেখে কি মনে করবে, ভেবে অস্বস্তি হচ্ছিলো তাঁর।

হাজতটা ছিলো ঘন অন্ধকার। এস্থা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তবে সে শুনছিলো যন্ত্রণায় হাঁসফাস করা নিঃশ্বাসের শব্দ। পায়খানার গন্ধ তার নাকে লাগলো। কেউ একজন সুইচ টিপলো। আলো জ্বললো। উজ্জ্বল। চোখ ধাঁধানো। নোংরা পিছল মেঝেতে পড়েছিলো ভেলুথা। আধুনিক বাতির নিচে এক প্রাগৈতিহাসিক দৈত্য। পুরো উলঙ্গ, তার মাটিমাখা মানড়ু খুলে গিয়েছিলো। মাথা থেকে রক্ত ঝরছিলো যেন গোপনে। মুখ ফুলে উঠেছিলো, মাথাটা হয়েছিলো কুমড়োর আকৃতি, বিশাল, ভারি, ছোট বোঁটার ওপরে উল্টো হয়ে জন্মেছিলো যেন। উল্টো দিকে বাঁকা হাসিও যেন ছিলো। পুলিশের বুট সন্তর্পণে ছড়িয়ে পড়া পেসাব এড়িয়ে গেলো, উজ্জ্বল উলঙ্গ বাল্বের আলো প্রতিফলিত হচ্ছিলো ওতে।

মরা মাছ ভেসে উঠলো এসথার ভিতরে। একটা পুলিশ পা দিয়ে ভেলুথাকে উল্টে দিলো। কোন সাড় ছিলো না। ইন্সপেক্টর টমাস ম্যাথু ঝুঁকে পড়ে তার জীপের

চাবি দিয়ে ওর পায়ের তলায় জোরে দাগ কাটলো। ফোলা চোখ খুললো। আশ্চর্য হলো। রক্তের পর্দার মধ্যে দিয়ে দেখলো একটা প্রিয় শিশুকে। এসথার মনে হলো সে মনে মনে হাসলো। তার মুখ নয়। তবে অক্ষত অংশগুলো। তার কনুই কিংবা কাঁধ।

ইন্সপেক্টর তার প্রশ্নটা করলো। এসথার মুখ বললো, হ্যাঁ।

শৈশবে পা টিপে বেরিয়ে গেলো।

নীরবতা বল্টুর মতো এঁটে গেলো।

কেউ সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিলো আর

ভেলুথা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

পুলিশের জীপে চড়ে ফেরার পথে বেবি কোচাম্মা রিলায়বল মেডিকোসে থেমে কালমপোজ কিনলেন। প্রত্যেককে দিলেন দু'টো করে। চুংগাম ব্রিজের কাছে পৌছাতে পৌছাতে ওদের চোখ ঘুমে ঢুলে আসলো। এসথা রাহেলের কানে কানে বললো,

'তুই ঠিক বলেছিলি, ও ছিলো না, ছিলো উরুমবান।'

'থ্যাং গড?' রাহেল ফিসফিস করে উত্তর দিলো।

'ও কোথায় গেছে মনে হয়?'

'আফ্রিকায় পালিয়ে গেছে।'

ওদেরকে মায়ের কাছে দেওয়া হলো ঘুমন্ত অবস্থায়, ওরা তখন এই কল্পনার রাজ্যে ভাসছিলো।

পরদিন সকালে আম্মু ঠেলে না তোলা পর্যন্ত ওরা জাগলো না। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ইন্সপেক্টর ম্যাথু ছিলো এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ, তার কথাই ঠিক হলো, ভেলুথা রাতটা পার করতে পারলো না। মাঝরাতের আধঘন্টা পর মৃত্যু তাকে নিয়ে গেলো।

আর তখন ছোট পরিবারটা নীল সুতোর ফোঁড় তোলা শুজনী জড়িয়ে ঘুমিয়েছিলো? ওদের কি হয়েছিলো?

মরেনি। শুধু জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

সোফি মলের শেষকৃত্যের পর, আম্মু যখন তাদের নিয়ে থানায় গিয়েছিলো আর ইন্সপেক্টর তার আম দু'টো (ট্যাপ, ট্যাপ) পছন্দ করেছিলো ততক্ষণে তার মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো, সেই মাড়িখুজিতে– ভিখিরীদের গোরস্থানে। পুলিশ তাদের নিয়ম মতো মাটি চাপা দিয়েছিলো।

আম্মুর থানায় যাওয়ার কথা শুনে বেবি কোচাম্মা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। যা কিছুই তিনি– বেবি কোচাম্মা করেছিলেন, একটা হিসাব কষে করেছিলেন। তিনি জুয়ার বাজির মতো ধরে নিয়েছিলেন যে, আম্মু আর যাই করুক, যতো রাগই দেখাক অন্তত ভেলুথার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা বাইরে প্রকাশ করবে না। কারণ তাঁর ধারণা ছিলো যে, সে বুঝবে ওটা করলে সে নিজেকে আর তার বাচ্চাদের

ভয়ঙ্কর ক্ষতি করবে। চিরদিনের মতো। আম্মুর অরক্ষিত দিকটার কথা বেবি কোচাম্মা হিসাবে আনেননি। বেমিলকে মেলানো– মাতৃত্বের প্রচণ্ড স্পর্শকাতরতা। আত্মহননের উদগ্র প্রবণতা।

তিনি স্তম্ভিত হয়েছিলেন আম্মুর প্রতিক্রিয়ায়। তাঁর পা'র তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিলো। তিনি জানতেন তাঁর সঙ্গে ইন্সপেক্টর ম্যাথু টমাসের একটা সখ্য আছে। কিন্তু সেটা ক'দিন থাকবে? সে বদলি হয়ে গেলে যদি মামলাটা আবার চালু করা হয়? এটা সম্ভব– কারণ কমরেড কে এন এম পিল্লাই পার্টি ওয়ার্কারদের জড়ো করে তাঁদের গেটের বাইরে থেকে শ্লোগান দেওয়াতে পেরেছিলেন, চীৎকার-চেঁচামেচিও হয়েছিলো। তখন থেকেই শ্রমিকরা কারখানার কাজে আসা বন্ধ করেছিলো। প্যারাডাইস পিকলসের উঠোনে জমে থাকা গাদা গাদা আম, কলা, আনারস, রসুন আর আদা ধীরে ধীরে পচতে শুরু করেছিলো।

বেবি কোচাম্মা বুঝতে পারছিলেন, আম্মুকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এইমেনেমের বাইরে পাঠাতে হবে। তিনি কি করবেন সেটাও তিনি ভেবে রেখেছিলেন। জমিতে সেচের ব্যবস্থা করাবেন, ফসলের পরিচর্যা করাবেন আর অন্যদের হিংসার উদ্রেক করবেন।

চাকোর দুঃখের জন্যে তিনি গুদামের মধ্যে ইঁদুরের মতো ছোঁক ছোঁক করে ঘুরছিলেন। সহজে উদ্ধার করার মতো একটা কৌশল তিনি রাগ গোপন করে ছকে ফেলেছিলেন। সোফি মলের মৃত্যুর জন্যে আম্মুকে দায়ী করতে তাঁর কষ্ট হয়নি। আম্মু আর তার দুই ভ্রূণের যমজদের।

চাকো যে শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙেছিলো, তাও বেবি কোচাম্মার কারসাজিতে। আম্মুর জিনিপত্র বেঁধেছেঁদে চলে যাওয়াটাও হয়েছিলো তাঁর বুদ্ধিতেই। এসথাকে ফেরত পাঠানোটাও।

২০

মাদ্রাজ মেল

আর তাই কোচিন হারবার টার্মিনাসে ট্রেনের শিকওয়ালা জানালার পাশে এসথা একাই ছিলো। রাষ্ট্রদূত ই, পেলভিস। একটা মাইলফলকের সঙ্গে এলোমেলো চুল। আর একটা সবুজ ঢেউ খেলানো ঘন-জলীয়, পিচ্ছিল, সামুদ্রিক শ্যাওলার মতো, ভাসমান, ভিত্তিহীন-সন্দেহজনক অনুভূতি। নাম লেখা ট্রাঙ্কটা ছিলো সিটের নিচে। ওর টিফিনবক্সে ছিল টমেটো স্যান্ডুইচ আর সামনের ফোল্ডিং টেবিলের ওপর ছিলো ওর ঈগল ওয়ালা ঈগেল ফ্লাস্কটা।

ওর পাশে বসেছিলো সবুজ লাল কাঞ্জিভরম শাড়ী পরা এক মহিলা, খেয়েই যাচ্ছিলো। তার নাকের দু'পাশে ছিল দু'টো হীরের নাকফুল। জ্বল জ্বল করছিলো উজ্জ্বল মৌমাছির মতো। মহিলাটি একটা বাক্স থেকে হলুদ লাড্ডু দিতে চাইলো এসথাকে। এস্থা মাথা নাড়লো। সে হাসলো, হাসতে হাসতে কাশলো। চশমার ভিতরে তার চোখ লুকিয়ে পড়লো। মুখ দিয়ে চুমুর মতো শব্দ করলো।

'একটা খেয়ে দেখো, খুব মিষ্টি' তামিলে বললো সে

'রোমবো মাদুরাম'

'সুইট,' তার এসথার চেয়ে বয়সে বড় মেয়ে বললো ইংরেজিতে। এসথা আবার মাথা নাড়লো। মহিলাটি তার চুল নেড়ে দিলো আর তার ফাঁপানো চুল এলোমেলো হয়ে গেলো। মহিলাটির পুরো পরিবার (স্বামী আর তিন বাচ্চা) সবাই লাড্ডু খেতে শুরু করেছিলো। গোল বড় বড় হলুদ লাড্ডুর গুঁড়ো সিটে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাদের পায়ের নিচে ছিলো ট্রেনের কাঁপতে থাকা মেঝে। নীল রাতের বাতিটা তখনও জ্বালানো হয়নি।

খাউনে মহিলার ছোট ছেলেটা ওটা সুইচ টিপে জ্বালালো। খাউনে মহিলাটি ওটা নেভালো। সে তার বাচ্চাটাকে বললো, 'ওটা ঘুমানোর বাতি জেগে থাকার বাতি না।'

ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস বগির সবকিছু ছিলো সবুজ। সিটগুলো সবুজ। ওপরের বার্থ সবুজ। মেঝে সবুজ। চেন সবুজ। কোনোটা গাঢ় সবুজ কোনোটা হালকা সবুজ।

'ট্রেন থামাতে চেন টানুন' সবুজ রঙে লেখা ছিলো, বাক্যটাকে উল্টো করে মনে মনে পড়লো এসথা, তাও সবুজ। জানালার শিক গলিয়ে আম্মু হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো। 'তোর টিকিটটা সাবধানে রাখিস' আম্মুর মুখ বললো। আম্মুর না কাঁদতে চাওয়া মুখ। 'ওরা চেক করতে আসবে।'

এসথা ট্রেনের জানালায় আম্মুর অস্থির মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। রাহেলের দিকে তাকালো– ছোট্ট মেয়েটা স্টেশনের ধুলো-ময়লার সঙ্গে মিশেছিলো। ওরা তিনজনই আলাদা আলাদাভাবে জানতো তাদের প্রিয় মানুষটিকে ভালোবেসে তারা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলো।

ওসব কাগজপত্রে লেখা ছিলো না।

যা ঘটেছিলো তাতে আম্মুর ভূমিকা কতোটা ছিলো, তা বুঝতে যমজদের অনেক বছর সময় লেগেছিলো।

সোফি মলের শেষকৃত্য আর এসথার ফিরে যাওয়ার আগের ক'টা দিন ওরা দেখেছিলো তার চোখ ফোলা আর বাচ্চাদের আগলে রাখার চেষ্টা, ওদেরকে সে পুরোপুরি তার চোখে চোখে রেখেছিলো।

'নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগেই স্যান্ডুইচগুলো খেয়ে ফেলিস' আম্মু বললো, 'আর লিখতে ভুলিস না।'

ধরে থাকা ছোট্ট হাতটার আঙুলগুলো সে খুঁটছিলো, বুড়ো আঙুল থেকে কালো একটা ময়লার দলা বের করেছিলো।

'আমার মানুষটাকে দেখে রাখিস, আমি যেন তাকে গিয়ে পাই। কবে আম্মু? কবে তুমি তার কাছে যবে?'

তাড়াতাড়ি।

'কিন্তু কবে? ঠিক কবে?'

'তাড়াতাড়ি সোনামণি। যতো তাড়াতাড়ি আমি পারি।'

'পরের মাসে? আম্মু?' জোর দিয়ে জানতে চাইলো এসথা তবে আম্মু মনে মনে বলছিলো, অনেক দেরি আছে সে বলতে চাইলো।

তার আগে এসথা, বুঝে শুনে চলিস তোর লেখাপড়ার কি হবে?

'তাড়াতাড়ি আমি একটা চাকরি পেলেই। তাড়াতাড়িই আমি এখান থেকে চলে যাবো একটা চাকরি নেবো,' আম্মু বললো।

'কিন্তু তা কখনও হবে না (বাট দ্যাট উইল বি নেভার)' একটা ভয়ের ঢেউ। একটা ভিত্তিহীন-সন্দেহজনক অনুভূতি।

খাউনে মহিলাটি আড়ি পেতে শুনছিলো উদাসীনভাবে।

'দেখ্ কি সুন্দর ইংরেজি বলে,' তামিলে সে তার ছেলেমেয়েদের বললো।

'নেভার' শব্দটা দিয়ে এসথা বোঝাতে চেয়েছিলো অনেক দিনের কথা। অর্থাৎ এখন নয়, তাড়াতাড়িও না।

কিন্তু শব্দটা ওভাবেই এসেছিলো।

বাট দ্যাট উইল বি নেভার।

নেভার থেকে ওরা বের করে এনেছিলো একটা এন আর টি। ওদু'টো দিয়ে কথাটা হয়েছিলো নট এভার।

'ওরা'

সরকার।

যেখানে লোকজনকে স্বভাব-চরিত্র ভালো করার জন্যে পাঠানো হয়।

আর এভাবেই সব কিছু বদলে যায়।

নেভার, নট এভার।

তারই ভুল ছিলো। আম্মুর বুকে দূরের মানুষটি চীৎকার বন্ধ করেছিলো। তার ভুল ছিলো এটাই। আম্মু মারা গিয়েছিলো এমন একটা জায়গায় যেখানে তার সঙ্গে থাকার, তাকে দেখার, তার সঙ্গে কথা বলার কেউ ছিলো না।

কারণ একমাত্র সে-ই কথাটা বলেছিলো।

'কিন্তু আম্মু আর কখনোই যাবে না।'

'এসথা বোকার মতো বকিস না। তাড়াতাড়িই আসবো' আম্মুর মুখ বললো। মাস্টারী করবো। একটা স্কুল খুলবো। তুই আর রাহেল ওখানে পড়বি।'

'আমরা ওটা চালাতে পারবো কারণ ওটা আমাদেরই,' এসথা বলেছিলো। তার জেগে ওঠা আশা নিয়ে। ওর চোখ সুযোগ খুঁজছিলো। বিনা ভাড়ায় বাসে চড়ার, বিনা খরচে শেষকৃত্যের। বিনা পয়সায় লেখাপড়ার।

ছোট্ট মানুষ, যে থাকে একটা ক্যারাভানে। দাম দাম।

'আমাদের নিজেদের বাড়ি হবে' আম্মু বলেছিলো।

'একটা ছোট্ট বাড়ি।' রাহেলও বলেছিলো।

আর আমাদের স্কুলে আমাদের ক্লাসরুমগুলোতে থাকবে ব্ল্যাকবোর্ড। এসথা বলেছিলো।

আর চক।

'আসল টিচাররা পড়াবে।'

'ঠিকমতো শাস্তিও দেবে।' রাহেল বলেছিলো।

এভাবেই তৈরি হয়েছিলো তাদের স্বপ্ন। সেদিন এসথা ফিরে গিয়েছিলো। চক, ব্ল্যাকবোর্ড, আসল শাস্তি। ওরা কোন কিছু হালকাভাবে বলেনি। ওরা শুধু ওদের অপরাধের যোগ্য শাস্তি চেয়েছিলো। চায়নি সাজানো শোয়ার ঘরের দেয়ালে গাঁথা আলমারী। চায়নি সারা জীবন সুখে কাটানোর মতো তাক।

জানান না দিয়েই ট্রেনটা চলতে শুরু করেছিলো। খুব আস্তে আস্তে।

এসথার চোখের মণি ঝাপসা হয়ে উঠেছিলো। প্ল্যাটফরম ধরে হাঁটতে হাঁটতে আম্মু তখনও ওর নখ খুঁটে দিচ্ছিলো। মাদ্রাজ মেল জোরে ছুটতে শুরু করলে তার ছোটা দৌড় হয়ে গেলো।

গড ব্লেস মাই বেবি। মাই সুইটহার্ট, আই উইল কাম ফর ইউ সুন।

হাত ছাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এসথা চেঁচিয়ে উঠেছিলো 'আম্মু'– বলে। আঙুল থেকে আঙুল খুলে যাচ্ছিলো। 'আম্মু বমি পাচ্ছে,' এসথার কণ্ঠ যেন কুয়োর গভীরে হারিয়ে গেলো।

লিট্‌ল এলভিস, এলোমেলো চুলে গন্ধওয়ালা পেলভিস। আর বেগি আর চোখা জুতো পরা। তার কণ্ঠস্বর পিছনে ফেলে গিয়েছিলো।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রাহেল গলা চড়িয়ে চীৎকার করতে লাগলো। চীৎকার করতে লাগলো।

ট্রেনটা চলে গেলো। আলোটা দূরে সরে গেলো।

তেইশ-বছর-পর, রাহেল, হলুদ টিশার্ট পরা কালোমেয়েটি, অন্ধকারে এসথার দিকে ফিরেছিলো।

'এসথা পাপ্পাইচাচেন কুট্টাপেন পিটার মন' সে বললো।

ফিসফিস করলো সে।

মুখটা নাড়ালো।

ওদের সুন্দর মায়ের মুখটা।

এসথা একেবারে খাড়া হয়ে বসেছিলো, ধরা পড়ার অপেক্ষায়। ওর ওপর আঙুল রাখলো। মুখ থেকে তৈরি হওয়া কথাগুলো ছুঁতে চাইলো। ফিসফিসানিটা ধরে রাখার জন্যে। ওর আঙুলগুলো অনুসরণ করে চললো তার বদলে যাওয়া আকৃতি। দাঁতের ছোঁয়া। ওর হাত ধরা পড়লো এবং চুমু খেলো।

একটা ঠাণ্ডা গালের ওপর চেপে ধরেছিলো, ঝমঝম বৃষ্টিতে ভেজা। তারপর সে বসে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। টেনে পাশে বসালো। ওরা ওভাবেই শুয়ে রইলো বহুক্ষণ। অন্ধকারে জেগে উঠলো। হঠাৎ এবং নিঃসঙ্গ।

বৃদ্ধ নয়। তরুণ নয়।

তবে চলনসই একটা মৃত্যুর বয়স।

অপরিচিত মানুষের মতো হঠাৎ ওদের দেখা হয়ে গিয়েছিলো ওরা একে অন্যকে চিনতো জীবন শুরু হওয়ার আগেই।

তারপর কি হয়েছিলো তার ব্যাখ্যা যে কেউ দিতে পারবে। এমন নয় (যেমন মামাচির বইতে আছে) যে দুই বিপরীত লিঙ্গের প্রেম। কিংবা অনুভূতির চাহিদা মেটানো।

এসব ছাড়া সম্ভবত আর কোন পাহারাদার রাহেলের চোখ দিয়ে দেখেনি। কেউ জানালা দিয়ে সাগর দেখেনি। কিংবা নদীর পাড়ে একটা নৌকা। অথবা হ্যাট মাথায় কোন পথিককে।

এসব ছাড়া সম্ভবত ছিলো অল্প ঠাণ্ডা। একটু ভেজা। কিন্তু খুবই শান্ত। বাতাস।

এবং কীইবা বলার ছিলো?

কেবলই ছিলো অশ্রু। শুধু নীরবতা আর শূন্যতা জোড়া লেগেছিলো সাজিয়ে রাখা চামচের মতো। শুধু সুন্দর গ্রীবার ভিতরে কফ দলা পাকিয়ে যাচ্ছিলো। শুধু একটা মধুরঙা কাঁধে অর্ধেক গোল দাঁতের দাগ বসে গিয়েছিলো। শুধু ওরা অনেকক্ষণ জড়াজড়ি করেছিলো ওটা হয়ে যাওয়ার পর। ঐ রাতে ওরা যা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলো তা সুখ না, ভয়ঙ্কর কষ্ট।

শুধু আবার ওরা প্রেমের আইন ভেঙেছিলো। ঐ প্রশ্নটাই শুধু ছিলো কে কাকে ভালোবাসলো। কেন? আর কতোটা?

পরিত্যাক্ত ফ্যাক্টরীর ছাদে এক নিঃসঙ্গ ঢুলি ঢোল বাজাচ্ছিলো। একটা পর্দাওয়ালা দরজা বন্ধ হলো। একটা ইঁদুর ফ্যাক্টরীর মেঝে দিয়ে দৌড়ে গেলো। মাকড়শারা আচারের গামলাগুলোর মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলো জাল বানিয়ে। একটা জিনিস্ ছাড়া আর সবকিছু ছিলো খালি। একটার মধ্যে সাদা খানিকটা গুঁড়ো স্তূপ হয়েছিলো। হাড়ের গুঁড়ো কুটরে প্যাঁচার। বহু আগে মরে যাওয়া। আচার প্যাঁচা।

সোফি মল প্রশ্ন করেছিলো চাকোকে–

'চাকো বুড়ো পাখিরা কোথায় গিয়ে মরে? কেন মরা পাখিরা আকাশ থেকে পাথরের টুকরোর মতো টুপ করে পড়ে না?'

যেদিন সে এসেছিলো সেদিন সন্ধ্যাতেই প্রশ্নটা করেছিলো। ও দাঁড়িয়েছিলো বেবি কোচাম্মার সাজানো পুকুরের পাড়ে আকাশে ওড়া ঘুড়িগুলো দেখছিলো।

সোফি মল। হ্যাট পরা। বেলবটম পরা। আর তখন থেকেই সবাই ওকে ভালোবেসেছিলো।

মার্গারেট কোচাম্মা (কারণ সে জানতো কখন ওরা আঁধারের হৃদয়ে গিয়েছিলো *(খ) যে কারুর যে কোন কিছু ঘটতে পারে*), ওকে প্রতিষেধক ট্যাবলেট খেতে ডেকেছিলো। ফাইলেরিয়া, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া। দুর্ভাগ্য হলো ওর কোন রোগ হয়নি মরেছিলো পানিতে ডুবে।

ডিনারের সময় হয়েছিলো।

'সাপার, বোকা,' সোফি মল বলেছিলো, এসথা ওকে ডাকতে গিয়েছিলো।

সাপারে বোকা, বাচ্চাদের একদিকে ছোট একটা টেবিলে বসানো হয়েছিলো। সোফি মল বসেছিলো বড়দের দিকে পিছন দিয়ে, খাবার দাবার দেখে তার মুখের চেহারা বদলে গিয়েছিলো। প্রত্যেকবার খাবার মুখে নিয়ে সে তার ফুফাতো ভাইবোনদের দেখিয়ে দেখিয়ে চিবাচ্ছিলো। আধা চিবানো, লালা জড়ানো, টাটকা বমির মতো লেগেছিলো ওর জিভে।

রাহেলও তাই করছিলো। আম্মু তাই দেখে ওকে ঠেলে তুলে বিছানায় নিয়ে এসেছিলো টানতে টানতে। বাতি নিভিয়ে দিয়েছিলো। তার 'গুড নাইট' চুমুতে রাহেলের গালে থুথুর দাগ পড়েনি। রাহেল বলতে চেয়েছিলো সে আসলে রাগেনি। 'তুমি আসলে রাগ করোনি আম্মু' খুশিতেই ফিস ফিস করে ও বলেছিলো।

একটু বেশি মায়ের আদর চাচ্ছিলো ও।

'না' আম্মু আবার ওকে চুমু দিয়ে বলেছিলো, 'গুড নাইট সুইট হার্ট গডব্লেস।'

'গুডনাইট আম্মু, তাড়াতাড়ি এসথাকে পাঠিও'।

আম্মু যেতে যেতে শুনতে পেয়েছিলো তার মেয়ের ফিস্‌ফিস্

'আম্মু!'

'আবার কি?'

'আমরা এক রক্তের না! তুমি আর আমি।'

আম্মু অন্ধকারে শোয়ার ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলো ডিনার টেবিলে ফিরে যেতে গিয়ে। ওখানে কথাবার্তা চলছিলো উড়ন্ত মথের মতো, শুধু সাদা একটা বাচ্চা আর তার মা ছিলো আলোর উৎস হয়ে। আম্মুর মনে হচ্ছিলো সে মরে যাবে, আর একটা কথা শুনলেই। টেনিস ট্রফি জেতা খেলোয়াড়ের মতো চাকোর হাসি গা জ্বালিয়ে দিচ্ছিলো কিংবা মামাচির। যৌন হিংসার গোপন স্রোত তার মধ্যে উঠে আসছিলো। অথবা ঘরবাড়ি কাজকর্ম নিয়ে হলেও তাকে আর তার ছেলেমেয়েদের কথার বাইরে রাখা বেবি কোচাম্মার স্বভাবই ছিলো।

অন্ধকারে যখন সে দরজায় হেলান দিয়েছিলো তখন সে তার স্বপ্নটাকে অনুভব করেছিলো, বিকেলের দুঃস্বপ্নটা তার মধ্যে জেগে উঠেছিলো সাগর জলের বিরাট একটা ঢেউয়ের মতো। নোনা চামড়ার এক হাতওয়ালা, সাগরের খাড়া পাড়ের মতো কাঁধওয়ালা হাসিখুশি মানুষটি যেন তার দিকে এগিয়ে আসছিলো ছায়ার মধ্যে থেকে ভাঙা কাঁচ ছড়ানো বেলাভূমির ওপর দিয়ে।

কে সে?

কে হতে পারে?

হারানোর দেবতা!

ক্ষুদে জিনিসের দেবতা!

হংসপুচ্ছ আর হঠাৎ মুচকি হাসির দেবতা!

সে এক সময়ে একটা কাজই করতে পারে।

যদি সে তাকে ছোঁয় তাহলে কথা বলতে পারে না, যদি ভালোবাসে তাহলে ছাড়তে পারে না, যখন সে কথা বলে তখন সে শোনে না, যদি সে লড়াই করে তাহলে জিততে পারে না।

আম্মু তাকে চাচ্ছিলো। তার সমস্ত জৈব যন্ত্রণা ছিলো তার জন্যে। সে ডিনার টেবিলে ফিরে গিয়েছিলো।

২১

বাঁচার দাম

প্রাচীন বাড়িটা ঝাপসা চোখ মুদে ঘুমে তলিয়ে গেলে, আম্মু লম্বা সাদা পেটিকোটের ওপর চাকোর একটা পুরনো শার্ট চড়িয়ে সামনের বারান্দায় পায়চারী করলো কিছুক্ষণ, সিড়ি দিয়ে ওঠানামা করলো। অস্থির। ব্যাকুল। তারপর বসলো বেতের চেয়ারটায়। ওটা ছিলো বোতামের মতো চোখওয়ালা বাইসনের মাথা আর তার দু'পাশে রাখা কম ভাগ্যবান একজনের এবং এলিউটি আমাচির ছবি দু'টোর নিচে। তার যমজ দু'টো ক্লান্ত হয়ে নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছিলো– চোখ আধখোলা রেখে। দু'টো ক্ষুদে দৈত্য। ঐ অভ্যাসটা ওরা পেয়েছিলো ওদের বাবার কাছ থেকে।

আম্মু তার ছোট ট্রানজিস্টারটা ছাড়লো। একটা পুরুষের হেঁড়ে গলার আওয়াজ বের হলো। একটা ইংরেজী গান হচ্ছিলো– আগে সে শোনেনি।

সে ওখানে অন্ধকারে বসেছিলো। এক নিঃসঙ্গ ঋজু নারী তাকিয়ে রইলো তার খিটখিটে ফুফুর সাজানো বাগানের দিকে, শুনতে লাগলো ছোট্ট রেডিওটা। বহু দূরের কণ্ঠস্বর। রাতের মধ্যে দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলো। হ্রদ আর নদীর ওপর দিয়ে পাল তুলে যাচ্ছিলো। বৃক্ষদের ঘন মাথার ওপর দিয়ে। হলুদ গীর্জাটাকে ছাড়িয়ে। স্কুল ছাড়িয়ে। কাঁচা রাস্তায় ঠোক্কর খেতে খেতে, বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠে। তার কাছে।

গানের দিকে মন ছিলো না, সে দেখছিলো বাতি ঘিরে পোকামাকড়দের হুটোপুটি। তাদের আত্মহননের ব্যাকুলতা। গানের বাণী তার মাথায় বিস্ফোরিত হয়েছিলো।

নষ্ট করার মত সময় নেই
আমি তাকে বলতে শুনেছি
তোমার স্বপ্নগুলোকে সত্যি করো
ওরা ঘুমিয়ে আছে
সব সময় মরতে থাকে
তোমার স্বপ্নগুলো হারিয়ে গেলে
তোমার মনটাও হারিয়ে যাবে।

আম্মু তার হাঁটু দু'টো জড়িয়ে বসলো। সে বিশ্বাস করতে পারছিলো না এত সহজে মিলে যাওয়া কথাগুলোকে। সে বিস্ফোরিত চোখে বাগানের দিকে তাকালো। কুটরে প্যাঁচা ওউসা নিঃশব্দে উড়ে গেলো রাতের ঘোরাঘুরিতে। রসালো এ্যানথুরিয়ামগুলো গানমেটালের মতো চক্‌চক্ করছিলো।

কিছুক্ষণ সে বসে রইলো। গানটা শেষ হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরও। হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে ডাইনির মতো তার পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গেলো। আরও ভালো সুখের জায়গায়।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলো, খাবারের গন্ধ পাওয়া পিঁপড়ের মতো। ওর বাচ্চাদের মতো নদীর পথটা সেও ভালোই চিনতো, চোখ বন্ধ করে চলে যেতে পারতো। গাছের তলা দিয়ে যাওয়ার সময় সে কেন তাড়াহুড়ো করছিলো সে নিজেই জানে না। প্রায় দৌড়ে পরিণত হলো তার হাঁটা। এক দমে সে পৌঁছালো।

মীনাচলের পাড়ে। হাঁফাতে লাগলো যেন কিছুর জন্যে দেরি হয়ে গেছে। যেন ওখানে সময়মতো পৌঁছানোর ওপর ওর জীবন মরণ নির্ভর করছিলো। ও যেন জানতো সে ওখানে থাকবে। অপেক্ষায়। যেন সেও জানতো ও আসবে।

সে এসেছিলো।

তার জন্যেই।

তার মধ্যে জ্ঞানটা ঢুকেছিলো বিকেল বেলায়। পরিষ্কার। ধারালো ছুরির মতো। যখন ইতিহাস পিছলে গিয়েছিলো। যখন সে ওর ছোট্ট মেয়েটাকে কোলে নিয়েছিলো। যখন ছোট মেয়েটার চোখ বলেছিলো সে একাই কেবল উপহার নেবে না। তারও কিছু দেওয়ার আছে। তার নৌকা, তার বাক্সগুলো, তার ছোট্ট হাওয়াকল, ওগুলো পেয়ে ছোট্ট মেয়েটার মুখে হাসি ছড়িয়েছিলো আর সঙ্গে সঙ্গে পড়েছিলো গভীর টোল। তার মসৃণ বাদামী শরীর। তার উজ্জ্বল কাঁধ। তার চোখ দু'টো। ওগুলো যেন আরও কোথাও ছিলো সব সময়।

সে ওখানে ছিলো না।

আম্মু পাথরের সিঁড়ির শেষ ধাপে বসেছিলো। হাত মুড়ে মাথা ঢেকে রেখেছিলো। নিজেকে তার বোকা বোকা লাগছিলো অত নিশ্চিন্ত হওয়ায়।

এত নিশ্চিন্ত।

তখন ভাটিতে, নদীর মাঝ বরাবর ভেলুথা চিৎ হয়ে ভাসছিলো, তারার দিকে তাকিয়ে। তার অচল ভাই আর এক চোখওয়ালা বাবাকে রাতে খাবার রান্না করে খাইয়েছিলো, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সে তখন মুক্ত হয়ে নদীতে এসে শুয়ে পড়েছিলো। মৃদু স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। একটা গুঁড়ি। একটা শান্ত কুমির। নারকেল গাছগুলো নদীর ওপর নুয়ে ছিলো। তাকে ভেসে যেতে দেখছিলো। হলুদ বাঁশ ভিজছিলো। ছোট ছোট মাছ তার সঙ্গে স্বাধীনভাবে ভেসে যাচ্ছিলো। ঠোকর মারছিলো। সে ওল্টালো। উজানে সাঁতার কাটতে লাগলো। স্রোতের উল্টোদিকে। পাড়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিলো। জল আছড়ালো, এত নিশ্চিত হয়ে নিজেকে কেবল বোকা মনে হলো। এত নিশ্চিত।

যখন সে তাকে দেখলো এতটাই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো যে ডুবে যাচ্ছিলো প্রায়। ভেসে থাকার জন্যে সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগাতে হলো। সে জল ছলকালো, অন্ধকার নদীর মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে রইলো।

অন্ধকার নদীতে তার মাথার ওঠানামা সে দেখতে পেলো না। তাকে অন্য কিছু ভেবেছিলো সে। ভেসে যাওয়া নারকেল। যে কারণেই হোক সে তাকায়নি। দু'হাতে সে মাথা ঢেকেছিলো।

সে তাকে লক্ষ্য করলো। কিছুটা সময় নিলো।

সে কি জানতো যে এমন একটা সুড়ঙ্গে সে ঢুকতে যাচ্ছে যাতে সে শুধু নিজের ধ্বংসই ডেকে আনতে পারে, সে কি ফিরতে চেয়েছিলো?

সম্ভবত?

সম্ভবত না।

কে জানে?

সে তার দিকে সাঁতরাতে লাগলো। নিঃশব্দে। জল কেটে এগোতে লাগলো কোন ঢেউ না তুলে। যখন সে প্রায় তীরে পৌঁছে গেছে তখন ও তাকে দেখলো। তার পা ছুঁলো কাদা প্যাঁচপেচে নদীর খাত। অন্ধকার নদী থেকে উঠে এসে সে পাথুরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো। ও দেখলো, যে পৃথিবীতে ওরা দাঁড়িয়ে আছে সেটা তার। সেই তার মালিক। এই জল। এই কাদা। এই গাছ। এই মাছ। তারা। সে সহজেই এর ভিতর দিয়ে চলে এলো। তাকে দেখতে দেখতে ও বুঝতে পারলো তার সৌন্দর্য্য। তার শ্রম কিভাবে তাকে গড়ে তুলেছে। যেমন করে সে কাঠ চেঁছে ছিলে সুন্দর করে তেমনি তাকেও সুন্দর করেছে। যে কটা তক্তা সে মসৃণ করেছে, যে কটা পেরেক সে ঠুকেছে, যে কটা জিনিস সে বানিয়েছে– সব কিছুই তাকেও বানিয়েছে। সব কিছুর সৌন্দর্য্যই তার মধ্যে রয়ে গেছে। তাকে শক্তি যুগিয়েছে। তাকে ব্যক্তিত্ব দিয়েছে।

পাতলা একটা সাদা কাপড় ছিলো তার কোমরের নিচে। দু'টো কালো পায়ের মাঝখানে আটকে ছিলো। তার হঠাৎ সাদা হাসি সে বয়ে নিয়ে এলো শৈশব থেকে যৌবনে। তার একমাত্র বোঝা।

দু'জন দু'জনকে দেখলো। ওরা বেশিক্ষণ ভাবলো না। তাদের জন্য যে সময় এসেছিলো তা চলে যাচ্ছিলো। মরা হাসি ছিলো ভবিতব্যে, তবে তা পরের কথা।

প-রে।

আম্বুর সামনে যখন সে দাঁড়ালো তখন নদী ঝরে পড়ছিলো তার শরীর বেয়ে। ও বসে বসেই তাকে দেখছিলো। চাঁদের আলোয় তার মুখটা মলিন দেখাচ্ছিলো। হঠাৎ শীত লাগলো তার। হৃদপিণ্ড ধুক্‌পুক্ করতে লাগলো। পুরোটাই ছিলো মারাত্মক ভুল। সে ওকে ভুল বুঝলো। সব কিছুই তার কল্পনায় হচ্ছিলো। একটা ফাঁদ ছিলো। ঝোপের মধ্যে লোকজন ছিলো। দেখছিলো। ও ছিলো সুন্দর টোপ। অন্য কিছু কেমন করে হয়? ওরা তাকে মিছিলে দেখেছিলো। সে চেষ্টা করলো তার গলা স্বাভাবিক রাখতে। স্বাভাবিক। বের হলো ভাঙা আওয়াজ।

'আম্মু কুট্টি...এটি?'

ভেলুথা তার কাছে গেলো নিজের শরীরের ভর দিয়ে দাঁড়ালো। আম্মু দাঁড়িয়েই ছিলো। সে ওকে ছুঁলো না। সে কাঁপছিলো। কিছুটা ঠাণ্ডায়। কিছুটা ভয়ে। কিছুটা কামনার যন্ত্রণায়। থির থিরে ভয়কে ছাড়িয়ে তার শরীর চাইছিলো টোপটা গিলতে। ওটা তাকে চেয়েছিলো। তাড়াতাড়ি। তার ভেজা শরীর ওকেও ভেজালো। আম্মু তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো।

ভেলুথা চেষ্টা করলো ছাড়াতে;

কী খারাপ জিনিস যেটা ঘটতে পারে? আমি সব হারাবো।...কাজ। আমার পরিবার। আমার জীবিকা। সব কিছু।

ও শুধু তার হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি শুনতে পাচ্ছিলো।

আম্মু ভেলুথাকে জড়িয়ে রইলো ওটা না কমা পর্যন্ত। কিছুটা হলো।

আম্মু শার্টের বোতাম খুললো। ওরা ওখানে দাঁড়ালো। কাছে আসলো গায়ে গা লাগিয়ে। ওর বাদামীর সঙ্গে তার কালো রঙ। ওর পেলবতার বিপরীতে তার কাঠিন্য। আম্মুর বাদাম-বাদামী স্তন (যা টুথব্রাশ ধরে রাখতে পারেনি) তার কালচে বুকের ওপর। ও নদীর ঘ্রাণ নিলো ভেলুথার শরীর থেকে। তার পারভান গন্ধ অসহ্য ছিলো বেবি কোচাম্মার। আম্মু জিভ দিয়ে তা চাখলো, তার গলা পর্যন্ত পৌঁছালো তার জিভ। তার কানের লতিতে। ভেলুথা তার মাথা টেনে এনে চুমু খেলো তার ঠোঁটে। একটা জলজ চুমু। একটা চুমু ফিরতি চুমু চাইলো। সেও ওকে চুমু খেলো। প্রথমে সাবধানে তারপর সজোরে। ধীরে ধীরে তার বাহু তাকে জড়িয়ে ধরলো পিছন থেকে। সে ওকে পিছনে ঠেলে দিলো। আলতো করে। ও অনুভব করলো তার হাতের তালুতে ওর ত্বক। খস্‌খসে। চামড়া ওঠা। শিরীষ কাগজ। আম্মু যাতে ব্যথা না পায়। সে সজাগ ছিলো। ও তাকে বোঝাতে চাচ্ছিলো কতো নরম ও। তার মধ্যে দিয়ে অনুভব করছিলো তার শরীরকে। যেখানে তার ছোঁয়া লাগছিলো সেখানেই ওর শরীর জেগে উঠছিলো। বাকিটা ছিলো ধোঁয়া। ও অনুভব করলো সে তাকে আঁকড়ে ধরেছে। ভেলুথার হাত দু'টো ছিলো আম্মুর নিতম্বে (যেগুলো টুথব্রাশ আটকাতে পারতো) তার দিকে টানছে, ওকে বোঝাতে চাচ্ছে কতোটা সে ওকে চায় কতটা কাছাকাছি কতটা গভীর।

জৈবতা নাচের মুদ্রা এঁকেছিলো। ভয় চলে গিয়েছিলো। ছন্দ এসেছিলো ওদের শরীরে, উত্তর দিচ্ছিলো পরস্পরের প্রশ্নের। যদিও ততক্ষণে ওরা জেনে গিয়েছিলো যে আনন্দ ওরা পাচ্ছে তার যন্ত্রণা উসুল হবে। ওরা জানতো কতটা তারা খেতে পারে আর কতটা তারা নিতে পারে। তারা আলাদা হলো। সামনা সামনি দু'জন দু'জনকে বুঝলো। আস্তে আস্তে আবার দু'জন দু'জনকে ধরা দিলো। তবে তা খারাপই হলো। ওটা শুধু চাহিদা বাড়ালো। আরও বেশি মূল্য দিতে হলো। কারণ ওটা বলিরেখা মুছে দিয়েছিলো। দ্বিধা আর অবৈধ প্রেমের টান তাদের উন্মাদ করে তুলেছিলো। শরীর চাচ্ছিলো শরীরকে।

ওদের পিছনে অন্ধকারে নদীটা স্পন্দিত হচ্ছিলো। বুনো সিল্কের মতো ঝলকাচ্ছিলো। হলুদ বাঁশ ভিজছিলো। রাত বিশ্রাম নিচ্ছিলো জলে আর দেখছিলো ওদের।

ওরা শুয়েছিলো একটা তাহার গাছের নিচে। ক'দিন আগে যেখান থেকে একটা নৌকাফুলওয়ালা ধূসর প্রাচীন নৌকা গাছ আর একটা নৌকা ফল উদ্ধার করেছিলো এক চলমান প্রজাতন্ত্র। একটা বোলতা। একটা পতাকা। একটা এলোমেলো চুল। একটা লাভ ইন টোকিওতে বাঁধা ঝরনা, খেলনা চশমা পরা।

গতিশীল, ব্যস্ত নৌকার পৃথিবী এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।

সাদা উঁইপোকারা তাদের কাজে চলে গেছে।

সাদা মা পাখিরা তাদের বাসায় ফিরেছে।

সাদা গুবরে পোকারা আলো দেখে সরে পড়েছে।

সাদা ঘাস ফড়িংগুলো সাদা কাঠের বেহালা বানিয়েছে।

সাদা দুঃখের সুর।

সব চলে গেছে।

শুকনো খোলা মাটিতে নৌকার ছাপ রেখে গেছে, পরিষ্কার আর ভালোবাসার জন্যে তৈরি। যদিও এসথাপ্পেন আর রাহেল জায়গাটা নিজেদের জন্যেই ঠিক করেছিলো। এমন ঘটার চিন্তাও করেছিলো হয়তো। আম্মুর স্বপ্নের যমজ ধাত্রী।

আম্মু এখন নগ্ন, ভেলুথার ওপর বসে আছে। ওর মুখ ওর মুখের ওপর। সে ওর চুলগুলোকে তাঁবুর মতো নিজের ওপর টেনে নিয়েছে। যেমন ওর বাচ্চারা বাইরের পৃথিবী থেকে লুকানোর জন্যে করে। ও পিছলে নামলো, নিজের বাকিটুকু উত্তপ্ত শরীরের সবটুকু ভেলুথাকে দেখাতে চাইলো। তার গলা, তার স্তনবৃন্ত, তার চকোলেটের মতো পেট। ভেলুথা তার নাভী থেকে নদীর শেষ স্বাদটুকুও শুঁষে নিলো। ও ভেলুথার বড় হয়ে ওঠা অঙ্গটির উষ্ণতা অনুভব করলো নিজের চোখের পাতা ঠেকিয়ে। জিভ-ঠোঁট দিয়ে চেখে দেখলো। তার মুখে নোনা স্বাদ, পিচ্ছিল, উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলো ভেলুথা। উষ্ণ অঙ্গটি চাচ্ছিলো তার বিপরীত উষ্ণ আবাস। সে উঠে বসলো ওকে ঠেলে দিলো পিছনে। ও অনুভব করলো তার পেট ওর পেটের সঙ্গে শক্ত হয়ে এঁটে গেছে। কাঠের মতো শক্ত। ও অনুভব করলো তার চামড়ার ওপর ওর ভিজিয়ে দেওয়ার অনুভূতি। সে তার একটা স্তনবৃন্ত মুখে নিলো, চুষলো। আর একটা ধরল, চাপ বাড়ালো, দলতে লাগলো তার কর্কশ থাবা দিয়ে। শিরীষ কাগজে ভেলভেটের দস্তানা।

তখন আম্মু ভেলুথাকে ওর ভিতরে ঢোকার পথ দেখালো। ও যেন দেখলো ওর যৌবনের পিছলে সরে যাওয়া, তার তারুণ্য। চোখে তার বিস্ময়। ভেলুথার উষ্ণ অঙ্গটা আম্মুর উষ্ণতার স্পর্শে গিয়ে মাটি খুঁড়ে বের করলো যেন গোপন সম্পদ। ও তার দিকে চেয়ে হাসলো। যেন ও তারই শিশু।

একবার সে তার ভিতরে ঢুকেই ভয়ে পথ হারালো, তাড়াতাড়ি ঢুকে গেলো জৈব উৎসব। জীবনের দাম গেলো অতিমাত্রায় বেড়ে। যদিও পরে বেবি কোচাম্মা বলেছিলেন, খুব কম খরচেই সারা গেছে।

সত্যি কি?

দু'টো জীবন। দু'টো শিশুর শৈশব।

এবং ভবিষ্যতের অপরাধীদের জন্যে ইতিহাসের শিক্ষা।

ঝাপসা চোখ তাকালো ঝাপসা চোখের দিকে, একদৃষ্টে এক উজ্জ্বল নারী নিজেকে মেলে ধরলো এক উজ্জ্বল পুরুষের কাছে। ও ছিলো নদীর মতো চওড়া আর গভীর। সে ওর জলে নৌকা ভাসালো। ভেলুথা প্রবেশ করলো আম্মুর ভিতরে ও অনুভব করলো– সে শুধু ওর গভীর থেকে গভীরে যাচ্ছে। আশ্চর্য। ভয়ঙ্কর। অদম্য যন্ত্রণাদায়ক। তবু তাকে বললো আরও। আরো। যখন সে আসবে তখন থামবে। আম্মু আসলো। আর তখন তাকে ও থামালো, ওর শেষ গভীরতায় সে পৌঁছে গিয়েছিলো। কাঁপছিলো ঝাঁকি খাচ্ছিল, দীর্ঘশ্বাস, সে ডুবলো।

ও তার বুকের ওপর শুয়েছিলো। ওদের শরীর ঘামে জবজবে হয়ে গিয়েছিলো। ওর মনে হচ্ছিল শরীরটা কোথায় ঝরে গেছে। তার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছিলো। ও দেখলো তার চোখ পরিষ্কার হয়ে গেছে। সে ওর চুলে বিলি কাটলো। তখনও ভিতরে থাকা তার জিনিসটা শক্ত হয়েইছিলো আর কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। আস্তে আস্তে সে ওকে তার নিচে নিয়ে আসলো। ভেলুথা তার ভেজা কাপড়টা দিয়ে ওর ঘাম আর ময়লা মুছিয়ে দিলো। আম্মুর ওপর সে শুয়ে পড়লো, সাবধানে, ওর ওপর ভর না চাপিয়ে। ছোট ছোট নুড়ি তার হাতে বিঁধছিলো। সে ওর চোখে চুমু খেলো। ওর কানে। ওর স্তনে। ভেলুথার ঠোঁট আর জিভ খেলা করলো আম্মুর দু'টি বাদামী বোঁটায়। ওর পেটে। যমজদের জন্যে হওয়া সাতটা সেলাইয়ের দাগে। নাভির নিচে থেকে নেমে যাওয়া দাগে। অন্ধকার ত্রিভূজে নেমে গেল লেভাতুর জিভ। ওটা বলেছিলো কোথায় তাকে যেতে হবে। দু'পায়ের ভাঁজের ভিতরে, যেখানে তার ত্বক সবচেয়ে নরম। ছুতোর মিস্ত্রির হাত আম্মুর নিতম্ব উঁচু করে ধরলো এবং এক অস্পৃশ্য জিভ স্পর্শ করলো ওর গভীরতম প্রদেশকে। জিভটা নড়ছিলো ঠোঁট জোড়া চুষছিল, অনেকক্ষণ ধরে সে ওর পাত্র থেকে পান করলো।

ও তার জন্য নেচেছিলো। ঐ নৌকার মতো মাটির ওপর। সেখানে ও ছিলো।

সে ওকে জড়িয়ে ধরেছিলো তাহার গাছে হেলান দিয়ে। ও একই সঙ্গে কাঁদছিলো আবার হাসছিলো। তারপর ওর মনে হয়েছিলো অনন্তকাল কিন্তু মিনিট পাঁচেক ও তার ওপর ভর দিয়ে শুয়েছিলো। ওর পিঠ ছিলো তার বুকে লেপ্টে। শত শত বছরের অবদমিত ক্ষুধার ভারি ডানা ওকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো ছায়ার ওপর দিয়ে। অনেকটা ভোঁতা ইস্পাত-শীতল অনুভূতি। আর আম্মুর পথে (বয়স এবং মৃত্যুর দিকে) একটা ছোট রৌদ্রস্নাত ছায়া পড়লো। তামাটে ঘাস নাড়িয়ে গেলো নীরব প্রজাপতিরা। এসব ছাড়িয়ে এক অতল গহ্বরে। ধীরে ধীরে ভয় ছড়িয়ে পড়লো তার মধ্যে। যা সে করেছে যা সে জেনেছে তা সে আবার করবে। আবার। ও জেগে উঠলো তার ধক্‌ধক্ করা হৃদপিণ্ডের শব্দে।

যদিও ওটা বেরুনোর একটা পথ খুঁজছিলো। অস্থির পাঁজরের মধ্যে। একটা গোপন টানা বা ভাঁজ করার মতো কপাট আর হাত দু'টো তখনও ওকে

জড়িয়েছিলো। ও অনুভব করেছিলো তার পেশীর নড়াচড়া। তখন সে তার খসখসে তালু ঘষছিলো। অন্ধকারে আম্মু নিজে নিজেই হাসলো। ভাবলো এই হাতগুলো তার ভালো লাগছে, ওগুলোর আকার, শক্তিকে। ওগুলোতে জড়িয়ে থেকে নিজেকে তার নিরাপদ মনে হচ্ছিলো, আসলে ওগুলো ছিলো ওর জন্যে সবচেয়ে মারাত্মক জিনিস।

আম্মু কাছে সরে আসলো, তার সঙ্গে মিশে যেতে চাচ্ছিলো, আরও বেশি ছোঁয়া চাচ্ছিলো। সে আবার ওকে তার দেহের গুহার মধ্যে টেনে নিলো। আম্মুর মধ্যে ভেলুথা শক্তিমান উষ্ণ। নদী থেকে একটা ঝিরঝিরে বাতাস উঠে ওদের শরীর জুড়ালো। একটু ঠাণ্ডা ছিলো। একটু ভেজা, একটু নীরব, বাতাস তখন।

কিছু কি বলার ছিলো?

ঘণ্টাখানেক পর আম্মু নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো আস্তে আস্তে।

'আমাকে যেতে হবে।'

সে কিছু বললো না। সে তার কাপড় পরা দেখলো।

এখন একটাই ব্যাপার। ওরা বুঝে গিয়েছিলো, যে কোন প্রশ্নই ওরা করতে পারে। একটাই ব্যাপার। সবসময়। ওরা দু'জনেই জানতো।

তারপরে, তের রাত ধরে ওরকম চলেছিলো। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুদে ক্ষুদে সব জিনিসকে ওরা জড়িয়েছিলো। বড় জিনিসগুলো সবসময় ভিতরে তড়পাচ্ছিলো। ওরা জানতো ওদের কোথাও যাওয়ার নেই। ওদের কিছুই নেই। ভবিষ্যত নেই। তাই ওরা জড়িয়েছিলো সব ক্ষুদে জিনিসকে। পাছায় পিঁপড়ে কামড়ানো নিয়ে ওরা হাসতো। শুঁয়োওয়ালা শুঁয়োপোকা পাতার ধারে এসে ঝুলতো। সুর ধরা ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো ওদের অধিকার দিতো না। একজোড়া ছোট মাছ ভেলুথার পিছনে লেগে থাকতো আর ঠোকর দিতো। ধ্যানমগ্ন মুনির মতো। সেই সময় ইতিহাস বাড়ির বারান্দায় ফাটলবাসী এক মাকড়শা নিজেকে লুকিয়ে ফেলতো, সারা গায়ে ময়লা মেখে। একটা রূপালী বোলতার ডানা। খানিকটা মাকড়শার জাল। ধুলো। পাতার বোঁটা। একটা মরা মৌমাছির শুকনো কণ্ঠনালী।

'চাপ্পু থামবুরান'

ভেলুথা বলতো ওকে।

ময়লা মহারাজ।

একরাতে ওরা তার আলমারীতে একটা জিনিস দিয়েছিলো– একটুকরো রসুনের াসা, সে ওটাকে অপরাধ মনে করে ক্ষেপে গিয়েছিলো। রাগের চোটে তার সব র্মচর্ম খুলে বেরিয়ে এসেছিলো, হতাশ, উলঙ্গ শিকনি-রঙের। যদিও সে তাদের াপড়ের জন্য দুঃখ পেয়েছিলো। কয়েকদিন সে ওভাবেই রইলো উলঙ্গ, মর মর। ার খোলস পড়ে রইলো, বিশ্বদর্শনের নিস্পৃহতা নিয়ে। একটা বাতিল দর্শন। র ওটা গুঁড়িমেরে আসলো। আস্তে আস্তে চাপ্পু থামবুরান নতুন পোশাক

কাউকে বলেনি, ওদের নিয়তির যোগসূত্র তৈরি করেছিলো, ভবিষ্যত উন্মত্ততা, আশা, অসীম আনন্দ) ছিলো তার হাতে। ওরা প্রতিরাতে

ওকে পরীক্ষা করতো (ভয় ক্রমশ বাড়ছিল) কি করে ও দিনটা পার করলো। ওরা তার সূক্ষ্ম-ভঙ্গুর কাজকর্ম দেখতো। তার ক্ষুদ্রত্ব। তার লুকানোর দক্ষতা। তার আত্মধ্বংসী অহঙ্কার। ওরা তার রুচিকে ভালোবাসতো। তার টলেটলে চলার মধ্যে ফুটে ওঠা ব্যক্তিত্বকে।

ওরা তাকে পছন্দ করেছিলো কারণ ওরা জানতো ওদের বিশ্বাসকে ভঙ্গুর কিছুর মধ্যে রাখতে হবে। ক্ষুদ্রকে জড়িয়ে। প্রত্যেকবার ওরা আলাদা হওয়ার সময় ছোট্ট একটা অঙ্গীকার করতো।

কালকে?

কালকে।

ওরা জানতো এক দিনেই সবকিছু বদলে যেতে পারে। এ ব্যাপারটা ওরা ঠিকই বুঝেছিলো।

যদিও *চাঞ্জু থামবুরানকে* ওরা বুঝতে ভুল করেছিলো। সে ভেলুথাকে ত্যাগ করেছিলো। পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে পিতৃ দায়িত্ব পালন করেছিলো।

সে সাধারণভাবেই মারা গিয়েছিলো।

প্রথম রাতে, যেদিন সোফি মল এসেছিলো, ভেলুথা তার প্রেমিকার পোশাকপরা দেখছিলো। তৈরি হওয়ার পর ও তার দিকে ফিরেছিলো। ও তাকে আলতো করে ছুঁয়েছিলো, তারপর তার চামড়ার ওপর একটা শিরশিরে দাগ টেনেছিলো। নির্জন নীল আকাশে জেট প্লেনের ধোঁয়ার মতো। ধান ক্ষেতে মৃদুমন্দ বাতাসের মতো। ব্ল্যাকবোর্ডে চকের দাগের মতো পাতলা। ভেলুথা আম্মুর মুখটা দু'হাতে ধরে তার দিকে টেনে নিয়েছিলো। চোখ বন্ধ করে ওর শরীরের ঘ্রাণ নিয়েছিলো। আম্মু হেসে উঠেছিলো।

'হ্যাঁ মার্গারেট,' ও মনে মনে বলেছিলো আমরা এটাও করি।

আম্মু ভেলুথার বোঁজা চোখে চুমু খেয়েছিলো এবং উঠে দাঁড়িয়েছিলো। ভেলুথা ছিলো তাহার গাছে পিঠ ঠেকিয়ে, দেখছিলো ওর হেঁটে যাওয়া।

একটা শুকনো গোলাপ ছিলো ওর চুলে।

ও মুখ ফিরিয়ে আবার বলেছিলো

না-আলেই

আগামীকাল।

ভারতীয় সমালোচকদের দৃষ্টিতে

ভাষার কারুকাজ আর কল্পনা দিয়ে অরুন্ধতী রায় শৈশবের এক মজার কিন্তু সতর্ক জগৎকে তুলে ধরেছেন, যাতে আছে একধরনের সারল্য, তীক্ষ্ণতা এবং ব্যাঙ্গ।

– মারিয়া কোউটো, **ফ্রন্টলাইন**

অসাধারণ ব্যাপ্তি, গভীরতা আর অনুভুতির কাজ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত অভিব্যাক্তি প্রকাশ করেছে প্রথম উপন্যাসেই। অত্যন্ত সুন্দর উপস্থাপন এবং বিষয়বস্তুর গভীরতা অতুলনীয়, রোমাঞ্চ কাহিনীর মতই। এতে আছে উত্তেজনা এবং বলিষ্ঠতা"

– সুনীল শেঠী, **আউটলুক**

দ্য গড অব স্মল থিংস এ আছে সবকিছুই: প্রতিধ্বনি, আহ্বান এবং পৃথিবীর ক্রন্দন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন নান্দনিক সাহস। এটি শুধু অতুলনীয় একটি উপন্যাসই নয় বরং মানুষের অমিমাংসীত গোপন বিষয় গুলির উপস্থাপন। নিঃসন্দেহে এটি অপ্রতিদন্দ্বী।

– রাজাগোপাল নিদাম্বুর, **সানডে অবজারভার**

রায় অতীত ও বর্তমানের অস্থিরতাকে অভূতপূর্ব দক্ষতা এবং মুন্সীয়ানায় তুলে ধরেছেন, আশ্চর্য এক নিয়ন্ত্রন রয়েছে তাঁর। বর্ননামূলক কাঠামোর মধ্যে প্রেম, ঘৃনা, বিশ্বাসঘাতকতা আর অপরাধকে মাকড়সার জালের মত বোনা হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ন সাফল্য।

- সুপ্রিয়া চৌধুরী, **এশিয়ান এজ**

বৃটিশ সমালোচকদের মন্তব্য

দ্য গড অব স্মল থিংস, এর সাফল্য এখানেই যে, এটি মস্তিস্ক এবং হৃদয়কে যুগপৎ সমভাবে ভাবায়। এটি কৌশলী এবং জটিল তবু সবাইকে হাসায়, শেষ পর্যন্ত কাদাঁয়। একটি ধ্রুপদী এবং ব্যাতিক্রমী কাজ।

– উইলিয়াম ডারলিমপেল, **হারপারস এণ্ড কুইন**

মনকাড়া শুরুর পর এটা বোঝা যায় যে, আমরা এক নতুন সুরের মায়াজালে বন্দী হয়েছি, যার সৌন্দর্য শ্বাসরুদ্ধকর। দ্য গড অব স্মল থিংস সত্যিকার এক বেদনা বিধুর অনুভূতি সৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহে এটি একটি মাষ্টারপিস।

– ক্রিশ্চিয়ানা প্যাটারসন, **অবজারভার**

মার্কিন সমালোচকদের দৃষ্টিতে

এমন এক রোমাঞ্চকর যাদুতে এটি আবদ্ধ করে যে পাঠক বাধ্য হয় আবার পড়তে। তখনই বুঝতে পারে এটি চিত্তাকর্ষক।

– দেইরদ্রে দোনাহিউ, **ইউ এস এ টুডে**

রায়ের বর্ননা ব্যাতিক্রমী–একই সঙ্গে নৈতিকতা এবং কল্পনাশক্তির বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়। পাঠককে শেষপর্যন্ত টেনে রাখে। একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রথম উপন্যাস।

– এ্যালিস ত্রাউস্ক, **নিউ ইয়র্ক বুক রিভিও**